ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি

এ. আর. দেশাই

কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা

আমার পিতামহের
স্মৃতির উদ্দেশে

যার বোধশক্তি ছিল 'বলিষ্ঠতর
বিশেষ করে কৌতুকরঞ্জিত
যে বোধশক্তিকে দীর্ঘদিন ধরে
নিদারুণ দুর্ভাগ্য কঠোর আঘাত হেনেছে'
যিনি আমার কাছে প্রকটিত করেছিলেন
যুক্তির মাহাত্ম্য ; মানবতার মহিমা
ও অস্তিত্বের আনন্দ।

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ লিখতে পেরে গ্রন্থকার আনন্দিত।

দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধে বলা হয়েছে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর ঘটনাপ্রবাহ জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং চূড়ান্ত। শুধু তাই নয় সারা বিশ্বেই এ থেকে ঘূর্ণি ঝড় উঠেছে। এই সময়ে যথেচ্ছ বা খামখেয়ালীভাবে না হলেও ইতিহাসের গতি সামুদ্রিক ঝড়ের মত প্রবাহিত হয়েছে।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদে যুদ্ধ ও যুদ্ধপরবর্তী ঘটনা প্রবাহের প্রবণতা আলোচনা করে একটা সংক্ষিপ্ত সংযোজন বসিয়ে দেবার জন্য প্রকাশকরা আমার ওপর চাপ দিয়েছিলেন। আমি একটা সংক্ষিপ্ত সংযোজন রচনার চেষ্টা করে-ছিলাম। কিন্তু তথ্যসম্ভারের ব্যাপ্তি ও জটিলতা এতটা যে এটাকে সংক্ষিপ্ত সংযোজনমাত্র করে রাখা সম্ভব হল না। একটা আলাদা জিনিস হয়ে গেল এবং তা **Recent Trends in Indian Nationalism** নাম দিয়ে একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে।

'ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি' গ্রন্থখানি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে সাদরে গৃহীত হয়েছে। এটা খুবই সন্তোষজনক ব্যাপার।

ডঃ জি. এস. ঘুরের সস্নেহ ও মূল্যবান নির্দেশাধীনে বর্তমান গবেষণা নিষ্পন্ন হয়েছে। তাঁর কাছে আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ সমাজতত্ত্ব গ্রন্থমালায় প্রকাশ করার জন্য আমি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এ. আর. দেশাই

সমাজতত্ত্ব বিভাগ
বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়
বোম্বে
নভেম্বর, ১৯৫৯

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ অধ্যাপক সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রধান ডঃ জি. এস. ঘুরের সাধারণ সম্পাদনাধীনে বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনায় সমাজতত্ত্ব গ্রন্থমালায় '১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক মতাবলম্বী বহু সমালোচক এই গ্রন্থের সপ্রশংস মূল্যায়ন করেছেন। আধুনিক ভারতের বিবর্তনে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব অতীব তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বর্তমান গ্রন্থে ভারতে জাতীয়তাবাদ উদ্ভবের সর্বতোমুখী এবং পরস্পর সংশ্লিষ্ট বিবরণ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

কাজটি আরম্ভ করবার পর দশ বছরেরও বেশী সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সময় ভারত এবং সারা বিশ্বে নানা ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে গেছে। বড় বড় রূপান্তর ঘটেছে। অসংখ্য ব্যাপার পরোক্ষ বা অস্পষ্ট অবস্থা থেকে অকস্মাৎ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। সারা বিশ্বে মানবসমাজের চরিত্রে দ্রুত গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেছে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের প্রভাবে ভারতেও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটেছে। অনেকদিন ধরে যে সব ঘটনা ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল সেগুলো কয়েক বৎসরে দ্রুত রূপান্তরের প্রবাহে মিলে গেছে।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমির অনুসন্ধান এই গ্রন্থের প্রধান লক্ষ্য। গত এক দশকে যে যুগান্তকারী ঘটনাসমূহ ঘটে গেছে দ্বিতীয় সংস্করণে শুধুমাত্র একটা postscript জুড়ে দিয়ে তার পরিচয় দেওয়া সম্ভব হত না। আমার ধারণা বর্তমান গ্রন্থের পরিণতি হিসাবে সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করলে তবেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে।

সুতরাং প্রথম সংস্করণে আলোচ্য বিষয়বস্তু যা ছিল দ্বিতীয় সংস্করণে তার চেয়ে বেশী কিছু নেওয়া হয় নি। সাম্প্রতিককালে ভারতে জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি আলোচনা করব বলে ইচ্ছা আছে।

অবশ্য নিম্নলিখিত কয়েকটি পরিবর্তনসহ দ্বিতীয় সংস্করণ পুনর্মুদ্রিত হল।

১। প্রথম সংস্করণে বিভিন্ন ধারণার যেসব পুনরাবৃত্তি ছিল সেগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে। ২। প্রথম সংস্করণের পাণ্ডুলিপি রচনার সময় ভারত ব্রিটিশ শাসনাধীন ছিল এই কারণে কাল সম্পর্কে যে সব অসঙ্গতি ছিল সেগুলো সংশোধন করা হয়েছে। ৩। পূর্ববর্তী সংস্করণে যে সব ধারণা অস্পষ্ট ছিল সেগুলো স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ৪। পাঠকের সুবিধার জন্য উপশিরোনামও যোগ করা হয়েছে।

ডঃ জি. এস. ঘুরের সস্নেহ ও মূল্যবান নির্দেশাধীনে এই বিষয়ে গবেষণা করেছিলাম। তাঁর কাছে আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সমাজতত্ত্ব গ্রন্থমালায় এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করবার জন্য আমি বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

সমাজতত্ত্ব বিভাগ
বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়
বোম্বে
আগষ্ট, ১৯৫৪

এ. আর. দেশাই

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

ভারতীয় সমাজের মধ্যযুগীয় ভিত্তি থেকে আধুনিক যুগের ভিত্তিতে রূপান্তর এবং এর ফলে সামাজিক, ধর্মীয়, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভৃতি নানারূপে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উদ্ভব সমাজবিজ্ঞান ও ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে গভীর আগ্রহের বিষয়। মানবজাতির প্রায় এক পঞ্চমাংশের এই আন্দোলনের শুধু মহত্ত্ব ও নাটকীয়তাই আছে তা নয়, মানবসমাজের ভবিষ্যৎ প্রশ্নেও এর গভীর তাৎপর্য রয়েছে। বিষয়টি অতীব আকর্ষণীয় এবং আমি এই বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম।

উপরন্তু ছাত্রজীবনে কিছু কিছু ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিজ্ঞতা থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে এই সব আন্দোলন সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা করতে হলে এবং আন্দোলনে যোগদান সার্থক করে তুলতে হলে ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন, নূতন সামাজিক শক্তিসমূহের উদ্ভব ও ভূমিকা এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সামাজিক উৎপত্তি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও ব্যাপক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

আমি যতদূর জানি এমন একখানা গ্রন্থও নেই যাতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সূচনা সম্পর্কে ঐতিহাসিক, সাংশ্লেষিক ও সুবিন্যস্ত বিবরণ লেখা আছে অথবা যে সব সুনির্দিষ্ট প্রভাব এবং যে অসংখ্য নতুন সামাজিক-ঐতিহাসিক শক্তিসমূহের নির্দিষ্ট গুরুত্ব ও পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া থেকে জাতীয় চেতনা জন্মলাভ করেছে তার বিবরণ পাওয়া যাবে। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ করা পি. এইচ্. ডি থিসিসের ভিত্তিতে রচিত বর্তমান গ্রন্থই এই অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে রচিত। বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে এবং যে সমস্ত শক্তিদ্বারা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশের সামাজিক পটভূমি বিবর্তিত ও গঠিত হয়েছিল সেগুলোকে সন্ধান করে বার করা এবং তাদের নির্দিষ্ট প্রভাব নির্ণয়ে আমি ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পদ্ধতি প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছি।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রধান, অধ্যাপক ডঃ জি. এস. ঘুরের সস্নেহ এবং মূল্যবান নির্দেশাধীনে আমি গবেষণা সম্পূর্ণ করেছিলাম। আমি তার উদ্দেশ্যে গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ উদ্ভবের জটিল এবং বৈচিত্র্যময় প্রক্রিয়া এবং তার বহুবিধ রূপের একটা সংহত চিত্র এই গ্রন্থে দেবার চেষ্টা করেছি। এই গ্রন্থের বহু ত্রুটি বিচ্যুতি আছে, এ বিষয়ে আমি সচেতন। তবে যদি পাঠকের মনে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ উদ্দীপিত হয় এবং ব্যাপকতর তথ্য ও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে বিশিষ্ট নতুন কাজে উৎসাহ সঞ্চার করে তবে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়ে উঠবে।

বম্বে
এপ্রিল, ১৯৪৬

এ. আর. দেশাই

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

সূত্র নির্দেশের ব্যাপারে গ্রন্থের নাম দেওয়া হয় নি, শুধুমাত্র লেখক ও পৃষ্ঠার উল্লেখ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট গ্রন্থগুলি গ্রন্থপঞ্জীতে ৩৮৭-৩৯৬ পৃষ্ঠায় তালিকাবদ্ধ করা আছে।

এক লেখকের একাধিক গ্রন্থের উল্লেখ আছে। এইরকম ক্ষেত্রে পৃষ্ঠা সংখ্যার আগে বন্ধনীর মধ্যে একটি সংখ্যা দেখতে পাওয়া যাবে। এই সংখ্যাটি গ্রন্থতালিকায় সংশ্লিষ্ট লেখকের উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের ক্রম নির্দেশক।

মুখবন্ধ

জাতীয়তাবাদ, ঐতিহাসিক ঘটনা

সর্বপ্রকার সামাজিক ব্যাপারের মতন জাতীয়তাবাদকে একটা ঐতিহাসিক বর্গ হিসাবে গণ্য করতে হবে। গোষ্ঠীজীবনে বিবর্তনের একটা পর্যায়ে কতকগুলো বিষয়াশ্রিত ও ব্যক্তিচেতনাগত ঐতিহাসিক পরিস্থিতি পরিণতি লাভ করলে সামাজিক ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়। E. H. Carr বলেছেন, "মধ্যযুগ শেষ হওয়ার আগে আধুনিক অর্থে জাতির উদ্ভব হয়নি।"

সাধারণভাবে বলা যায় যে জাতীয় সম্প্রদায়, জাতীয় সমাজ, জাতীয় রাষ্ট্র, জাতীয় সংস্কৃতি উদ্ভবের আগে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে মানবগোষ্ঠীসমূহ সমাজবিবর্তনের পর্যায়ক্রম যথা, কৌমজীবন, দাসত্বপ্রথা ও সামন্ততন্ত্র পার হয়ে এসেছিল। সামাজিক, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের একটা পর্যায়ে জাতির উদ্ভব হয়। কতকগুলো সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য দিয়ে জাতিকে পূর্ববর্তী প্রাক্ জাতি সম্প্রদায় থেকে পৃথক করা যায়। বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নোক্ত রূপ : প্রথমতঃ, নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী এবং অখণ্ড আর্থিক ব্যবস্থার অন্তর্গত জাতিবদ্ধ জনসাধারণের মধ্যে অঙ্গাঙ্গীবন্ধন, দ্বিতীয়ত, সাধারণতঃ এক জাতিভুক্ত লোকে এক ভাষাভাষী। তৃতীয়, জাতিভুক্ত লোকের মানসিক গঠনের সৌসাদৃশ্য এবং জাতির নিজস্ব প্রক্রিয়ায় বিবর্তিত সর্বজনীন সংস্কৃতি। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের পরিপূর্ণ বিকাশ হয়েছে এমন জাতি দুর্লভ। কারণ যে কোনো জাতির জীবনেই পূর্বের আর্থিক ব্যবস্থা, সামাজিক কাঠামো, মানসিক অভ্যাস এবং সংস্কৃতির উপাদান কিছু না কিছু থেকেই যায়। তবুও একথা ঠিক যে ষোড়শ শতকের পর থেকে মানবেতিহাসের রঙ্গমঞ্চে জাতীয় সংহতির বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থিত জাতীয় সম্প্রদায়ের বিকাশ হচ্ছে।

জাতি : E. H. Carr-এর সংজ্ঞা

যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য দ্বারা জাতিকে জাতি-বহির্ভূত সম্প্রদায় থেকে পৃথক করা যায় সে সম্পর্কে E. H. Carr-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

"জাতি নামক শব্দটি দ্বারা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানবগোষ্ঠী বোঝানো হয়।

(ক) সর্বতোগ্রাহ্য সরকার সম্পর্কে বোধ। এটা বর্তমানের বা বিগতকালের বাস্তব ঘটনা হতে পারে, ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষাও হতে পারে। সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর বিশেষ আকার এবং জাতিভুক্ত সকলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

(খ) মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড।

(গ) এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য (অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাষা) যা দিয়ে একটা জাতিকে অন্য জাতির ও জাতিবহির্ভূত গোষ্ঠী থেকে আলাদা করা যায়।

(ঘ) কতকগুলো ব্যাপারে সর্বজনীন আগ্রহ।
(ঙ) সকলের মনের ওপর জাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনুভূতি এবং ইচ্ছার খানিকটা প্রভাব।"২

বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদের বিকাশ

সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায় মিলে জাতির উদ্ভব হয়েছে। সৃজ্যমান জাতি বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে অগ্রসর হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংলণ্ডের কথা ধরা যাক। যে সামন্ততান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থা জনসাধারণকে আর্থিক দিক থেকে অসংহত করে রাখে এবং বাণিজ্য ও শিল্পবিকাশে বাধা সৃষ্টি করে ইংলণ্ডের সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র তাকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছিল। সৃজ্যমান জাতি এই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল। সৃজ্যমান জাতিকে রোমান চার্চের বিরুদ্ধেও সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছিল কারণ রোমান চার্চ ব্রিটিশ জনগণের সামাজিক এবং আর্থিক অসংহতির ওপর নির্ভরশীল ইংলণ্ডের সামন্ততান্ত্রিক আর্থিক এবং সামাজিক কাঠামোর ওপরে পবিত্রতার আবরণ দিয়ে রেখেছিল। সৃজ্যমান জাতি রোমান চার্চের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল এবং ইংলণ্ডের জাতীয় প্রোটেস্ট্যাণ্ট চার্চ স্থাপন করেছিল। ইংরাজ জনসাধারণ সংস্কারবাদী ও বৈপ্লবিক উভয় প্রকার রাজনৈতিক সংগ্রামের দ্বারা সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র উচ্ছেদ করে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র স্থাপন করেছিল। এই রাষ্ট্রের সাহায্যেই জাতীয় সামাজিক জীবন, আর্থিক ব্যবস্থা এবং সংস্কৃতি আরও সংহত করে তুলেছিল।৩

জাতি হিসাবে যারা সংহত হয়েছিল তাদের মধ্যে ইংরেজরা অন্যতম। কতকগুলি ঐতিহাসিক কারণে অন্য অনেক দেশের আগে ইংলণ্ডে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পূর্বাঞ্চলে বাণিজ্য ও শিল্পের বিকাশ হবার ফলে জনসাধারণ ক্রমবর্ধমান হারে পারস্পরিক বিনিময়ঘটিত সম্পর্কে আবদ্ধ হচ্ছিল এবং তার ফলে জাতীয় অর্থনীতির উদ্ভব হচ্ছিল। এর ফলে গণতান্ত্রিক এবং জাতীয়তাবাদী ভাবধারাও আগে উদ্ভূত হয়। এই ভাবধারা রাষ্ট্র ও সমাজ এবং ব্যক্তির মর্যাদা সম্পর্কিত সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণার বিরুদ্ধবাদী।

কালক্রমে অন্য দেশেও জাতীয়তাবাদ উদ্ভবের উপযোগী ঐতিহাসিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। অভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহের বিকাশ এবং বাইরের প্রভাব এই দুই কারণে এই ঘটনা ঘটল।

বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদের বিকাশ নিজ নিজ বিশেষ পরিস্থিতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এর মধ্যে আছে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, রাজনৈতিক, আর্থিক এবং সামাজিক কাঠামো এবং যেসব সামাজিক শ্রেণী জাতীয় সামাজিক বিকাশের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত তাদের নির্দিষ্ট মানসিক ও আর্থিক চরিত্র। ফলতঃ প্রত্যেকটি দেশেই জাতীয়তাবাদের বিকাশ হয়েছে স্বতন্ত্রভাবে।

সপ্তদশ, অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকের ইতিহাস মূলতঃ জাতিগঠনের ইতিহাস। অভ্যন্তরীণ ও বাইরের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে সৃজ্যমান জাতিদের পরিপূর্ণ জাতিরূপে প্রতিষ্ঠালাভের ইতিহাস এবং ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত

জাতিদের মধ্যে আত্মরক্ষা এবং আত্মবিস্তারের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক সংগ্রামের ইতিহাস। জাতিগঠনের প্রক্রিয়া বিংশ শতকেও চলেছে। এই সময় ভারতীয়, চীনা, তুর্কী, আরব এবং মিশর প্রভৃতি এশিয়া এবং আফ্রিকার জাতিসমূহ স্বাধীন জাতি হিসাবে পরিপূর্ণ বিকাশের পথে দেশীয় সামন্ততান্ত্রিক এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী বাধাসমূহ অপসারিত করবার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয়, এই সব জাতির সংগ্রামে জাতীয় ভিত্তিতে স্বচ্ছন্দে আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের দাবি উঠেছে। ইউরোপেও প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে (১৯১৪-১৮) মগিয়ার, হাঙ্গেরীয়, চেক প্রভৃতি যেসব জাতি বহুজাতিক অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের অধীন ছিল, তারা অধীনতা মুক্ত হবার জন্য সংগ্রাম শুরু করেছিল।[৪]

বর্তমান মানবজগৎ প্রধানতঃ বিভিন্ন জাতি নিয়ে গঠিত এবং নানাজাতির সমাহার। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য লীগ অফ নেশনস্ গঠন এবং এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাষ্ট্রসংঘ স্থাপন এই বাস্তব ঘটনার স্বীকৃতি বলে অভিহিত করা চলে। বর্তমান বিশ্বে জাতিই মানবসমাজের মুখ্য সংগঠন। বস্তুতপক্ষে সামাজিক জীবন থেকে বিবাদ-বিসম্বাদ লোপ করা এবং বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর সৃজনশীল ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকগণ, রাষ্ট্রনায়কগণ এবং রাজনীতিবিদগণ মানবসমাজের রাজনৈতিক এবং অপরাপর পুনর্গঠনের যেসব চিন্তা-ভাবনা করেছেন তা প্রধানতঃ জাতীয়তাবাদের নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থিক নীতি পুঁজিবাদ থেকে ঐতিহাসিকভাবে উন্নততর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উন্নীত হয়েছে। কিন্তু সেখানেও জাতীয়তাবাদের নীতি স্বীকৃত হয়েছে কেননা সোভিয়েত ইউনিয়ন বিভিন্ন জাতীয় প্রজাতন্ত্রের সমাহার। সব থেকে দুঃসাহসী মার্কসবাদী দ্রষ্টার চোখেও বিশ্বপর্যায়ে পরবর্তী স্তরে মানবসমাজের ভবিষ্যৎ প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক জাতির বিশ্ব সংগঠন বা সমাহার বলে প্রতিভাত হয়েছে।

জাতীয় ভাবানুভূতি বর্তমানকালের মুখ্য ভাবানুভূতি

দেখা যাচ্ছে, জাতি বর্তমান যুগের প্রধানতম বিষয় এবং জাতীয় ভাবানুভূতি মানুষের মুখ্য ভাবানুভূতি, সমসাময়িককালের আর্থিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক (প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা চর্চার মত বস্তুগত বিজ্ঞান চর্চা বাদে) আন্দোলনসমূহ সচেতন জাতীয় প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে থাকে। এই জাতীয় ভাবনা নিজ নিজ স্বাধীনতা ও সংস্কৃতিরক্ষার জন্যও হতে পারে, আবার অন্যান্য জাতির স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি দমন করবার জন্যও হতে পারে। আধুনিক বিশ্বে মানবসমাজকে পুঁজিবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করবার জন্য যতরকম সার্বিক পুনর্গঠনের পরিকল্পনা আছে—তার প্রত্যেকটি জাতিভিত্তিক।

জাতীয়তাবাদ : বর্তমানকালে গবেষণার বিশিষ্ট বিষয়বস্তু

মানুষের জীবনে জাতীয়তাবাদের অপরিহার্য ও নিশ্চিত ভূমিকা লক্ষ্য করে বিশ্বের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ সম্প্রতিকালে জাতীয়তাবাদ নিয়ে

বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। জাতীয়তাবাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তাঁরা আলোচনা, গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছেন যথা, কোন্ কোন্ উপাদান নিয়ে জাতি গঠিত হয়, কোন্ সামাজিক-ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলে জাতির উদ্ভব হয়, মানব-সমাজের অগ্রগতিতে জাতীয়তাবাদের ভূমিকা, আন্তর্জাতিকতাবাদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক এবং বিশ্বপর্যায়ে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য মানুষের আগ্রহ। এছাড়া সমাজ, অর্থব্যবস্থা, রাজনীতি ও সংস্কৃতির মত বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতীয়তা-বাদের প্রভাব সম্বন্ধেও পর্যালোচনা করতে চেষ্টা করেছেন। শেষতঃ কেউ কেউ বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও প্রসারের মৌল কারণসমূহ আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছেন। বস্তুতঃ সম্প্রতিকালে জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছে তাতে জাতি গঠনের জটিল ও বহুমুখী প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং এই প্রক্রিয়ার আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রকরণসমূহ আবিষ্কার করবার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে পৃথক এবং স্বতন্ত্রভাবে, তাই প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে পর্যালোচনা পৃথক এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ পর্যালোচনা

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ আধুনিককালের ঘটনা। ব্রিটিশ আমলে বিদেশী শাসনের চাপ ও বিশ্বব্যাপী শক্তিসমূহের প্রভাবে ভারতীয় সমাজের মধ্যে অসংখ্য বিষয়াশ্রিত ও ব্যক্তিচেতনাগত শক্তি ও উপাদান সৃষ্টি হয়। এদের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া থেকেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব।

জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করতে গেলেও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পর্যালোচনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হবে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ উদ্ভবের প্রক্রিয়া অতিশয় জটিল এবং বহুমুখী। এর অনেক কারণ নির্দেশ করা যায়। প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতীয় সমাজের কাঠামো অতিশয় স্বতন্ত্র ; এর তুলনা মেলা ভার। আর্থিক ভিত্তির প্রশ্নে এই সমাজ পুঁজিবাদ উদ্ভবের আগে মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় সমাজ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। উপরন্তু ভারত-বর্ষের পরিসর বিরাট এবং এই দেশে বহু ভাষাভাষী এবং নানা ধর্মাবলম্বী বিপুল সংখ্যক লোক বাস করত। হিন্দুধর্মাবলম্বীগণ ছিল ভারতীয় জন-সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ। সামাজিকভাবে হিন্দুরা বিভিন্ন জাত এবং উপজাতে বিভক্ত ছিল। জাতিভেদ হিন্দু সমাজের সম্পূর্ণ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। আবার হিন্দুধর্ম সুসংহত সমরূপ ধর্ম নয়, বহু বিশ্বাসের সমাহার। এই কারণে হিন্দুরা অনেকগুলি ধর্মসম্প্রদায়ে বিভক্ত। সাধারণভাবে ভারতীয়দের এবং বিশেষভাবে হিন্দুদের বহুল সামাজিক ও ধর্মীয় ভেদের ফলে ভারতে জাতীয়তা-বাদ বিকাশের প্রেক্ষাপট অতিশয় বৈচিত্র্যপূর্ণ। অন্যান্য দেশে জাতীয়তাবাদ উদ্ভবের প্রেক্ষাপটে এইরকম অভিনব ও শক্তিশালী ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠান ছিল না। একদিকে সামাজিক, আর্থিক এবং রাজনৈতিক কাঠামো এবং ধর্মীয় ইতিহাসের অভিনবত্ব অন্যদিকে বিশাল পরিসর ও বিপুল জনসংখ্যা মিলে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তাতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশের

পর্যালোচনা বেশ দুরূহ ঠেকে বটে, কিন্তু এই কারণেই আকর্ষণীয় এবং ফলপ্রদও বটে। বিগত সামাজিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর আত্মসংরক্ষণের শক্তি বোধহয় বিশ্বের অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় ভারতে বেশি ছিল। উপরন্তু মানবসমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ইতিহাসে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তাৎপর্য গভীর কেননা এই আন্দোলনের গতিবেগ ক্রমশ বেড়েছে এবং মানবসমাজের একটা বড় অংশ এতে আত্মনিয়োগ করেছে।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আর একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পরিস্থিতিতে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়। প্রাগ্রসর ব্রিটিশ জাতি নিজস্ব স্বার্থের প্রয়োজনে ভারতীয় সমাজের আর্থিক ব্যবস্থা আমূল বদলে দিয়েছিল, কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র স্থাপন করেছিল এবং আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন করেছিল। এর ফলে নতুন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব হল এবং অভিনব নতুন সামাজিক শক্তিসমূহ ক্রিয়াশীল হয়ে উঠল।[৫] নিজস্ব প্রকৃতিগত কারণেই এই সামাজিক শক্তিসমূহ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধবাদী হয়ে উঠেছিল এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে তাতে প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছিল।

দেখা যাচ্ছে বেশ একটা জটিল ও অভিনব পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটেছে এবং তার বিকাশ হয়েছে।

জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমিকায় যে সব উপাদান লক্ষ্য করা যায় তাদের পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন করা এবং এই পটভূমিকা থেকে কিভাবে জাতীয়তাবাদ উদ্ভূত হল তার বিবরণ রচনা করা বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

সূত্র নির্দেশ

১ Carr, পৃষ্ঠা ৭।
২ উপরিউক্ত, পৃঃ XX।
৩ Weisbord, Laski উল্লিখিত।
৪ Macartney, Hans Kohn, Stalin উল্লিখিত।
৫ Weisbord, Carr উল্লিখিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি

ভারতবর্ষে জাতীয় চেতনা অভ্যুদয়ের ইতিহাস একত্র সংহত জাতীয় অর্থ-নীতি বিস্তারের সংগে নিবিড়ভাবে জড়িত। পূর্ববর্তী প্রাক্ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির বিনাশ এবং তার জায়গায় আধুনিক ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা হবার ফলেই এই একত্রীকরণ সম্ভব হয়েছিল। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে উদ্ভূত আর্থিক ব্যবস্থার এই রূপান্তরের সামগ্রিক প্রক্রিয়া বিভিন্ন পর্যায়ে সুসংহতভাবে এবং সবিস্তারে আলোচনা করব।

প্রথমে প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতে প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্য-গুলি সংক্ষেপে পর্যালোচনা করব।

স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজ

আদিমকালের বলদটানা হালের চাষ এবং সহজ-সরল যন্ত্রপাতি-নির্ভর হস্তশিল্পের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম। এই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামই ছিল প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতীয় সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সামান্য পরিবর্তনের প্রশ্ন বাদ দিলে ব্রিটিশ শাসনের আগে পর্যন্ত শতাব্দীকাল ধরে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামই ছিল ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থার মৌলিক উপাদান। সর্বপ্রকার রাজনৈতিক উত্থানপতন, ধর্মীয় আন্দোলন ও বিধ্বংসী যুদ্ধের প্রভাব অতিক্রম করে এই ব্যবস্থা অক্ষুন্ন থেকে গেছে। সর্বপ্রকার বৈদেশিক আক্রমণ, রাজবংশের উত্থানপতন, বিভিন্ন রাজ্যের পারস্পরিক সংঘর্ষের জয় পরাজয় জড়িত পরিবর্তনের মধ্যেও এই ব্যবস্থা অভেদ্য থেকেছে। বিভিন্ন রাজ্যের উত্থানপতন হয়েছে, কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম টিকে গিয়েছে। "গ্রামগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্ররূপে বিরাজ করত। জীবনধারণের জন্য যা প্রয়োজন তার প্রায় সবকিছুই তারা নিজেরাই যোগাড় করতে পারত। বাইরের সংগে যোগাযোগ তাদের বিশেষ প্রয়োজন হত না। যেখানে কোন কিছুই টিকে থাকে না, সেখানে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম নিজের জোরে টিকে গেছে। একের পর এক রাজবংশ এসেছে এবং লোপ পেয়েছে, এক বিপ্লবের পর এসেছে আর এক বিপ্লব, হিন্দু, পাঠান, মোগল, মারাঠা, শিখ, ইংরাজ সবাই ক্রমান্বয়ে প্রভুত্ব করেছে, কিন্তু গ্রামীণ সমাজ মূলতঃ এইরকমই থেকে গেছে।"১

গ্রামীণ জনসাধারণের বৃহত্তম অংশ ছিল কৃষক। গ্রামের পঞ্চায়েত ছিল গ্রাম সমাজের প্রতিনিধি। গ্রামের অন্তর্গত জমির মালিকানা প্রকৃতপক্ষে

পঞ্চায়েতের হাতে ন্যস্ত ছিল। পঞ্চায়েত গ্রামস্থ কৃষকদের মধ্যে জমি ভাগ ভাগ করে বিলি করে দিত। কৃষকগণ সম্মিলিতভাবে পরিশ্রম করে আদিম ধরনের হাল ও বলদ দিয়ে প্রত্যেকের জমি চাষ করত। কৃষকগণ ঐতিহ্যগতভাবে পুরুষানুক্রমে নিজ নিজ কৃষি জমি ভোগ দখল করত।

গ্রামবাসী কৃষক পরিবারসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্পর্কে Shelvankar বলেছেন, "এরা একদিকে বিবিধ প্রকার যৌথ বাধানিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত আবার অন্যদিকে যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বিবিধ প্রকার সুযোগসুবিধা পাবার অধিকারী ছিল। "পৌর" কৃত্যকসমূহ, চৌকিদারী প্রভৃতি, সার্বজনীন গোচারণভূমি ও বনভূমির ওপর অধিকার রক্ষা, সেচ ও জল সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা, লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা এবং সেই সঙ্গে বন্যজন্তু, কীটপতঙ্গ এবং গবাদিপশুর গ্রাস থেকে জমি ও শস্য রক্ষা করা—গ্রাম জীবনের এইসব অত্যাবশ্যকীয় ব্যবস্থাদির জন্য কৃষকগণ পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সংগঠিত হত। এই পরিস্থিতি ব্যক্তিগত অধিকারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং ব্যক্তিগত অধিকারবোধ এর সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না। সর্বোপরি ছিল নিয়মানুযায়ী সমবেতভাবে স্বাধিকারসম্পন্ন শাসক অথবা মধ্যবিত্ত করগ্রাহীকে রাজস্ব বা খাজনা দেবার প্রশ্ন।[২]

ভারতীয় সামন্ততন্ত্র বনাম ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্র

ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্র থেকে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের পার্থক্য এই যে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রে জমির ওপর কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। হিন্দু যুগে ভূমি সমগ্র গ্রামসমাজের সম্পত্তি বলে পরিগণিত হত এবং কখনো রাজার সম্পত্তি বলে গণ্য হত না।[৩] রাজা অথবা তাঁর মধ্যবর্তী করগ্রাহী উৎপাদনের একটা অংশমাত্র দাবি করতেন, গ্রাম সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েত তার প্রাপ্য মিটিয়ে দিত। "রাষ্ট্র শুধুমাত্র উৎপাদনের একটা অংশমাত্র পাবার অধিকারী ছিল। উৎপন্ন দ্রব্য দিয়ে রাষ্ট্রের প্রাপ্য মেটান হত। মুসলমানদের আমলে প্রচলিত স্বত্বাধিকার ও কর ব্যবস্থা কিছুটা সংশোধন করে গৃহীত হয়েছিল।"[৪]

যেহেতু রাজা অথবা মধ্যবর্তীরা (যেমন জমিদার এবং করসংগ্রহকারীগণ, জায়গীরদার অথবা অভিজাতবর্গ যাদেরকে রাজা অনুগ্রহবশতঃ একটা নির্দিষ্ট এলাকা থেকে রাজস্ব আদায়ের এবং সংগৃহীত রাজস্ব পুরা অথবা অংশতঃ নেবার অধিকার দিয়েছিলেন অথবা যেসব ধর্মীয়, দাতব্য এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান রাজার কাছ থেকে অনুরূপ অধিকার লাভ করেছিল)—তাঁরা কেউই জমির মালিক ছিলেন না। রাজাদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ বা রাজার সঙ্গে মধ্যবর্তী করগ্রাহী বা গ্রাম-সংঘ বিবাদ সর্বক্ষেত্রেই উৎপন্ন দ্রব্যের ভাগাভাগি নিয়ে ঘটত। ঐতিহ্যগত রীতি এবং ধারণা অনুসারে রাজা এবং মধ্যবর্তীরা কেউই গ্রাম-সমাজের হাত থেকে ভূমির মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণের অধিকার কেড়ে নেয়নি এবং ভূমির ওপর সম্পত্তির অধিকার আরোপ করেনি অথবা কৃষিকর্মের সম্পর্কে কখনো আগ্রহ দেখায়নি।

বস্তুতপক্ষে "ভারতবর্ষের ইতিহাসের বড় যুদ্ধ কখনো গ্রামের ভেতরে অধিকার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়নি—সব ক্ষেত্রেই লক্ষ্য ছিল গ্রামের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। কৃষকদের কাছ থেকে প্রাপ্য লাভ করবার অধিকার বা ক্ষমতা নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের রাজারাজরার মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ হয়েছে—কিন্তু কৃষকদের জমি দখল করার জন্য কখনো বিবাদ হয়নি। এর বিপরীতে ইউরোপীয় ইতিহাসে কৃষকশ্রেণী এবং ভূস্বামীর মধ্যে বিবাদ দেখা যায়। এই বিবাদে ভূস্বামীগণ উৎপাদনের অংশ দাবি করেই ক্ষান্ত হয়নি তারা বাধ্যতামূলক শ্রমের দ্বারা একটা বিশেষ ধরনের কৃষি কার্য বা কৃষিতে নতুন পদ্ধতি (inclosure বা আবদ্ধীকরণ, ব্যাপকহারে চাষ) প্রবর্তন করতে চেয়েছে। ভারতবর্ষে যাঁরা সংঘর্ষে লিপ্ত হতেন চাষের পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না, তাদের উদ্দেশ্য ছিল কৃষকের কাছ থেকে সম্পদ আহরণ করা। ...সংঘর্ষ হত শক্তিধর বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে। গ্রাম বা কৃষকের এতে কোনো ভূমিকা ছিল না। তাদের ওপর অধিকার অর্জনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হত।"৫

প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতে গ্রামীণ অর্থনীতির স্বরূপ

এইভাবে শতাব্দীকাল ধরে ভারতীয় গ্রামসমূহে কৃষি উৎপাদনের কাঠামো অক্ষুন্ন ছিল। কোনো সম্রাট অথবা তাঁর রাজপ্রতিনিধি গ্রামস্থ জমির ওপর গ্রামসমাজের প্রথাগত অধিকারের বিরোধিতা করেনি।

অধিকন্তু গ্রামে উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্য গ্রামের প্রয়োজনেই লাগত। উৎপন্ন শস্যের অংশবিশেষ রাজস্ব হিসাবে দিল্লীর সম্রাটের সুবাদার, অথবা পুনার পেশোয়ার সর্দার অর্থাৎ যখন যে প্রভুত্বে আসীন তাকে দিতে হত। এটুকু বাদ দিলে বাকি সমগ্র উৎপাদনটা কৃষক এবং অকৃষক জনসংখ্যাই প্রায় স্থানীয় পর্যায়ে উপভোগ করত।

গ্রামে কৃষক ছাড়া ছুতোর, কুমোর, মুচি, ধোপা, তেলি, নাপিত এবং অন্যান্য কারিগররা বাস করত। তারা সবাই সর্বোতভাবে গ্রামস্থ জনসাধারণের প্রয়োজন মেটানোর জন্য কাজ করত।

উপরন্তু গ্রামীণ সমাজের মধ্যে সাধারণতঃ আরও একটা নিম্নশ্রেণীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। পেশায় এরা ছিল ধাঙর বা মেথর। সামাজিক বিচারে এরা অন্ত্যজ। এদের অধিকাংশই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বংশধর। প্রাচীনকালে হিন্দু সমাজ এদের পূর্বপুরুষদের অবলুপ্ত না করে আপন গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল।৬

গ্রামস্থ কৃষিজীবী অকৃষিজীবী লোকের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যাদির লেনদেন গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত বলে বিনিময়ের সুযোগ খুব কম ছিল। গ্রামের মধ্যে যা উৎপন্ন হত তার প্রায় সবটাই গ্রামের লোকের প্রয়োজন মেটাতেই লেগে যেত।৭

গ্রামীণ দ্রব্যাদির বিনিময় প্রসঙ্গে শেল্ভান্কার বলেছেন, "ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বিনিময় হত একথা বললে পুরোপুরি সত্যি বলা হবে না। কৃষকেরা ব্যক্তিগতভাবে কারিগরকে দিয়ে যে কাজ করিয়ে নিয়ে প্রতিদানে যা দিত সেটা

প্রতিটি কাজের ভিত্তিতে হিসাব করা হত না, প্রতিটি গ্রাহক (বা যজমান) আলাদা আলাদা ভাবে তাকে মজুরি দিতে চাইত না। গ্রাম সামগ্রিকভাবেই এই দায়িত্ব বহন করত। গ্রাম-সংঘ স্থায়ীভাবে কারিগরকে এক খণ্ড জমি দিয়ে রাখত বা ফসল তোলার সময় নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য তাদের দেবার ব্যবস্থা করা থাকত। ফলতঃ এবম্বিধ বিনিময়ে স্বতন্ত্র একজন কৃষকের মতো গ্রামের যৌথ সংগঠনও অপরপক্ষ হিসাবে পরিগণিত এবং কারিগর কেবলমাত্র একজন স্বতন্ত্র উৎপাদক নয়—সে গ্রামীণ সম্প্রদায় কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারী।"৮

কেবলমাত্র বহির্বিশ্বের সঙ্গে গ্রামের যে কোনো রকম বিনিময় সম্পর্ক ছিল না তা নয় গ্রামের ভেতরেও বেচাকেনার প্রশ্ন একেবারেই ছিল না। গ্যাডগিল বলেছেন, "গ্রামসমূহ বিচ্ছিন্ন ছিল শুধুমাত্র এটাই খুব উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয়, কারিগরেরা সকলেই গ্রামে বাস করত এটাও একটা বিশেষ কথা নয়, ভারতীয় গ্রামজীবনের বৈশিষ্ট্য এই অধিকাংশ কারিগরের কাজ ছিল সংশ্লিষ্ট গ্রামের প্রয়োজন মেটানো।"৯

গ্রামীণ অর্থনৈতিক জীবনের আর একটা বৈশিষ্ট্য হল অপরিণত শ্রম-বিভাগ। কৃষি ও শিল্পের পৃথকীকরণ অধিকদূর অগ্রসর না হবার ফলেই এটা হয়েছিল। প্রধানতঃ কৃষিকাজ করলেও কৃষক পরিবারের লোকেরা সুতা কাটত। অনুরূপভাবে কারিগররা গ্রামীণ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে যে জমি পেত সেই জমিতে বছরের কিছুটা সময় চাষের কাজও করত।

কারিগরেরা প্রয়োজনীয় কাঁচামাল যথা কাঠ, মাটি, চামড়া ইত্যাদি গ্রাম থেকেই সংগ্রহ করত। গ্রামের প্রত্যন্তভাগে অবস্থিত বনভূমি থেকে কাঠ সংগ্রহ করা হত। গ্রামের মৃত জন্তুর দেহ থেকে চামাররা চামড়া সংগ্রহ করত। দেশের প্রায় সর্বত্রই তুলা জন্মাত। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে লোহা বাইরে থেকে আমদানি করতে হত। মোটের ওপর গ্রামীণ কারিগরের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের ব্যাপারে গ্রামগুলো প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল।

দেখা যাচ্ছে আর্থিক প্রশ্নে গ্রামগুলো প্রায় সার্বভৌম ছিল। স্থানীয় শ্রম এবং সহায়সম্পদ দিয়ে তৈরি দ্রব্যাদি স্থানীয় পর্যায়েই ব্যবহৃত হত। গ্রাম ও বহির্জগতের মধ্যে বিনিময় খুব সামান্যই হত। ব্যবসাবাণিজ্য সামান্য যা হত তা সাধারণত সপ্তাহের একটা নির্দিষ্ট দিনে গণ্ডগ্রামের হাটেই হত। হাটে বিভিন্ন স্থান থেকে আসা পণ্য বিক্রি হত।

"সাধারণভাবে কাঁচামাল গ্রামের মধ্যে বা আশেপাশেই পাওয়া যেত। এতেই বোঝা যাবে গ্রামীণ স্বয়ংসম্পূর্ণতা কতটা বেশি স্পষ্ট ছিল। গ্রামের অন্তর্গত বনভূমি থেকে ঘরবাড়ি ও যন্ত্রপাতি গড়বার কাঠ পাওয়া যেত। দেশের অনেক জায়গায় তুলা উৎপন্ন হত। গ্রামে উৎপন্ন দ্রব্যাদি প্রধানতঃ গ্রামের প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হত, বাড়তি জিনিস গ্রামের সাপ্তাহিক হাটে বিক্রি করা হত। কারিগরেরা বহু শতাব্দীব্যাপী উত্তরাধিকার সূত্রে দক্ষতা অর্জন করত। প্রতিটি ক্ষেত্রেই কারিগরদের বৃত্তি ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা বিধিবদ্ধ ছিল।"১০

গ্রামীণ কৃষি এবং কারিগরি শিল্পের কলাকৌশল খুব নিম্নমানের ছিল। কৃষির সরঞ্জাম ছিল সাদাসিধে এবং কারিগরি শিল্পে শুধুমাত্র হস্তচালিত যন্ত্র-পাতিই ব্যবহৃত হত। এমনকি হাওয়া কল এবং Water Wheelsও খুব কম ব্যবহার করা হত। কাস্তে ও লাঙল, করাত ও বাটালি, চরকা ও পায়ে ঠেলা

তাঁতের মত সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি অত্যন্ত সাধারণ উপকরণ দিয়ে অতি অল্প সময়ের জন্য তৈরি করা হত। তবে এগুলি ক্ষেত্রবিশেষে পুরুষানুক্রমে ব্যবহৃত হত।১১

অত্যন্ত সাধারণ কলাকৌশলে চালিত কৃষি ও শিল্প নির্ভর স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে আশ্রয় করে গ্রামীণ জনসাধারণ শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রায় একইরকমভাবে রুজি রোজগারে সংস্থান করে এসেছে। এই স্বনির্ভর গ্রামগুলো বহির্জগত থেকে প্রায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল এবং এই কারণে গ্রামীণ জীবনধারায় সামাজিক বিনিময়ের বিশেষ কোনো স্থান ছিল না। গ্রামগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী একই প্রকারের স্থিতিশীল একঘেয়ে সামাজিক জীবনের অভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়ে ছিল। "প্রাকৃতিক বিপর্যয়, পাহাড় পর্বতের পেছন থেকে আসা ভূমিগ্রাসী আক্রমণকারীদের অভিযান অথবা খরাজনিত বিপর্যয় এ সবের ফলে যা কিছু অবস্থান্তর ঘটত।"১২

কার্ল মার্কস এই অপরিবর্তনীয় সামাজিক পরিস্থিতি সুস্পষ্ট এবং পরিচ্ছন্নভাবে বর্ণনা করেছেন।

"এইসব ক্ষুদ্র এবং অতিশয় প্রাচীন ভারতীয় সম্প্রদায়গুলো—যার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল সে হল ভূমির ওপর সর্বসাধারণের স্বত্ব, কৃষি এবং কারিগরি শিল্পের সংমিশ্রণ এবং অপরিবর্তনীয় শ্রম বিভাগ।···প্রত্যেকটি গ্রামীণ সম্প্রদায় ঘনবিন্যস্ত, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদনে সক্ষম, উৎপন্ন দ্রব্যের প্রধান অংশ গ্রামীণ সম্প্রদায়ের প্রয়োজনেই লেগে যায়; এটা পণ্যে রূপান্তরিত হয় না। ফলতঃ পণ্য বিনিময়ের ফলে সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সমাজে উদ্ভূত শ্রমবিভাগের সঙ্গে উৎপাদনের কোনো সম্পর্ক নেই, শুধুমাত্র উদ্বৃত্ত অংশই পণ্যরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। তবে উদ্বৃত্তের একটা অংশই পণ্য হতে পারে কেননা অপর অংশ সুপ্রাচীনকাল থেকে রাজস্ব হিসাবে রাষ্ট্রের প্রাপ্য। এই গ্রামীণ সম্প্রদায়ের সংগঠন ভারতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার, যেখানে ব্যবস্থা সবচেয়ে সরল সেখানে দেখা যায় সকলে মিলে চাষ করে এবং উৎপন্ন দ্রব্য সকলের মধ্যে ভাগ হয়। একই সঙ্গে প্রত্যেক পরিবারে সম্পূরক কারিগরি শিল্প হিসাবে সুতা কাটা এবং কাপড় বোনা হয়। এর পাশাপাশি···রয়েছেন (গ্রামের) 'প্রধান ব্যক্তি', একাধারে ইনি বিচারক, শান্তিশৃঙ্খলার ভারপ্রাপ্ত এবং রাজস্ব সংগ্রাহক; আর আছেন পটোয়ারী, কৃষিসংক্রান্ত হিসাবনিকাশ করা এঁর দায়িত্ব; ···আর একজনের দায়িত্ব অপরাধীদের বিচারকের কাছে অভিযুক্ত করা, বাইরের লোক গ্রামে এলে তাকে রক্ষা করা এবং পরের গ্রামে পেঁছে দেওয়া; সীমান্তরক্ষীর কর্তব্য পার্শ্ববর্তী গ্রামীণ সম্প্রদায়ের হাত থেকে সীমান্ত রক্ষা করা; সেচের তত্ত্বাবধায়ক সর্বসাধারণের ব্যবহার্য পুষ্করিণী থেকে সেচের জল বণ্টন করা এঁর কর্তব্য; ব্রাহ্মণ, এঁর দায়িত্ব ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম নির্বাহ করা; পাঠশালার পণ্ডিত, ইনি বালির ওপর আঁক দিয়ে শিশুদের লিখতে ও পড়তে শেখান; আচার্য ব্রাহ্মণ বা জ্যোতিষী, ইনি শস্য বোনা ও তোলার শুভ ও অশুভ দিন দেখে দেন; কামার ও ছুতোর, চাষের সবরকম যন্ত্রপাতি তৈরি ও মেরামত করা এদের পেশা; কুম্ভকার, গ্রামের প্রয়োজনীয় মাটির বাসনকোসন তৈরি করে; নাপিত, ধোপা ও রুপার কামার; কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রামে কবিও থাকে, সেসব ক্ষেত্রে হয়তো

রূপার কামার বা পাঠশালার পণ্ডিত নেই। এইরকম দশ-বারোজনের ভরণ-পোষণ করে সমগ্র গ্রামীণ সম্প্রদায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে পতিত জমিতে পুরানো গ্রামীণ সম্প্রদায়ের ধাঁচে নতুন একটা গ্রামীণ সম্প্রদায়ের পত্তন হয়…। যে আইন অনুসারে গ্রামীণ সম্প্রদায়ের শ্রমবিভাগ পরিচালিত হয় সেটা প্রকৃতির নিয়মের মতই অমোঘ…এই অপরিবর্তিত রূপে নিরবধি বেড়ে চলেছে। কোনো গ্রামীণ সম্প্রদায় যদি ঘটনাচক্রে লোপ পায় তবে সেই জায়গাতেই একই নামে তার পুনরাবির্ভাব ঘটে। এইসব স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সম্প্রদায়সমূহের উৎপাদন সংক্রান্ত সংগঠন লক্ষ্য করলেই এশীয় সমাজের অপরিবর্তনীয় চরিত্রের গুহ্যসূত্রটি বোঝা যায়। এশিয়া মহাদেশে রাষ্ট্রের অবিরত পতন ও অভ্যুত্থান এবং সদাসর্বদা রাজবংশের আবির্ভাব ও বিলোপের যে প্রবণতা দেখা যায় তার পাশাপাশি গ্রামীণ সম্প্রদায়ের চারিত্রিক বৈপরীত্য লক্ষ্য করবার মতো। রাজনৈতিক জগতের আলোড়ন সমাজের আর্থিক ব্যবস্থার কাঠামোর ওপর স্বল্পতম প্রভাবও বিস্তার করতে পারে না।"১৩

গ্রামসমাজের আর একটা বৈশিষ্ট্য জাত। জাতপ্রথার কঠোর বিধি অনুসারে মানুষের বৃত্তি আগে থেকে নির্ধারিত করে রাখত। এই বিধি প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই অপ্রতিরোধ্য। বংশানুক্রমিকভাবে নির্দিষ্ট বলে বৃত্তিও বংশগত হয়ে উঠেছিল।

আর্থিক জীবন সংকীর্ণ এবং বিনিময়ও প্রায় গ্রামের মধ্যেই সীমিত ছিল বলে বাইরে যাওয়া আসার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ছিল না। শুধুমাত্র বিবাহ ও তীর্থযাত্রা উপলক্ষে—তাও অবশ্য বহু বছর পর হত। ফলে যানবাহনের উন্নতি ঘটানোরও কোনো প্রেরণা ছিল না। প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতে গরুর-গাড়িই ছিল যাতায়াতের একমাত্র উপায়।

গ্রামীণ সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার সামাজিক ও অন্যান্য দিক সম্পর্কে ও'ম্যালির বক্তব্য উল্লেখযোগ্য।

"যেসব মুখ্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান টিকে গেছে সেগুলো ব্যক্তিভিত্তিক নয়, সমষ্টিভিত্তিক। সামাজিক সংগঠন ব্যক্তিকে অবলম্বন করে নয়, গড়ে উঠেছে পরিবারকে অবলম্বন করে। পারিবারিক বন্ধন দ্বারাই ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয়েছে। বিভিন্ন পরিবারের পারস্পরিক সম্পর্ক পরিচালিত হয়েছে গ্রামীণ সম্প্রদায় ও জাতের দ্বারা। গোষ্ঠীগত স্বায়ত্তশাসনের উদ্দেশ্যে কতকগুলি পরিবার নিয়ে গ্রামসম্প্রদায় গঠিত। বিবাহ, পানাহার, বৃত্তি এবং সমাজে অন্যান্যদের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কতকগুলি পরিবারের সমষ্টি জাত নামে অভিহিত। তবে জাত গ্রামসম্প্রদায়ের মতো একস্থানে আবদ্ধ নয়। পরিবার, জাত এবং গ্রামসম্প্রদায় এই ত্রিবিধ প্রতিষ্ঠানের মতাদর্শে ব্যক্তি আবদ্ধ থাকে। ব্যক্তি এইসব প্রতিষ্ঠানের বিধিনিয়ম মেনে চলতে বাধ্য। গোষ্ঠীর বাইরে ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। গোষ্ঠীর বিধিনিষেধের গন্ডীর মধ্যে থেকেই আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্ভব।…গ্রামসম্প্রদায়কে আংশিকভাবে মাত্র সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলে অভিহিত করা চলে। গ্রামসম্প্রদায় মুখ্যত আর্থিক এবং প্রশাসনিক সংগঠন। এর ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধিকার আছে, তবে সে অধিকার কদাচিৎ প্রযুক্ত হত। জাত ও পরিবার সংক্রান্ত ব্যাপারে

রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ভূমিকা কিছুই নেই। জাত ও পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্ক ধর্মনিরপেক্ষ আইন অনুসারে পরিচালিত হত না। এই সম্পর্ক নির্ধারিত হত হিন্দু আইন এবং প্রথাসিদ্ধ বিধিনিষেধ দ্বারা।"১৪

ব্রিটিশ অধিকারের পূর্বে বহু শতাব্দীকাল ধরে ভারতীয় সমাজে ব্যক্তি পুরোপুরিভাবে জাত, পরিবারের এবং গ্রামপঞ্চায়েতের অধীনস্থ ছিল। "এমনকি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকেও ভারতীয় সমাজব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা ভিত্তিক পরিবার, জাত ও গ্রামপঞ্চায়েতের কাছে এবং এছাড়া শহরাঞ্চলে ব্যবসাবাণিজ্যভিত্তিক শ্রেণী ও নিগমের কাছে দায়বদ্ধ ছিল।"১৫

প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতবর্ষে নাগরিক অর্থনীতির স্বরূপ

অসংখ্য ছোট ছোট স্বনির্ভর গ্রামের মধ্যে কতকগুলো শহরও গড়ে উঠেছিল এবং টিকে ছিল। এই শহরগুলো ছিল তিন ধরনের। এদের মধ্যে কতকগুলো ছিল রাজনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন, কতকগুলো ছিল ধর্মীয় গুরুত্বসম্পন্ন আর কতকগুলো ছিল বাণিজ্যের জন্য উল্লেখযোগ্য।১৬

রাজনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন শহরগুলো ছিল বিভিন্ন রাজ্য এবং সাম্রাজ্যের রাজধানী। এগুলো ছিল প্রশাসনিক কেন্দ্র। রাজা বা সম্রাট এখানে অভিজাতবৃন্দ, সামন্তবর্গ, সেনাধ্যক্ষগণ এবং বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মচারী সহ রাজসভা স্থাপন করে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। সৈন্য-বাহিনীর অধিকাংশ রাজধানীতে থাকত বলে রাজধানী প্রধান সৈন্যাবাসও হয়ে উঠত। এর সংগে আনুষংগিক হিসাবে থাকত বিভিন্ন গায়ক, ভাস্কর, চিত্রকর, কবি, বারাংগনা, নর্তকী প্রভৃতি সামাজিক গোষ্ঠী। এরা শাসকবর্গ ও অভিজাতদের সুস্থ ও অসুস্থ শারীরিক ও শিল্পগত প্রয়োজন ও খেয়াল মেটাত।

বারাণসী, মথুরা, পুরী, নাসিকের মত আরও একধরনের শহর ছিল। এগুলো ছিল ধর্মাচরণের কেন্দ্র ও তীর্থস্থান। হাজার হাজার তীর্থযাত্রীরা এইসব শহরে আসত। তাদের পূজা-পাঠ দেখাশোনা—এইসব কাজ নির্বাহের জন্য একটা নির্দিষ্টসংখ্যক লোক এইসব শহরে বাস করত।

এ বাদে ছিল বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ শহর। এই শহরগুলো সমুদ্রোপকূল অথবা নদীর তীরে অথবা গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথের মিলনস্থলে অবস্থিত ছিল।

জটিল ও নানাধরনের কারুশিল্প এইসব শহরে গড়ে উঠেছিল। এই প্রসংগে Calverton-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

"ভারতবর্ষের কারিগরি শিল্প পশ্চিমের দেশসমূহ অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিল। তীক্ষ্ণধী সুনিপুণ কলাকৌশল এবং সৃজনশীল প্রতিভাসম্পন্ন লোকে এইসব শিল্প গড়ে তুলেছিল। প্রথমেই ধরা যাক নৌ পরিবহনের কথা। পশ্চিমের দেশসমূহে নৌ পরিবহন যখন অপরিণত অবস্থায় ছিল সেই আদি কালেও এখানে "এক হাজার বা এক হাজার দুশ লোক বইতে পারে এরকম ওজনের জাহাজ তৈরি হত।" হিন্দুস্থানে বয়নশিল্পের বিশেষ প্রসার হয়েছিল।

এখানে তৈরি বিবিধ প্রকার সুতী ও রেশমবস্ত্রের খ্যাতি বহুদূর পরিব্যাপ্ত হয়েছিল এবং নানা দেশের লোক ভারতীয় বস্ত্র পরম আগ্রহের সংগে কিনত। এছাড়া ত্রয়োদশ-চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে হিন্দুস্থানে ধাতু ও পাথরে তৈরি জিনিস, চিনি, নীল ও কাগজশিল্প ছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে কাঠের কাজ, মৃৎপাত্র তৈরি ও চর্মশিল্প বিকাশলাভ করেছিল। অনেক জায়গায় বেশ উচ্চস্তরের জরি ও চিকনের কাজ হত।

দস্তা ও পারদখনি এবং কিছু লৌহখনির সমবায়ে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ শিল্প গড়ে উঠেছিল। কাচশিল্প বিশেষ উন্নত ছিল। তখনকার দিনের তুলনায় কাচ তৈরির পদ্ধতি বেশ অভিনব ছিল। বহু ভ্রমণকারীর বিবরণে উচ্চস্তরের লৌহ উৎপাদনের কথা লেখা আছে। রাসায়নিক শিল্প সম্পর্কে এইসব বিবরণে কোনো প্রতিকূল ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, ক্যাথির মত ভারতেও চীনামাটির শিল্প উল্লেখযোগ্য ছিল। হিন্দুস্থানে তৈরি হাতির দাঁতের কাজ সব দেশের লোকের কাছেই প্রিয় ছিল। হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি বালা, দুল, পাশা, খাট, পুঁতি প্রভৃতি বহুবিধ সামগ্রী ইউরোপীয়বাসীদের কাছে মনোমুগ্ধকর ছিল। দামী পাথর দিয়ে করা বিবিধ শিল্পদ্রব্য তৈরি করাতেও বিশেষ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যেত।"১৭

কারিগরি শিল্পগুলো ছোট গ্রামগোষ্ঠীর সীমিত প্রয়োজন মেটাত। এর বিপরীত ধারায় ছিল শহরের শিল্পগুলো যা সমাজের অভিজাত ও ধনী বণিকশ্রেণীর জন্য বিলাসদ্রব্য উৎপাদন করত। শহরের শিল্পগুলো আবার সৈন্যবাহিনীর সাজসরঞ্জাম, যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করত ও সামরিক প্রয়োজনে দুর্গ নির্মাণও করত। এরাই আবার জমকালো প্রাসাদ, সুউচ্চ মন্দির নির্মাণ করত। এদেরই হাতে তৈরি হয়েছিল শিল্পকলা এবং স্থাপত্যকৌশলের চরমোৎকৃষ্টস্বরূপ ভুবন বিখ্যাত তাজমহল ও কুতুবমিনার। শহরের কারিগররাই সেচের জন্য খাল কাটত।

প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতবর্ষে বহু শতাব্দীকালব্যাপী প্রচলিত শহরের কারিগরি শিল্প খুব উন্নত হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় শহরের কারিগরগণ বহুবিধ দ্রব্য তৈরি করতে পারত। তাদের কাজে শিল্পগুণ ছিল খুব উঁচুদরের। ফলতঃ ভারতীয় শিল্পদ্রব্য বিশ্বের বাজারে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। V. F. Calverton বলেছেন "...সুপ্রাচীন যুগ থেকে যখন ভারতীয় বস্ত্র, কারুকার্যশোভিত পর্দা, মণিমুক্তো, গালিচা, এনামেল, মোজাইক প্রভৃতি রোমের সরকারি ও বেসরকারি বাড়িগুলো অলংকৃত করত তখন থেকে শিল্পবিপ্লবের প্রারম্ভ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব চিত্তাকর্ষক ও মনোমুগ্ধকর শিল্পদ্রব্যের জন্য ভারতবর্ষের মুখাপেক্ষী ছিল।"১৮

শহরে যে শিল্পগুলো বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিবিধ প্রয়োজন মেটাত সেগুলোকে মোটামুটিভাবে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যে শিল্পগুলো ভারতীয় ও বিদেশী অভিজাত ও সম্পন্ন শ্রেণীর জন্য বিলাসদ্রব্য বা আধা বিলাসদ্রব্য প্রস্তুত করত সেগুলোকে নিয়ে প্রথম ভাগ। এই ভাগটাই শহরের শিল্পের প্রধান অংশ। যে শিল্পগুলো রাষ্ট্র অথবা অন্যান্য সরকারি সংগঠনের প্রয়োজন মেটাত সেগুলোকে নিয়ে দ্বিতীয় ভাগ। সর্বশেষ ভাগে যে শিল্পগুলো

আছে তার মধ্যে যা আছে "লোহা তৈরি, সোরা তৈরি, চুড়ি বালা তৈরি··· প্রধানতঃ ভারতবর্ষের কোনো কোনো জায়গায় এগুলো দেখা যেত।"১৯

শহরের কারিগরদের মোটামুটিভাবে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এক হল যাঁরা স্বাধীনভাবে কাজ করত, আর একদল যারা রাষ্ট্র বা কোনো নিগম অথবা কোনো ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা মজুরির ভিত্তিতে নিযুক্ত হত।

যেসব কারিগর মজুরি নিয়ে কাজ করত না অর্থাৎ স্বাধীন উৎপাদক ছিল, উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল তাদের নিজ মালিকানায় থাকত। তারা নিজেদের ঘরে বা স্থলে কাজ করত এবং উৎপন্ন দ্রব্য অসংগঠিত বাজারে বিক্রি করতে আনত। এর বিপরীত ধারায় ছিল শহরের কারিগরি শ্রমিকরা। এরা মজুরি নিয়ে কাজ করত। এদের নিয়োগকর্তা কাঁচামাল সরবরাহ করত এবং নিয়োগকর্তার দ্বারা নির্দিষ্ট কাজের জায়গায় এরা একত্র হয়ে কাজ করত এবং তাদের নিয়োগকর্তার জন্য উৎপাদন করত, বাজারের জন্য নয়।

সম্ভবতঃ সীমিত চাহিদাই ছিল শহুরে শিল্পের সব থেকে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এর কারণ এই যে শহুরে শিল্পীরা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন বাজারের জন্য জিনিস উৎপাদন করত না, ওপরে উল্লিখিত সামাজিক স্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্দিষ্ট প্রয়োজন মেটানোর জন্য উৎপাদন করত। অন্যদিকে স্থানীয় কারিগরি শিল্পের উৎপাদন থেকে স্বনির্ভর গ্রামে বসবাসকারী বিশাল জনসাধারণের প্রয়োজন মিটে যেত। ফলে শহরে উৎপন্ন পণ্যের চাহিদা অত্যন্ত সীমিত এলাকাতে সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতবর্ষে ভারতীয় অর্থনীতির ও সামাজিক কাঠামোর পুঁজিবাদী রূপান্তরের কিছুটা সম্ভাবনা ছিল বটে কিন্তু এইসব সম্ভাবনা থেকে রূপান্তর ঘটাবার অবস্থা আসে নি। প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতীয় সমাজের আর্থিক ও সামাজিক কাঠামোর কতকগুলো অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের জন্যই অভ্যন্তরীণ সামাজিক শক্তিসমূহ যথা, বাণিজ্যিক মূলধন ও শহরের শিল্পের ভিত্তিতে ভারতবর্ষে বুর্জোয়া সমাজের উদ্ভব হয়নি। সম্ভবতঃ স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম এইরূপ প্রক্রিয়ার পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল।

"গ্রামীণ সংঘজীবনে কুটিরশিল্প ও কৃষিকার্য প্রত্যক্ষভাবে একত্রে নির্বাহিত হবার দরুন যে আর্থিক ব্যবস্থা ছিল তারই জোরে গ্রামীণ জীবনে ভারসাম্য বজায় ছিল এবং গ্রামসংঘ সংহতি নাশক বিপত্তিসমূহ রোধ করতে পেরেছিল।"২০

"সাধারণভাবে বলতে গেলে গ্রামীণ জীবনে দাসপ্রথা বা ভূম্যধিকারীদের শোষণের অবকাশ ছিল না। গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার কাঠামো ছিল দৃঢ়তর। এই কারণে ম্যানর প্রথার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লোপ পেলেও গ্রামীণ জীবনের ক্ষেত্রে এই বিপর্যয় ঘটেনি। ঊনবিংশ শতকে গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা যন্ত্রশিল্পের বহুল উৎপাদন ক্ষমতার চাপ প্রতিরোধ করতে পেরেছিল। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ও আর্থিক পরিবর্তনের পুঞ্জীভূত চাপ সহ্য না করতে পেরে অবশেষে ভেঙে পড়ল। এইসব কথা চিন্তা করলে গ্রামীণ জীবনের সংসক্তি বিস্ময়কর বলেই বোধ হয়।"২১

স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের আর্থিক ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ ভারসাম্য থাকবার ফলে শহরের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী শ্রেণীসমূহ গ্রামাঞ্চলকে বাণিজ্যিক লেনদেনের মধ্যে বিশেষ টেনে আনতে পারেনি। এর ফলে প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতবর্ষের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রসার কেবল যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল তাই নয় শ্রেণী-গুলোকে আর্থিক দিক দিয়ে এবং সেই কারণে রাজনৈতিক প্রশ্নে সামন্তগণ এবং তাঁদের অভিজাতবর্গের ওপর নির্ভরশীল এবং তাঁদের অধীনস্থ করে রেখেছিল। আর্থিক দিক দিয়ে তারা গ্রামাঞ্চলকে অধিকার করতে পারত না ও ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের সমর্থন চালিত করতে পারত না এবং ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারত না।

শেল্‌ভাঙ্করের মতে ভারতীয় বুর্জোয়ারা সামন্তপ্রথা উৎখাত করে ভারতবর্ষে যে একটা প্রভাবশালী পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারেনি তার আরও একটা কারণ ছিল।

"ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থায় সর্বসাধারণের জন্য পথঘাট এবং সেচ অবশ্য প্রয়োজন ছিল। রাষ্ট্রের মত একটা প্রতিষ্ঠানের সহায়সম্বল এবং আধিপত্য ভিন্ন এইসব কাজ নির্বাহ করা সম্ভব নয়। এইসব কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করা, সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করা ও দেখাশোনা করা এবং ভূমি রাজস্ব সংগ্রহের জন্য রাষ্ট্রকে শহরের মত কেন্দ্রসমূহে নিজের লোক নিয়োগ করতে হত।"২২

উপরন্তু "ভারতের পরিস্থিতিতে···রাষ্ট্রের সহায়সম্পদ ভূমি নির্ভর বলে ক্ষমতার কেন্দ্র অর্থাৎ শহরের ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হতে দিলে চলত না।"২৩

এগুলোই সম্ভবত হল প্রধান কারণ যেজন্য ভারতীয় বুর্জোয়ারা উচ্চ-পর্যায়ের রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি ও পুঁজিবাদী প্রভাবশালী আর্থিক ব্যবস্থা হিসাবে গড়ে উঠতে পারেনি। "গ্রামের অভেদ্য আবরণ ও বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক অক্ষমতা এই দ্বিবিধ কারণে ভারতীয় অর্থনীতির বিবর্তন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উদ্ভব অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।"২৪

বস্তুতপক্ষে ইংলণ্ডের উন্নতিশীল বুর্জোয়ারাই পরবর্তী সময়ে ভারতীয় সামন্ত রাজাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে দেশব্যাপী তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং ভারতের গ্রামীণ ও নাগরিক অর্থ-নীতির ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। মার্কস একেই বলেছেন, 'ভারতীয় ইতিহাসে একমাত্র প্রকৃত সামাজিক বিপ্লব।'

প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতবর্ষে গ্রামীণ সংস্কৃতির স্বরূপ

অতঃপর প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতবর্ষে ভারতীয় জনগণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হবে।

প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতবর্ষে প্রতিটি গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। বহির্বিশ্বের সঙ্গে এইসব গ্রামের খুব সামান্যই সামাজিক আর্থিক অথবা আত্মিক বিনিময় ঘটত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এইরকম অসংখ্য স্বনির্ভর গ্রামে বসবাসকারী ভারতীয় জনসাধারণের বৃহত্তম অংশের মন সংকীর্ণতায় আবদ্ধ

হয়ে ছিল এবং প্রসারিত হতে পারেনি।২৫ গ্রাম ও বহির্বিশ্বের মধ্যে কোনো-রকম উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক বিনিময় প্রায় ছিল না বললে চলে। যানবাহন ব্যবস্থাও ছিল অত্যন্ত অনুন্নত, গরুর গাড়ি ভিন্ন আর কিছু ছিল না। এসব কিছু মিলে গ্রামীণ জনসাধারণকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। লোকে কেবলমাত্র একটা ক্ষুদ্র গণ্ডীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গ্রামের মধ্যে বিচ্ছিন্ন-ভাবে জীবনযাপন করত। কেবলমাত্র গ্রামান্তরের মেলা, তীর্থযাত্রা বা বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষ ছাড়া গ্রামবাসী গ্রাম ছেড়ে বার হত না। তাও বাইরে যেত খুব অল্প সময়ের জন্য।

গ্রামের মধ্যেও আর্থিক জীবন বা আদিম কৃষি ও কারিগরি শিল্পের ওপর ভিত্তি করে চলত। এসবও আবার ছিল খুব নীচু মানের ও প্রায় অনড়। যুগ যুগ ধরে বলদে টানা আদিম হাল এবং কারিগরির সহজ সরল যন্ত্রপাতি দিয়েই গ্রামীণ জনসাধারণ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র উৎপাদন করত। নীচু মানের উৎপাদন পদ্ধতির দরুন শ্রমজাত ফললাভও কম হত। এর ফলে জনগণের হাতে (জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যক প্রয়োজন এবং অর্থলোলুপ শাসকের রাজস্বসংক্রান্ত দাবি মেটানোর পর) উৎপন্ন দ্রব্যের উদ্বৃত্ত প্রায় থাকতই না বলা চলে। আবার উচ্চ মানের ব্যবহারিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন সংগঠিত করবার সময়ও তারা পেত না।

গ্রামবাসীদের উৎপাদন পদ্ধতি যেমন সাদামাটা ছিল, সেইরকম তাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও ছিল অত্যন্ত সামান্য। অন্যদিকে গ্রাম ও বহির্বিশ্বের মধ্যে কোনো মূলগত অর্থনৈতিক বিনিময় ছিল না, আর যোগাযোগ ব্যবস্থাও ছিল অনুন্নত। এইসব কিছু একত্রিত হবার ফলে গ্রামে মানুষের জীবনযাত্রা ছিল অতিশয় বিপজ্জনক। বিধ্বংসী বন্যা অথবা শস্যহানির ফলে গ্রামবাসী একেবারে সর্বনাশের মুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়ত। বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা ক্ষীণ হওয়ার দরুন ও যানবাহন ব্যবস্থা অনুন্নত হবার ফলে বাইরে থেকে সাহায্য পাওয়া যেত না।

এই ধরনের অনিশ্চিত জীবনযাত্রা, প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের মুখে এইরকম অসহায়তা এবং এ ধরনের নিরাপত্তাবিহীন অবস্থায় গ্রামীণ জনসাধারণের মন কুসংস্কার, ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়তা এবং প্রাকৃতিক শক্তির অসংস্কৃত পূজা অর্চনার প্রতি আকৃষ্ট হতে বাধ্য। দৈবাধীনতা ও ব্যর্থতার মনোভাব সবসময়ই তাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে আচ্ছন্ন করে রাখত।

গ্রামীণ জনসাধারণের পর্যায়বদ্ধ জাতব্যবস্থা ভিত্তিক সামাজিক সংগঠন ও ব্যক্তিগত উদ্যম, দুঃসাহসিক কাজ বা নতুন উপায় অন্বেষণের পক্ষে সহায়ক ছিল না। গ্রামবাসীরা জাতব্যবস্থাকে দৈবাদিষ্ট বলে গণ্য করত। জাতপ্রথার সবরকম আচার ও বিধিনিষেধ তারা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিত। গ্রামজীবনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে 'ঈশ্বর-সৃষ্ট' জাত প্রথা অনুসারে নির্দিষ্ট যে মর্যাদা ও কর্তব্য তারা মাথা পেতে নিয়েছিল। ধর্মীয়-অতীন্দ্রিয় ব্যাখ্যায় গ্রামবাসীদের মন আচ্ছন্ন ছিল বলে জাত ব্যবস্থার মতাদর্শ ও কাঠামো সম্পর্কে স্বাধীন বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের প্রশ্ন তাদের মনে উঠতই না। গ্রামের বিচ্ছিন্ন জীবনযাত্রা, বন্যা বা খরার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় দ্বারা পর্যুদস্ত মানুষের মনে যে অসহায়তা সৃষ্ট হয় সেটা গভীরতর হয়ে উঠেছিল তিনটি

কারণে। প্রথমতঃ জাত ব্যবস্থা, দ্বিতীয়তঃ প্রভুত্বপরায়ণ যৌথ পরিবার এবং শিশুকাল থেকে লব্ধ ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়তার প্রভাব। এইসব কিছুর মিলিত শক্তির জোরে গ্রামীণ জনসাধারণের মানসিক উদ্যম, পরীক্ষা নিরীক্ষার আগ্রহ, অন্বেষণার আকাঙ্ক্ষা এবং বিদ্রোহের মনোভাব একেবারে লোপ পেয়ে গিয়েছিল।

ফলতঃ শতাব্দীকালের গ্রামীণ জনসাধারণের সামাজিক জীবন ও চিন্তাধারা ছিল বন্ধ্যা, কুসংস্কারপরায়ণ, সঙ্কীর্ণ এবং বাঁধাগতের দ্বারা নির্দিষ্ট। প্রায় একই রকমের কুসংস্কার, একই ধরনের ঠাকুর দেবতা, একই প্রকার সংকীর্ণ গ্রাম ও জাতের চেতনা, দুঃসহ গ্রামীণ জীবনযাত্রা দ্বারা সীমাবদ্ধ পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের মনকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এই অবস্থায় লোকে যেখানে বাস করত অর্থাৎ সেই স্বয়ংশাসিত, স্বয়ংসম্পূর্ণ, আত্মনিবিষ্ট গ্রামগুলো ছিল অনড় আর্থিক ব্যবস্থা, সামাজিক প্রতিক্রিয়া এবং সাংস্কৃতিক বদ্ধতার লীলাভূমি।

এমনকি সমুদ্রগুপ্ত অথবা আকবরের মতো মহান সম্রাটদের আমলে যখন ভারতবর্ষের একটা বড় অংশ একই রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে ছিল তখনও স্বশাসিত গ্রামের মৌলিক জীবনধারা কোনোভাবে প্রভাবিত হয়নি। এইসব সম্রাটদের শাসনকালে গ্রামের জীবনধারা অক্ষুন্ন ও অবিকৃত থেকে গেছে। বড় জোর সামান্য কিছু পরিবর্তন মাত্র হয়েছে। বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ফলে গ্রামের ক্ষেত্রে এইমাত্র পরিবর্তন ঘটেছে যে ভূমি রাজস্ব পুরাতন শাসকদের পরিবর্তে নতুন শাসকদের হাতে জমা পড়েছে। আর্থিক দিক থেকে গ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণই রয়ে গিয়েছিল। জাত ও গ্রামপঞ্চায়েতের বিধিনিষেধ দ্বারা গ্রামবাসীর জীবনযাত্রা পরিচালিত হচ্ছিল। গ্রামের নীচু মানের সামাজিক আর্থিক জীবনযাত্রার জন্য জনসাধারণের মধ্যে একই ধরনের চিন্তার অসাড়তা, অচলতা ও মানসিক বদ্ধতা থেকে গিয়েছিল।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায় সামরিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আলোড়ন প্রায়ই ঘটা সত্ত্বেও গ্রামের গোঁড়া অপরিবর্তনীয় রূপ অক্ষুন্ন থেকে গিয়েছিল।

ফলতঃ জনসাধারণের মধ্যে কোনোরকম জাতীয় চেতনা গড়ে উঠতে পারেনি, কেননা জাতীয় চেতনা জনগণের সর্বজনীন রাজনৈতিক ও আর্থিক জীবনধারা থেকে উৎসারিত হয়। উৎপাদিকা শক্তিগুলোর প্রভূত উন্নতি হলে ও শ্রমবিভাগ সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীণ হয়ে উঠলে এবং তার ফলে যখন সর্বব্যাপী অর্থনৈতিক বিনিময় হতে থাকে একমাত্র তখনই এই ধরনের একটা আর্থিক জীবন সম্ভবপর হয়ে ওঠে। এই ধরনের উন্নতিশীল আর্থিক জীবনের প্রয়োজনে যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার যে প্রসার হয় তার ফলে আর্থিক জীবন সংহত হয় এবং ব্যাপক যাতায়াত ও জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সামাজিক ও চিন্তাগত বিনিময়ের সুযোগ-সুবিধা বেড়ে গিয়ে, জনসাধারণের মধ্যে সংহতিবোধ দৃঢ় হয়ে ওঠে।

স্বনির্ভর গ্রামীণ জীবনযাত্রার ব্যবস্থায় মোটের ওপর কোনো সর্বজনীন আর্থিক জীবন গড়ে উঠতে পারেনি এবং তার ফলে কোনো সর্বজনীন আর্থিক জীবনের চেতনাও উদ্ভূত হতে পারে নি।

রাষ্ট্র গ্রামভিত্তিক গোষ্ঠীসমূহের সামাজিক মতাদর্শগত আর্থিক এমনকি

শাসনতান্ত্রিক জীবনে কোনো মৌলিক প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি বলে গ্রামবাসীদের মধ্যে কোনো সর্বজনীন রাজনৈতিক জীবনের চেতনাও গড়ে উঠতে পারে নি। বিজয়ী রাজা বা সম্রাট সামরিক বলপ্রয়োগ করে বিশেষ একটা ভূখণ্ড একত্রবদ্ধ করতে পেরেছিলেন বটে, কিন্তু সে একতা কখনই আভ্যন্তরিক ঐক্য হয়ে ওঠে নি। এই একতা গ্রামজীবনের সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে অনুপ্রবেশ করে তাকে কখনই প্রভাবিত করতে পারে নি। কেবলমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি যে এই ধরনের রাজনৈতিক পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হয়নি তাই নয়, গ্রামজীবনের সামাজিক ও আইনগত অবস্থাও আগের মতই রয়ে গিয়েছিল ; সচেতন জাত এবং গ্রামপঞ্চায়েত এবং তাদের বিধিনিষেধ অব্যাহত ছিল।

অবশ্য এইসব কথার অর্থ এই নয় যে—গ্রামজীবনের সুপ্রাচীন ইতিহাসে গ্রামের ওপর কোনো প্রভাব আসেনি বা গ্রামের ভেতরে কোনো পরিবর্তনই ঘটেনি। বস্তুতপক্ষে মৌলিক আত্মনির্ভরতা এবং পরিবর্তনশীলতা সত্ত্বেও গ্রামের মধ্যে অনেকরকম সামাজিক কার্যকলাপ চলত। গ্রামবাসীদের নিজেদের উৎসব অনুষ্ঠান ছিল সাদাসিধে রকমের যাত্রা যথা রামলীলা হত, 'কথা' উপলক্ষে ধর্মীয় সমাবেশ হত এবং আরও নানাধরনের সম্মিলিত ক্রিয়াকলাপ ছিল। প্রবল ধর্মীয় আলোড়নের সময় যেমন ধরা যাক বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব অথবা হিন্দুধর্মের কাঠামোর মধ্যে একটা নতুন প্রবণতা গড়ে ওঠার সময় নতুন ধর্মের প্রবক্তারা অথবা পুরানো ধর্মের নতুন ভাষ্যকাররা (যথা শঙ্করাচার্য, বল্লভাচার্য, চৈতন্য, রামানুজ প্রভৃতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মতবাদ বা সম্প্রদায়) নতুন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের প্রসার উপলক্ষে গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এমনকি এরকমটাও দেখা যায় যে এই ধরনের ধর্মীয় প্রচারের ফলে যে গ্রামটা আগে প্রধানতঃ হিন্দু অধ্যুষিত ছিল সেটা প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হয়ে গেছে অথবা যে গ্রামটা বৈষ্ণবপ্রধান ছিল সেটা পরে শৈবপ্রধান গ্রামে পরিণত হয়ে গেছে। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর এইরকম চমকপ্রদ পরিবর্তনের ফলে কিন্তু গ্রামবাসীদের চেতনার মধ্যে কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নি। তাদের চেতনা প্রসারিত হয়নি অথবা মানুষের মনে কোনোরকম জাতীয় চেতনা গড়ে ওঠেনি। আগের মতোই সংকীর্ণ গ্রামীণ দৃষ্টিভঙ্গীতে গ্রামবাসীদের মনোভাব আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। এইরকম পরিবর্তনের ফলে যা হয়েছিল তা হল লোকে নিজেকে হিন্দু বলে গণ্য করার পরিবর্তে বৌদ্ধ বলে মনে করত। জাতীয় চেতনার ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে এমন ভাবনা অর্থাৎ নিজেকে ভারতীয় বলে মনে করা, মানুষের মনে আসত না। ঐক্যের ধারণাও একমাত্র ধর্মীয় অর্থেই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল অর্থাৎ কিনা ভারতবর্ষ হিন্দুভূমি—হিন্দুধর্মের বন্ধনে একতাবদ্ধ জনসমষ্টির বাসভূমি। ভারত আর্থিক এবং রাজনৈতিক দিক দিয়ে একত্রিত ভারতীয়দের বাসভূমি এই চিন্তা মানুষের মনে আসত না। চেতনাটা ছিল ধর্মীয় মতাদর্শজনিত ঐক্যের চেতনা, রাজনৈতিক আর্থিক একতার (জাতীয়তাবাদ) নয়।*

* বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থান, হিন্দুধর্ম পুনরুজ্জীবিত করবার উদ্দেশ্যে শঙ্করাচার্যের সংগ্রাম-শীল আন্দোলন, অথবা সামাজিক ও ধর্মীয় দিক থেকে হিন্দু মুসলমান ও অন্যান্য

প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতবর্ষে নাগরিক সংস্কৃতির স্বরূপ

স্বনির্ভর গ্রামের আর্থিক সাংস্কৃতিক জীবন ছিল দীন, প্রায় অনড় এবং একঘেয়ে। সেই সংকীর্ণ জীবন গ্রামের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকত বললেই ঠিক বলা হয়। এর একদম বিপরীত অবস্থা দেখা যায় শহরে। শহরগুলো ছিল পরিবর্তনশীল, সম্পদশালী, অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল ; বহির্বিশ্বের সঙ্গে এদের প্রায় সবসময়ই যোগাযোগ থাকত। শহরগুলো ছিল শাসনকেন্দ্র, রাজা বা সম্রাটের সদর ও রাজসভার অবস্থান ক্ষেত্র। অন্য শহরের সঙ্গে এমনকি প্রায়ই অন্য দেশের সঙ্গেও এদের আর্থিক যোগাযোগ ছিল। শহরগুলো ছিল সম্পন্ন বাণিজ্যকেন্দ্র, অথবা তীর্থক্ষেত্র কিম্বা সমাবেশের মুখ্য কেন্দ্র। শহরের অর্থনীতি ছিল অনেক বেশি অগ্রসর এবং বিশেষীকৃত। কেননা শহরের আর্থিক ব্যবস্থা দ্বারা রাজা বা তার অমাত্যবর্গ, ধনী ব্যবসায়ী এবং মহিমান্বিত যাজক সম্প্রদায়ের অতিশয় জটিল এবং বহুবিধ প্রয়োজনসমূহ সাধিত হত। গ্রাম থেকে সংগৃহীত ভূমি রাজস্বের একটা বড় অংশ শহরে ব্যয়িত হত। বণিক সম্প্রদায় শহরে বসেই লাভের অংশ ভোগ করত। এইসব ব্যাপার শহরের অর্থনীতিতে বেগ সঞ্চার করত এবং শহরের উৎপাদনের ধারা নির্ধারণ করত। রুচিবিলাসী অভিজাতবর্গ ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রয়োজনমাফিক উৎকৃষ্ট সুতী ও রেশমবস্ত্র, কারুকার্যখচিত ধাতু ও পাথরের পাত্র ও নানারকমের বিলাসসামগ্রী এবং যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামও শহরে উৎপন্ন হত।

ধনসম্পদের একটা বড় অংশ শহরেই কেন্দ্রীভূত হত এবং ব্যয় হত সেখানেই। ফলে শহরের আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ ছিল।

আবার দেশের ধনসম্পদের অধিকাংশ যারা আত্মসাৎ করেছিল সেইসব শ্রেণীও শহরেই বাস করত। রাজা, অভিজাতবর্গ এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায় প্রমুখ ঐশ্বর্যশালী গোষ্ঠীর এমন একটা উদ্বৃত্ত ধনসম্পদ থাকত যাতে তারা শিল্পী, দার্শনিক, কবি, চিত্রকর, সংগীতশিল্পী, ভাস্কর, উৎকৃষ্ট সৌধাদি নির্মাণক্ষম স্থপতি, জমকালো প্রাসাদ নির্মাণক্ষম বাস্তুকার এবং বিভিন্ন প্রকারের বিজ্ঞানী, চিকিৎসক প্রভৃতির ভরণপোষণ করতে পারত।

ফলতঃ গ্রামের দৈন্যযুক্ত সংকীর্ণ জীবনে নয়, শহরেই অতি উন্নত সাংস্কৃতিক ও আর্থিক জীবন গড়ে উঠেছিল। বস্তুতপক্ষে এই শহরেই বড়

সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে কবীর ও নানকের মহিমাময় আন্দোলন এর কোনোটাই ভারতবাসীর মনে সর্বজনীন জাতীয় চেতনা সঞ্চার করতে পারে নি। মরমিয়াবাদী ভাবান্দোলনের ফলে ভারতবাসীর মনে ধর্মীয় মতাদর্শগত পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা সঞ্চারিত হয়নি। এর জন্য একটা বস্তুগত ভিত্তি প্রয়োজন ছিল, যথা একত্র সংহত জাতীয় অর্থনীতি, ব্যাপক আর্থিক এবং সামাজিক বিনিময়ের জন্য উন্নত ধরনের দ্রুত যানবাহন ব্যবস্থা এবং ব্রিটিশ অধিকারের ফলে উদ্ভুত সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় সংগঠন। "ভারতের সামাজিক আর্থিক ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন না ঘটায় মরমিয়া বিপ্লব প্রকৃত বিপ্লবের প্রতিচ্ছায়া হয়ে উঠবেই। ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে ভারতের সামাজিক আর্থিক ব্যবস্থার ভিত্তি বদলে গেছে।"

(ডি. পি. মুখার্জি, পৃঃ ২৮)

বড় দার্শনিক ও শিল্প সম্বন্ধীয় আন্দোলনের সূচনা ও পুষ্টি হয়েছিল। অভিজাত ও সম্পন্ন ব্যবসায়ীশ্রেণীরা সর্বদা এইসব আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে।

সামরিক, রাজনৈতিক ও ব্যবসাসংক্রান্ত ও সাংস্কৃতিক কারণে শহরগুলোতে সবসময়ই অবিরাম বহু লোকের যাতায়াত চলত। কেবলমাত্র যে ভারতবর্ষের এক শহর থেকে অন্য শহরে লোক যেত তাই নয় অন্য দেশ থেকেও আসত। অন্য যেসব দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের যুগ যুগ ধরে যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল এবং প্রসারিত হয়েছিল সেইসব দেশ থেকেও দলে দলে মানুষ ভারতবর্ষে আসত। এরা আসত হয়ত বন্ধু রাষ্ট্রের দূত হয়ে, অথবা ভ্রমণকারী বা ব্যবসায়ী হিসাবে। তাছাড়া আসত দার্শনিক, শিল্পী, এমনকি অন্য ধর্মের প্রচারক। শহরগুলো কখনো বিচ্ছিন্নভাবে থাকত না। সাধারণতঃ ভারতবর্ষের এক শহরের সঙ্গে আরেক শহরের এমনকি অন্য দূর দেশের শহরের সঙ্গেও ভারতবর্ষের শহরের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক বিনিময় হত।

সেইকালে সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক শিল্পসম্বন্ধীয় এবং ধর্মগত শিল্পসম্বন্ধীয় সংস্কৃতি শহরেই কেন্দ্রীভূত ছিল। কুসংস্কার, স্থূলতম প্রকৃতি পূজা ও দেবদেবী পূজা গ্রামগুলোতে অবাধে চলত কিন্তু বুদ্ধি ও বোধসম্পন্ন নগরবাসীর মধ্যে অতিশয় সূক্ষ্ম, জটিল এবং কার্যকারণ সম্পর্কভিত্তিক নানা-প্রকার আদর্শগত ও অধিবিদ্যাগত দার্শনিক মতবাদ বিকাশলাভ করেছিল। হিন্দু, বৌদ্ধ অথবা মুসলমান শাসকগণ সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় এবং প্রতিনিধিস্থানীয় শিল্পী, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের পৃষ্ঠ-পোষকতা করতেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে নবরত্ন বলে খ্যাত এইসব পণ্ডিতবর্গ এবং শিল্পীবৃন্দ পরিবৃত হয়ে পৃষ্ঠপোষক রাজা রাজসভাতে বসতেন।

অশোক, বিক্রমাদিত্য, ভোজ এবং অন্যান্য বৌদ্ধ ও হিন্দু রাজাদের সভায় এবং আকবর, সাহাজাহান এবং অন্যান্য মোঘল সম্রাটদের সভাতেও তৎকালীন বিখ্যাত শিল্পী, বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাবিদগণের সমাবেশ ঘটেছিল। কালিদাস, বাণ এবং হিন্দু সাহিত্যের অন্যান্য জ্যোতিষ্করা রাজসভাতেই পরিপোষিত হয়েছিলেন। তানসেন ছিলেন মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীতশিল্পী। তিনি সংগীতে নতুন ধারা প্রবর্তন করেছিলেন। তানসেন আকবরের পৃষ্ঠ-পোষকতা লাভ করেছিলেন। জ্যোতির্বিদেরা রাজাদের উৎসাহ এবং সহায়তা লাভ করতেন। রাজারা তাদের জন্য মানমন্দির তৈরি করে দিতেন। রাজা জয়সিংহ জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার জন্য মানমন্দির তৈরি করে দিয়েছিলেন। আগেকার কালের যেটুকু ইতিহাস আজ আমরা জানি তার সবটুকুই রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত বিবরণ থেকেই জানা যায়।

ভারতীয় সংস্কৃতি, হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই প্রধানতঃ ও মূলত ছিল ধর্মীয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের ক্ষেত্রেই আত্মিক বুদ্ধিচর্চা, শিল্পচর্চা, ধর্মচেতনা দ্বারা প্রভাবিত হত। এই প্রসঙ্গে O'Malley-র উক্তি উল্লেখযোগ্য।

"হিন্দু সংস্কৃতির সব থেকে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল ধর্মীয় উপাদান। এর প্রভাবই প্রবলতম। ধর্ম হিন্দু ব্যবহারবিধির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

ব্যবহারবিধি সমন্বিত গ্রন্থসমূহ, অর্থাৎ স্মৃতিশাস্ত্র দৈবাদিষ্ট বলে গণ্য করা হয়। ধর্ম ও সাহিত্যের সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ঠ যে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রচিত সাহিত্যের বৃহত্তর অংশই ভক্তিরসাশ্রিত। শিল্প জনগণের সৌন্দর্য ভাবনার প্রকাশ। সেই শিল্পও ধর্মের সংগে নিবিড়ভাবে জড়িত। মন্দির গঠনে যে স্থাপত্যকলার প্রকাশ হয়েছে এবং মন্দিরের অলংকরণে যে ভাস্কর্য-কলার প্রকাশ হয়েছে তার সবই ধর্মীয় প্রতীকের বিভিন্ন রূপ।"২৬

মুসলমান সংস্কৃতি বিষয়ে এই কথা সমভাবে প্রযোজ্য। প্রকৃতি ও প্রকাশ-ভংগী উভয় প্রশ্নেই সংস্কৃতিও ছিল মূলতঃ ও প্রধানতঃ ধর্মীয়। এমনকি যখন হিন্দু ও মুসলমানদের দীর্ঘস্থায়ী ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে এই দুই সংস্কৃতির সমন্বয়ের একটা জোরদার প্রবণতা দেখা গিয়েছে তখন সে সমন্বয়ও উভয় সংস্কৃতির মূলগত ধর্মীয় চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

ভারতীয় সংস্কৃতির ধর্মীয় মতাদর্শগত ঐক্য

প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতে সামন্ততান্ত্রিক কৃষিজীবী সমাজের সংস্কৃতির (দার্শনিক, ধর্মীয় ও অন্যান্য) চরিত্র প্রধানতঃ অতীন্দ্রিয় ভাবনামূলক। এর কারণ হল সমাজটা ছিল আর্থিক দিক দিয়ে অত্যন্ত নিম্নমানের ও অনড় এবং সামাজিক দিক দিয়ে নানা বাধানিষেধে আবদ্ধ। সমাজের মধ্যে যা কিছু পরিবর্তন ঘটেছে তার সবটুকুই পরিমাণগত, গুণগত নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই সমাজ মূলগতভাবে একই রকম রয়ে গিয়েছিল। এই ধরনের সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনযাত্রা থেকে অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিভংগীর উদ্ভব অপরিহার্য। দার্শনিক, শিল্পগত এবং সামাজিক-সাংগঠনিক ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার কার্যকলাপ এই অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিভংগীর দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে।

"অনড় না হলেও ভারতীয় সমাজ ছিল প্রধানতঃ "বদ্ধ" সমাজ। স্বভাবতই এইভাবে দীর্ঘকাল চলবার ফলে ভারতীয় সংস্কৃতিতে P. Sorokin-এর ভাষায় বলতে গেলে অভিন্ন চরিত্রলক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠল। জীবনযাত্রার জন্য কি প্রয়োজন এবং জীবনের উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট নান্দনিক, নীতিগত সামাজিক মূল্যবোধ এবং ব্যবস্থা এবং সত্য, ভাল, অস্তিত্ব এবং পরমতত্ত্ব সম্পর্কে সর্বজনীন ধারণা সমন্বিত সামাজিক কার্যকলাপ সম্পর্কে মোটামুটি স্পষ্ট দৃষ্টিভংগী গড়ে উঠল। অন্যভাবে বললে বলা যায় যে হিন্দু, বৌদ্ধ এবং মুসলমানরা সমবেতভাবে একটা ধারণা সৃষ্টি করেছিল। ধারণাটা এই—মানুষের অস্তিত্ব শুধুমাত্র জড় জগতের এই জীবনেই আবদ্ধ নয়, দৃশ্যমান জগতে যা রয়েছে তার সবই ক্ষণিক, এই বাহ্যিক জীবনের প্রয়োজনে দৃষ্টি দেওয়া অনাবশ্যক। পরমাত্মার উপলব্ধি ও পরমাত্মায় লীন হওয়াই মনুষ্য জন্মের উদ্দেশ্য, তাই সেই চেষ্টাই শ্রেয়। বস্তুতপক্ষে ব্যক্তির দিক থেকে এর অর্থ এই যে রীতিনীতি এবং আচার-অনুষ্ঠান যথাযথ-ভাবে পালন করলেই মানুষ অন্তর্জীবনের ওপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে পারে। সামাজিক দিক দিয়ে এই ধারণা একটা উচ্চ-নীচ ক্রমবিন্যাস সৃষ্টি করে। একমাত্র এইসব মূল্যবোধই চিরন্তন, এর থেকেই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি জন্মায়। সর্বতোভাবে আধ্যাত্মিকতায় নির্দিষ্ট না হলেও আধ্যাত্মিকতাকেই যারা

জীবনের পরমগতি বলে ধরে নিয়েছে তারাই হয় সমাজের অগ্রগণ্য। এই জীবনভাবনাই সাধারণতঃ অতীন্দ্রিয় বলে পরিচিত। ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রভাব প্রসারের আগে এইটাই ছিল ভারতীয় জীবনভাবনার প্রধানতম প্রেরণাস্থল।"২৭

হিন্দু ও মুসলমান উভয় সংস্কৃতিই প্রেরণাতে ছিল ধর্মীয়। নগরে রাজা অভিজাত এবং সম্পন্ন ব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠপোষকতায় উভয় সংস্কৃতিই বিকাশলাভ করেছিল।

বারাণসী, পুরী, মাদুরা, নাসিক, মথুরা, সোমনাথ, পাটন প্রভৃতি অসংখ্য হিন্দু তীর্থক্ষেত্রের সুবিশাল মন্দিরসমূহ হিন্দু রাজা, অভিজাতবর্গ ও ধনী বণিকগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। বস্তুপাল এবং তেজপাল নামক দুই বিত্তশালী জৈন বণিক দিলওয়ারাতে কতকগুলো জৈন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সৌন্দর্য ও স্থাপত্যগত উৎকর্ষের জন্য মন্দিরগুলি সর্বকালের সর্বোৎকৃষ্ট সৌধসমূহের অন্যতম বলে বিবেচিত হয়। অশোক কর্তৃক স্থাপিত বিখ্যাত স্তম্ভগুলো গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে ছড়িয়ে আছে। স্তম্ভগুলিতে বৌদ্ধধর্মের সারকথা উৎকীর্ণ আছে। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় যে মহান কলা বিস্তারলাভ করেছিল স্তম্ভগুলো তারই সাক্ষ্য বহন করে।

বস্তুতপক্ষে ভারতবর্ষে এমন কোনো একটা শহর দেখতে পাওয়া যায় না যেখানে অতীতের ধর্মীয় উদ্দীপনা ও শিল্প প্রতিভার নিদর্শনবাহী কোনো একটা মন্দির নেই।

মুসলমান সম্রাটেরাও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে কিছু কম ছিলেন না। দিল্লী, আগ্রা, লাহোর, আমেদাবাদ এবং অন্যান্য অসংখ্য শহরে বিভিন্ন আমলে মুসলমান রাজাদের প্রতিষ্ঠিত অনেক মসজিদ দেখা যায়। মসজিদগুলো সংশ্লিষ্ট শাসকদের শিল্পকলার প্রতি সুগভীর অনুরাগ ও উৎসাহের নিদর্শন। এঁদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া শিল্পীদের পক্ষে ঐসব সৌধ তৈরি করা সম্ভব হত না।

অতিরিক্ত বিশুদ্ধতাবাদী আওরঙ্গজেব ছাড়া দিল্লীর মুঘল সম্রাটেরা সকলেই শিল্পকলার পরম অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 'শ্বেতমর্মরে স্বপ্ন' পৃথিবীখ্যাত তাজ, মতি মসজিদ এমনকি দিল্লী আগ্রার রাজপ্রাসাদগুলো— প্রতিটিই স্থাপত্য ইঞ্জিনিয়ারিং এবং শিল্পকৌশল উভয়েরই অপূর্ব সমন্বয়। শ্রীনগর (শালিমার এবং নিশাতবাগ) ও লাহোরের সুসজ্জিত উদ্যানগুলোও উল্লেখযোগ্য। এগুলো তৎকালীন শিল্পোৎকর্ষ এবং সেই সঙ্গে শিল্পকলার প্রতি রাজাদের সাগ্রহ পৃষ্ঠপোষকতার প্রকৃষ্ট এবং অবিসম্বাদিত প্রমাণ।

শহরগুলো ছিল সেই যুগের বুদ্ধিজীবীদের ঘাঁটি। রাজাদের পোষকতায় রাজসভায় প্রতিদ্বন্দ্বী এবং বিরুদ্ধবাদী দার্শনিক মতের প্রবক্তাদের মধ্যে বিচার হত। এমনকি প্রায়ই দূরবর্তী শহর ও গ্রামাঞ্চল থেকে বিভিন্ন ধর্মের খ্যাতনামা প্রবক্তারা রাজাদের আমন্ত্রণে আসতেন এবং ধর্মমতের উৎকর্ষ সম্বন্ধে স্থানীয় ধর্মের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করতেন।

অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগ সম্পর্কে O'Malley লিখেছেন, 'মধ্য এশিয়া, তুরস্ক, পারস্য এবং উত্তর আফ্রিকা থেকে সাধু, কবি, স্থপতি এবং ভ্রমণকারীরা ভারতবর্ষে আসতেন ; ইতিহাসবিদ ফেরিস্তা ছিলেন

কাস্পিয়ান সাগর তীরবর্তী অসট্রাবাদের অধিবাসী; ইবন বতুতা এসেছিলেন উত্তর আফ্রিকা থেকে; বাবর কনস্টাণ্টিনোপল থেকে স্থপতিদের নিয়ে এসেছিলেন। পারসিক লেখকদের মতে তাজমহলের নকসা যিনি করেছিলেন তিনিও তুর্কী ছিলেন এবং কনস্টাণ্টিনোপল থেকেই এসেছিলেন।'২৮

আগের যুগেও হিন্দু সংস্কৃতি জাভা, বালি, সুমাত্রা, মালয় এবং পূর্ব দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য দ্বীপগুলো পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছিল। এমনকি এখন পর্যন্ত এইসব দ্বীপপুঞ্জের জনসাধারণের বেশ বড় অংশের মধ্যে হিন্দু সংস্কৃতির ছাপ লক্ষ্য করা যায়।

এইসব যুগে শহরগুলো শিক্ষার কেন্দ্রও ছিল। হিন্দু এবং তার পরে মুসলমান শিক্ষাকেন্দ্রগুলো বিভিন্ন শহরে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

দেখা যাচ্ছে যে প্রাক্ ব্রিটিশ যুগে শহরগুলোতেও একটা সমৃদ্ধ, জটিল, সাংস্কৃতিক জীবন ছিল।

জাতীয় ভাবানুভূতির অভাব

এই সংস্কৃতি কিন্তু কোনো জাতীয় চেতনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়নি, কেননা জাতীয় চেতনা এই যুগে ছিল না, থাকতেও পারে না। এমনকি ধর্মীয় সম্পর্কবিহীন শিল্পকলাও বিষয় ও পরিধিতে জাতীয় চরিত্রবিশিষ্ট ছিল না। এগুলো রাজাদের মাহাত্ম্যসূচক (কুতুব মিনার, রাজকীয় প্রাসাদসমূহ, জমকালো স্থাপত্যালঙ্কারশোভিত সমাধিগৃহসমূহ) অথবা মহিষীর জন্য সম্রাটের গভীর অমর প্রেমের নিদর্শন (তাজমহল)। এই শিল্পকলা ছিল অভিজাতবর্গের অথবা হিন্দু বা মুসলমান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের। এই শিল্প সমগ্র জাতির শিল্প নয়, অথবা আধুনিক জাতিকে গড়ে তুলেছে যে নূতন সামাজিক শ্রেণী তাদেরও নয়। নগরবাসী, রাজা, অভিজাতশ্রেণী, ব্যবসায়ীশ্রেণী ও কারিগর—কারোও চেতনাই জাতীয় চেতনা ছিল না।

জাতীয় চেতনা উদ্ভবের জন্য যে ধরনের বৈষয়িক ও মানসিক শর্তের (সর্বজনীন, আর্থিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব) সরকার হয় প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতে তা ছিল না। জাতীয় সংস্কৃতির জন্য একটা গোটা সম্প্রদায়কে জাতীয় রূপে নির্বিষ্ট করা প্রয়োজন। আর্থিক অগ্রগতির (যথোপযুক্ত উৎপাদিকা শক্তি এবং শ্রমবিভাগ প্রসারের দ্বারা—একটা জনগোষ্ঠীকে একটা সামগ্রিক বিনিময় সম্পর্কে আবদ্ধ করা, সুবিস্তৃত ও দ্রুত যানবাহন ব্যবস্থার প্রসার) ফলে অর্থনৈতিকভাবে এবং কালক্রমে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে একটা জনগোষ্ঠী সুসংহত হয়ে উঠলে জাতীয় চেতনা রূপ লাভ করে। সর্বজনীন আর্থিক জীবনযাত্রার প্রয়োজনে সর্বজনীন ভাষার উদ্ভব হয়। সর্বজনীন ভাষা একটা গোষ্ঠীকে সংহত জাতিতে পরিণত করার আর একটা উপায়। জাতীয় সংহতিসাধনের বিভিন্ন পর্বে সর্বজনীন অর্থনৈতিক চেতনা গড়ে ওঠে—এবং একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রয়োজন দেখা দেয়। উত্তরোত্তর এমন একটা সংস্কৃতি গড়ে ওঠে যাতে সংগীতে, ভাস্কর্যে, চিত্রকলায়, নাটকে, উপন্যাসে অথবা সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্যে জাতীয় সমাজ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত হয় এবং জাতির অন্তর্গত ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও শ্রেণীর অবাধ বন্ধনমুক্ত অধিকতর সমৃদ্ধিশালী সামাজিক, আর্থিক

ও সাংস্কৃতিক জীবনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। প্রাক্ জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক কালের সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারার অবশিষ্টাংশ বা বিজাতীয় আধিপত্যের মতো যেসব শক্তি জাতীয় সমাজ গড়ে তোলার পক্ষে প্রতিবন্ধক তাদের বিরুদ্ধে ক্রোধ ও বৈরীভাব জাতীয় সংস্কৃতির মধ্যে প্রকাশ পায় অথবা জাতীয় সংস্কৃতি দ্বারা এইসব আবেগানুভূতি জাগ্রত হয়। জাতের নির্বাধ বৈষয়িক এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকের বিরুদ্ধে জাতীয় সংস্কৃতি ললিতমধুরভাবে অথবা যুক্তিবিচারের মাধ্যমে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

পুঁজিবাদী আর্থিক ব্যবস্থা বিভিন্ন সমাজে অসংহত জনগোষ্ঠীকে আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে একত্রিত করে আধুনিক জাতি সৃষ্টি করেছে। এই ব্যবস্থার প্রভাবেই ভারতীয় জাতির উদ্ভব হয়েছে। পূর্ববর্তী ব্যবস্থার মতো পুঁজিবাদী সমাজেও একটা শ্রেণীকাঠামো আছে, বুর্জোয়া জাতিও শ্রেণী নিয়ে গঠিত। ভারতবর্ষে বুর্জোয়া জাতি রাজা, আধা-সামন্ততান্ত্রিক জমিদার প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মিশ্রণে গঠিত। অবশ্য ভারতবর্ষের নূতন সামাজিক শ্রেণীসমূহ, যথা বুর্জোয়া ও গৌণ বুর্জোয়াদের প্রগতিশীল গোষ্ঠীগুলো কৃষক এবং শ্রমজীবীগণ নূতন জাতীয় অর্থনীতি থেকে উদ্ভূত এবং জাতীয় ভিত্তিতে ও পর্যায়ে গঠিত জাতীয় অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। অবাধ অগ্রগতির পথে সামন্ততান্ত্রিক উপাদান এবং সে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের প্রতিবন্ধকতা এরা অনুভব করতে পারছিল। এদের শ্রেণীস্বার্থ ছিল পৃথক এম্যাক পরস্পরবিরোধী, যে অনুপাতে এদের গোষ্ঠী সচেতনতা গড়ে উঠেছিল সেই অনুপাতে এই নূতন (জাতীয়) সামাজিক শ্রেণীর সংস্কৃতি শ্রেণী-বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে জাতীয় রূপ লাভ করল, যথা, শ্রেণীসচেতন শ্রমজীবীদের সংস্কৃতির বিষয়বস্তু হল সমাজতান্ত্রিক, রূপ হল জাতীয়। জাতীয় বুর্জোয়া, জাতীয় শ্রমিক, জাতীয় গৌণ বুর্জোয়া এবং কৃষক ইত্যাদি এই নব সৃষ্ট শ্রেণীসমূহের বিকাশমান সংস্কৃতি ভারতবর্ষের সামগ্রিক জাতীয় সংস্কৃতি গঠন করেছিল। বাঙালী, গুজরাটী, মহারাষ্ট্রীয়, কানাড়ী প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জাগ্রত জাতীয় সত্তা এই সংস্কৃতির অন্তর্গত।

স্পষ্টতই জাগ্রত সামাজিক শ্রেণীসমূহ এবং আঞ্চলিক জাতীয় সত্তার মিলনে গঠিত এই ধরনের একটা জাতীয় সংস্কৃতি প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতে ছিল না, কারণ তখন বিভিন্ন অংশ নিয়ে গঠিত একত্রবদ্ধ জাতির অস্তিত্ব ছিল না। এই নূতন সংস্কৃতির মধ্যে—সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীসমূহের এবং সেই সঙ্গে সমগ্র ভারতীয় জাতির অবাধ অগ্রগতির প্রয়োজনীয়তা প্রতিফলিত হয়েছিল। প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতের সামন্তশ্রেণী এবং বিত্তশালী বণিকদের সুসমৃদ্ধ, জটিল এবং বিস্তারিত সংস্কৃতি এবং জনসাধারণের সংস্কৃতি (প্রধানতঃ লোকশিল্প, লোকগাথা এবং ধর্মীয় উৎসবাদি) কোনোটাতেই জাতীয় চরিত্র এবং জাতীয় সম্ভাবনা ছিল না।

সূত্র নির্দেশ

১ Sir Charles Metcafe-এর উক্তি, Ghurey কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ২৪।
২ Shelvankar, পৃ. ৯৫।

৩ Wadia and Merchant, পৃ. ২৩৪।
৪ উপরিউক্ত পৃ. ২৩৪।
৫ Shelvankar, পৃ. ১০২।
৬ Wadia and Merchant, পৃ. ৩০।
৭ Gadgil, পৃ. ১০-১২ দ্রষ্টব্য।
৮ Shelvankar, পৃ. ১২৪-৫।
৯ Gadgil, পৃ. ১০।
১০ Wadia and Merchant, পৃ. ৩১।
১১ Buchanan, পৃ. ১৫।
১২ উপরিউক্ত পৃ. ১৫।
১৩ Karl Marx, পৃ. ৬৯১।
১৪ O' Malley, পৃ. ৩৫৫।
১৫ Mukerji, D P., পৃ. ১-২।
১৬ Gadgil, পৃ. ৬ দ্রষ্টব্য।
১৭ Calverton, পৃ. ১৬-৭।
১৮ উপরিউক্ত, পৃ. ১৮।
১৯ Gadgil, পৃ. ৪৫।
২০ Shelvankar, পৃ. ১৩৯।
২১ উপরিউক্ত, পৃ. ১৩৯।
২২ উপরিউক্ত, পৃ. ১৪২।
২৩ উপরিউক্ত, পৃ. ১৪২।
২৪ উপরিউক্ত, পৃ. ১৪৩।
২৫ Gadgil, পৃ. ১২।
২৬ O' Malley, পৃ. ২।
২৭ Mukerji, পৃ. ২-৩।
২৮ O' Malley, পৃ. ৮।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন

ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতীয় সমাজের রূপান্তর

ব্রিটিশ অধিকারের আগে ভারতবর্ষের অর্থনীতি ছিল সামন্ততান্ত্রিক। এর মূলগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আগের পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। দীর্ঘকাল-ব্যাপী প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এই অর্থনীতি পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে পরিবর্তিত হয়। অবশ্য সামন্ততান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য একেবারে লোপ পায়নি। এই পরিবর্তন ঘটেছিল প্রধানতঃ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অধিকারের ফলে। একদিকে ছিল ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অনুসৃত রাজনৈতিক এবং আর্থিক নীতিসমূহ, অন্যদিকে ছিল বাণিজ্য, শিল্প ও আর্থিক এই তিন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ পুঁজিবাদের প্রসার।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, জার্মানী সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সেখানকার পুঁজিবাদীশ্রেণী সামন্ততান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থার বদলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল কিন্তু ভারতবর্ষে পরিবর্তনটা এসেছিল প্রধানতঃ বৃটেনের পুঁজিবাদীদের দ্বারা—দেশীয় পুঁজিবাদীদের এতে বিশেষ কোনো ভূমিকা ছিল না। ফলতঃ ভারতের পুঁজিবাদী আর্থিক ব্যবস্থা স্বাধীনভাবে বিকাশলাভ করেনি। এর প্রকৃতি এবং ব্যাপকতা নির্ধারিত হত প্রধানতঃ বৃটিশ পুঁজিবাদী-দের প্রয়োজন ও স্বার্থানুসারে। এই কারণেই ভারতবর্ষকে বৃটেনের আর্থিক উপনিবেশ বলা হয়ে থাকে।

যখন ইংরেজ, ফরাসী ও অন্যান্য বিদেশী শক্তিগুলো ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে ভারতবর্ষে বাণিজ্য বিস্তার এবং রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপন করেছিল সেই সময় বস্তুত তার আগে থেকেই ভারতবর্ষে একটা বাণিজ্যিক পুঁজিবাদীশ্রেণী বিরাজ করছিল। এই বণিকশ্রেণীর দুর্বলতা স্পষ্ট, তবে তাদের শক্তিও বাড়ছিল। "অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যখন মুঘল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ছিল তখন একটা নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণীর উত্থান হতে আরম্ভ হয়। অবশ্য তখনও উৎপাদনের কেন্দ্র হিসেবে গ্রামের গুরুত্ব অব্যাহত ছিল। তবে ধনবল-পুষ্ট মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্যোগে পণ্য বিনিময় এবং পণ্য বণ্টনের ফলে বিভিন্ন শহরে বাণিজ্য কেন্দ্র উদ্ভূত হয়েছে। এই শহরগুলোতে নানা ধরনের কারিগর এসে বাস করতে থাকে। এই কারিগরেরা প্রধানতঃ বিনিময় ও বণ্টনের জন্য উৎপাদন করত স্থানীয় প্রয়োজনে ততটা নয়। মুঘল সাম্রাজ্য পতনের পর দেশের বিভিন্ন অংশে নূতন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এদের রাষ্ট্রকাঠামো সামন্ত-

তান্ত্রিক ছিল তবে আর্থিক দিক দিয়ে এই রাষ্ট্রগুলো প্রধানতঃ বণিকশ্রেণীর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হত। নতুন বণিকশক্তি হয়তো একসময় দেশকে একত্রে বেঁধে ফেলতে পারত। কিন্তু বণিকশ্রেণী এতটা শক্তি সঞ্চয় করবার আগেই দেশে অবস্থান্তর ঘটেছে, দেশ রাজনৈতিকভাবে খণ্ডবিখণ্ড হয়েছে। ফলে বহিঃশক্তির আক্রমণের মুখে আত্মরক্ষার ক্ষমতা তার ছিল না। ভারত বিদেশীদের দ্বারা অধিকৃত হল। যে দেশ ভারত অধিকার করল, আর্থিক উন্নয়নের প্রশ্নে সে ভারতের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রসর ছিল।"১

উদীয়মান বণিকশ্রেণী হয়তো প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চয় করে সামন্তশ্রেণীর হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করতে পারত এবং সেই ক্ষমতা ব্যবহার করে পুঁজিবাদের প্রসার ঘটিয়ে ভারতকে সামন্ততান্ত্রিক পর্যায় থেকে পুঁজিবাদী পর্যায়ে উন্নীত করতে পারত কিন্তু তার আগেই শস্ত্রবল ও আর্থিকবলে অধিকতর বলীয়ান বিদেশী বাণিজ্য সংস্থাসমূহ ভারতের ওপর আর্থিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের জন্য সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছে।

ব্রিটিশ আধিপত্যের কারণ

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা যা ছিল তাতে পরাধীনতা বিস্ময়কর নয়। একটা সুসংবদ্ধ, সংহত এবং অধিকতর অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিসম্পন্ন বিদেশী শক্তির পক্ষে দেশটা জয় করে নেওয়া মোটেই কঠিন ছিল না। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর যে বিশৃঙ্খলা এবং গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল তার ফলে এইরূপ বিদেশী আধিপত্যের পথ সুগম হয়েছিল।

"ভারতবর্ষে ইংরেজ প্রাধান্য কিভাবে অধিষ্ঠিত হয়েছিল? মুঘল সম্রাটের সার্বভৌম ক্ষমতা মুঘল সুবাদারেরা (ভাইসরয়েরা) বিনষ্ট করেছিল, সুবাদারদের ক্ষমতা মারাঠাদের দ্বারা বিনষ্ট হয়েছিল, মারাঠাদের ক্ষমতা আফগানদের দ্বারা বিনষ্ট হয়েছিল। দেশের সবাই যখন সবাকার সঙ্গে এইভাবে সংঘর্ষে লিপ্ত তখন ইংরেজ এগিয়ে এসে সবাইকে অধীনস্থ করে ফেলল। দেশ শুধুমাত্র মুসলমান আর হিন্দুতে নয়, বিভিন্ন কৌমগোষ্ঠী, জাত এবং বর্ণে বিভক্ত ছিল। সমাজের কাঠামো সমাজভুক্ত ব্যক্তিবর্গের বিধিগত স্বাতন্ত্র্য এবং পারস্পরিক বিকর্ষণসঞ্জাত একপ্রকার ভারসাম্যের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়েছিল। এইরকম একটা দেশ ও সমাজ যে বিজিগীষু শক্তির পদানত হবে এতে বিস্ময়কর কিছু নেই।"২

ভারতবর্ষের ওপর ব্রিটেনের রাজনৈতিক আধিপত্য নয়, ব্রিটিশরা রাজনৈতিক আধিপত্যের সুযোগ যেভাবে কাজে লাগিয়েছিল তাতেই ভারতীয় সমাজজীবনে আর্থিক অবস্থার বিপুল পরিবর্তন ঘটে যায়।

আগেও ভারতবর্ষ বহুবার বিজিত হয়েছে। কিন্তু এইসব জয়ের ফলে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই পরিবর্তন ঘটেছিল। মূলগত অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপরে বিশেষ কোনো প্রভাব পড়ে নি। ভূমির যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে গঠিত স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম, গ্রামীণ কৃষি ও শিল্পের একতা, রাজস্ব নির্ধারণের প্রশ্নে গ্রামকে এক করে ধরার প্রবণতা এবং গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্য প্রায় সবটা গ্রামের মধ্যেই ব্যবহৃত হবার ফলে গ্রাম-সমাজে খুব একটা জোর ছিল। এই জোরের জন্যই বৈদেশিক আক্রমণ, সামরিক অভিযানজনিত বিপর্যয়, ধর্মীয় আন্দোলন এবং

বিভিন্ন রাজবংশের মধ্যে সংগ্রাম সত্ত্বেও ব্রিটিশ আগমনের পূর্বে বহু শতাব্দী ধরে ভারতের আর্থিক কাঠামোর ওপর কেউ হাত দিতে পারে নি। এইসব ঘটনা হয়তো অনেক ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনক ও বিপ্লবাত্মক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এসবের প্রভাবে শুধুমাত্র ভারতীয় সমাজের সামাজিক রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় মতাদর্শের ক্ষেত্রে বাহ্যিক পরিবর্তন ঘটেছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক ভিত্তি কখনো পাল্টায় নি। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলিই ছিল প্রায় সকলেরই জীবনযাত্রার অবলম্বন। প্রবলতম রাজনৈতিক ঝঞ্ঝা বা সৈন্যবাহিনীর তাণ্ডব গ্রামগুলোকে বিপর্যস্ত করতে পারে নি।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে অসংখ্য যুদ্ধ ও অভিযানের কাহিনী আছে। কিন্তু এইসব যুদ্ধ ও অভিযান সত্ত্বেও প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোতে চিড় ধরেনি। এর কারণ এই যে সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতি, যার ওপর ভিত্তি করে ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, তদপেক্ষা উন্নততর কোনো উৎপাদন পদ্ধতি আক্রমণকারী বা যুধ্যমান জাতিদের কেউই প্রবর্তন করতে পারেনি।* বস্তুতপক্ষে উত্তর থেকে আগত আক্রমণকারীরা যারা ভারতে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেছিল এবং ক্রমে ক্রমে শাসকশ্রেণী হিসাবে ভারতবর্ষে বসবাস আরম্ভ করেছিল তাদের সকলেই এই দেশে আসার আগে যে সমাজে বসবাস করত তার আর্থিক ব্যবস্থা ভারতের তুলনায় পশ্চাদ্পদ ছিল। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল প্রাক্-সামন্ততান্ত্রিক যাযাবর অথবা আধা-সামন্ততান্ত্রিক। তাই তারা ভারতবিজয় করে তারপরে এখানে বাস করে এবং এই দেশ শাসন করে ভারতীয় সমাজের সামন্ততান্ত্রিক ভিত্তির ওলটপালট অথবা পুনর্গঠন করতে পারে নি। নতুন শাসকবর্গ পুরোনো অর্থনৈতিক ভিত্তি মেনে নিয়েছিল।

"আরব, তুর্কী, তাতার ও মোগল—যারা পরের পর ভারতবর্ষ জয় করেছিল তারা সকলেই অচিরে হিন্দু সমাজের অন্তর্গত হয়ে গিয়েছিল। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে এই যাযাবর বিজেতারা নিজেরাই শাসিত সমাজের উন্নততর সভ্যতার কাছে পরাভূত হয়েছিল।"৩

ব্রিটিশ আধিপত্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসমূহ

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আধিপত্যের তাৎপর্য ভিন্ন ধরনের। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অধিকারের অর্থ একটা আধুনিক জাতির আধিপত্য, যে জাতি নিজ দেশে সামন্ততান্ত্রিক প্রথা বিলুপ্ত করেছে এবং তার জায়গায় আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের সৃষ্টি করেছে। ব্রিটিশ শাসন ছিল এমন এক শাসকগোষ্ঠীর আধিপত্য যারা নিজ দেশে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তিতে গঠিত সামন্ততান্ত্রিক

* প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতের অর্থনীতি হল সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির এশীয় রূপ। ইউরোপীয় সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে এর কতকগুলো স্বাতন্ত্র্য আছে। এই ব্যবস্থানুসারে ভূমি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছিল না—ভূমি ছিল সমগ্র গ্রামের সাধারণ সম্পত্তি। শিল্প ও কৃষির সংযোগে গ্রাম ছিল অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সেচ ও অন্যান্য জনহিতকর কাজ ছিল রাষ্ট্রের এক্তিয়ারভুক্ত।

মার্ক্সের মতে এই বৈশিষ্ট্যগুলো প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতীয় সমাজের জীবনযাত্রা ও অগ্রগতি (অথবা অগ্রগতিহীনতা, আপেক্ষিক স্থিতিশীলতা) নির্ধারণ করত।

অনৈক্য অতিক্রম করে এসেছে। যে পুঁজিবাদের প্রভাবে আধুনিক জাতিসমূহের ইতিহাসে সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক একত্রীকরণ সম্ভব হয়েছে সেই পুঁজিবাদের উদ্ভব ও বিস্তারে ব্রিটিশরা আধুনিক জাতি হিসাবে সুসংহত হয়েছিল।৪

পুঁজিবাদী জাতি সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক—সর্বদিক থেকেই সামন্ততান্ত্রিক জনগোষ্ঠী থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। সামন্ততন্ত্রের তুলনায় পুঁজিবাদ উন্নততর উৎপাদন পদ্ধতিতে গঠিত বলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। সামন্ত-তান্ত্রিক ব্যবস্থাধীন জনসাধারণ পৃথক পৃথকভাবে জীবনযাপন করে। তারা সামাজিক রাজনৈতিক প্রশ্নেও বিচ্ছিন্ন এবং বহুধাবিভক্ত। কিন্তু পুঁজিবাদী দেশগুলো এক রাজনৈতিক শাসন এবং এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় থাকার ফলে সামাজিক, আর্থিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে বিশেষভাবে সুসংহত। তাই পুঁজিবাদী দেশে দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদ প্রবল। এই কারণে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তারের ইতিহাস আলোচনা করলে ব্রিটিশরা ব্রিটেনের স্বার্থ-হানিকর কাজ করছে এমন দৃষ্টান্ত বিশেষ পাওয়া যাবে না। অপরপক্ষে দেখা যায় যে রাজন্য, সেনাধ্যক্ষ, বণিক সহ বহুসংখ্যক ভারতীয় ব্রিটিশদের পক্ষ অবলম্বন করে ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তারে সহায়তা করেছিল। যে সামাজিক-আর্থিক পরিবেশে পুঁজিবাদী সমাজ গড়ে ওঠে ও বিস্তারলাভ করে,* তার প্রভাবে পুঁজিবাদী দেশসমূহে জাতীয় সংহতি, শৃঙ্খলাবোধ, দেশপ্রেম, সহযোগিতার অভ্যাস এবং সাংগঠনিক ক্ষমতা—এসবগুলো বিশেষভাবে বিকাশ-লাভ করে। তাই পুঁজিবাদী ব্রিটেন যে বিচ্ছিন্ন সামন্ততান্ত্রিক ভারতবর্ষকে পরাভূত করেছিল—এটা কিছুই বিস্ময়ের নয়।

ভারতের আর্থিক কাঠামোর ওপর ব্রিটিশ শাসনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব

ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তারের পর আগের অবস্থা বদলে গেল। ভারতবর্ষে পুঁজিবাদী জাতির শাসন প্রতিষ্ঠা হল। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর এই শাসন একটা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভারতীয় সমাজের সামন্ততান্ত্রিক ভিত্তির উচ্ছেদ না করে এবং ভারতবর্ষে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক

* এটা অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে ঐতিহাসিক দিক থেকে, সামন্ততান্ত্রিক ধরন থেকে অনেক উন্নততর সামাজিক কাঠামো থাকা সত্ত্বেও পুঁজিবাদী সমাজ এখনো বহুধা, এমনকি সামঞ্জস্যহীন বিরুদ্ধ স্বার্থসমন্বিত শ্রেণী নিয়ে গঠিত। যাই হোক পুঁজিবাদ বিকাশের প্রথম পর্যায়ে স্বদেশীয় বুর্জোয়ারা স্বভাবসম্মতভাবে সমস্ত প্রগতিশীল সামাজিক গোষ্ঠীকে জাতীয় একতার বন্ধনে একত্রিত করতে সমর্থ হয়, তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের চেতনা উদ্বুদ্ধ করতে পারে। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন, সমাজের গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন এবং সেইসঙ্গে পুঁজিবাদী সংহতিসাধন ও বিস্তারের জন্য বুর্জোয়ারা প্রগতি-শীল সামাজিক গোষ্ঠীর সমর্থন লাভ করতে পারে। পুঁজিবাদের অবক্ষয় হতে থাকলে এবং শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তিতে শ্রমিক আন্দোলন বৃদ্ধি পেতে থাকলে জাতীয় বুর্জোয়াদের সংহতি প্রচেষ্টা দুষ্কর হয়ে ওঠে।

রূপের সূচনা না করে ব্রিটেন তার নিজস্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রয়োজন অনুসারে ভারতবর্ষের উপনিবেশকে ব্যবহার করতে পারত না। বস্তুতঃ ব্রিটেনের রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সমান্তরালভাবে ভারতবর্ষের পুরানো অর্থনৈতিক কাঠামোর বিলোপসাধন ও নতুন পদ্ধতি প্রচলন করা হচ্ছিল।৫

সুতরাং ভারতবর্ষে উত্তরোত্তর ব্রিটিশ শাসন প্রসারের ইতিহাস একই সঙ্গে প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতের সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিবর্তনের ইতিহাসও বটে—তা সে বিবর্তন যতই ত্রুটিযুক্ত বা বিকৃত হোক না কেন। পুরানো ভূমিসম্পর্ক কারিগরি ও কুটিরশিল্পের অবক্ষয় এমনকি ধ্বংস এবং নতুন ভূমিসম্পর্ক ও আধুনিক শিল্পের আবির্ভাব এই পরিবর্তনের সঙ্গে আঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ফলতঃ এই পরিবর্তন পুরানো শিল্প ও ভূমিসম্পর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুরানো শ্রেণীসমূহের ধ্বংস এবং আধুনিক শিল্প ও নতুন ভূমিসম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত নতুন শ্রেণীর উদ্ভবের সঙ্গে জড়িত। গ্রামীণ সংঘের পরিবর্তে আধুনিক মালিকানা, স্বত্ববান কৃষক অথবা জমিদারের উদ্ভব হল—উভয়েই জমির ব্যক্তিগত মালিকানা লাভ করেছিল। ব্রিটিশ শাসনকালে একদিকে যেমন ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্প ও যানবাহন ব্যবস্থা প্রসারের ফলে কারিগর ও হস্তশিল্পীশ্রেণী লোপ পেল, অন্যদিকে তেমনি নতুন কতকগুলো শ্রেণীর আবির্ভাব হল যথা, পুঁজিপতিশ্রেণী, শিল্প ও যানবাহন শ্রমিকশ্রেণী, কৃষি শ্রমিকশ্রেণী, প্রজাকুল, আধুনিক ভারতীয় এবং বিদেশী শিল্পজাত পণ্য ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত নতুন ধরনের বণিকশ্রেণী। ভারতবর্ষে ব্রিটিশের প্রভাব শুধুমাত্র ভারতীয় সমাজের স্বয়ংক্রিয় অর্থনৈতিক কাঠামোরই পরিবর্তন করেনি, সামাজিক চেহারাও বদলে দিয়েছিল।

ভারতবর্ষে ইংরেজকে দুটো উদ্দেশ্যসাধন করতে হয়েছিল, একটা ধ্বংসাত্মক আরেকটা গঠনমূলক। একটা হল পুরানো এশীয় সমাজের উচ্ছেদসাধন ও আরেকটা হল এশিয়াতে পাশ্চাত্য সভ্যতার বস্তুগত ভিত্তি স্থাপন করা। স্থানীয় সম্প্রদায়সমূহ ও দেশীয় শিল্পের উচ্ছেদসাধন করে ইংরেজরা এর ধ্বংসসাধন করেছিল।

মুঘল সম্রাটের আমলে যতটা রাজনৈতিক ঐক্য ছিল তার থেকে আরও অনেক বেশি সংহত এবং অনেক বেশি ব্যাপক রাজনৈতিক ঐক্য এই পুনর্গঠনের প্রথম সর্ত···জমিদারী ও রায়তওয়ারী প্রথাতেই এশীয় সমাজের অন্যতম মূল চরিত্র লক্ষণ ব্যক্তিগত মালিকানার দুটো বিশিষ্ট রূপ ধরা পড়ে।"৬

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ব্রিটিশ আধিপত্যের প্রগতিশীল তাৎপর্য

স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বয়ম্ভর গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তিতে গঠিত ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতার অবসান এবং পুঁজিবাদীর মাধ্যমে ভারতবর্ষের এক অর্থনৈতিক unit-এ রূপান্তর ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের প্রগতিশীল ফলাফল বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। অবশ্য একথা ঠিক যে এই রূপান্তর যে পর্যন্ত ব্রিটিশ বাণিজ্য, শিল্প এবং আমানতী স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসাবে সংঘটিত হয়েছিল ভারতীয় সমাজের স্বাধীন নির্বাধ আর্থিক উন্নয়ন ততখানি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল।৭ ফলতঃ ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব একদিকে যেমন ভারতীয়

সমাজের ঐতিহাসিক প্রগতির সহায়ক হয়েছিল অন্যদিকে তেমন বাধাও সৃষ্টি করেছিল।

প্রকৃতপক্ষে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ভারতীয় জনসাধারণ এবং তার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর স্বাধীন বিবর্তনের পথে ব্রিটিশের স্বার্থের বাধার ফলেই উদ্ভূত হয়েছিল। ভারতের অবাধ এবং স্বাভাবিক অগ্রগতি ব্রিটিশ স্বার্থের অধীনস্থ করে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছিল। ভারতীয় শিল্পায়নে বাধা দিয়ে এবং নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে ব্রিটিশ শিল্পের জন্য যোগান দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভারতীয় কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা বিকৃতভাবে চালিত করে অর্থাৎ ভারতবর্ষকে মূলতঃ ব্রিটেনের কৃষি, কাঁচামাল উৎপাদনকারী উপনিবেশ এবং ব্রিটিশ শিল্পজাত পণ্যের বাজারে পরিণত করে ইংরেজরা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় করেছিল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতবর্ষে ব্রিটেনের প্রগতিশীল ভূমিকার কথা স্বীকার করলেও ভারতীয় জনসাধারণের স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ব্যাহত করার জন্য ব্রিটেনের সমালোচনাও করতেন।* ভারতবর্ষের ওপর ব্রিটেন চাপ সৃষ্টি করত বলেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধবাদী।

কিভাবে ব্রিটিশ যুগে পুঁজিবাদ ভারতের গ্রামীণ জীবনে অনুপ্রবেশ করেছিল সে বিষয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা করব। পুঁজিবাদ প্রসারের ধারাটি পর্যালোচনা করা দরকার কেননা পুঁজিবাদ প্রসারের ফলেই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যায় এবং গ্রামীণ অর্থনীতি একত্রীভূত হয়ে ওঠে, সুসংহত জাতীয় অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষের আর্থিক এই ঐক্য অবলম্বন করে অনেক কিছু ঘটেছিল। ভারতের বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীসমূহের একত্রীকরণ, তাদের মধ্যে জাতীয়তার ভাব ও সচেতনতার প্রসার এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির জন্য সর্বভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভব এবং প্রসার এইসব কিছুরই ভিত্তি আর্থিক ঐক্য।

সূত্র নির্দেশ

১ Joan Beauchamp, পৃ. ১৬।
২ Karl Marx, পৃ. ৫৮।
৩ Karl Marx, পৃ. ৫৯।
৪ Laski, Tawney এবং Stalin-এর রচনা দ্রষ্টব্য।
৫ R. C. Dutt-এর রচনা দ্রষ্টব্য।
৬ Karl Marx, পৃ. ৫৯-৬০।
৭ Gadgil, Wadia and Merchant এবং R. P. Dutt-এর রচনা দ্রষ্টব্য।

* যতদিন পর্যন্ত গ্রেট ব্রিটেনে নতুন শাসকগোষ্ঠী শিল্প শ্রমিকদের দ্বারা উচ্ছেদ অথবা হিন্দুরা ইংরেজ আধিপত্যের অবসান ঘটাবার মতো শক্তি অর্জন করতে না পারবে, ততদিন ব্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণী সমাজবিকাশের যেসব উপাদান ভারতে নিয়ে এসেছে, ভারতীয়রা তার ফল ভোগ করতে পারবে না।—কার্ল মার্কস, পৃ. ৬৩।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় কৃষির রূপান্তর

ভারতীয় সামন্ততন্ত্রবাদের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রবাদ থেকে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রবাদের একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। পার্থক্যটা এই যে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রবাদে কখনো মালিকানার অধিকার সহ সামন্ত ভূম্যধিকারীশ্রেণী ছিল না। ব্রিটিশ-পূর্বকালে, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং মুসলমান রাজাদের আমলে, প্রাচীনযুগে বা মধ্যযুগে এইটাই ছিল ভারতীয় সমাজের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য।

প্রাক্ ব্রিটিশকালে সারা দেশজুড়ে যেসব সামন্ত অভিজাতবর্গ ছিলেন তাঁরা রাজার কাছ থেকে শুধুমাত্র কতকগুলো নির্দিষ্টসংখ্যক গ্রামের ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ করার অধিকার পেয়েছিলেন। এই সামন্তবর্গ গ্রামগুলোর মালিকানা পেতেন না, তাঁরা ছিলেন রাজস্ব আদায়কারী মাত্র এবং ভূমি রাজস্বের কিছুটা বা সবটা নিজেরা কাছে রেখে দিতেন।১

প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতীয় সমাজে ইংলণ্ডের মতো খাস জমিদারী প্রথা (ম্যানর) প্রচলিত ছিল না।

অনুরূপভাবে রাজাও নিজ রাজ্যভুক্ত কৃষিজমির মালিক ছিলেন না। রাজা অথবা রাষ্ট্রের শুধুমাত্র উৎপাদনের একটা নির্দিষ্ট অংশ নেওয়ার অধিকার ছিল।

"ভারতবর্ষে ভূমির মালিক ছিল কৌম গোষ্ঠী বা তার একটা অংশ—গ্রাম-সম্প্রদায়, গ্রামে বসবাসকারী বংশভিত্তিক গোষ্ঠী অথবা সংঘ। ভূমি কখনই রাজার সম্পত্তি বলে গণ্য হত না।"২

"সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় বা সাম্রাজ্য শাসনে কৃষক ভিন্ন অন্য কারও হাতে জমির মালিকানা ন্যস্ত করবার প্রশ্নই ওঠে নি।"৩

রাজা জমির মালিক ছিলেন না বলে তিনি ভূমি ব্যবস্থায় মালিকানা স্বত্ব সম্বলিত কোনো অভিজাতশ্রেণী সৃষ্টি করতে পারতেন না। শুধুমাত্র তার রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতাই তিনি অভিজাতদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

হিন্দু, বৌদ্ধ বা মুসলমান রাজাদের আমলেই হোক অথবা প্রজাহিতৈষী বা স্বেচ্ছাচারী রাজার শাসনেই হোক কোনো সময়েই গ্রামসম্প্রদায়কে জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করার বা তার ওপর একটা নতুন জমিদারশ্রেণী সৃষ্টি করার কোনো চেষ্টা করা হয় নি। এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে ভূমি রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে গণ্য হত না। আইনগত অধিকার বলে হোক বা

না হোক প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রাম সমাজই ছিল গ্রামের জমির মালিক। রাষ্ট্র অথবা রাজা ভূমির বাৎসরিক উৎপাদনের একটা অংশবিশেষ মাত্র পেতে পারতেন।

অপরপক্ষে তখন জমির ওপর কৃষকের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব বলতে কিছু ছিল না। অর্থাৎ প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতে জমির ওপর কোনো ধরনের ব্যক্তিগত মালিকানা বর্তমান ছিল না।

এমনকি মুঘল সম্রাটগণ কর্তৃক প্রবর্তিত নতুন ভূমি ব্যবস্থাদিও মৌলিক ভূমি সম্পর্কের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। গ্রাম থেকে রাষ্ট্রের প্রাপ্য ভূমি রাজস্ব টাকা হিসাবে আদায় করবার ব্যবস্থা চালু হয়েছিল বটে কিন্তু জমির ওপর গ্রাম সমাজের মালিকানা ও প্রথাগত অধিকারে কখনো হস্তক্ষেপ করা হয় নি। যথারীতি গ্রামই রাজস্ব ধার্যের একক হিসাবে গণ্য হতে লাগল।

জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার সূচনা

ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতবর্ষ জয়ের ফলে তৎকালীন ভূমি ব্যবস্থাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছিল। ব্রিটিশেরা ভারতবর্ষে যে নতুন রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল তার ফলে গ্রামের জমির ওপর গ্রাম সমাজের ঐতিহ্যগত অধিকার বাতিল হয়ে যায় এবং জমিতে দুই ধরনের জমির মালিকানা সৃষ্টি হয়। দেশের কিছু অংশে ভূস্বামী প্রথা প্রবর্তিত হয় ও অন্যত্র ব্যক্তিগতভাবে কৃষককে মালিকানা দেবার অর্থাৎ রায়তওয়ারী প্রথা প্রবর্তিত হল।

লর্ড কর্ণওয়ালিস তার কার্যকালের মধ্যে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করে ভারতবর্ষে প্রথম ভূস্বামী সৃষ্টি করলেন। ব্রিটিশদের রাজনৈতিক উত্তরসূরীরা এই প্রদেশগুলোতে দস্তুরী নিয়ে রাজস্ব আদায়ের জন্য যেসব ইজারদারদের নিযুক্ত করেছিল তাদের মধ্য থেকে লোক নিয়েই নতুন ভূস্বামীদের পত্তন করা হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবাদে এইসব রাজস্ব আদায়কারীদের অনেকেই জমিদারে রূপান্তরিত হল।[৪] বন্দোবস্তের শর্তানুযায়ী তারা এখন থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সরকারকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দেবে।

ভূমির ওপর গ্রামের অধিকারভিত্তিক যে প্রাচীন ভূমিব্যবস্থা দেশে প্রচলিত ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে ব্রিটিশরা তাতে সর্বপ্রথম ভাঙন ধরাল। তিনটি প্রধান কারণে ব্রিটিশ শাসকগণ ভারতবর্ষে ভূস্বামী প্রথা প্রবর্তনে উদ্যোগী হল।

প্রথমতঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষের ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্তের ব্যাপারে ব্রিটিশ আইনগত ও অর্থনৈতিক ধ্যানধারণা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাসের মৌলিক পার্থক্য আছে। অতীতে সামন্তযুগে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার ঐতিহ্য সূত্রেই ব্রিটিশ ভূস্বামী প্রথার উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাসে ভূস্বামী প্রথা সৃষ্টির কোনো পূর্ব নজির নেই।

দ্বিতীয়তঃ ব্রিটিশ শাসনের প্রথমাবস্থাতে শাসন পরিচালনার প্রয়োজনে অসংখ্য মালিকানাস্বত্ববিশিষ্ট ছোট ছোট কৃষকের তুলনায় কয়েক হাজার ভূস্বামীর কাছ থেকে ভূমি রাজস্ব আদায় করা অনেক বেশি সহজ ও অর্থকরী বলে মনে হত।

তৃতীয়তঃ রাজনৈতিক কৌশলগত কারণে তখনকার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে ভারতবর্ষে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সামাজিক সমর্থন অর্জন করা প্রয়োজন ছিল। ব্রিটিশ শাসনের দরুন উদ্ভূত নতুন ভূস্বামীশ্রেণী স্বাভাবিকভাবেই যে ব্রিটিশকে সমর্থন করবে এটা আশা করা যায়। ১৮২৮ থেকে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিক বলেছেন:

"চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে এবং সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় প্রশ্নে ফলপ্রসূ হয়নি একথা ঠিক। কিন্তু তবুও আমি বলব যে অন্ততঃ একটা ব্যাপারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত খুব কার্যকর হবার সম্ভাবনা আছে। ব্যাপক হাঙ্গামা বা বিপ্লবের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার অভাব হলে সেক্ষেত্রে এমন এক ধরনের বিপুলসংখ্যক ঐশ্বর্যবান ভূস্বামী থাকবে যারা একদিকে ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্বে গভীরভাবে আগ্রহী আর অন্যদিকে যারা জনসাধারণকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম।"[৫]

পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে দেখা যায় যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এই আশা সফল হয়েছিল। ভূস্বামীরা সর্বদা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের দৃঢ় সমর্থক থেকে গেছেন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ছোট ছোট রাজাদের নিয়েও এক ধরনের ভূস্বামী সৃষ্টি করেছিল। কোম্পানি এদের দেয় কর রাজস্বে রূপান্তরিত করে নিয়ে এবং এদের রাজনৈতিক, সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে এদেরকে ভূস্বামীতে পরিণত করে। এই উদ্দেশ্যে আরও একটা উপায় কোম্পানি অবলম্বন করত। যারা সামরিক বা অন্যান্য দিক দিয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিশেষ সহায়তা করত তাদের ভূমির মালিকানা দিয়ে ভূস্বামী করে দেওয়া হত।

অভিজ্ঞতায় যখন দেখা গেল যে সরকারের পক্ষে জমিদারদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট স্থায়ী রাজস্ব নেবার ব্যবস্থা আর্থিক দিক থেকে অসুবিধাজনক তখন রাজস্ব সংক্রান্ত নতুন বন্দোবস্ত অস্থায়ী ভিত্তিতে করা হতে লাগল। এই অস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুন উদ্ভূত জমিদারগণকে জমির মালিকানা দেওয়া হল। তবে তাঁরা সরকারকে যে রাজস্ব দিতেন তার পরিমাণ পরবর্তীকালে পুনর্নির্ধারণ করা যেত।[৬] চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলা, বিহার ও উত্তর মাদ্রাজের কিয়দংশে প্রচলিত ছিল; ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষের ২'০ শতাংশ ছিল এই বন্দোবস্তের অধীন। সংযুক্ত প্রদেশের বেশিরভাগ অংশ, বাংলা ও বোম্বাইয়ের কিছুটা অংশ এবং মধ্যপ্রদেশ ও পঞ্জাবে অস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্ত প্রচলিত করা হয়। এই ব্যবস্থা ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষের ৩০ শতাংশ জুড়ে কার্যকর ছিল।

ব্রিটিশ শাসনের ফলে একদিকে যেমন দেশের কতকাংশে বৃহদাকার ভূম্যধিকারী সৃষ্টি হয়েছিল অপরদিকে দেশের অন্যত্র ভূমির ওপর রায়তের ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। দ্বিতীয়টি রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত বলে

পরিচিত। রায়তওয়ারী বন্দোবস্তে প্রত্যেক কৃষক যে জমি সে চাষ করত তারই মালিকানা লাভ করে।

স্যার টমাস মুনরো বুঝতে পেরেছিলেন যে ভূস্বামী প্রথা ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতিকূল। তিনি এর পরিবর্তে রায়তওয়ারী প্রথার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মতে এই প্রথা মোটামুটিভাবে ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ১৮২০ সালে মাদ্রাজের গভর্ণর থাকাকালীন তিনি ঐ প্রদেশের অধিকাংশ এলাকায় এই প্রথা প্রবর্তন করেন।

রায়তওয়ারী প্রথা পরবর্তীকালে দেশের অন্য অনেক প্রদেশেও বিস্তারলাভ করেছিল। বম্বে, সিন্ধু, বেরার, মাদ্রাজ, আসাম ও অন্যান্য কয়েকটি এলাকা রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের অধীন ছিল। ব্রিটিশ ভারতীয় ভূখণ্ডের ৫১ শতাংশ জুড়ে এই বন্দোবস্ত প্রচলিত ছিল।

জমিদারী প্রথার মতন রায়তওয়ারী প্রথাও জমির ব্যক্তিগত মালিকানা ভিত্তি করে গঠিত ছিল। প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতে ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। এই দিক থেকে বিচার করলে জমিদারী প্রথার মতন রায়তওয়ারীও ভারতীয় ঐতিহ্যের পক্ষে বহিরাগত। উভয় প্রথাই ঐতিহ্যগত ভারতীয় অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন কারণ ভারতীয় ঐতিহ্যে ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানা বলে কিছু ছিল না। "রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত ভারতীয় প্রথার অনেকটা কাছাকাছি বলে যুক্তি দেখানো হয় বটে—কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কৃষকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করায় এবং জমির প্রকৃত উৎপাদনের অনুপাতে না করে জমির ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারণ করবার ব্যবস্থা থাকায় রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত জমিদারী বন্দোবস্তের মতোই সরাসরি ভারতীয় প্রথার বিনষ্টি সাধন করেছিল।"[৭]

এইভাবেই ভারতবর্ষে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার সূচনা হল। জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হল আর বাজারে বন্ধক দেওয়া যায় বা কেনাবেচা করা যায় এমন পণ্য বলে গণ্য করা হল।

এইভাবেই ব্রিটিশ বিজয়ের ফলে ভারতবর্ষে একটা কৃষিবিপ্লব অনুষ্ঠিত হল। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা অর্থাৎ কৃষকের নিজস্ব মালিকানা এবং বৃহদাকার জমিদারী মালিকানা প্রবর্তন করে ব্রিটিশ শাসন কৃষিতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথ পরিষ্কার করেছিল। এর সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যিক ও অন্যান্য আর্থিক শক্তি গ্রামাঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতের কৃষি অর্থনীতি ও স্বনির্ভর গ্রামব্যবস্থা উভয়েরই ক্ষতিসাধন করেছিল। যেসব কার্যকারণ যোগে ভারতের সমগ্র প্রাক্ ধনতান্ত্রিক-সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি বর্তমান ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হল তার মধ্যে ভূমি সম্পর্কের রূপান্তর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র।

এই বস্তুগত রূপান্তরের নিগূঢ় সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক পরিণতি সম্পর্কে এখন আলোচনা করব।

নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা

যতদিন পর্যন্ত জমিতে গ্রামসমাজের মালিকানা ছিল ততদিন গ্রামকেই রাজস্ব নির্ধারণের একক হিসেবে গণ্য করা হত। মণ্ডল অথবা পঞ্চায়েতের

মাধ্যমে গ্রামসমাজ রাষ্ট্র অথবা কোনো মধ্যবর্তী ব্যক্তিকে বাৎসরিক কৃষি উৎপাদনের একটা নির্দিষ্ট অনুপাত রাজস্ব হিসেবে দিত। বিভিন্ন রাজত্বে রাজস্বের হারে হয়তো পার্থক্য হয়েছে কিন্তু খুব সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া গ্রামই ছিল রাজস্ব নির্ধারণের একক এবং গ্রামের কাছ থেকেই রাজস্ব আদায় করা হত।

নতুন ভূমি ব্যবস্থায় রাজস্ব নির্ধারণ এবং রাজস্ব সংগ্রহের একক হিসাবে গ্রামের কোনো স্থান রইল না। ব্যক্তিগত মালিকানা সৃষ্টি হবার ফলে ব্যক্তিগত পর্যায়ে রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায় ব্যবস্থার সূচনা হল।

দ্বিতীয়তঃ ভূমিরাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের ব্যাপারে একটা নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হল। আগে রাষ্ট্র অথবা রাজস্ব আদায়ের অধিকারপ্রাপ্ত মধ্যবর্তীকে দেয় রাজস্ব বাৎসরিক উৎপাদনের একটা নির্দিষ্ট অংশে নির্ধারিত হত এবং বছরে বছরে এর পরিমাণ পাল্টাতো। "এর পরিবর্তে যে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল তাতে জমি অনুসারে নির্দিষ্ট হারে নগদ মুদ্রায় রাজস্ব দেবার বিধান থাকল। সুবৎসর ও দুর্বৎসরে উৎপাদনের তারতম্য, সংশ্লিষ্ট জমির কতটা চাষ করা হয়েছে রাজস্ব নির্ধারণে এইসব প্রশ্ন বিবেচনা করবার অবকাশ ছিল না। সর্বাধিক সংখ্যক ক্ষেত্রে এই রাজস্ব ধার্য করা হল ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকারীর ওপর। স্বত্বাধিকারী নিজে হাতে চাষ করে কিংবা রাষ্ট্র নিযুক্ত ভূম্যধিকারী কিনা সেটা কথা নয়।"৮ রাজস্ব নির্ধারণ ও দেওয়ার এই নতুন পদ্ধতি ও রূপের পরিণাম সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

পূর্বে যখন বাৎসরিক উৎপাদনের একটা অংশবিশেষ রাষ্ট্রকে রাজস্ব হিসাবে দেওয়া হত তখন জমির ওপর গ্রামের মালিকানা বিপন্ন হয় নি। কোনো বছর শস্যহানি হলে সে বছর ভূমিরাজস্বও স্বাভাবিকভাবে তামাদি হয়ে যেত কেননা রাজস্ব উৎপন্ন শস্যের অনুপাতে পরিমাপ করা হত। কোনো গ্রাম রাজস্ব দিতে না পারলে জমির ওপর তার মালিকানা বিঘ্নিত হত না।

কিন্তু নতুন ব্যবস্থা অনুসারে যখন বাৎসরিক উৎপাদনের পরিবর্তে জমির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট নগদ খাজনা ধার্য হল তখন ফসল ভাল না হলেও জমিদার অথবা স্বত্ববান কৃষককে দেয় রাজস্ব মেটাতে হত।

এই নতুন ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের অব্যবহিত পরে জমি বন্ধক ও জমি কেনাবেচা অপরিহার্য হয়ে উঠল। ভূম্যধিকারী যদি উৎপন্ন ফসল অথবা তার অন্য সম্বল থেকে রাষ্ট্রকে দেয় রাজস্ব দিতে না পারত তা হলে জমি বন্ধক অথবা বিক্রি করা ছাড়া উপায় ছিল না। কাজে কাজেই জমির মালিকানা ও স্বত্বের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিল। প্রাক্ ব্রিটিশ কৃষিসমাজে এ ঘটনা কখনই ঘটত না। নতুন জমিব্যবস্থা গ্রামের যৌথ চরিত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি ও যৌথ সমাজ-জীবনযাপনকে ভয়ানকভাবে বিপর্যস্ত করে দিল।

আগে গ্রামসমাজ জমির মালিক ছিল। প্রথাসিদ্ধ আইন অনুসারে গ্রামসমাজ যে কৃষকদের মধ্যে জমি বিলি করে দিত তাদের চাষবাস ভালমন্দ দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধান গ্রামসমাজই করত। এইসব কৃষিসংক্রান্ত আর্থিক কার্যকলাপের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামপঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামসমাজ জমিজমা, চাষবাস সংক্রান্ত বিবাদ-বিসম্বাদের নিষ্পত্তি করত।

নতুন জমিব্যবস্থা অনুসারে গ্রামসমাজ আর জমির মালিক রইল না। ফলে চাষবাসের তত্ত্বাবধান করবার দায়িত্বও তার থাকল না। প্রত্যেক ভূস্বামী

সরাসরিভাবে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের সংগে যুক্ত ছিল ও রাষ্ট্রের কাছ থেকেই সে জমির মালিকানা পেত এবং সরাসরি ভূমিরাজস্ব দিত। উপরন্তু ভূমিসংক্রান্ত সবরকম বিবাদ-বিসম্বাদ এখন আর গ্রামপঞ্চায়েতের দ্বারা নিষ্পত্তি না হয়ে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত আদালতেই নিষ্পত্তি হতে থাকল। এর ফলে ক্ষমতাচ্যুত পঞ্চায়েতের মর্যাদা নষ্ট হয়ে গেল।

এইভাবে এই নতুন ভূমিব্যবস্থা শুধুমাত্র যে গ্রামসমাজের কৃষিসংক্রান্ত আর্থিক কার্যকলাপের অবসান ঘটাল তা-ই নয় তার বিচার বিষয়ক ক্ষমতাও লোপ পেয়ে গেল। যে বন্ধন গ্রামের কৃষককে গ্রামসমাজের সংগে আবদ্ধ করে রেখেছিল তাও ছিন্ন হয়ে গেল।

গ্রাম সম্পর্কিত যেসব অপরিহার্য কাযকলাপ আগে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজ পরিচালনা করত তার প্রায় সবটাই এখন কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রে বিভিন্ন বিভাগের আয়ত্তভুক্ত হয়ে পড়ল।

প্রাক্ ব্রিটিশযুগে শিল্প ও কৃষি উভয়ক্ষেত্রেই উৎপাদন এবং উৎপন্ন বস্তু শুধুমাত্র গ্রামসমাজের প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত হত—এই উদ্দেশ্য দ্বারাই উৎপাদন ও উৎপন্ন বস্তুর প্রকৃতি নির্ধারিত হত। এর ভিত্তিতেই গ্রামীণ কৃষি এবং শিল্পের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করা সম্ভব হয়েছিল এবং উভয়ের মধ্যে সমতা রক্ষিত হত।

কৃষিজাত দ্রব্যের পণ্যে রূপান্তর ও বাণিজ্য

নতুন ভূমিসম্পর্ক ও বাঁধা হারে নগদ রাজস্ব দেওয়ার প্রথা প্রবর্তনের ফলে গ্রামীণ কৃষির আদি রূপ সম্পূর্ণ বদলে গেল। গ্রামের অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মেটানোর জন্য উৎপাদন করার পরিবর্তে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে উৎপাদন করা শুরু হয়ে গেল। নতুন উদ্দেশ্যে উৎপাদন অর্থাৎ বিক্রির দিকে লক্ষ্য রেখে করবার ফলে উৎপাদন ও উৎপন্ন দ্রব্যের প্রকৃতিও পাল্টে গেল।৯

নতুন ব্যবস্থাতে কৃষকেরা প্রধানত বাজারের জন্য উৎপাদন করত। ব্রিটিশ আমলে যানবাহন ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি এবং বাণিজ্যিক মূলধনের প্রসারের দরুন কৃষকের কাছে পণ্য বিক্রয় করার সুযোগ এসে গিয়েছিল। কৃষক যতটা বেশি সম্ভব নগদ উপার্জনের আশায় পণ্য বিক্রয় করতে আরম্ভ করল। নগদের প্রয়োজন হত উচ্চ হারে নির্দিষ্ট খাজনা মেটাবার প্রয়োজনে। কালক্রমে আরও একটা কারণে নগদের প্রয়োজন হত। কৃষককে মহাজনের দাবি মেটাতে হত। বহু কারণে কৃষক উত্তরোত্তর মহাজনের কবলে পড়ে যাচ্ছিল।

এরই ফলে কৃষিজাত দ্রব্য পণ্যে রূপান্তরিত হল এবং কৃষিপণ্যের বাণিজ্য আরম্ভ হল। এর ফলে কৃষকেরা বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনে আগ্রহী হল। যেখানে জমি যে শস্যের পক্ষে উপযুক্ত তদনুসারে তুলো, পাট, গম, আখ, তৈলবীজের মত এক একটা বিশেষ শস্য চাষের জন্য বিভিন্ন গ্রামের কৃষিজমি পুরোপুরি নিয়োজিত হতে লাগল।১০

"যানবাহনের এই একই সুযোগসুবিধার ফলে ভারতীয় কৃষিতে আর একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল। যথার্থ শব্দের অভাবে এই পরিবর্তনকে কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যবসাদারি আখ্যা দেওয়া যায়। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে

এই পরিবর্তন হল স্থানীয় প্রয়োজন মেটানোর পরিবর্তে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদন।··· পরিবহন ব্যবস্থার প্রসারের ফলে গ্রামের সংবদ্ধ প্রকৃতি যেমন ভেঙে গেল তেমন গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতির ওপরেও প্রভাব বিস্তার করল। বাণিজ্যিক শস্য চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন জেলায় বিশেষ ধরনের শস্য চাষের প্রবণতায় এই পরিবর্তনের লক্ষণ ধরা পড়ে। রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার হল এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যও ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেতে লাগল। নগদে রাজস্ব নির্ধারণ প্রথা প্রবর্তিত হবার ফলে কৃষিতে ব্যবসাদারির ঝোঁক প্রথম দেখা দিল। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত না যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছিল ততদিন পর্যন্ত এর প্রভাব বেশিদূর এগোতে পারে নি। এরপর ধীরে ধীরে উৎপন্ন দ্রব্যে খাজনা দেওয়া অচল হয়ে গেল এবং নগদে খাজনা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হল। এর সঙ্গে রাজস্ব নির্ধারণের নতুন প্রথা মিলিত হবার পরিণতি হল এই যে ফসল ওঠবার ঠিক পর পরই কৃষককে তার উৎপাদনের একটা অংশ বিক্রি করে দিতে হত; এবং প্রায় সেই সময়েই মহাজনের সুদ দেয় হত বলে উৎপাদনের একটা বড় অংশ বিক্রি করে দিতে হত।”১১

ইংলণ্ডে আধুনিক শিল্প বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের জন্য কাঁচামালের চাহিদা বৃদ্ধি পেল। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার এমন আর্থিক নীতি অবলম্বন করল যাতে ব্রিটিশ শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এইভাবে সরকারি নীতি ভারতীয় কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ ও বিশেষ ধরনের পণ্য উৎপাদন ত্বরান্বিত করল।

“যেসব অঞ্চলে শস্য অধিকাংশই রপ্তানির জন্য উৎপাদিত হত সেইসব অঞ্চলেই কৃষির ব্যবসাদারি দ্রুত প্রসার লাভ করে। ব্রহ্মদেশের ধান চাষে, পাঞ্জাবের গমের চাষে, পূর্ববাংলার পাটের চাষে এবং গুজরাট ও বেরারের তুলোর চাষে এরকমটা ঘটেছিল। রপ্তানিকারকদের প্রচেষ্টায় শস্য তাড়াতাড়ি বন্দরে নিয়ে আসার সুপরিচালিত সংগঠন গড়ে উঠেছিল।”১২

মোট শস্যের অনেকটাই এখন স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবহৃত হবার পরিবর্তে বাজারে চলে আসছিল। যেসব শস্যের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বা রপ্তানির বাজার ছিল তাদের ক্ষেত্রে এই গতিবিধি ততটা বোঝা যেত না। কিন্তু যেসব শস্যের অভ্যন্তরীণ বাজার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল না, যেমন জোয়ার ও ভুট্টা জাতীয় শস্য, সেগুলোর একটা বড় অংশ পরিস্থিতির চাপে বাজারে চলে আসত।

“এই পরিস্থিতির উদ্ভব হত ভূমিরাজস্ব ও মহাজনকে সুদ দেবার দায় থেকে। এই দুটো দায় মেটাবার জন্য ফসল ওঠার ঠিক পরেই কৃষককে বাধ্য হয়ে শস্য বাজারে আনতে হত এবং যে দাম পাওয়া যেত তাতেই তার উৎপাদনের একটা বড় অংশ বিক্রি করতে হত। অধিকাংশ গরিব কৃষককেই ফসল তোলার সময়ে যে শস্য সে নিজে বিক্রি করে দিয়েছিল প্রায় ছয় মাস পরে আবার সেই শস্যই ফিরে কিনতে হত। ফসল ওঠার সময়ে শস্যের দাম খুব কম থাকে কিন্তু ছয় মাসে সেই শস্যের দাম এমন এক স্তরে ওঠে যেটা কৃষকের পক্ষে সম্পূর্ণ বিপর্যয়কর···।”১৩

স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজের উচ্ছেদ ও গ্রামসমাজ ধ্বংসের ফলে পুঁজিবাদী রূপান্তরের মাধ্যমে দেশের আর্থিক দুরবস্থা সত্ত্বেও বলা চলে যে একত্রবদ্ধ

জাতীয় ভারতীয় বা বিশ্ব অর্থনীতির অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে এটা একটা প্রগতিশীল পদক্ষেপ। ভারতের এই আর্থিক পরিবর্তন আর্থিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে একত্রে সংযুক্ত করেছিল এবং ভারতকে বিশ্বের সংগে যুক্ত করেছিল। এই অবস্থাই ভারতীয় জনসাধারণের জাতীয় সংহতি এবং পৃথিবীর আন্ত-র্জাতিক অর্থনৈতিক একত্রীকরণের বস্তুগত ভিত্তি রচনা করেছিল।

উৎপাদনের দিক থেকে দেখলেও কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ অগ্রগামী সম্মুখ পদক্ষেপ বলে অভিহিত করা যায়। "প্রথমতঃ এই পরিবর্তন হল কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ। এইটাই একটা হিতকর ব্যাপার। এর ফলে শস্যবণ্টন ব্যবস্থা কিছুটা উন্নততর হয়েছিল এবং কৃষিকাজের লাভও বেড়ে গিয়েছিল।"১৪

কৃষকদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও গ্রামের প্রয়োজন থেকে সরে গিয়ে কৃষি উৎপাদন ভারতীয় ও বিশ্বের বাজারে চাহিদা পূরণে নিযুক্ত হয়েছিল। এর ফলে কেবলমাত্র যে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ ও বিশেষীকরণ ঘটেছিল তাই নয় চিরায়ত ভারতবর্ষের শিল্প ও কৃষির পারস্পরিক বন্ধন ব্যাহত হয়েছিল।

ভূমি রাজস্ব দেওয়া এবং মহাজনদের কাছে দায় মেটানোর জন্য যতটা সম্ভব নগদ টাকা লাভের উদ্দেশ্যে কৃষকরা বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন করার কথা ভাবত। এছাড়া বিক্রির জন্য উৎপাদন করবার আরো একটা কারণ ছিল। সরকারি উদ্যোগে যানবাহন ব্যবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি হবার ফলে কৃষকের পক্ষে গ্রামের বাজার অথবা জেলাভিত্তিক মেলা থেকে কলে তৈরি কাপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস কেনা সম্ভব হয়েছিল। প্রচলিত প্রথা অনুসারে কৃষক ব্যবহার্য কাপড় নিজেই তৈরি করত এবং বাৎসরিক উৎপাদনের একটা অংশের বিনিময়ে গ্রামীণ কারিগর তার অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করে দিত। এখন এইসব জিনিসের বেশিটাই কৃষক বাজার থেকে কিনে নিতে লাগল। গ্রামীণ কারিগর ও অন্যান্য গ্রামীণ শিল্প ধ্বংসের এইটা অন্যতম প্রধান কারণ।

কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ এবং তার সংগে ব্রিটেন এবং পরবর্তী সময়ে অন্যান্য দেশ থেকে আমদানি করা এমনকি ভারতবর্ষের কলে তৈরি সস্তা জিনিসের অনুপ্রবেশের দরুন গ্রামীণ শিল্পের ধ্বংস ভারতের গ্রামীণ আর্থিক ব্যবস্থার ভারসাম্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল।

ঐতিহ্যগত ভারতীয় গ্রামজীবনের ধ্বংসসাধন

স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতির মূল স্তম্ভ গ্রামীণ কৃষি ও শিল্পের একতা এইভাবে বিপর্যস্ত হয়ে গেল। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ জীবনযাত্রার অর্থনৈতিক ভিত্তি এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল।

"এশিয়ার সমাজে যে অচলাবস্থা দেখা যায় এই ব্যবস্থা তার ভিত্তি হিসাবে খুবই উপযোগী। তার কারণ উৎপন্ন বস্তু দিয়ে রাজস্ব দেওয়ার প্রথা, কৃষি ও শিল্পের অচ্ছেদ্য বন্ধন, প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ ব্যবস্থার মধ্যে কৃষকের জীবনযাত্রা নির্বাহ, বাজার এবং উৎপন্ন দ্রব্যের লেনদেনের সংগে কৃষকের বিচ্ছিন্নতা এবং সামাজিক পর্যায়ে ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের সংগে সংযোগহীনতা।"১৫

আরও কথা আছে। "যে উৎপাদন প্রণালীর ওপর স্বভাবজ অর্থনীতি গড়ে ওঠে কৃষি তার ভিত্তিস্বরূপ। কিন্তু কৃষির সঙ্গে কুটির শিল্প এবং কারিগরি শ্রমিক আনুষঙ্গিক হিসাবে সংযুক্ত থাকে। প্রাচীনকালের ইউরোপে, মধ্যযুগে এই ব্যবস্থা চালু ছিল। ভারতবর্ষের গ্রামসমাজে ঐতিহ্যগত সংগঠন এখনো লোপ পায়নি। এর দিকে তাকালেও এই জিনিস দেখতে পাওয়া যাবে। পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি কৃষি ও কুটির শিল্পের এই সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দেয়।"১৬

অন্যান্য আরো অনেক উপায় ও জবরদস্তির ফলে গ্রামসমাজের যৌথ গোষ্ঠীভিত্তিক এবং স্বয়ংশাসিত পরিচালনা ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। গ্রামস্থ কৃষিজমির স্বত্ব থেকে গ্রামসমাজকে বঞ্চিত করা হল। উপরন্তু গ্রামসংলগ্ন গোচারণভূমি ও জঙ্গলের ওপর গ্রামসমাজের অধিকারও নষ্ট হল। গ্রাম-সমাজের নিয়ন্ত্রণে কৃষক ও অন্যান্য গ্রামবাসীরা জ্বালানি সংগ্রহ করা এবং গরু চরানোর জন্য এইসব জমি ব্যবহার করত। উপরন্তু সার্বিক গ্রামীণ অর্থনীতি ও কৃষি রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও এইসব জমির একটা নিশ্চিত মূল্য ছিল। ব্রিটিশ শাসনকালে রাষ্ট্র এইসব প্রত্যন্ত ভূমি ভোগ দখলের অধিকার গ্রামসমাজের হাত থেকে কেড়ে নিল। বনভূমি সংক্রান্ত আইন জারি করে এই অধিকার নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। এই আইন সম্পর্কে পট্টভি সীতারামিয়ার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: "কলমের একটা খোঁচায় সরকার রায়তদের আবহমান গোষ্ঠীগত অধিকার নষ্ট করে দিয়েছিল। এর ফলে গ্রামসমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হল।"১৭

গ্রামের চাষবাস গ্রামসমাজের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল বলে এবং গ্রামের সমীপবর্তী বনভূমির ওপর গ্রামসমাজের দখলদারি এবং পরিচালনার অধিকার ছিল বলে গ্রামে একটা যৌথ জীবনযাত্রা পদ্ধতি বিকাশলাভ করেছিল। গ্রাম ছিল একটা স্বয়ংশাসিত স্বয়ংনিয়ন্ত্রিত সংগঠন। গ্রামজীবন ছিল সুসংবদ্ধ অবিচ্ছিন্ন একত্রিত। সার্বজনীন প্রয়োজনে গ্রামবাসীরা সকলে মিলে কি করণীয় তা স্থির করত এবং পারস্পরিক সহযোগিতা দ্বারা দৈনন্দিন কার্যনির্বাহ করত বলে গ্রাম-বাসীদের মধ্যে একটা স্বচ্ছন্দ যৌথ গ্রামসচেতনতা বজায় থাকত। কৃষি জমি ও বনভূমির ওপর গ্রামের অধিকার ও যৌথ নিয়ন্ত্রণ লোপ পাবার ফলে এবং এইসব জমি ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত হবার ফলে গ্রামবাসীদের মধ্যে পুরানো আর্থিক সহযোগিতা ও সর্বজনীন বন্ধন লোপ পেয়ে গেল। যেসব আর্থিক কার্যক্রম আগে গ্রামসমাজ সম্পাদন করত এখন সেসব কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে চলে গেল। গ্রামবাসীদের সহযোগিতা ও যৌথজীবন ভিত্তি করে যে স্বয়ংশাসিত গ্রামসমাজ গড়ে উঠেছিল তা ভেঙে গেল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পণ্যব্যবসায় প্রভাব পুরানো আর্থিক ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা গ্রাম-বাসীদের পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধন আরও শিথিল করে দিল এবং পরিশেষে ধ্বংস করে দিল।১৮

কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র গ্রামসমাজের অন্যান্য কাজকর্ম যথা প্রতিরক্ষা নিজের হাতে তুলে নিল। ক্রমশ সুনিশ্চিতভাবে গ্রাম স্বয়ংশাসিত গোষ্ঠীসমাজ থেকে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থার অঙ্গে পরিণত হল এবং জাতীয় আর্থিক ব্যবস্থা

বস্তুতঃ বিশ্বব্যাপী আর্থিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। ঐতিহ্যগত গ্রামসমাজের আর্থিক ও শাসনতান্ত্রিক সার্বভৌমত্ব লোপ পেয়ে গেল। সর্বজনীন অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে গঠিত যৌথ গ্রামজীবন ও তার ফলস্বরূপ যৌথ সহযোগিতার পরিবর্তে গ্রামজীবনে দেখা দিল প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষের সম্পর্ক। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পণ্য ব্যবসায়ের দরুন উদ্ভূত প্রতিযোগিতামূলক আর্থিক সম্পর্ক পুরানো সহযোগিতামূলক সামাজিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের স্থান অধিকার করে নিল।

এইভাবে গ্রামে পুঁজিবাদী আর্থিক সম্পর্কের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। এর সঙ্গে সঙ্গে এতদিনের স্বাধীন কেন্দ্রগুলোকে এক সুসংহত রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে একত্রীভূত করে একটা কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছিল। এদের মিলিত শক্তি আপাত সুদৃঢ় গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার ওপর প্রাণঘাতী আঘাত হানল।

উৎপাদন বণ্টন ও বিনিময়ের নতুন সামাজিক সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্ভব হল। ইতিপূর্বে গ্রামসমাজের অভ্যন্তরীণ লেনদেন প্রচলিত প্রথা দ্বারা নির্ধারিত হত। গ্রামসভা (পঞ্চায়েত) গ্রামবাসীদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিধিব্যবস্থা পরিচালনা করত ও বিবাদ-বিসম্বাদের নিষ্পত্তি করত। এখন জমির ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক নতুন ভূমিব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত জটিল সামাজিক সম্পর্কসমূহ নতুন শাসনব্যবস্থার অধীনে প্রচলিত নতুন আইন-কানুন ও আদালতের তত্ত্বাবধানে নির্ধারিত ও পরিচালিত হতে লাগল। "ষোড়শ শতকে ইংলণ্ডে যেমন হয়েছিল সেইরকম একটা পরিবর্তন (ভারতের) কৃষক-জীবনে ঘটল। মধ্যযুগীয় কাঠামো ভেঙে পড়ল, বহিরাগত শক্তিসমূহ এবং আর্থিক লেনদেন প্রসঙ্গ এবং চুক্তিমূলক সম্পর্ক গ্রামসমাজে ঢুকে পড়ল এবং প্রথানুসারে ব্যবস্থিত কর্মপ্রচেষ্টার পরিবর্তে এল ব্যক্তিগত দায়িত্ব, 'উদ্যোগ' এবং স্বাধীনতা।"১৯

এইভাবে আপাতদুর্ভেদ্য বিন্ধ্য পর্বতের মতো ঐতিহ্যগত ভারতীয় গ্রাম-সমাজের অন্তিমকাল উপস্থিত হল। ইতিপূর্বে গ্রামসমাজ সব রকমের রাজনৈতিক ঝড়ঝঞ্ঝা, যুদ্ধ ও আক্রমণের বেগ প্রতিহত করে বেঁচে ছিল। কিন্তু নতুন অবস্থায় যে অজ্ঞাতপূর্ব রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হল তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রভাবে এবং বাণিজ্যিক শিল্পোদ্যোগের প্রভাবে ভারতীয় গ্রামসমাজ পরাভূত হল।

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজের বিলোপ প্রগতি-শীল ঘটনা বলে উল্লেখ করা চলে। এর ফলে অবশ্য গ্রামীণ জনসাধারণের যৌথ জীবনের বিনাশ হয়েছিল, তাদের মধ্যে সহানুভূতিপ্রবণ মানবিক সম্পর্ক লোপ পেয়েছিল এবং যুদ্ধ বা দুর্ভিক্ষ ব্যতিরেকে সমাজে যে আর্থিক নিরাপত্তা ছিল সেটাও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এইসব ঘটনা পীড়াদায়ক সন্দেহ নাই।

তবে অন্যদিক দিয়ে ভাবলে দেখা যায় যে গ্রামের জীবনযাত্রা একটা সংকীর্ণ গ্রামীণ পর্যায়ে আবদ্ধ ছিল, সংস্কৃতির গুণগত মান ছিল অত্যন্ত নীচু, জীবন ছিল অনুন্নত এবং নিষ্ক্রিয়। যদি ভারতীয় জনসাধারণকে জাতীয়তাবাদ, আর্থিক ঐক্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতির পথে উচ্চস্তরের সামাজিক জীবনে উন্নীত হতে হয় তাহলে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজ থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে।

ইতিহাস দ্বন্দ্বমূলক পথে অগ্রসর হয়। আগেকার সদর্থক ভাবসমূহের পরিমাণগত বিস্তার সাধন করলে অগ্রগতি হবে না। এর জন্য চাই গুণগত রূপান্তর। পুরোনো ব্যবস্থার পরিমাণগত বিস্তার নয় তার নিবৃত্তি থেকেই উচ্চতর মানের সহযোগিতা ও সামাজিক প্রক্রিয়ার উদ্ভব ঘটে। এটা সত্যি যে গ্রামীণ সহযোগিতা ব্যবস্থা ধ্বংসের ফলেই গ্রামীণ অর্থনীতির পুঁজিবাদী রূপান্তর সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে এর প্রগতিশীল ভূমিকা এইখানেই যে এই রূপান্তর গ্রামীণ অর্থনৈতিক জীবনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা ভেঙে দিয়েছিল এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে সুসংহত জাতীয় অর্থনীতির অংগ রূপে পরিণত করেছিল। ভারতীয় জনসাধারণকে আর্থিক দিক দিয়ে সুসংহত করার পক্ষে এর ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। এই রূপান্তরের ফলে রেলওয়ে, মোটরযান প্রভৃতি জনযোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ব্যাপক সামাজিক বিনিময়ের যে সম্ভাবনা সৃষ্ট হয়েছিল তা থেকেই গ্রামীণ জনসাধারণের অবস্থানগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা এককালে দূরীভূত হয়েছিল।

যারা অসংখ্য কেন্দ্রে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে, অবস্থানগতভাবে বিভক্ত এবং যাদের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিনিময়ের পরিমাণ সামান্যমাত্র তাদের নিয়ে একটা সুসংহত জাতি কিভাবে গড়ে উঠতে পারে? জনসাধারণ যদি ছোট ছোট গোষ্ঠীতে স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করে তাহলে তাদের সচেতনতা কি কখনও জাতীয় স্তরে উন্নীত হতে পারে? জাগতিক জীবনযাত্রার পরিস্থিতি চেতনার স্বরূপ নির্ধারণ করে। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামে সংকীর্ণ জীবনযাত্রার পরিস্থিতি মানুষের মনে কেবলমাত্র গ্রামভিত্তিক চেতনাই সৃষ্টি করে। খুব সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া জনসাধারণের বৃহত্তম অংশ সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ গ্রামজীবনের পরিস্থিতির মধ্যে থেকে গ্রামীণ দৃষ্টিভংগী ও গ্রামসচেতনতা অতিক্রম করতে পারত না।

এটা সত্যি যে পুঁজিবাদী সম্পর্কের সূচনা হবার ফলে গ্রামীণ সহযোগিতা বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই সহযোগিতা ছিল কেবলমাত্র সংকীর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ জীবনযাত্রা রক্ষা করবার উপায়। এই কারণেই শতাব্দীকাল ধরে সার্বভৌম গ্রামের জনসাধারণেরা সাম্রাজ্য অথবা রাজবংশের উত্থান ও পতন, অথবা সংকীর্ণ গ্রামসীমানার বাইরে সমগ্র জেলা বা প্রদেশের ধ্বংস হবার মতো সর্বনাশা সামাজিক ঘটনা ঘটলেও নির্বিকার থাকতে পারত। জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক সংহতির প্রশ্ন উঠত না বলেই গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনযাত্রায় আবদ্ধ গ্রামীণ ঐক্য বিকাশ লাভ করেছিল। গ্রামীণ সহযোগিতা গ্রামীণ স্বয়ংসম্পূর্ণতার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এইটি ধ্বংস হবার সংগে সংগে সহযোগিতারও অবসান ঘটল। যেহেতু গ্রামীণ সহযোগিতা গ্রামীণ স্বয়ংসম্পূর্ণতার সংগে আবদ্ধ ছিল তাই একে রক্ষা করতে পারা যায়নি।

সংকীর্ণ গ্রামীণ স্তরে গ্রামীণ সার্বভৌম ও সহযোগিতা অবলুপ্ত করে ভারতবর্ষের যে পুঁজিবাদী ঐক্য গড়ে উঠল তারই প্রভাবে উন্নততর মানের অর্থনীতি ও সামাজিক সহযোগিতার পথ পরিষ্কার হল। এই পুঁজিবাদী ঐক্যই জাতীয় অর্থনীতি ও ভারতীয় জনগণের মধ্যে জাতীয় স্তরে সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। এই ঐক্য সাধিত হওয়ার আগে ভারতীয় জনসাধারণ

অসংখ্য গ্রামে বিচ্ছিন্ন ছিল এবং তাদের মধ্যে আর্থিক বা সামাজিক বিনিময় ছিল অত্যন্ত সামান্য। সুতরাং সর্বজনীন স্বার্থবোধ তাদের মধ্যে ছিল না বললেই চলে। এই অবয়বহীন অবস্থা কাটিয়ে উঠে ভারতীয় জাতির বিকাশের বস্তুগত ভিত্তি পুঁজিবাদী আর্থিক রূপান্তরের ফলেই তৈরি হয়েছিল।

সার্বভৌম গ্রাম এবং গ্রামীণ জনসাধারণের যৌথ জীবনযাত্রার বিনাশ যতই বেদনাদায়ক হোক না কেন ভারতীয় জনগণের আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্যের পক্ষে এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজনীয় ছিল। ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াসমূহের নৈতিকতা-নিরপেক্ষ ক্রিয়াকলাপের ফলেই সামাজিক প্রগতি সাধিত হয়। এটা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে এইরকম গ্রামেই সামাজিক নিষ্ক্রিয়তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক অকর্মণ্যতা শিকড় গেড়ে বসেছিল এবং গ্রামীণ জনসাধারণ যুগ যুগ ধরে একই ধরনের জীবনযাত্রা অতিবাহিত করত। অতীতে এই গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার শক্তিই ভারতবর্ষকে একত্রীকরণের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করে দিয়েছে। এই সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদে আমাদের প্রতিক্রিয়াশীল অশ্রুমোচন করা উচিত নয়।

সূত্র নির্দেশ

১। O' Malley এবং Baden Powell দ্রষ্টব্য
২। Radhakamal Mukherjee, পৃ. ১৬।
৩। উপরিউক্ত, পৃ. ৩৬।
৪। Thompson এবং Garratt, O' Malley এবং Baden Powell দ্রষ্টব্য
৫। Keith, Vol. I., পৃ. ২১৫তে উদ্ধৃত।
৬। Ranga, Baden Powell এবং Dutt দ্রষ্টব্য।
৭। R. P. Dutt, পৃ. ২১৩।
৮। উপরিউক্ত, পৃ. ২০৭।
৯। Gadgil, পৃ. ১৫৩—৫ দ্রষ্টব্য।
১০। Gadgil এবং Buchanan দ্রষ্টব্য।
১১। Gadgil, পৃ. ১৫৩—৪।
১২। উপরিউক্ত, পৃ. ১৫৪।
১৩। উপরিউক্ত, পৃ. ১৫৫।
১৪। উপরিউক্ত, পৃ. ১৬২।
১৫। Karl Marx, পৃ. ৮২।
১৬। উপরিউক্ত, পৃ. ৮২-৮৩।
১৭। Sitaramayya, পৃ. ৬২।
১৮। R. C. Dutt এবং Shelvankar দ্রষ্টব্য।
১৯। Shelvankar, পৃ. ১০৬।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভারতীয় কৃষির রূপান্তরের সামাজিক পরিণাম

জাতীয় কৃষির উদ্ভব

জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ভিত্তি করে নতুন ভূমি সম্পর্কের সূচনা এবং জমির ব্যক্তিগত মালিকের স্বাধীনভাবে ভূসম্পত্তি লেনদেন করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের কৃষি অর্থনীতি একটা নতুন অগ্রগতির স্তরে পেঁছেছিল। এই অগ্রগতি ইতিহাসের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। কৃষিভিত্তিক জনসাধারণও একটা নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার মধ্যে প্রবেশ করল। এই নতুন অবস্থার দরুন যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল আমরা এখন তা পর্যালোচনা করব।

এই নতুন পরিস্থিতির দরুন অবশ্য একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। কৃষিতে নতুন ভূমি সম্পর্কের সূচনার সঙ্গে এর আর কোনো পৃথক গ্রামীণ প্রকৃতি ও তাৎপর্য থাকল না। সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির অখণ্ড অধীনস্থ অংশরূপে একটা জাতীয় কৃষি গড়ে উঠল। ফলতঃ ভারতীয় কৃষির সমস্যা একটা জাতীয় রূপ ধারণ করল। সংহত অর্থনৈতিক জোত গঠন, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির দ্বারা কারিগরিভাবে কৃষির পুনর্গঠন, বৈজ্ঞানিক সার ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক কর্ষণ পদ্ধতি প্রভৃতি কারিগরি ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিই হয়ে উঠেছিল জাতীয় সমস্যা।

ব্রিটিশ শাসনের আমলে ভারতীয় কৃষি জাতীয় কৃষির পর্যায়ে উঠেছিল কিন্তু তা সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠতে পারে নি। কৃষককুলের বাস্তব অবস্থাও মোটের ওপর উন্নত হয় নি।

সংগঠন এবং উৎপাদনশীলতার দিক থেকেও কৃষি কোনো উচ্চপর্যায়ে পেঁছতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় কৃষির ইতিহাস প্রকৃতিতে জাতীয় হওয়া সত্ত্বেও একটা 'অবিরাম এবং ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খলারই ইতিহাস।' এই ইতিহাস আবার কৃষি জনসাধারণের উত্তরোত্তর দারিদ্র্য বৃদ্ধি, ঋণের দ্রুত প্রসার, কৃষকদের নিজ জমি থেকে উত্তরোত্তর উচ্ছেদ এবং তাদের কৃষিশ্রমিক অথবা ভিক্ষাজীবীতে রূপান্তরেরও ইতিহাস।

জমির বিভাজন ও খণ্ডীকরণ সমস্যার বিস্তার

ভারতীয় কৃষির অন্যতম ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক বৈশিষ্ট্য হল জমির চরম বিভাজন ও খণ্ডীকরণ। প্রতিটি কৃষক যা জমি পেত তার পরিমাণ অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে জোতের পরিমাণ উত্তরোত্তর হয়ে দাঁড়িয়েছিল অলাভজনক।

কয়েকটা ঘটনা এই অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। ইউরোপীয় দেশগুলোতে কৃষিতে পুঁজিবাদী সম্পর্কের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্যের একক হিসাবে সন্নিবিষ্ট খামারের সৃষ্টি হয়েছিল। অন্যদিকে ভারতবর্ষে ব্রিটিশেরা জমির সেরকম কোনো পুনর্বিন্যাস করে নি। মালিকানা ও ব্যক্তিগত চাষের দিক দিয়ে দেখতে গেলে জমি একত্রই রয়ে গিয়েছিল। জমি খণ্ডীকরণ ও একত্র চাষ ব্যবস্থার অসুবিধাগুলো চলছিলই।১

জমিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি আর তার বিলি-বন্দোবস্তে ব্যক্তিস্বাধীনতা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যৌথ পরিবারের মধ্যে বহির্মুখী প্রবণতা দেখা দিল। আগে যৌথ পরিবারের সভ্যরা সম্মিলিতভাবে জমির মালিক হত, গ্রামের নির্দিষ্ট করে দেওয়া জমি একত্রিত হয়ে চাষ করত। কিন্তু বহির্মুখী প্রবণতার ফলে বিভিন্ন দাবিদারদের মধ্যে পারিবারিক জমি ভাগ শুরু হল, ফলতঃ দাঁড়াল উত্তরোত্তর জমি খণ্ডীকরণ।২

আর একটা ব্যাপারও জমি খণ্ডীকরণকে সহায়তা করেছিল—তা হল জমির মালিক এমনকি প্রজাকৃষকরাও জমি খাজনায় বিলি করত বা ভাগে দিত, তারও আবার উপ-ভাগ হত। জোত এমনিতেই ক্ষুদ্র, এইভাবে ক্ষুদ্রতর জোতে খণ্ড-বিখণ্ড হয়েছিল।

যা হোক, সব থেকে চূড়ান্ত যে ঘটনা জমি বিভাগ ও খণ্ডীকরণ ত্বরান্বিত করেছিল তা হল কৃষিতে অত্যধিক চাপ। লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ ও শহুরে হস্তশিল্পী ও কারিগরদের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের দরুন এই চাপ সৃষ্টি হয়েছিল।

কৃষিতে নির্ভরশীলতার বর্ধমান প্রক্রিয়া নিচের সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যাবে ঃ

কৃষিনির্ভর জনসংখ্যার (শতাংশ) ঃ৩

১৮৯১	—	৬১·১
১৯০১	—	৬৫·৫
১৯১১	—	৭২·২
১৯২১	—	৭৩·০
১৯৩১	—	৭৫·০

কৃষিনির্ভর জনসংখ্যার এই বৃদ্ধির সঙ্গে আমরা শিল্পনির্ভর জনসংখ্যার হ্রাস তুলনা করতে পারি।

শিল্পনির্ভর জনসংখ্যার শতাংশ ঃ৪

১৯১১	—	৫·৫
১৯২১	—	৪·৯
১৯৩১	—	৪·৩
১৯৪১	—	৪·২

প্রকৃতপক্ষে এই প্রক্রিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৮৮০ সালে ফেমিন কমিশনের রিপোর্টে ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে "জমির ব্যাপক চাষের জন্য প্রকৃতপক্ষে যে সংখ্যক লোকের প্রয়োজন তার থেকে অনেক বেশি লোক আছে যাদের কৃষি ছাড়া আর কোনো কাজ নেই।"৫

এই প্রবণতার সঙ্গে আমরা ইউরোপীয় দেশগুলোর বিপরীত প্রবণতার তুলনা করতে পারি। "ফ্রান্সে ১৮৭৬ সাল থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে কৃষি জনসংখ্যা ৬৭·৬ থেকে ৫৩·৬ শতাংশে নেমে গিয়েছিল। জার্মানীতে ১৮৭৫ সাল থেকে ১৯১৯ সালের মধ্যে এই শতাংশ ৬১ থেকে ৩৭·৮-এ নেমে গিয়েছিল, ইংলণ্ড ও ওয়েলসে ১৮৭১ থেকে ১৯২১-এর মধ্যে তা ৩৮·২ থেকে ২০·৭-এ নেমে গিয়েছিল এবং ডেনমার্কে ১৮৮০ থেকে ১৯২১-এর মধ্যে ৭১ থেকে ৫৭-তে নেমে গিয়েছিল।"৬

এই ব্যাপারটা ভারতের 'শিল্পশূন্যকরণ' বলে পরিচিত ছিল, অর্থাৎ আনুপাতিক আধুনিক শিল্পের বিকাশ ছাড়াই পুরানো হস্তশিল্প ধ্বংস করা। এর ফল হল জমিতে উত্তরোত্তর ভীড় বাড়ানো।

জমিতে ভীড় বৃদ্ধি জমি বিভাগ ও খণ্ডীকরণ ত্বরান্বিত করেছিল। দাক্ষিণাত্যের একটা সাধারণ গ্রাম পরিদর্শন করে এইচ মান মন্তব্য করেছিলেন যে জোতের গড়পড়তা আকৃতি ১৭৭১ সালে ৪০ একর থেকে ১৯১৫ সালে ৭ একরে নেমে গিয়েছিল।

জমির এই বিভাজন ও খণ্ডীকরণের প্রক্রিয়া দাক্ষিণাত্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সমস্ত প্রদেশে বিভিন্ন মাত্রায় এটা চলছিল। যুক্তপ্রদেশে কৃষক প্রতি গড় কৃষিযোগ্য জমি ২·৫ একরে নেমে গিয়েছিল। পশ্চিমবাংলায় গড়পড়তা জোতের পরিমাণ ছিল ৩·১ একর, আসামে ৩ একর, বিহার ও উড়িষ্যাতে ৩·১ একর, মাদ্রাজে ৪·৯ একর, মধ্যপ্রদেশে ৮·৫, পঞ্জাবে ৯·২ এবং বোম্বেতে ১২·২ একর।৭

এগুলো অবশ্য গড়পড়তা আয়তনের পরিসংখ্যান। অধিকাংশ জোতই যে ছোট ও দক্ষতাহীন ছিল এ ঘটনাতে তা প্রকাশ পায় না।

১৯২৬ সালে Agricultural Journal of India-তে নিম্নভাবে জোতের বর্গীকরণ করা হয়েছিল :

১০ একরের বেশি—২৪ শতাংশ
৫ থেকে ১০ একর—২০ শতাংশ
১ থেকে ৫ একর—৩৩ শতাংশ
১ একর অথবা তার কম—২৩ শতাংশ

এমনকি পঞ্জাব যা কৃষিতে অপেক্ষাকৃত বর্ধিষ্ণু জায়গা সেখানকার সম্পর্কেও রয়াল কমিশন অব এগ্রিকালচার বলেছেন, "পঞ্জাবে শতকরা ২২·৫ ভাগ কৃষক এক একর অথবা কম জমি চাষ করত, শতকরা ১৫ ভাগ ১ থেকে আড়াই একর চাষ করত, শতকরা ১৭·৯ ভাগ আড়াই থেকে ৫ একর চাষ করত এবং শতকরা ২০·৫ ভাগ ৫ থেকে ১০ একর জমি চাষ করত।"

জমি বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে খণ্ডীকরণও সমানভাবে বেড়ে চলেছিল। কংগ্রেস কৃষি অনুসন্ধান কমিটি রিপোর্ট উত্তর প্রদেশের ঘটনা এইভাবে বর্ণনা করেছেন : "অতীতে বহু বছর ধরে জোতের খণ্ডীকরণ প্রক্রিয়া দ্রুতগতিতে চলে আসছিল। এক বিঘার শতভাগের একভাগ থেকে চারশভাগের একভাগ পর্যন্ত অধিকার করে আছে এমন কৃষকের সংখ্যা নির্ধারণ করা কঠিন কিন্তু সেই সংখ্যাটি বেশ বড়।"৮

জোতের এই অতিরিক্ত খণ্ডীকরণের ফলে কৃষকদের পক্ষে দক্ষতার সঙ্গে কৃষিকাজ করা খুবই অসুবিধাকর হয়ে পড়েছিল।৯ সমস্ত দেশজুড়ে জমি বিভাগ ও খণ্ডীকরণ এমন একটা ভয়ংকর পর্যায়ে এসেছিল যে "এমনকি অনেক ছোট ছোট জোতে লাঙল পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারা যায় না। জমি খণ্ডীকরণ বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি শ্রমিকের যোগানও বৃদ্ধি পায়, কোদাল ও নিড়ানির ব্যবহার বেশি প্রচলিত হয়।"১০ আতঙ্কজনক জমি বিভাগ ও খণ্ডীকরণের এটা হল একটা জোরদার সাক্ষ্য।

জনসংখ্যার নিরংকুশ বৃদ্ধি হল আর একটা ঘটনা যা জমির চাপ আরো ব্যাপক করে তুলেছিল। এই ঘটনার ভূমিকাকে অবশ্য প্রায়ই বাড়িয়ে বলা হয়।

এটা স্বীকার করা দরকার যে "তিন-চতুর্থাংশ মানুষের একমাত্র বৃত্তিরূপে কৃষির প্রতি এই অত্যন্ত বৈষম্যযুক্ত, অপব্যয়ী নির্ভরতা আধুনিক যুগে টিকে থাকা পুরানো আদিম ভারতীয় সমাজের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া নয়। এর বিপরীতে এটা হল একেবারে আধুনিক ঘটনা—সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সরাসরি ফল। ব্রিটিশ শাসনের আমলে কৃষিতে বৈষম্যমূলক নির্ভরতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এটি হল শিল্প ও কৃষির সমতার অবলুপ্তি এবং সাম্রাজ্যবাদের কৃষিগত উপাঙ্গ হিসেবে ভারতের ভূমিকার অবনয়নের প্রকাশ।"১১

যথেষ্ট পরিমাণ জমির অভাব কৃষির ওপর অত্যধিক চাপ ব্যাখ্যা করতে পারে না। "সম্পূর্ণ এলাকার শুধুমাত্র ৩৪·২ শতাংশই চাষ করা হয়। কৃষির জন্য পাওয়া যায় না এমন ৩৫·২ শতাংশ জমি বাদ দিয়েও এখন চাষ করা যায় এমন ৩০·৬ শতাংশ জমি আমাদের আছে। সিন্ধু এবং পঞ্জাব প্রদেশের অনেক বিস্তৃত ভূখণ্ড আছে যার উর্বরতা খুবই সম্ভাব্য এবং যার জন্য দরকার শুধুমাত্র জলের কিন্তু সরকার এই জমিগুলোতে জলসেচের কোনো ব্যবস্থা করছে না। তাছাড়া নতুন কৃষি জমি ব্যবহার করতে হলে মূলধনের প্রয়োজন হয় কিন্তু ভারতীয় কৃষক তার ঋণগ্রস্ততার বোঝা নিয়ে সম্ভবত এই প্রয়োজনীয় প্রাথমিক বিনিয়োগ করতে পারে না। সরকারও এই সমস্যার প্রতি অত্যন্ত বেশি রকমের উদাসীন থাকার দরুন কোনো অনুদান বা অন্য কোনোরকমভাবে কোনো সহজ-শর্তে আর্থিক সাহায্য করে না।"১২

খণ্ডীকরণের ফল

অত্যধিক জমি বিভাজন ও খণ্ডীকরণের ফল কৃষি এবং কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত ক্ষতিকর ছিল।

কৃষিকাজের একক হিসাবে আয়তনে বড় সংহত জমি হল বৃহদাকার বৈজ্ঞানিক কৃষির বাস্তব ভিত্তি। ক্ষুদ্র জমি ছড়ানো, ছিটানো হয়ে এবং

ক্ষুদ্রতরভাবে বিভক্ত হয়ে সমৃদ্ধিশালী কৃষির উপযুক্ত ভিত্তি হতে পারে না।

ক্ষুদ্র জোত যদি অনেকাংশে কৃষকের দারিদ্র্য ব্যাখ্যা করে তবে কি কারণে কৃষক তার উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি করতে পারে না—এই দারিদ্র্য তা ব্যাখ্যা করে। জমিতে বিনিয়োগের মতন কোনো টাকা না থাকার দরুন কৃষক উৎপাদনের পুরানো আদিম পদ্ধতি ও উপাদানের মধ্যেই আটকে থাকতে বাধ্য হত। সে বৈজ্ঞানিক সার ও আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারত না। তার গবাদি পশুকেও সে সতেজ ও স্বাস্থ্যকর রাখতে পারত না। এতে শুধুমাত্র কৃষির উত্তরোত্তর অবনতিই ঘটেছিল।

কৃষিতে অতিরিক্ত চাপের ফলে গবাদি পশুর খাবার সরবরাহকারী গোচারণ-ভূমিগুলো উত্তরোত্তর কৃষির জন্য নিয়ে নেওয়া হচ্ছিল এবং গোচারণভূমি দ্রুত-ভাবে কমে আসছিল। এর ফলে পশুখাদ্যের ঘাটতি শুরু হল এবং যথেষ্ট পুষ্টির অভাবে তাদের জীবনীশক্তি কমে গেল। এসবকিছুই কৃষি উৎপাদনকে প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করেছিল।

এইসব বহু ঘটনা ব্যাখ্যা করে কেন একর প্রতি কর্ষিত জমির উৎপাদন দ্রুতগতিতে কমে আসছিল।

বিশ্বেশ্বরাইয়া বলেছেন, "স্বাভাবিক যুদ্ধপূর্ব ভিত্তিতে ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষের গড় উৎপাদন সেচসেবিত শস্যসমেত একর প্রতি ২৫ টাকার বেশি হতে পারে না ; জাপানে তা দেড়শ টাকার কম নয়।"১৩

অন্যান্য আরো যেসব ঘটনা কৃষিকে এবং কৃষকদের অবস্থাকে প্রভাবিত করেছিল আমরা এখন তা আলোচনা করব।

নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা

আগেই দেখা গেছে যে ব্রিটিশ সরকার একটা সম্পূর্ণ নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল। এই নতুন ব্যবস্থাতে কৃষককে প্রতি বছরই সরকারকে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের মাপে ভূমিরাজস্ব দিতে হত—তা সে কৃষকের বাৎসরিক ফসল ভাল হোক বা না হোক। ভারতবর্ষের মত দেশে যেখানে বৃষ্টি না হওয়া বা কম হওয়ার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা হিসাবে কোনো ব্যাপকভাবে সুবেষ্টিত সেচব্যবস্থা নেই এবং যেখানে স্বাভাবিক বছরেও ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর বাজারে সে তার শস্যের জন্য সামান্য দাম পেত সেখানে এটা অবশ্যম্ভাবী যে কৃষক রাষ্ট্রের বাৎসরিক চাহিদা মেটাতে পারত না, তা সে আগেই হোক বা পরেই হোক, দ্রুতগতিতে দারিদ্র্য ও ঋণগ্রস্ততায় নিমজ্জিত হত।

ভূমিরাজস্বই যে কৃষকের দারিদ্র্য বাড়ার এবং তার ফলস্বরূপ ঋণগ্রস্ততার অন্যতম কারণ—এটা সেই ১৮৯২ সাল থেকেই বোঝা গিয়েছিল।১৪ Vaughan Nash তাঁর বই The Great Famine-এ উল্লেখ করেছেন : "আমি বম্বে সফরকালে প্রকৃতই খুশি হয়েছিলাম কেননা কর্তৃপক্ষ মহাজনদের রাজস্ব দেওয়ার প্রধান অবলম্বন বলে গণ্য করত।"১৫

ব্রিটিশের প্রবর্তিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা এইভাবে কৃষি জনসাধারণের দারিদ্র্য ও ঋণগ্রস্ততা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলে প্রমাণিত হয়েছিল। "যে ব্যবস্থা ফসল অথবা অর্থনৈতিক পরিবর্তন অনপেক্ষে এককালীন ৩০ বছরের জন্য

—৪

অভিন্ন হারে, নগদে নির্দিষ্ট রাজস্বের পরিমাণ ধার্য করে তা রাজস্ব আদায়কারী বা বাজেট প্রস্তুতকারী সরকারি রাজনীতিজ্ঞদের কাছে সুবিধাজনক হতেও পারে ; কিন্তু দেশীয় লোক যাদের আয়ের দারুণ অনিশ্চয়তার মধ্যেও সমানহারে রাজস্ব দিতে হত, দুঃসময়ে তাদের এই ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিত এবং অপরিহার্যভাবে তাদের মহাজনদের দ্বারস্থ হতে হত। চরম অবস্থাতে বাতিল করে বা রেহাই করে এই প্রক্রিয়া কিছুটা লাঘব করলেও কিন্তু তা ঠেকাতে পারত না"[১৬]

অত্যধিক পরিমাণে ভূমিরাজস্বের জন্য এই অনমনীয় ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ক্ষতিকর প্রভাবের প্রকোপ বেড়ে গিয়েছিল।

১৮৫৭-৮ সালে রাজনৈতিক ক্ষমতা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি থেকে ব্রিটিশ রাজে হস্তান্তরিত হওয়ার সময় সমগ্র ভারতবর্ষের ভূমিরাজস্ব ছিল ১·৫৩ কোটি পাউন্ড। পরবর্তীকালে ভূমিরাজস্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯০০-১ সালের মধ্যে ভূমিরাজস্ব ১·৭৫ কোটি পাউন্ড, ১৯১১-১২ সালে ২ কোটি পাউন্ড, ১৯৩৬-৭ সালে ২·৩৯ কোটি পাউন্ড বেড়ে গিয়েছিল।[১৭]

ভূমিরাজস্বর সবসময়ই বাড়ার দিকে একটা প্রবণতা থেকে গিয়েছিল। রাধাকমল মুখার্জি তার Land Problems in India বইয়ে উল্লেখ করেছেন, "মাদ্রাজ, বোম্বে ও বিশেষ করে যুক্তপ্রদেশে রাজস্ব লাফে লাফে বেড়ে গিয়েছে।"[১৮] তিনি আরো বলেছেন, "যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বেতে ১৮৯০ থেকে ১৯২০ এই তিন দশকে যখন কৃষি আয় মোটামুটিভাবে যথাক্রমে ৩০, ৬০ এবং ২৩ শতাংশ বেড়েছে তখন ভূমিরাজস্ব যথাক্রমে ৫৭, ২২·৬ এবং ১৫·৫ শতাংশ বেড়েছে। ভূমিরাজস্ব এত বেশি বেড়ে যাওয়া ও সেই সংগে ফসলের সময় নগদে তা দিতে হওয়ার ব্যাপারটা ক্ষুদ্র জোতের কৃষকদের, যারাই এইসব প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর খুব প্রতিকূলভাবে কাজ করেছে।"[১৯]

জমি বিভাজন ও জমিতে অতিরিক্ত চাপের মধ্যে অলাভজনক জোতের বৃদ্ধির পরিস্থিতিতে অত্যধিক বেশি ভূমিরাজস্বই ব্রিটিশ শাসনের প্রথমদিকে ভারতীয় কৃষির দারিদ্র্যের মুখ্য কারণ। সরকারের ক্রমবর্ধমান রাজস্ব দাবি কৃষক তার পড়তি আয়ের থেকে মেটাতে উত্তরোত্তর অসমর্থ হত এবং এর ফলেই তাদের পরবর্তী ঋণগ্রস্ততা এসে গিয়েছিল।

কৃষিজাত দ্রব্যের পণ্যে রূপান্তর ও বাণিজ্য

আরো একটা ঘটনা কৃষককে প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করেছিল। সেটা হল ব্রিটিশ শাসনের আমলে কৃষির বাণিজ্যপণ্য হয়ে ওঠা। কৃষকেরা এখন ভারতবর্ষ ও বিশ্ব বাজারের জন্য উৎপাদন করত। এইভাবে ভারতীয় কৃষক সতত অস্থির বাজারের সর্বপ্রকার উত্থান-পতনের অধীন হল। তাকে আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়ার বৃহৎ কৃষি ট্রাস্টগুলির মতো দুর্দান্ত আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের সংগে প্রতিযোগিতা করতে হত। এরা ট্রাক্টর ও অন্যান্য আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির সাহায্যে বৃহদাকারে উৎপাদন করত যখন ভারতীয় কৃষক খাদ্যাভাবে

মৃতপ্রায় আদিম হালবলদ ও শ্রমশক্তির সাহায্যে তার শোচনীয় ছোট এক টুকরো জমি চাষ করত। আবার কৃষির বাণিজ্যিকতা কৃষকদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য মধ্যবর্তী দালাল, বণিকদের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য করত। বণিকেরা তাদের উন্নততর অর্থনৈতিক অবস্থার দরুন কৃষকদের দারিদ্র্যের পুরোপুরি সুযোগ নিত। কোনোরকম অর্থনৈতিক সঞ্চয় না থাকার দরুন এবং সরকারের রাজস্ব দাবি ও মহাজনের বেশি বেশি সুদের দাবির দরুন দরিদ্র কৃষককে ফসল কাটার সময়ই তার উৎপাদন দালালকে বিক্রি করতে হত। অত্যন্ত প্রয়োজনের তাগিদে এই কাজ করতে হওয়াতে কৃষকদের পাওনাও কম হত। যদি তারা অপেক্ষা করতে পারত তাহলে এর থেকে বেশি পেত। দালালরা এইভাবে লাভের একটা বড় অংশ নিজেরা আত্মসাৎ করত।

দারিদ্র্যের প্রসার

আরো অনেক কারণ ছিল কৃষকদের দারিদ্র্য বৃদ্ধির পেছনে। মাঝে মাঝে কৃষি বিপর্যয়ের মতো অর্থনৈতিক ভূকম্পের কথা ছেড়ে দিলেও আরো অনেক প্রাকৃতিক কারণ ছিল, যেমন খরা, বিধ্বংসী বৃষ্টি যেগুলোও কৃষকদের অর্থ-নৈতিক বিপর্যয় এনেছিল। ভারতীয় কৃষকদের দুঃসময়ের জন্য কোনো সঞ্চয় প্রায় থাকতই না। ভারতীয় কৃষকদের অধিকাংশই ঋণগ্রস্ত হত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুন রাজস্ব দিতে না পারার কারণে। দুর্ভিক্ষ ভারতীয় জন-সাধারণের জীবনযাত্রার একটা বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

জমি করের সঙ্গে কৃষকদের অতিপ্রয়োজনীয় জিনিসের ওপর যেমন, কোরোসিন, তেল এবং নুন প্রভৃতির ওপর কর দিতে হত। "দরিদ্র কৃষককে জমি থেকে তার উপার্জনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে শুধু সরকারকে দিতে হত তাই নয় সাধারণ ভোগের কতগুলো জিনিস যেমন চিনি, কেরোসিন, তেল, নুন প্রভৃতিরও করভার বহন করতে হত। যেখানে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" বহাল ছিল সেখানে জমিদার ও জোতদারদের থেকে এরা খুব পৃথক ব্যবহার পেত বলে মনে হয়। জমিদার ও জোতদারেরা বিস্তৃত এলাকার মালিক ছিল এবং যার জন্য তারা রাষ্ট্রকে শতাব্দীকাল আগে নির্দিষ্ট একটা যৎসামান্য দক্ষিণা দিত যা চিরকালের জন্য অপরিবর্তনীয় বলে ঘোষিত ছিল এবং যেখানে তার কৃষি আয়ও ছিল পুরোপুরিভাবে আয়কর মুক্ত।"২০

আবার বনভূমির ওপর সরকারী একচেটিয়া সাধারণকে জ্বালানি অথবা বাড়ি ঘর তৈরির জন্য কাঠ তুলতে বাধা দিত। এতে কৃষকেরা গোবরকে সার হিসাবে ব্যবহার না করে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করতে বাধ্য হত। এর ফলে জমি থেকে উৎপাদন কমে গিয়েছিল এবং তা ভারতীয় কৃষকদের দারিদ্র্য আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। "অরণ্য আইনসমূহ-সৃষ্ট বিপর্যয় সম্যকভাবে উপলব্ধি করা হয়নি। ভূমিরাজস্ব ও লবণকর অসহনীয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ মানুষকে যে বোঝা চাপায় এই আইনগুলি কেবল তা বাড়াবার জন্যই প্রতিযোগিতা করছে।"২১

যে কৃষক নিজের এবং পরিবারের প্রয়োজনীয় যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য জোটাতে পারে না স্পষ্টতঃই সে তার পশুকে সবল রাখতে পারে না। গবাদি পশুর সংখ্যা

যখন বেড়ে যাচ্ছিল তখন তাদের পুষ্টি যাচ্ছিল কমে। "তাই গ্রামগুলো দীন ও ক্ষুধার্ত গরুর অপর্যাপ্ত খাটাল হয়ে দাঁড়াল।" এতে কৃষির ক্ষমতা হ্রাস ত্বরান্বিত হয়েছিল।

উপরে বর্ণিত এইসব ঘটনার সম্মিলিত ফল কৃষি জনসাধারণের বিস্ময়কর দারিদ্র্য বৃদ্ধি ব্যাখ্যা করে। তার আয় ও যেসব দাবি তাদের মেটাতে হত তার ফারাকটা ক্রমে ক্রমেই বেড়ে চলছিল, ফলে কৃষক আরো বেশি ঋণের চুক্তি করতে বাধ্য হত এমনকি সেই সুদের শর্তেও যা সে দিতেও পারত না।

এটা একটা পাপচক্র। দারিদ্র্যের দরুন কৃষকের ঋণগ্রস্ততা বেড়ে গিয়েছিল আবার ঋণগ্রস্ততা বেড়ে গিয়ে দারিদ্র্য ত্বরান্বিত করল। কৃষক তার ঋণ এমনকি সুদ পর্যন্ত দিতে না পারায় মহাজনের কাছে সে যে কেবল তার শস্য হারাচ্ছিল তাই নয়, দ্রুত তার জমিও হারাচ্ছিল। এইভাবে কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদের প্রক্রিয়া বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত দ্রুতগতিতে চলে আসছিল।

গ্রামীণ জীবনে ঋণগ্রস্ততার প্রসার

ব্রিটিশ শাসনের আমলে ভারতীয় কৃষকদের ঋণগ্রস্ততা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এক দশক থেকে আরেক দশকে তা বেড়ে যাচ্ছিল।

এমনকি ১৮৮০ সালেই গ্রামীণ জনসাধারণের ঋণগ্রস্ততা অনেক উঁচু স্তরে পেঁছে গিয়েছিল। "জোতজমিসম্পন্ন কৃষকশ্রেণীর এক-তৃতীয়াংশ গভীরভাবে এবং অবিচ্ছেদ্যভাবে ঋণে আবদ্ধ ছিল এবং অন্ততঃ আরো সম-পরিমাণ ঋণে আবদ্ধ ছিল বটে যদিও তারা ঋণমুক্তির ক্ষমতার বাইরে ছিল না"২২

১৮৮০ সাল থেকে গ্রামীণ জনসাধারণের ঋণগ্রস্ততা বেড়ে যাচ্ছিল এমনকি গুণোত্তর হারে। এই ঘটনা সব গবেষকরাই লক্ষ্য করেছেন।২৩

কৃষকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মহাজনদের কাছে ঋণী হয়ে জীবনযাপন করত (সাইমন রিপোর্ট, প্রথম খণ্ড, পৃ ১৬)।

বিশাল কৃষি ঋণগ্রস্ততার পরিমাপ করার নানা প্রচেষ্টা হয়েছে অনেক সময়েই যা প্রকাশিত করে এর নিয়ত ঊর্ধ্বগতি।

১৯১১ সালে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে ম্যাকলগন এর পরিমাপ ধরেছিলেন ৩০০ কোটি টাকা, ১৯২৫ সালে এম. এল. ডারলিং করেছিলেন ৬০০ কোটি টাকা, ১৯২৯ সালে সেন্ট্রাল ব্যাংক অনুসন্ধান কমিটি রিপোর্টে ধার্য ছিল ৯০০ কোটি টাকা এবং এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট ডিপার্টমেন্ট ১৯৩৭ সালে ১৮০০ কোটি টাকা পরিমাপ করেছিল।২৪

১৯২৯ সালে পৃথিবীব্যাপী সংকট ভারতীয় কৃষকসমাজকে গভীরভাবে আঘাত করেছিল। কৃষিজ দ্রব্যাদির বিপর্যয়কর মূল্য হ্রাসের দরুন তারা এত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যে ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তাদের মোট ঋণের পরিমাণ বেড়ে ১৮০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছিল। "এই ভয়াবহ বৃদ্ধির মূল কারণ হল এই যে ১৯২৯ সালে কৃষকদের আয় যখন অর্ধেকের ওপর কমে গিয়েছিল তখন করভার সেই একই থেকে গিয়েছিল। কতগুলো এলাকাতে সরকার কৃষকদের ছাড় দিত কিন্তু তাও ছিল অকিঞ্চিৎকর...। জমিদারী

এলাকাতে আর একটা অতিরিক্ত বোঝা ছিল—তা হল কৃষকদের মোকদ্দমা সংক্রান্ত খরচ। কৃষকদের পক্ষে খাজনা দিতে না পারার জন্য বড় রকমের বকেয়া জমে ওঠে এবং জমিদাররাও দেদার মোকদ্দমা করে।

"এটা কৃষকদের ওপর অত্যন্ত গুরুভার হয়ে পড়ে। তারা বর্তমান অবস্থাতে এই মোকদ্দমা খরচ নির্বাহের জন্য সম্পূর্ণভাবে মহাজনের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়।"২৫

"বেশির ভাগ ঋণের কারণ এই যে ৭৫ শতাংশেরও বেশি কৃষক জমি থেকে তাদের ন্যূনতম জীবনযাত্রাও নির্বাহ করতে পারে না…।"২৬

"অতএব বর্তমান গ্রামীণ ভারতে ঋণগ্রস্ততা হল অন্যতম প্রধান সমস্যা। অবস্থাটা এখন এই যে ৮০ শতাংশেরও বেশি কৃষক তাদের বর্তমান জোত জমি নিয়ে কখনই ঋণ পরিশোধ করতে পারে না।"২৭

কৃষক মালিকের হাত থেকে অকৃষক মালিকের কাছে জমি হস্তান্তর

কৃষকদের এই অতিরিক্ত ঋণগ্রস্ততার দরুন রায়তওয়ারী এলাকায় জমি ব্যাপকভাবে স্বত্ববান কৃষকদের কাছ থেকে মহাজনদের কাছে হস্তান্তরিত হচ্ছিল এবং জমি থেকে প্রজা কৃষকদের ব্যাপকভাবে উচ্ছেদ করা হচ্ছিল।

একেবারে নিষ্ঠুর সুদখোরের ঐতিহ্যানুযায়ী মহাজনেরা কৃষকদের অর্থ-নৈতিক অসহায়তাকে কাজে লাগাচ্ছিল। যদিও সুদের হার বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রকম ছিল তবু সব সময়ই তা উঁচু ছিল। কমপক্ষে ১২ শতাংশ থেকে ২০০ অথবা ৩০০ শতাংশ পর্যন্ত এই হার ছিল।২৮ এর ফলে গ্রামের সাহুকর সবার অপছন্দের এমনকি ঘৃণার বিষয় হয়ে গিয়েছিল। তাকে অত্যাচার ও অমানুষিকতার মূর্ত প্রতীক রূপে মনে করা হত এবং দেশের সাহিত্যে, মঞ্চ নাট্যে, ছায়াছবিতে তাকে দুর্জনের ভূমিকায় দেখা যেত।

মহাজনেরা এই আইনগত প্রথা বাদে আরও অনেক কপটতার আশ্রয় নিয়ে কৃষকদের নির্যাতিত করত। যেমন যতটা দাদন তাকে দেওয়া হয়েছে তার থেকে বেশি অঙ্কের টাকা লেখা আছে এমন দলিল তাকে সই করতে বাধ্য করানো হত ও ভুল হিসেব রাখা হত। কৃষকদের অজ্ঞতার সুযোগ সে নিত এবং কৃষকেরাও চাতুরী ধরতে পারত না এবং দারিদ্র্যের দরুন তার পক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া অসুবিধাকর এমনকি অসম্ভব হয়ে পড়ত।

গ্রামীণ ঋণের সমস্যার সমাধানে সরকার অনেক আইনগত উপায় নিয়েছিল কিন্তু সে প্রচেষ্টা কোনোরকম অনুভবনীয় সফলতা অর্জন করতে পারে নি। রয়াল কমিশন অন এগ্রিকালচার তার প্রতিবেদনে বলেছে, "ঋণগ্রস্ততার মোকাবিলার জন্য আইনগত উপায় আপেক্ষিকভাবে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে।"

কৃষকদের এই বিশাল প্রতিকারহীন ও অসহনীয় ঋণগ্রস্ততা সম্পর্কে প্রতি-বেদনে আরও বলা হয়েছে : "ভারতবর্ষের কৃষক অনেকাংশে লাভের জন্য খাটে না, নীট আয়ের জন্যও খাটে না, খাটে জীবনধারণের জন্য। জমিতে কৃষকদের অতিরিক্ত ভীড়, জীবনযাপনের বিকল্প কোনো উপায়ের অভাব, মুক্তির কোনো পথ দেখার অসুবিধা—এসবকিছুই কৃষককে যেখানেই যে পারুক না কেন এবং যে শর্তেই তা হোক না কেন খাদ্য উৎপাদন করাতে বাধ্য করেছিল। তার জমি

যখন উত্তমর্ণের দখলে চলে গেল, তখন কোনো আইনই তার প্রয়োজন মেটাতে পারবে না, কোনো কৃষি আইনই তাকে রক্ষা করতে পারবে না। খাদ্যের জন্য তার জমি দরকার এবং জমির জন্য তাকে উত্তমর্ণের কাছে যেতে হবে যার কাছে সম্ভবত সে তার সম্পত্তির মোট মূল্যেরও অনেক বেশি ঋণী।"

নতুন জমি ব্যবস্থাতে জমি একটা বিক্রয়যোগ্য পণ্য হয়ে দাঁড়াল। কৃষককে জমি বন্ধক ও বিক্রির স্বাধীনতা দেওয়ার সংগে সংগে এ ব্যবস্থা মহাজনকে ঋণগ্রস্ত কৃষককে জমি থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়ার অধিকারও দিল। নতুন অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে কৃষকদের দারিদ্র্য বেড়ে যাওয়াতে কৃষকের ঋণের পরিবর্তে বেশিসংখ্যক জমি মহাজনের কাছে হস্তান্তরিত হতে আরম্ভ করল। ভারতীয় কৃষকরা ব্যাপকভাবে উৎখাত হতে লাগল, পরিণতি হল অনুপস্থিত জমিদারশ্রেণীর ব্যাপক বৃদ্ধি।

কৃষি মালিক থেকে অকৃষি মালিক, ব্যবসায়ী অথবা সুদখোরের কাছে জমি হস্তান্তরীকরণ কৃষি পদ্ধতি ও উপায়ের কোনো উন্নতি সাধন করতে পারে নি। Agriculturists' Relief Act-এর কাজের রিপোর্ট দেওয়ার জন্য ১৮৯২ সালে নিযুক্ত দাক্ষিণাত্য কমিশন "একটি কৃষি সমাজ ব্যবস্থায় সীমাহীন কর আদায়কারী বিদেশীদের কাছে, যারা জমির উন্নতির জন্য কিছু করে না তাদের কাছে জমি হস্তান্তর" বলে সমালোচনা করেছেন।২৯

অত্যধিক ঋণভার কৃষি ও কৃষকের উৎসাহের ওপর সর্বনাশা কুফল ছিল। International Cooperative Alliance-এর প্রাক্তন সভাপতি Henry, W. Wolff বলেছেন, "Sir Daniel Hamilton ছবির মতো বর্ণনা করেছেন দেশ 'মহাজনদের করতলগত' ঋণের এই বন্ধনই কৃষিকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে। এই সুদ—ন্যক্কারজনক, সবচেয়ে উৎপীড়নকারী, ক্ষমাহীন সুদই রায়তের হাড়-মজ্জা চুষে খাচ্ছে আর তাকে অসীম দারিদ্র্য ও দাসত্বের জীবনে নিক্ষেপ করছে যেখানে শুধু লাভজনক উৎপাদনই ব্যর্থ হয় তাই নয়, যেখানে উদ্যম এবং ইচ্ছাও অসাড় হয়ে যায় আর মানুষ অসহায় অদৃষ্টবাদী অবস্থায় নিমজ্জিত হয়। এটা অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই, সবার চোখেই এটা পরিস্ফুট।"

ভূমিদাস প্রথার উদ্ভব

ভারতের কিছু কিছু অংশে কৃষক ঋণগ্রস্ততার দরুন ভূমিদাসে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আধুনিককালের ঋণগ্রস্ততা থেকে উদ্ভূত আর্থিক দাসত্ব মধ্যযুগীয় রূপ পরিগ্রহ করল।

"যে ক্ষেত্রে মহাজনের ক্ষমতা প্রবল সেখানে আর্থিক দাসত্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে কতদূর যেতে পারে দুটো দৃষ্টান্ত দিয়ে সেটা বোঝানো যেতে পারে। বিহার ও ওড়িশার আমরা কামিউতি নামে এক ধরনের প্রথা প্রচলিত আছে বলে শুনলাম ...এটা প্রকৃতপক্ষে ভূমিদাস দ্বারা চাষ করাবার ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। কামিয়ারা মালিকের কাছে দায়বদ্ধ ভৃত্যবিশেষ। ঋণ গ্রহণ করে তারা সুদ দেওয়ার বদলে মহাজনের কাছে যে কোনো প্রকারের দাসসুলভ কাজ করবার দায়ে আবদ্ধ হয়। যেসব মালিক নিজ জমি চাষে মজুর নিয়োগ করে তারা

মজুরদের ডেকে চুক্তি করে। এইভাবে দাদন দিয়ে মজুরদের বেঁধে ফেলবার প্রথার পত্তন হল। দাদন দেওয়া হয় এই শর্তে যে চাষের কাজে মহাজন ডাকলেই বাধ্যতামূলকভাবে কাজে আসতে হবে। এইরকম দায়বদ্ধ মজুরেরা মহাজনের জমিতে কাজ করলে দৈনিক মজুরী হিসাবে টাকার বদলে কিছু জিনিস পায়— বস্তুতপক্ষে এই প্রথা কামিয়ার পক্ষে চরম হানিকর। প্রথমতঃ কামিয়া মজুরী নিয়ে দরদস্তুর করতে পারে না···। খোলা বাজারে যে হারে মজুরী দেওয়া হয়, ধরা যাক্ একজন ঠিকাদার রাস্তা মেরামতের জন্য যে মজুরী দেয়, কামিয়া পায় তার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র।··· অবসর সময়ে এখানে ওখানে খাটাখাটনি করে সামান্য দু-চার পয়সা উপার্জন করা ছাড়া কামিয়ার নগদ উপার্জন বলে কিছু নেই। এমতাবস্থায় কামিয়া কখনই আসল শোধ দিয়ে মুক্ত হতে পারে না। কামিউতির ঋণ আসলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মত হয়ে দাঁড়ায়।"৩০

নতুন বিচার ব্যবস্থায় দরিদ্র কৃষকের চেয়ে বিত্তবান মহাজনের সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশি কারণ মামলা মোকদ্দমা ব্যয়বহুল ব্যাপার। মহাজন আইনজীবী নিযুক্ত করতে পারে এবং অনেকদিন ধরে মামলা চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু দরিদ্র কৃষক খাওয়াপরার ব্যবস্থাই ঠিকমত করে উঠতে পারে না। তার পক্ষে বেশি খরচা করে আইনজীবী ব্যবস্থা করা বেশ কঠিন। ধূর্ত মহাজন এই ব্যবস্থার পুরো সুযোগ নিয়ে নিজের অবস্থার উন্নতি করেছে।

কৃষকদের ঋণগ্রস্ততা অনেকসময়ই এই যুক্তিতে ব্যাখ্যা করা হত যে তারা ছিল বেহিসেবী স্বভাবের এবং সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে টাকা উড়িয়ে দিত। কৃষকদের পারিবারিক খরচের হিসেব পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞগণ কিন্তু অভিমত প্রকাশ করেছেন যে এইসব অনুষ্ঠানে তারা যে পরিমাণ খরচ করত, তা ছিল তাদের আয়ের একটা সামান্য অংশ মাত্র।৩১

এই দুঃখজনক পরিস্থিতির আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে যদিও সরকার অথবা মানবতাবাদী সংস্থাসমূহের অবলম্বিত পদ্ধতিতে কৃষকদের একটা অংশ আর্থিক সুবিধা ভোগ করতে পারত কিন্তু যে অবস্থাতে তাদের রাখা হয়েছিল তাতে সাধারণত তার বিশেষ কোনো উপকার হত না। মহাজনের অথবা জমিদারের দাবি পুরোপুরি মেটানো কৃষকের পক্ষে অসম্ভব ছিল তাই তাদের পাওনার পরিবর্তে এই সুবিধাগুলো পুরোপুরি ভোগ করত মালিক মহাজনেরাই।

ভারতীয় কৃষকের অসীম দারিদ্র্য, এবং তার ফলস্বরূপ তাদের ঋণগ্রস্ততা ও সেই সঙ্গে ভারতীয় কৃষির উৎপাদন হ্রাস অলাভজনক জোতে ও আদিম পদ্ধতিকে ভিত্তি করে চলে আসছিল। এ সবের কারণ অনেক গভীরে নিহিত ছিল। ভারতীয় কৃষির প্রধানত ঔপনিবেশিক চরিত্র এবং স্বাভাবিক স্বাধীন বিকাশের সমস্ত ব্যর্থতা সহ ভারতের সাধারণ অর্থনীতিই ছিল এর কারণ।

ভারতীয় কৃষির অপরিমেয় দারিদ্র্য এবং তার ঋণগ্রস্ততার ফলে বণিকশ্রেণী, মহাজন এবং জমিদারেরা উত্তরোত্তর কৃষকদের জমি অন্যায়ভাবে দখল করে নিচ্ছিল। স্বত্ববান কৃষকের সংখ্যা কমে যাচ্ছিল এবং জমি উত্তরোত্তর একটা সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ গোষ্ঠীর হস্তগত হতে লাগল। যখন গরীব ও মধ্যবিত্ত কৃষকদের একটা অংশ ধনী কৃষক হয়ে উঠতে লাগল তখন তাদের অনেক বড় অংশটাই হয়ে গেল প্রজাকৃষক ও কৃষি মজদুর।

কৃষি জগতে বিভিন্নশ্রেণীর সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী প্রবণতা

এইভাবে কৃষি জনসাধারণের মধ্যে একটা শ্রেণীবিভেদের প্রক্রিয়া অনবরতই ক্রমবর্ধমান হারে চলছিল। কৃষি-মালিক ও প্রজার সংখ্যা যখন কমে আসছিল তখন অ-কৃষি মালিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

বাংলা বিহার মাদ্রাজ এবং দেশের অন্যান্য অংশে যে নতুন জমিদারশ্রেণী ব্রিটিশ আমলে চিরস্থায়ী সম্পত্তি অধিকারের ফলে সৃষ্ট ও স্বীকৃত হয়েছিল, সেই জমিদারশ্রেণী বাদেও এই এক ধরনের নতুন অনুপস্থিত এবং অ-কৃষক ভূস্বামীশ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল।

নীচের পরিসংখ্যানে দেখা যায় কিভাবে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে অ-কৃষক ভূস্বামী-শ্রেণীর প্রসার এবং কৃষি মজুরের প্রসার সমান্তরাল ভাবে ঘটেছিল।৩২

	১৯২১ লক্ষ	১৯৩১ লক্ষ
অ-কৃষক ভূস্বামী শ্রেণী	৩৭	৪১
কৃষক (মালিক অথবা প্রজা)	৭৪৬	৬৫৫
খেতমজুর	২১৭	৩৩৫

মাদ্রাজ এবং বিহার প্রদেশের দৃষ্টান্ত নিয়ে আমরা এই প্রক্রিয়াটি আলোচনা করব।

মাদ্রাজের সংখ্যা (হাজার প্রতি)৩৩

	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
অ-কৃষক ভূমি মালিক	১৯	২৩	৪১	৩৪
অ-কৃষক প্রজা	১	৪	২৮	১৬
কৃষিকার্যে অভ্যস্ত ভূস্বামী	৪৮৪	৪২৬	৩৮১	৩৯০
কৃষিকার্যে অভ্যস্ত প্রজা	১৫১	২০৭	২২৫	১২০
প্রোলেতারিয়েত	৩৪৫	৩৪০	৩১৭	৪২৯

বাংলার সংখ্যা (হাজার প্রতি)৩৪

	১৯২১	১৯৩১	শতকরা বৃদ্ধি অথবা হ্রাস
অ-কৃষক ভূস্বামী অথবা করগ্রহীতা	৩৯০	৬৩৪	+৬২
কৃষি মালিক এবং প্রজা	৯২৭৫	৬০৪১	−৩৫
প্রোলেতারিয়েত	১৮০৫	২৭১৯	+৫০

অন্যান্য প্রদেশেও কৃষি জনসাধারণের শ্রেণী-বৈষম্যের সেই একই প্রবণতা দেখা যায়। কারণটা যেহেতু সর্বত্র একই ছিল সেহেতু পরিণতিটাও একই দেখা যাচ্ছিল।

কৃষি শ্রমিকদের সংখ্যা খুব বেশিরকমভাবে বেড়ে যাচ্ছিল। ১৮৮২ সালে কৃষি শ্রমিকদের সংখ্যা যেখানে ছিল ৭৫ লক্ষ, ১৯২১ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল

২১৫ লক্ষ এবং ১৯৩১ সালে তা দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৩৩০ লক্ষ। এই বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে ১৯৬১ সাল থেকে কৃষি প্রোলেতারিয়েতের সংখ্যা আরও বেড়ে গিয়েছিল।৩৫

অ-কৃষি জমিদার, কৃষি মালিক, প্রজা এবং খেতমজুরদের নিয়ে শুধু গঠিত নয় কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব সামাজিক গোষ্ঠী। ভূমিহীন প্রোলেতারিয়েতের সামাজিক কাঠামোর স্তরের নিচে রয়েছে কৃষি জনসাধারণের আরও অনেক গোষ্ঠী যারা দারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে প্রায় ক্রীতদাসত্বের অবস্থার মধ্যে জীবনযাপন করে।

দেশের অনেক অংশেই শ্রমিক এবং আধা ক্রীতদাস ধরনের শ্রমিক বহাল ছিল। গুজরাটে ধুবলা এবং হালি, তামিলনাড়ুতে পাড়িয়াল, হায়দ্রাবাদে বাখেলা, মধ্যপ্রদেশে বরসৈলা এবং অন্যান্য সব অঞ্চলের ঐ ধরনের গোষ্ঠী ছিল যাদের নিয়ে ভারতীয় সমাজের নিম্নতম সামাজিক কাঠামো গঠিত ছিল। এরা প্রায় আর্থিক শোষণ এবং সামাজিক বাধানিষেধের মধ্যে জীবনযাপন করত।৩৬

এইসব গোষ্ঠীর কারো কারো অবস্থা প্রায় দাসত্বের পর্যায়ে ছিল—যেমনটা ছিল গুজরাটের হালিদের ক্ষেত্রে। "হালিরা হল খেতমজুর যারা তাদের নিজের সুবিধামতন মজুরিতে কাজ করে না কিন্তু বংশপরম্পরায় স্থায়ী চাকর হিসাবে অপেক্ষাকৃত বড় জমিদার কর্তৃক নিযুক্ত হয় যারা তাদের বাসস্থান ও খাদ্যেরও ব্যবস্থা করে। তারা পদত্যাগ করতে পারে না বা অন্য কোথাও কাজও খুঁজতে পারে না। বস্তুতপক্ষে হালিদের অবস্থা এবং গৃহযুদ্ধের পূর্ববর্তী কালে আমেরিকার বাগিচা শিল্পে নিযুক্ত ক্রীতদাসদের অবস্থা প্রায় একই। একটাই পার্থক্য এই যে আইন অনুসারে হালির ওপরে মালিকের নিরঙ্কুশ অধিকার ছিল না। আইন অনুসারে তারা স্বাধীন কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তারা ক্রীতদাস ভিন্ন আর কিছুই নয়।৩৭

বিস্তৃত রবার, চা এবং কফি বাগিচা শিল্পের মত কৃষি পুঁজিবাদী উদ্যোগ-গুলির মধ্যে অনেকগুলিই ইউরোপীয় অধিকৃত ছিল। এইসব উদ্যোগগুলির শ্রমিকদের জীবন ও শ্রমের পরিস্থিতিও খুব খারাপ ছিল। ইউরোপীয় পুঁজি এইসব উপনিবেশ দেশগুলোকে বিনিয়োগের ক্ষেত্র বলে নির্বাচন করেছিল প্রধানত এই কারণে যে এইসব দেশের মজুর অত্যন্ত সুলভ। প্রধানতঃ ইউরোপীয় অধিকৃত এই বাগিচা শিল্পগুলোতে শ্রমিকদের মজুরীর নিচু হারের কথা ছেড়ে দিলেও শ্রমিকেরা কতগুলো নিয়ন্ত্রণের অধীন হত এই কারণে যে বাগিচা এলাকাতে তাদেরকে পরিবার নিয়ে বসবাস করতে হত।৩৮

কৃষি প্রোলেতারিয়েতের উদ্ভব

আগেই বলা হয়েছে স্বত্ববান কৃষকদের একটা বড় গোষ্ঠীর দারিদ্র্যের দরুন খেতমজুরের সংখ্যা ভারতবর্ষে দ্রুত বেড়ে গিয়েছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে সংখ্যাটা এতই বেড়ে গিয়েছিল যে কৃষি জনসাধারণের প্রায় অর্ধেকই খেতমজুরে পরিণত হয়েছিল। এমনকি দরিদ্র কৃষিমালিকেরা অথবা উপ-প্রজা যারা তখনও জমির মালিক ছিল তাদের অবস্থা এতই খারাপ ছিল যে তাদের অবস্থা এবং খেতমজুরের অবস্থার মধ্যে বিশেষ কিছুই পার্থক্য ছিল না।

"জমি চাকরকে দিয়ে চাষ করানো এবং ভাড়াটে প্রজা দিয়ে চাষ করানোর মধ্যে বিশেষ পার্থক্যই দেখা যায় না। ভাড়াটে প্রজাকে টাকার হিসাবে ভাড়া দেওয়া হত খুব কমই ; ব্যবস্থাটা প্রায়ই ছিল ভাগের। জমিদার উৎপাদনের ৪০ ভাগ থেকে ৬০ ভাগ এমনকি ৮০ ভাগ পর্যন্ত পেত। জমিদারদের কাছ থেকে ধার করে ও তার কাছ থেকে বীজ, গরু ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির যোগান পেয়ে এমন একটা শর্তে প্রজা প্রায়ই বছরের পর বছর একটা বিপজ্জনক অবস্থায় জীবনযাপন করত। অন্যদিকে জমির চাকর জমিদারের বীজ, গরু ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারত, সময়ে সময়ে তার কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে দাদন পেত ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পেত এবং ফসলের একটা মোটা অংশ অথবা উৎপাদনের একটা অংশ হিসাবে তার পাওনা পেত। কোনো কোনো সময় জমির চাকর সামান্য কিছু টাকাও পেত ও সেই সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য পেত। প্রজা তার নিজ যন্ত্রপাতি নিয়ে হয়তো চাষ করতে পারে কিন্তু কার্যত প্রজা ও চাকরের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নেই এবং জমিদার যখন অনুপস্থিত থাকেন তখন প্রকৃত কৃষক, খেতমজুর অথবা উপ-প্রজা সেটা সবসময় স্পষ্ট নয়।৩৯

কৃষি প্রোলেতারিয়েতের শ্রেণী ও সেই সঙ্গে দরিদ্র কৃষকদের বিশাল জনতা যাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আধা-প্রোলেতারিয়েত—এরাই ছিল কৃষি-জনসাধারণের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠী। উঁচু মহলের কৃষকদের দ্রুত দারিদ্র্যের দরুন এবং জমি থেকে তাদের উৎখাত হয়ে যাওয়ার দরুন এই কৃষি প্রোলেতারিয়েতের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছিল। কেবলমাত্র মধ্য ও উচ্চতর পর্যায়ের কিছু প্রোলেতারিয়েতরা সমৃদ্ধ হয়ে ছোট ও বড় জমিদারে রূপান্তরিত হচ্ছিল।

পরভৃৎ ভূস্বামীশ্রেণীর উদ্ভব

মহাজন, পুরোনো জমিদারশ্রেণীর মতন শহুরে পেশা থেকে ধনবান হওয়া বণিকেরা—এদের নিয়েই গঠিত ছিল জমিদারশ্রেণী। এরা সাধারণতঃ কৃষির অগ্রগতিতে কোনো কার্যকরী প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করেনি। নতুন ও পুরোনো এই দুই ধরনের জমিদারশ্রেণী প্রজার কাছ থেকে খাজনা আদায় করা ছাড়া কৃষিতে কোনো সপ্রাণ উৎসাহ দেখায়নি। ভারতবর্ষের মতন একটা দেশে যেখানে পুঁজি বিনিয়োগের রাস্তা খুবই সীমিত এবং যেখানে জমির চাহিদা অত্যন্ত বেশি সেখানে জমিতে বিনিয়োগই বেশি লাভজনক দেখা গিয়েছিল।

এই অ-কৃষক ধরনের জমিদার-বণিক, মহাজন ও সম্পন্ন শহরবাসীর কাছে কৃষি একেবারে অজ্ঞাত ছিল। তাই যথারীতি সে তার জমিতে কৃষি উৎপাদন তত্ত্বাবধান করা অথবা কৃষি পদ্ধতি উন্নতি করার কোনো উৎসাহ বোধ করত না।৪০ কৃষিতে তার কোনো আন্তরিক আগ্রহ ছিল না বলে সে ঋণগ্রস্ত কৃষকের কাছ থেকে এলোমেলোভাবে জমি কিনেছে বা দখল নিয়েছে। এক লপ্তে জমি নেয়নি। গ্রামাঞ্চলে জমির চাহিদা খুব বেশি ছিল বলে সে ঐ জমি মোটা খাজনায় প্রজাদের মধ্যে বিলি করে দিত।

নতুন ভূস্বামীদের সংগে যুক্ত হয়েছিল যেসব পুরোনো জমিদার শ্রেণী তারাও প্রগতিবিমুখ শ্রেণী হয়ে রইল। প্রজাদের কাছ থেকে চড়া খাজনা দাবি করা ও আদায় করা ছাড়া কৃষিতে তাদের আগ্রহ ছিল খুব কমই।

পুরোনো জমিদারদের প্রগতিবিমুখ প্রকৃতি শুধুমাত্র যে জাতীয়তাবাদীদের দ্বারাই সমালোচিত হয়েছিল তাই নয়, ব্রিটিশ ভাইসরয়, রাজনীতিবিদ ও প্রচারকদের দ্বারাও সমালোচিত হয়েছিল। শ্রেণী হিসাবে তাদের টিকে থাকার জন্য এরা তাদেরকে প্রজাদের করভার লাঘব করা, কৃষিতে ব্যক্তিগত স্বার্থ নেওয়া এবং উন্নততর কারিগরিগত এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কৃষির পুনর্গঠন করার জন্য উপদেশ দিত। এইসব উপদেশ দেওয়ার পেছনে উদ্দেশ্যে ছিল গোঁড়া, নিষ্ক্রিয়, আধা-সামন্ততান্ত্রিক জমিদার থেকে তাদেরকে সক্রিয়, উদ্যোগী, আধুনিক পুঁজিবাদী জমিদারে রূপান্তরিত করা। কিন্তু এইসব উপদেশ একেবারেই ফল-প্রসূ হয়নি।

ভারতীয় জমিদারেরা তাদের পশ্চিমের সহযোগীদের সমান পর্যায়ে কখনো উঠতে পারে নি। সে তার এলাকাতে কোনোরকম বৈজ্ঞানিক কৃষির সূচনা করে নি, ভারতীয় কৃষির প্রাচীন কারিগরি হাল বলদ উচ্ছেদ করে দিয়ে তার বদলে আধুনিক ট্রাক্টর এনে, এদেরকে পুরোনো কারিগরি বলে উৎখাত করে দিয়ে সে কৃষির যান্ত্রিকীকরণের পথিকৃৎ হতে পারে নি।

ভারতীয় জমিদারদের একমাত্র আগ্রহ ছিল প্রজাদের কাছ থেকে সর্বাধিক খাজনা শুষে নেওয়াতে। জমিদারদের এই বৈধ এমনকি অবৈধ জবরদস্ত আদায় থেকে প্রজাদেরকে রক্ষা করার জন্য কয়েকটা প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করতে হয়েছিল। কিন্তু এইসব প্রতিরক্ষার উপায় খুব একটা কার্যকরী হয় নি।

জমিদারী কৃষির আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে জমি ভাড়া খাটানোর বহুল প্রচলনের জন্য কৃষিকর্মে নিযুক্ত প্রজা ও জমিদারদের মধ্যে একদল অন্তর্বর্তী শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। রাধাকমল মুখার্জি পত্তনি প্রক্রিয়া বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন: "জমি পুরোপুরি বিক্রি করে দিয়ে জমিদারকে তার সম্পত্তি হাতছাড়া করতে হয় না। তার জমি স্বত্বকে অল্পমূল্যের ছোট ছোট জোতে বিভক্ত করে সে তার টাকা তুলতে পারত। এর পরেও তার মর্যাদা অপরিবর্তিত থাকে এবং তার বার্ষিক আয় এমন হয় যাতে সরকারী রাজস্ব দেওয়ার মতো যথেষ্টই বাড়তি থাকে, অপেক্ষাকৃত নিম্নতর জোত মালিকরাও সেই একই পন্থা অবলম্বন করে। এর পরিণতিটা হয় এই যে একের পর এক অন্তর্বর্তী শ্রেণী গড়ে ওঠে যাদের জমির উন্নতি করার কোনো আগ্রহ নেই। উত্তর ভারতের ভূস্বামীর তালুক আর ইতালী আর স্পেনের ল্যাটিফান্ডিয়া ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যযুক্ত। উভয়-ক্ষেত্রেই তালুকের আকার খুব বড় এবং খাজনা সংগ্রহ করা ছাড়া তালুকের ওপর ভূস্বামীর আর কোনো আগ্রহ থাকে না। ভূস্বামীরা এক বা একাধিক মধ্যস্বত্বভোগীর হাতে তালুক ইজারা বা পত্তনি দিয়ে দেয়। ইজারার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইজারাদাররা যতটা সম্ভব মুনাফা তুলে নেন…। বাংলার বহু ভূস্বামী…ঠিক ইতালী ও স্পেনের ভূস্বামীদের মতোই তালুকের বাইরে বাস করেন এবং খাজনা তোলা ছাড়া তালুকের সংগে তাঁদের আর কোনো সম্পর্ক থাকে না।"[৪১]

"কোনো কোনো জেলায় পত্তনি প্রথার বিস্তার দেখলে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়ঃ জমিদার ও প্রকৃত চাষীর মধ্যে ৫০ বা তারও বেশি মধ্যস্বত্বভোগীর সন্ধান পাওয়া যায়।"৪২

এইরকম হবার ফলে পর্যায়ক্রমবদ্ধ ব্যবস্থার সর্বনিম্নে অবস্থিত চাষীকেই এতগুলি অ-কৃষক করগ্রাহীর ভার বহন করতে হত। কৃষকরূপ সিন্ধবাদের পিঠের ওপর সমুদ্রের একমাত্র বৃদ্ধব্যক্তিই থাকত তা নয় ; এইরকম এক দঙ্গল বৃদ্ধ লোক তার ওপর চেপে বসে থাকত। এরা সকলে মিলে যে খাজনা তুলত তার সবটা ভার গিয়ে পড়ত চাষীর ওপর।

জমি ইজারা দেওয়া আবার ইজারা জমি দর-ইজারা দেওয়ার প্রথা রায়তওয়ারী অঞ্চলেও বেশ ভালভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে জমি প্রকৃত কৃষক মালিকানা থেকে অ-কৃষক মালিকের হাতে চলে যেতে থাকে। নতুন মালিক জমি ইজারা দিয়ে দিলে ইজারাদার আবার সেই জমি আর এক দফা ইজারা দিয়ে দেন। এইভাবে জমিতে পরপর মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থের উদ্ভব হল। সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে চাষী উপর্যুপরি এতগুলি অ-কৃষক করগ্রাহীকে পোষণের দায়িত্ব বহন করত।

এইভাবে জমি ইজারা দেওয়ার প্রথা যা পূর্বে কেবলমাত্র জমিদারী এলাকাতে সীমাবদ্ধ ছিল, তা অনুপস্থিত জমিদারশ্রেণীর বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রায়তওয়ারী এলাকাতেও দেখা গেল। এমনকি রায়তওয়ারী এলাকাতেও প্রজা ও উপ-প্রজার সংখ্যা খুব বেড়ে যাচ্ছিল,…বোম্বাই এবং মাদ্রাজ প্রদেশের প্রায় ৩০ ভাগ জমি প্রজারা চাষ করে না। পাঞ্জাবেও অবস্থাটা অনুরূপ। করগ্রহীতার সংখ্যা সম্প্রতিকালে ৬০ লক্ষ থেকে বেড়ে ১ কোটি হয়ে গিয়েছিল। উত্তরপ্রদেশে ১৮৯১ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে করগ্রহীতার সংখ্যা ৪৬ শতাংশ বেড়ে গিয়েছিল, ঐ একই সময়ে মধ্যপ্রদেশে করগ্রহীতার সংখ্যা ৫০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছিল।৪৩ জমি ইজারা দেওয়ার সমস্যা, জমি বিভাজন এবং খণ্ডীকরণের সমস্যা, কৃষিতে অতিরিক্ত চাপের সমস্যা, হ্রাসমান উৎপাদিকা শক্তির সমস্যা, কৃষি ঋণগ্রস্ততার অতিরিক্ত বৃদ্ধির সমস্যা এবং ভারতীয় কৃষকদের ভিক্ষাজীবী ও প্রোলেতারিয়েতে রূপান্তরিত হওয়ার সমস্যা—এসব সমস্যাই একটা জাতীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সমস্যাগুলি ছিল সার্বজনীন এবং এরা সবাই হল একই কারণের পরিণতি।

ভারতীয় কৃষির ঔপনিবেশিক চরিত্র

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অধিকার ও ব্রিটিশ শাসন যখন ভারতীয় কৃষি অর্থনীতিকে নতুন অগ্রগতির পথ খুঁজে নিতে বাধ্য করেছিল তখন এই অগ্রগতি ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক পরাধীন অবস্থার দরুন স্বাধীনভাবে এগোতে পারে নি। তাই কোনো সমৃদ্ধিশালী কৃষি অথবা কোনো সম্পন্ন কৃষক জনসাধারণও গড়ে তুলতে পারে নি।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশে কৃষিতে পুঁজিবাদী সম্পর্কের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি উৎপাদন উন্নততর পর্যায়ে পেঁছেছিল এবং কৃষক জনসাধারণও সমৃদ্ধির উন্নত স্তরে পেঁছেছিল। পদ্ধতিগতভাবে কৃষির ভিত্তি

ক্রমশ আরো বেশি যন্ত্রনির্ভর হয়ে পড়ে এবং তাতে করে কৃষি শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতাও বাড়িয়ে দেয়। আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন, ট্রাক্টর, শস্য মাড়ানো ও কাটার নতুন যন্ত্র প্রভৃতি ক্রমেই লাঙল ও অন্যান্য মধ্যযুগীয় কৃষি যন্ত্রপাতিকে সরিয়ে দিতে লাগল। কৃষিকাজের কাঠামোগত একক হিসাবে নিবিড় বিন্যস্ত জোতের সূচনা হল, কৃষি জনসাধারণের জাগতিক এবং সাংস্কৃতিক মানও উন্নত-তর হল।

এটা সত্যি যে এমনকি স্বাধীন পুঁজিবাদী দেশগুলোতেও বর্তমান সময়ে প্রায়শই যে অর্থনৈতিক সংকট ও দুর্দশা ঘটেছে তার দরুন সাধারণ পুঁজিবাদী অর্থনীতির অবনতিতে কৃষি এবং কৃষক সাধারণ উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তবুও এই সংকটের প্রভাব কৃষি অর্থনীতি এবং জনসাধারণের ওপর ততটা ধ্বংসাত্মক ছিল না যতটা ধ্বংসাত্মক ছিল ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক কৃষি ও কৃষি জনসাধারণের ওপর।

এই দেশগুলোতে যা ঘটেছিল ভারতবর্ষে ঠিক তার বিপরীতটাই হয়। জমি-সম্পর্কের সূচনা এখানে আধুনিক পুঁজিবাদী শিল্পের কোনো সমকালীন ও সমান্তরাল অগ্রগতি আনে নি। ব্রিটিশ শিল্পের যন্ত্রে তৈরি জিনিসের অনু-প্রবেশের ফলে ভারতীয় হস্তশিল্পীর দল ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। এইসব হস্তশিল্পীরা কোনো ব্যাপকভাবে গড়ে ওঠা দেশীয় শিল্পে নিযুক্ত হতে পারে নি। এই ধ্বংস-প্রাপ্ত হস্তশিল্পীদের অনেকেই কৃষিকে তাদের জীবিকার্জনের উপায় বলে গণ্য করল। এতে কৃষিতে অতি চাপ বৃদ্ধি হল এবং তা ভারতবর্ষে অন্যতম সমৃদ্ধি-শালী কৃষি গড়ে ওঠার অন্তরায় সৃষ্টি করে দিল। জমিতে এই অতি চাপ বৃদ্ধি মূলতঃ ধ্বংসাত্মক জমি বিভাগ ও খণ্ডীকরণ সৃষ্টি করেছিল, অলাভজনক জোতের সৃষ্টি করেছিল, কৃষির মান নামিয়ে দিয়েছিল ও কৃষি এবং কৃষকদের দারিদ্র্য বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করেছিল। এমনকি ১৮৫০ সালের পর যখন দেশীয় শিল্প গড়ে উঠতে শুরু করেছিল তখনো তা ভারতবর্ষে হস্তশিল্প যে হারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল সেই হারে বাড়ে নি।

জমিতে অতি চাপ বৃদ্ধির ফলস্বরূপ জমি বিভাগ এবং খণ্ডীকরণ কৃষি জনসাধারণের অধিকাংশের আয়ের দ্রুত অবনতি ঘটিয়েছিল। অনবরত কৃষি বিপর্যয়, বিশ্ব বাজারের উত্থানপতন এবং উৎপাদন বিক্রির জন্য নির্ভর করতে হত যে ব্যবসায়ী দালালদের ওপর তাদের শোষণ কৃষকদের আয় আরও কমিয়ে দিচ্ছিল। সেই দালালেরা তাদের অর্থনৈতিক অসহায়তা ও অজ্ঞতার পুরোপুরি সুযোগ নিত। দ্রুত বর্ধমান হারে তারা দরিদ্র হয়ে যাচ্ছিল।

অত্যধিক বেশি ভূমিরাজস্ব দিতে না পেরে ও প্রাথমিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যেগুলো তারা কিনতে বাধ্য হত সেগুলোতে সরকার অতিরিক্ত হারে কর ধার্য করাতে কৃষক জনসাধারণ আরো বেশি করে মহাজন অথবা সমবায়ের কাছে ধার করতে লাগল। মহাজনেরা কৃষকদের কাছ থেকে চড়া হারে সুদ নিত এবং কৃষকেরা সময়কালে ধার এমনকি সুদটা পর্যন্ত দিতে না পেরে অবিরতই ধার করত। কৃষি জনসাধারণের ঋণগ্রস্ততা আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। এতে তাদের দারিদ্র্য আরো বেশি বেড়ে গিয়েছিল।

দারিদ্র্যের এই প্রক্রিয়া যা কৃষি জনসাধারণের অধিকাংশকে বেশি করে জড়িয়ে ফেলেছিল তা কৃষিকেও ভয়ানকভাবে প্রভাবিত করেছিল। দরিদ্র কৃষক নতুন

পশু কিনতে পারত না এবং উপযুক্তভাবে জমিতে সার দিতে পারত না। অপুষ্টির দরুন সে এবং তার পরিবার শারীরিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল এবং একইভাবে মাঠে শ্রমিকদের কাজ করবার ক্ষমতাও হারিয়ে গিয়েছিল। তাই কৃষি স্থিতিশীল হয়ে গেল প্রকৃতপক্ষে ধ্বংসই হয়ে গেল, একর প্রতি উৎপাদনও দ্রুত কমে গেল।

উত্তরোত্তর দারিদ্র্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং তার ফলস্বরূপ কৃষকদের ক্রম-বর্ধমান সংখ্যার ঋণগ্রস্ততার দরুন জমি অতি দ্রুত ধনী জমিদার, বণিক এবং মহাজনের করতলগত হল। এর ফলে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে সৃষ্ট জমিদার-শ্রেণী ছাড়াও নতুন এক ধরনের জমিদারশ্রেণী সৃষ্ট হল। এই নতুন অনুপস্থিত জমিদারশ্রেণীর জমির প্রতি কোনো স্বার্থ ছিল না, তারা কৃষিতে কারিগরিগত কোনো উন্নতির সূচনা করে নি। অন্যদিকে আবার কৃষকদের উদগ্র জমির ক্ষুধার সুযোগ নিয়ে তারা কৃষকদের জমি ভাড়া দিত এবং তারা আবার প্রায়ই সেই জমি ভাগে দিত। এইভাবে কৃষি জনসাধারণের মধ্যে একটা শ্রেণীকাঠামো গড়ে উঠেছিল। যে কোরফা নিজে হাতে চাষ করে সে পুরো প্রক্রিয়ার সর্বনিম্নে অবস্থান করে। এই কারণে উপরবর্তী অ-কৃষক ভূস্বামী, প্রজা এবং কোরফাদের পুরো চাপটি তার ওপর এসে পড়ে। এইভাবে ইজারা পত্তনি দেওয়ার ফলে ভূমি খণ্ডীকরণের সমস্যা আরো তীব্র হয়ে ওঠে এবং ভূমি বিভাজন বেড়েই চলে। ফলে জোত ক্রমশ অলাভজনক হয়ে ওঠে।

স্বত্ববান প্রজার হাত থেকে অ-কৃষক ভূস্বামীশ্রেণীর হাতে জমি চলে যাওয়ার ফলে কৃষি এলাকাতে একটা ক্রমবর্ধমান বিপরীতমুখী প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল। এই কৃষি জনসাধারণের এক প্রান্তে অ-কৃষক ভূস্বামীশ্রেণী দ্রুত বেড়ে যাচ্ছিল আর অন্য প্রান্তে ছিল দ্রুত স্ফীতমান কৃষি প্রোলেতারিয়েত, সেই সঙ্গে দরিদ্রতম প্রজা এবং যাদেরকে ক্ষেতমজুর থেকে প্রায় পার্থক্য করা যায় না।

এইভাবে ভূমিহীন কৃষকশ্রেণী এবং অ-কৃষি ভাড়াখাটানো জমিদারশ্রেণী ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছিল। কৃষক সমাজের এক প্রান্তে ভূসম্পত্তির কেন্দ্রীভবন হতে লাগল, অন্যপ্রান্তে জমিচ্যুতি ও দারিদ্র্য বেড়ে গেল। ১৯১৪ সালের পর থেকে এর প্রবণতা ভয়ানক বেড়ে যেতে লাগল। রাধাকমল মুখার্জি বলেছেন, "যতদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষের গ্রামীণ অর্থনীতিতে জমি নিষ্পত্তিকরণ, কৃষি সহযোগিতা এবং বৈজ্ঞানিক চাষের মাধ্যমে কোনো আমূল পরিবর্তন না হয় ততদিন ভূমিহীন কৃষকের সমস্যা আরো বেশি তীব্র হবে এবং এই শ্রেণীর পক্ষে শহরে শিল্প শ্রমিকদের সঙ্গে মিলিত হবার প্রবণতা দেখা যাবে। এটা সামাজিক অভ্যুত্থানের লক্ষণ সূচিত করবে।"[৪৪]

তাই ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক অবস্থার মধ্যে কৃষিতে নতুন জমি সম্পর্কের সূচনা কৃষির কোনো আধুনিকীকরণ ও যান্ত্রিকীকরণ ঘটায় নি এমনকি কোনো সময়ের জন্যও কৃষি জনসাধারণের সমৃদ্ধি আনে নি। জমি গ্রামীণ মালিকানার পরিবর্তে ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিণত হয়ে কৃষিতে সামাজিক সম্পর্কের পরি-বর্তন এনেছিল। কিন্তু কৃষির কারিগরি ভিত্তি একই ছিল।

আদিম লাঙল ও অলাভজনক জোত নিয়ে কৃষিকাজ করা ঔপনিবেশিক ভারতীয় কৃষককে ভারতবর্ষ এবং বিশ্বের বাজারের শক্তিশালী পুঁজিবাদী কৃষকের

সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হত অথবা ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইউ এস এ, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশগুলো যারা আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে বিরাট এলাকাতে অথবা বিস্তৃত খামারে চাষ করত সেইসব দেশের সমৃদ্ধিশালী পুঁজিবাদী কৃষকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হত। এর ফলে যদি কখনো কৃষি বিপর্যয়ের ঝঞ্ঝা দেখা যেত, তখন ঔপনিবেশিক ভারতীয় কৃষক এই বিধ্বংসী শক্তি সহ্য করতে পারত না, সে আরো বেশি দারিদ্র্য এবং তার ফলস্বরূপ ঋণগ্রস্ততায় নিমজ্জিত হত।

যেহেতু ভারতীয় জনসাধারণ রাজনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন ছিল না তাই তারা এমন কোনো স্বাধীন অর্থনৈতিক নীতি রূপায়ণ বা কার্যকর করতে পারত না যা ভারতীয় অর্থনীতি, তার শিল্পবাণিজ্য এবং কৃষির অবাধ অগ্রগতিতে সাহায্য করতে পারে। ব্রিটিশ পুঁজিবাদীর অর্থনৈতিক প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই ভারতীয় কৃষির অগ্রগতি হয়েছিল। ব্রিটিশ পুঁজিবাদীর প্রয়োজনে ভারতবর্ষকে প্রধানতঃ ব্রিটিশ শিল্পের জন্য কাঁচামাল উৎপাদন করার উপনিবেশ রূপে তৈরি করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থা ভারতীয় জনসাধারণের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য ভারতীয় কৃষির স্বাধীন অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করত। ভারতীয় কৃষির বিকাশ তাই রয়ে গিয়েছিল বিকৃত—'ভারসাম্যহীন।'

এসব সত্ত্বেও এটা স্বীকার করতে হবে যে গ্রামীণ কৃষি উৎপাদনকে ভারতবর্ষ এবং বিশ্বের বাজারের আওতায় এনে কৃষিকে ভারতীয় অর্থনীতির একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ করে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন ভারতীয় কৃষিকে জাতীয় কৃষির স্তরে উন্নীত করেছিল। এটা ব্রিটিশ অধিকারের একটা প্রগতিশীল দিক।

ভারতীয় কৃষি যেহেতু জাতীয় চরিত্র ধারণ করল, এর সমস্যাগুলোও জাতীয় গুরুত্ব পেতে লাগল। আগে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের যুগে কৃষি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতির একটা অংশ। এর সঙ্গে জড়িত সমস্যাগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতির সমস্যা ছিল এবং তা শুধুমাত্র গ্রামীণ জনসাধারণকেই প্রভাবিত করত। বাইরের জনসাধারণকে তা প্রভাবিত করত না। এটা সত্যি যে রাষ্ট্র ভূমিরাজস্বের ব্যাপারে গ্রামীণ কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিল কিন্তু সমগ্র জনসাধারণের কথা চিন্তা করলে তারা একটা বিশেষ গ্রামের কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিল না। প্রত্যেক গ্রামের জনসাধারণ প্রধানতঃ সেই গ্রামের নিজস্ব কৃষি উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল ছিল, অন্য গ্রামের উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল ছিল না। প্রতিটি শহরের অন্তর্ভুক্ত কতকগুলো গ্রাম ছিল যারা তাদের কৃষি প্রয়োজন মেটাত। সুতরাং প্রত্যেক গ্রামের কৃষিসম্পর্কিত কতকগুলো সাধারণ সমস্যা ছিল।

ভারতীয় কৃষি জাতীয় কৃষির স্তরে উন্নীত হওয়াতে ভারতীয় কৃষির সমস্যা জাতীয় প্রকৃতি ধারণ করল। কোনো একটা বিশেষ গ্রামের অথবা জেলার কৃষির অবস্থা বাকি সমস্ত দেশকেও প্রভাবিত করত। কেননা কোনো বিশেষ কেন্দ্রের কৃষি শুধুমাত্র সেই বিশেষ কেন্দ্রের জন্য উৎপাদন করত না, সমগ্র দেশ এমনকি সমগ্র বিশ্বের জন্য উৎপাদন করত। তাই কৃষি উৎপাদন হ্রাস, পশুসংখ্যার অবনতি, কৃষকদের দারিদ্র্য ও ঋণগ্রস্ততা, জমি বিভাজন ও খণ্ডীকরণ—প্রভৃতি সব সমস্যাই জাতীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। অনুপস্থিত জমিদার, অত্যধিক

ভূমিরাজস্ব, ভারতবর্ষে যথেষ্ট শিল্পায়নের অভাব ইত্যাদির দরুন যেসব সাধারণ সমস্যাগুলো সৃষ্টি হত সেগুলো শুধুমাত্র ভারতের কৃষি জনসাধারণই যে উপলব্ধি করত তাই নয় ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্পের সঙ্গে জড়িত যেসব শ্রেণী তারাও এই সমস্যাগুলো নিজেদের সমস্যা বলে মনে করত। কৃষি এবং কৃষকের অবস্থা শিল্প এবং অকৃষিশ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থাও প্রভাবিত করত। তাই কৃষি ও কৃষকের অবস্থা, সবকিছুই জাতীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়াল।

যেহেতু ভারতীয় কৃষির সমস্যাগুলো জাতীয় সমস্যা হয়ে উঠেছিল এবং যেহেতু উভয় সমস্যাই একই কারণে উদ্ভূত, তাই এই সমস্যাগুলো জাতীয় স্তরে জনগণ ও তার নানান অংশকে একত্রিত করার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করছিল। প্রতিটি দল একটা বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করত এবং সেই দলের স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় কৃষিকে পুনর্গঠন করার জন্য তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা ও নীতি ছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব এমনকি কৃষি জনসাধারণের বিভিন্ন গোষ্ঠী যেমন জমিদার, স্বত্ববান কৃষক, প্রজাকৃষক ও খেতমজুর ইত্যাদির মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, বিভিন্ন শ্রেণীর স্বতন্ত্র পরিকল্পনা ও নীতিগুলিকে পরস্পরবিরুদ্ধ করে তুলেছিল। কিন্তু সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এই যে এইসব বিভিন্ন এমনকি প্রায়ই প্রতিপক্ষ পরিকল্পনা ও নীতিগুলো ভারতের জাতীয় অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ, জাতীয় কৃষির সমস্যার চারধারেই ঘুরপাক খেত।

কৃষির পুনর্গঠন ঃ পূর্বশর্তসমূহ

সমৃদ্ধির ভিত্তিতে ভারতীয় কৃষির পুনরুজ্জীবন ও পুনর্গঠন এবং কৃষি জনসাধারণের জাগতিক মানের উন্নতি ঐসব অসংখ্য কর্মসূচী ও নীতির সাধারণ উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে।

যেহেতু গ্রেট ব্রিটেনই ভারতবর্ষে নতুন কৃষিব্যবস্থা তৈরি করেছিল এবং ভারতীয় কৃষিকে প্রভাবিত করে এমন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতিও নির্ধারণ করেছিল, তাই ভারতীয় কৃষির পুনর্গঠন ও পুনরুজ্জীবনের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর সব আন্দোলন ব্রিটিশ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ছকা হত। ব্রিটিশ সরকার যেহেতু জাতীয় সরকার নয়, বিদেশীয় সরকার, এই সব আন্দোলনগুলো তাই জাতীয় চেহারা নিয়েছিল। যেহেতু জনসাধারণের বিভিন্ন গোষ্ঠী যারা ভারতীয় কৃষিতে সংস্কার কিংবা আমূল পরিবর্তন করার জন্য ব্রিটিশ শাসনের ওপর চাপ দিত তারা একটা বিদেশী সরকারকে চাপ দেবার জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হত। এইভাবে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অধিকার ও শাসনে তৈরি জাতীয় কৃষি ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে কৃষিতে অভিন্ন বস্তুগত স্বার্থ এনেছিল। এইভাবে এ একটা সমৃদ্ধিশালী জাতীয় কৃষি গড়ে তোলার জন্য জনগণের মধ্যে জাতীয় চেতনা বিকাশের পথ করে দিল।

ভারতীয় কৃষির পুনর্গঠন ও আরও অগ্রগতির সমস্যা এবং কৃষি জনসাধারণের একটা সমৃদ্ধিশালী সমাজে রূপান্তর—একটা অতি বিশাল ঘটনা। এর সমাধানের জন্য প্রয়োজন একটা সংহত পরিকল্পনার যা পরিকল্পিত জাতীয় অর্থনীতির একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে। কেননা ভারতীয় অর্থনীতির

কোনো একটা বিশেষ ক্ষেত্র সমগ্র অর্থনীতির অগ্রগতি ছাড়া অগ্রসর হতে পারে না। "কৃষি উৎপাদনের পরিকল্পনাকে শিল্প উৎপাদনের পরিকল্পনার সঙ্গে সহসম্পর্কযুক্ত হতে হবে এবং এই উভয় পরিকল্পনাই সফল হতে পারে একমাত্র তখনই যখন এরা একটা পরিকল্পিত মুদ্রা ও ঋণ সরবরাহ সংস্থার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে।"৪৫

যেহেতু বর্তমান ভূমিসম্পর্ক ও অত্যধিক ঋণগ্রস্ততা কৃষি জনসাধারণের দারিদ্র্য ও তার ফলস্বরূপ কৃষির অবনতির মুখ্য কারণগুলোর মধ্যে দুটো, তাই পরিকল্পিত জাতীয় কৃষি কর্মসূচীতে বিদ্যমান ভূমিসম্পর্কের আমূল পরিবর্তন এবং ঋণ বাতিলের মতন জরুরী বিষয়গুলো একত্রিত করার দরকার হয়ে পড়ে। জমিদার, মহাজন ও জমিতে স্বার্থ আছে এমন ভারতীয় বুর্জোয়াদের মত কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের প্রবলতম প্রতিরোধ জয় করেই একমাত্র এইরকম পরিকল্পনা করা যেতে পারে। তাই খাপছাড়া বা আংশিক কোনো ব্যবস্থা যা নেওয়া হয়েছিল তা সত্যিসত্যিই কোনো উল্লেখযোগ্য ফল আনেনি বা আনতে পারে না। "কৃষিজীবী শ্রেণীগুলির ঋণ গভীরভাবে শিকড়গাড়া রোগের একটা লক্ষণ ছাড়া কিছু নয়।··· ঋণ সীমিত করার অথবা মহাজনদের ক্রিয়াকর্ম নিয়ন্ত্রিত করার আইন রোগ প্রতিরোধ করবে না।"৪৬

উপরন্তু "যতক্ষণ না পর্যন্ত সর্বপ্রকার ঋণ বাতিল হবার ফলে ঋণমুক্ত রায়ত নতুন করে শুরু করতে পারছে এবং তাদের দারিদ্র্য সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য বহুমুখী প্রচেষ্টা একত্রে শুরু করে কৃষিকার্য বিষয়ে নিরাপত্তা না পাচ্ছে ততক্ষণ ভারতের কৃষিজীবনে সমৃদ্ধির আশা করা যায় না।"৪৭

এই লেখকই বলেছেন, "যদি দ্বিধাগ্রস্তভাবে গৌণ সংস্কারের পরিবর্তে সংবদ্ধ ও সমবায়ভিত্তিক বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ভূমি পুনর্গঠনের কথা চিন্তা করা যায় তাহলে তার বৈপ্লবিক তাৎপর্য থাকবে এবং এ থেকে শুরু করে পত্তনিদার ও অনুপস্থিত ভূস্বামী পর্যন্ত সর্বপ্রকার কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রাম আরম্ভ করা যাবে। দুই ধরনের অবস্থা হতে পারে, এর মধ্যে আমাদের একটা বেছে নিতে হবে। আমাদের সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থা পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে আমূল পরিবর্তনমুখী কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। অথবা এখন যেমন চলছে তেমনি চলবে অর্থাৎ দ্বিধাগ্রস্তভাবে কিছু বিক্ষিপ্ত সংস্কারের প্রচেষ্টা সহ পরিকল্পনাবিহীন গতানুগতিক অবস্থা। এর ফলে কৃষি পরিস্থিতিতে গভীর সঙ্কট দেখা দিতে পারে এবং তা থেকে হিংসাত্মক বিপ্লব আসতে পারে।"৪৮

সাধারণ অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং ভারতীয় জনসাধারণের প্রয়োজনের দৃষ্টিভঙ্গীতে কৃষির অবাধ অগ্রগতিকে উদ্দেশ্য করে কৃষির পুনর্গঠনের একটা জাতীয় পরিকল্পনার জন্য অপরিহার্য পূর্বশর্ত হিসেবেই দরকার জনসাধারণের হাতে স্বাধীন রাজনৈতিক ক্ষমতা। তাই একটা পরিকল্পিত এবং সমৃদ্ধিশালী জাতীয় কৃষির পরিকল্পনার সফলতা একটা প্রকৃত জাতীয় সরকারের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে। এই জাতীয় সরকার ভারতীয় জনসাধারণের ইচ্ছা, স্বার্থ ও প্রয়োজনকে রূপায়িত করবে, কোনো কায়েমী স্বার্থের নয়—সে দেশীই হোক আর বিদেশীই হোক।

এটা স্বীকার করতেই হবে যে সমগ্র কৃষি অর্থনীতির পুনর্গঠনের মত বিশাল কাজ, এবং যে কাজে বিরাট ভারতবর্ষ উপমহাদেশে পাওয়া যায় এমন সমস্ত প্রাকৃতিক, কারিগরি এবং মানবসম্পদের পরিকল্পিত সংগ্রহ ও ব্যবহার দরকার তা কোনো ব্যক্তিগত উদ্যোগে, পুঁজিপতি অথবা একক, সাধিত হতে পারে না। শুধুমাত্র রাষ্ট্রই এটা করতে পারত। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে লাভের উদ্দেশ্য ও প্রতিযোগিতা দূর করতে হবে পরিকল্পনাতে এটাও নিহিত থাকা উচিত। পরিকল্পনাতে কৃষি উৎপাদনকে সমবায়ের নীতি এবং ভারতীয় জনসাধারণের প্রয়োজন এবং সমগ্র ভারতীয় অর্থনীতির সাধারণ অগ্রগতির প্রয়োজন-ভিত্তিক করে তুলতে হবে। "যে ধরনের কৃষি সংগঠনের কথা আমরা ভাবছি তার ভিত্তি হল আমাদের জনগণের সাধারণ স্বার্থে উৎপাদনের সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও কৃষি উৎপাদনকে একটা জনসেবার বিষয়ে পরিণত করা।"৪৯

এটা স্পষ্ট যে শুধুমাত্র ভারতীয় জনসাধারণের (এবং ভারতীয় বা বিদেশী কায়েমী স্বার্থের নয়) একটা প্রকৃত জাতীয় সরকার এইরকম একটা পরিকল্পনাকে সফল রূপ দিতে পারে।

তাই ভারতীয় কৃষির পুনরুজ্জীবন ও আরও অগ্রগতি শুধুমাত্র একটা 'কারিগরি অর্থনৈতিক' সমস্যা নয়, মূলতঃ এটা একটা সামাজিক-অর্থনৈতিক ও 'রাজনৈতিক' সমস্যা। এই সমস্যা ভারতীয় শিল্পের দ্রুত, অবাধ এবং সর্বব্যাপী উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত। এই শিল্প শুধুমাত্র যে দেশে বাড়তি লোককে কাজে নিযুক্ত করতে পারত তা-ই নয়, ভারতীয় কৃষির আধুনিকীকরণ এবং যান্ত্রিকীকরণের জন্য কৃষি যন্ত্রপাতিও সরবরাহ করতে পারত। বিদ্যমান ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তনের সমস্যার সঙ্গেও এই বিষয়টি জড়িত। এই বিষয়টি রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্নটিও তুলে ধরেছিল—ভারতীয় জনগণের স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান প্রশ্ন, যেখানে ক্ষমতা থাকবে জনগণের খেটেখাওয়া, শোষিত অংশের হাতে, কায়েমী স্বার্থের হাতে নয়।

তাই ঐতিহাসিকভাবে একটা উন্নত স্তরে ভারতীয় সমাজের স্বাধীনতা ও সামাজিক-আর্থনীতিক পুনর্গঠনের সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে কৃষি পুনর্গঠনের সমস্যার একটা প্রগতিশীল জাতীয় চরিত্র ছিল।

সূত্র নির্দেশ

১ Shelvankar, পৃ. ১০৬-৭ দ্রষ্টব্য।
২ Wadia এবং Merchant, পৃ. ১৬৭ দ্রষ্টব্য।
৩ উপরিউক্ত, পৃ. ৮৫।
৪ উপরিউক্ত, পৃ. ৮৭।
৫ Ahmad কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ১।
৬ Ahmad, পৃ. ১।
৭ উপরিউক্ত, পৃ. ৩।
৮ Congress Agrarian Inquiry Committee Report, পৃ. ২৮।

৯ Radhakamal Mookerjee, Mann, Brijnarayan, Ranga দ্রষ্টব্য।
১০ Radhakamal Mookerjee, পৃ. ১৯৬।
১১ R. P. Dutt, পৃ. ১৮৪।
১২ Ahmad, পৃ. ২-৩।
১৩ Visresvaraya, Ahmad কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ৮।
১৪ Report of the Commission of 1892 দ্রষ্টব্য।
১৫ R. P. Dutt কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ২২৮।
১৬ R. P. Dutt, পৃ.২২৭।
১৭ R. P. Dutt, পৃ. ২০৫ দ্রষ্টব্য।
১৮ Radhakamal Mookerjee, পৃ. ২০৬।
১৯ উপরিউক্ত, পৃ. ৩৪৫।
২০ Report of The Indian Statutory Commission, 1930, Vol.I.
২১ Sitaramayya, পৃ. ৬২।
২২ The Famine Commission Report, 1880.
২৩ Sir Edward Maclagan, M. L. Darling দ্রষ্টব্য। The Central Banking Enquiry Committee, P. J. Thomas, Agricultural Credit Department প্রভৃতি।
২৪ Wadia এবং Merchant, পৃ. ১৮৫ দ্রষ্টব্য।
২৫ Ahmad, পৃ. ২৬-৭।
২৬ উপরিউক্ত, পৃ. ২৭।
২৭ উপরিউক্ত, পৃ ২৭।
২৮ Reports of the Provincial Banking Enquiry Committee দ্রষ্টব্য।
২৯ R. P. Dutt কর্তৃক উদ্ধৃত পৃ. ২৩৫।
৩০ Royal Commission on Agriculture পৃ. ৪৩৩-৪।
৩১ The Deccan Riots Commission, Bengal Provincial Committee Report, Report of the Committee on Co-operation in Madras.
৩২ R. P. Dutt, পৃ. ২১৬ দ্রষ্টব্য।
৩৩ Wadia এবং Merchant থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ২৪৯।
৩৪ উপরিউক্ত, পৃ. ২৪৯।
৩৫ Sarkar, *Indian Journal of Economics*, July 1939, পৃ. ৯৪-৬ দ্রষ্টব্য।
৩৬ Dinkar Desai, "Agrarian Serfdom in India", *Indian Sociologist*, July, 1942.
৩৭ J. M. Mehta, পৃ. ১২৫।
৩৮ Royal Commission on Labour, R. P. Dutt এবং Shiva Rao দ্রষ্টব্য।
৩৯ Report of the Madras Banking Inquiry Committe, 1930.

৪০ Floud Commission Report, পৃ. ৩৭ দ্রষ্টব্য।
৪১ Radhakamal Mookerjee, পৃ. ৯০।
৪২ Simon Commission Report, Vol. I, পৃ. ৩৪০।
৪৩ Wadia এবং Merchant, পৃ. ২৩৯।
৪৪ Congress Agrarian Inquiry Committee Report, পৃ. ২৩ থেকে উদ্ধৃত।
৪৫ Wadia এবং Merchant, পৃ. ২৭১।
৪৬ উপরিউক্ত, পৃ. ১৯৫।
৪৭ উপরিউক্ত, পৃ. ১৯৫-৬।
৪৮ উপরিউক্ত, পৃ. ১৮২।
৪৯ উপরিউক্ত, পৃ. ২৭০।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শহরাঞ্চলে হস্তশিল্পের অবক্ষয়

শহরাঞ্চলের হস্তশিল্পে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব

শহরাঞ্চলের হস্তশিল্পে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব ডি. আর গ্যাডগিল অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছেন ঃ "সম্ভবতঃ প্রাচীন হস্তশিল্পের বিনাশই হল এই অর্থনৈতিক পালাবদলের একমাত্র নাটকীয় ঘটনা। এর ধ্বংস বাস্তবিকই ছিল আকস্মিক ও সম্পূর্ণ।"১ তিনি আরো বলেছেন, "এই পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার অসংখ্য কারণ ছিল। কিন্তু এদের মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য হল (ক) দেশীয় ভারতীয় রাজসভার অবলুপ্তি (খ) একটা বিদেশী শাসনের প্রতিষ্ঠা ও সেই সঙ্গে অনেক বিদেশী প্রভাবের অনুপ্রবেশ যা এই ধরনের সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে, (গ) আরও বেশি উন্নত ধরনের শিল্পের প্রতিযোগিতা।"২

আমরা এখন সবিস্তারে ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় শহরাঞ্চলের হস্তশিল্পের 'আকস্মিক ও সম্পূর্ণ' ধ্বংস পর্যালোচনা করব।

শহরাঞ্চলের হস্তশিল্পের পৃষ্ঠপোষক রাজ্যগুলির অবলুপ্তি

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষ জয় করার ফলে দেশীয় রাজন্যবর্গের দ্রুত অন্তর্ধান ঘটতে লাগল। রাজ্যের পর রাজ্য লোপ পেতে লাগল এবং তার জায়গা অধিকার করে নিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নতুন নিয়ম ও শাসনব্যবস্থা। এমনকি যেসব অঞ্চল থেকে দেশীয় রাজন্যবর্গ বিতাড়িত হননি সেই সব অঞ্চলও ব্রিটিশের পরোক্ষ রাজনৈতিক শাসনের অধীন হল। দেশীয় রাজ্যগুলোর অবলোপ ও পতনের ফলে ভারতবর্ষের শহরাঞ্চলের হস্তশিল্পের ওপর একটা প্রত্যক্ষ ও তাৎক্ষণিক প্রভাব পড়েছিল। দেখা যায় যে এই রাজ্যগুলোই ছিল পৌর হস্তশিল্পের প্রধানতম ক্রেতা। আবার তারা অনেক ক্ষেত্রে বড় বড় কলকারখানা রক্ষণাবেক্ষণ করত এবং তাতে সুদক্ষ কারিগর নিযুক্ত করত। সুতরাং দেশীয় রাজ্যগুলোর অন্তর্ধান ও পতন "এই সব পণ্যের চাহিদা দ্রুত সংকুচিত করে দিয়ে ভারতীয় হস্তশিল্পে প্রথম আঘাত হেনেছিল। এর আশু প্রভাবে সেইসব সর্বোৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপাদন একদম বন্ধ হয়ে গেল যেগুলি কেবল রাজা মহারাজা ও অত্যন্ত অভিজাত ব্যক্তিদের বড় বড় জাঁকজমকপূর্ণ রাজকীয় অনুষ্ঠানে প্রয়োজন হত। দেশীয় রাজসভাগুলো অন্তর্হিত হয়ে যাওয়ার পরও

কিছুকাল পর্যন্ত সাধারণ মানুষের চাহিদা থেকে গিয়েছিল বটে তবে তার অপরিবর্তনীয় প্রবণতা ছিল দ্রুত কমে যাওয়ার।”৩

রাজ্যগুলির অবলুপ্তিতে রাজ্যের প্রয়োজনীয় সামরিক ও অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহকারী শিল্পগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। যেমন, তরবারি, বর্শা, ছোরা, ঢাল ইত্যাদি সামরিক অস্ত্র এবং লোহা ও ইস্পাতে তৈরি অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র উৎপাদন ও আনুষঙ্গিক মিনা করা বা কারুকার্য করার মতন সুষমাময় কারিগরি শিল্প প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতবর্ষে উন্নতির উঁচু পর্যায়ে উঠেছিল। রাজ্যগুলির অবলুপ্তিতে এইসব শিল্পের উপর বিধ্বংসী প্রতিক্রিয়া হয়।

শহরাঞ্চলীয় হস্তশিল্পের ওপর ব্রিটিশ শাসনের সর্বনাশা প্রভাব

আমরা এখন ভারতবর্ষে বিদেশী শাসন প্রবর্তনের পরিণতি ও সেই সঙ্গে ভারতবর্ষে যন্ত্রশিল্পে বিদেশী প্রভাব পর্যালোচনা করব।

১৬০০ থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছিল মূলতঃ একটা বাণিজ্য সংস্থা। ভারতবর্ষে এই সংস্থা ভারতীয় রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও তাদের অনুমতি নিয়ে এবং কখনো কখনো বা তাদেরকে অগ্রাহ্য করেও বাণিজ্য চালাত। সে যাহোক, এটা ছিল মূলতঃ একটা বাণিজ্য কোম্পানি যা বিদেশ থেকে দ্রব্য অথবা বুলিয়ন আমদানি করত এবং ভারতবর্ষের মসলা, সুতীবস্ত্র ও অন্যান্য বিলাসদ্রব্যাদির সঙ্গে বিনিময় করত। এই সময় ভারতবর্ষে শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি খুব বেড়ে গিয়েছিল।

“সিল্ক ও সুতীবস্ত্র রপ্তানি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে তার শীর্ষস্থানে পেঁছয়। কোম্পানির পক্ষে এটা ছিল অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা এবং ১৬৭২ সালে কোম্পানি বিপুল পরিমাণ ইংরাজী নিদর্শন সহ বেশ কিছু সুতলী পাকানো, বোনা ও রঙ করাতে কুশলী কারিগরদের ভারতবর্ষে পাঠায় ভারতীয় তাঁতীদের ইংরাজ ও ইউরোপীয় বাজারের উপযোগী দ্রব্য উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি শেখানোর জন্য।”৪

এইভাবে ভারতবর্ষের রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল যখন ইণ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি একটা বাণিজ্য সংস্থা ছিল এবং ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশে ভারতীয় পণ্যের খোলা বাজারের জন্য সংগ্রাম করছিল। এই সময়ে ব্রিটিশ সরকার ইংলণ্ডে ভারতীয় দ্রব্যের অবাধ সরবরাহে উদ্বিগ্ন হয়ে এমন আইন পাশ করতে বাধ্য হয় যাতে ইংলণ্ডে ভারতীয় দ্রব্যের বিক্রি দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।৫

পলাশীর যুদ্ধ জয়ের ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এর ফলে কোম্পানির হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতিয়ার এসে গেল। ব্যবসা চালানোর অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে, কারিগর ও উৎপাদকদের নিজ শর্তাবলী নির্দেশ দিতে, অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে পণ্য যোগাড় করতে, কারিগরদের একচেটিয়া করাতে, ভারতবর্ষের জনসাধারণকে আমদানি করা জিনিস কিনতে বাধ্য করাতে এবং নিজ একচেটিয়া অবস্থা রক্ষা করাতে রাজনৈতিক উপায়ে বিদেশী এবং দেশী প্রতিদ্বন্দ্বীদের উৎখাত করতে সে এই ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারত।

১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে আরো বেশি অঞ্চলে তার নিয়ন্ত্রণ বিস্তৃত করে, কিছুসংখ্যক রাজ্যের বিলোপ-সাধন করে ভারতবর্ষ থেকে অঢেল সম্পদ চালান দেয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সমালোচকরা একে লুণ্ঠন বলে আখ্যা দিলেও ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব সম্পাদন করার পক্ষে এ হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রাথমিক পুঁজি। Brooks Adams তাঁর **Law of Civilization and Decay** শীর্ষক গ্রন্থে যথার্থ ব্যাখ্যা করেছেন:

"১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধের পর যে পরিবর্তন এসেছিল তার দ্রুততার সংগে সম্ভবতঃ আর কিছুরই তুলনা করা যেতে পারে না। ১৭৬০ সালে উড়ন্ত মাকুর উদ্ভব হল এবং লোহা গলানোতে কাঠের বদলে কয়লা ব্যবহার হতে লাগল। ১৭৬৪ সালে হারগ্রিভ্স চরকা আবিষ্কার করলেন, ১৭৭৬ সালে ক্রম্পটন সুতোকাটার বিশেষ কল উদ্ভাবন করেন, ১৭৮৫ সালে কার্টরাইট শক্তিচালিত তাঁতের নমুনার পেটেণ্ট লাভ করেন এবং সর্বোপরি ১৭৬৮ সালে ওয়াট কেন্দ্রীভূত শক্তির সবচেয়ে পরিণত প্রকাশ করলেন বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের পূর্ণ রূপ দিয়ে। যদিও এই যন্ত্রগুলো সেই সময়ের গতিশীল আন্দোলনের অভিব্যক্তি তবু এরা কিন্তু আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যায় নি। আবিষ্কারগুলো ছিল নিষ্ক্রিয়। এদের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধিকাংশই শতাব্দীকাল ধরে ছিল অব্যবহৃত যেন কাজে লাগাবার মতো শক্তি-সঞ্চয়ের অপেক্ষায় ছিল তারা। এই সঞ্চয় সর্বদাই অর্থের আকারে আসতে হয় এবং সেই অর্থ যা গুপ্তধন নয় বরং সচল ক্রিয়াশীল। ভারতীয় সম্পদপ্রবাহ এবং তার ফলে যে ঋণ সৃষ্টি হয়েছিল তার আগে এ বাবদে কোনো শক্তিসম্পদই ছিল না; আর ওয়াট যদি পঞ্চাশ বছর আগে জন্মাতেন তো তিনি এবং তাঁর আবিষ্কার দুইই একত্রে বিনষ্ট হত। পৃথিবীর জন্ম থেকেই সম্ভবতঃ কোনো বিনিয়োগই এত মুনাফা অর্জন করে নি যা করেছিল ভারতীয় লুণ্ঠন থেকে, কেননা প্রায় পঞ্চাশ বছর গ্রেট ব্রিটেন ছিল প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। ১৬৯৪ থেকে পলাশী (১৭৫৭) পর্যন্ত অগ্রগতি ছিল আপেক্ষিকভাবে মন্থর, ১৭৬০ থেকে ১৮১৫ পর্যন্ত তা ছিল খুবই দ্রুত এবং বিপুল।"৬

এইভাবে ঘটিয়ে তোলা শিল্পবিপ্লব ইংলণ্ডে একটা অত্যন্ত শক্তিশালী শিল্প পণ্য উৎপাদনকারী শ্রেণী সৃষ্টি করেছিল। ব্রিটেনে এই শ্রেণী উত্তরোত্তর রাষ্ট্র-ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ পেতে লাগল। সময়কালে এই শ্রেণী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে তার পূর্বদেশীয় বাণিজ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করল এবং এমন আর্থিক ও রাজনৈতিক উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য করল যা ব্রিটিশের শিল্পের আর্থিক চাহিদা মেটাবে। কঠিন সংগ্রামের পর ব্রিটেনে শিল্প পুঁজি মুৎসুদ্দি পুঁজির ওপর জয়ী হল।

ইংলণ্ডে শিল্প উৎপাদকশ্রেণীর উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধির সময়েই ভারতীয় হস্তশিল্প কঠিন আঘাত পায় এবং তার দ্রুত পতন ঘটে। যেসব বিভিন্ন কারণের জন্য এই ধ্বংস ঘটেছিল আমরা এখন তা আলোচনা করব।

ব্রিটেনের সংগে ভারতবর্ষের রপ্তানি বাণিজ্যের আঘাতটা এসেছিল সরকারের গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থার কারণে, যা ভারতীয় পণ্য দিয়ে ব্রিটিশ বাজার ছেয়ে ফেলা রোধ করে। এইভাবে উঠতি ইংরাজ উৎপাদনকারীরা যারা তখনো পর্যন্ত ভারতীয় পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারে নি, তাদের সংরক্ষিত করেছিল।

Horace Wilson যেমন চিত্রবৎ বর্ণনা করেছেন: "ভারতবর্ষের সঙ্গে সুতীবস্ত্র বাণিজ্যের ইতিহাস হল ভারতবর্ষের প্রতি অন্যায় আচরণের একটা বিষাদময় ইতিহাস। এই অন্যায় করেছে এমন একটা দেশ যার ওপর সে নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। ঐরকম কোনো নিষেধকারী শুল্ক বা ডিক্রি যদি না থাকত তাহলে Paisley এবং ম্যাঞ্চেস্টারের মিলগুলো শুরুতেই বন্ধ হয়ে যেত এবং এমনকি বাষ্পশক্তিতেও তাকে আবার চালু করা যেত কিনা সন্দেহ। ভারতীয় উৎপাদনের স্বার্থ বলি দিয়েই এদের সৃষ্টি। ভারতবর্ষ স্বাধীন থাকলে এর প্রতিশোধ নিত। ...আত্মরক্ষার এই উপায় তার ছিল না, সে ছিল বিদেশীদের করুণায়। কোনোরকম শুল্ক না দিয়েই ব্রিটিশের দ্রব্য তার ঘাড়ে চাপানো হত আর বিদেশী উৎপাদনকারী রাজনৈতিক অন্যায় আশ্রয় করে তার প্রতিযোগীকে নত ও শেষ পর্যন্ত দমন করত যার সঙ্গে অন্যথায় সে সমশর্তে পেরে উঠত না।"৭

বি. ডি. বসু তার সুপরিচিত বই **Ruin of Indian Trade and Industries** গ্রন্থে ভারতবর্ষ থেকে ইংলণ্ডে আমদানীকৃত বিভিন্ন দ্রব্যের ওপর বসানো শুল্কসমূহের একটা বিস্তৃত তালিকা দিয়েছেন যা পরিষ্কার করে দেখিয়ে দেয় কিভাবে ব্রিটিশ সরকার তার নিজ শিল্প পোষণের জন্য এবং সেই শিল্পগুলোর একটা অভ্যন্তরীণ বাজার যোগান দেবার জন্য সুপরিকল্পিত উপায়ে ভারতবর্ষের রপ্তানি বাণিজ্য ব্যাহত করেছিল।৮

যাহোক বিদেশী বাজার ছিল ভারতীয় হস্তশিল্প পণ্যের পক্ষে গৌণ, দেশী বাজারটাই ছিল বড়।৯ এইখানেই বিদেশী প্রভাব ও বিদেশী শাসনের অতি সর্বনাশা পরিণতি হয়েছিল।

শহরাঞ্চলীয় হস্তশিল্প ধ্বংসের কারণ

কতকগুলো কারণে ভারতবর্ষে হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন সর্বনাশা প্রতিপন্ন হয়েছিল। প্রথম কারণটা এই যে এই শাসন দেশীয় রাজ্যগুলোর বিনাশসাধন করেছিল এবং এই দেশীয় রাজারাই ছিলেন এই শিল্পের সব থেকে বড় ক্রেতা ও পৃষ্ঠপোষক। দ্বিতীয়তঃ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এইসব রাজ্যগুলোর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল; এই শিল্পগুলোকে প্রেরণা দিতে পারত বটে কিন্তু বিদেশী কোম্পানি হওয়ার দরুন একটা বিদেশী শক্তির নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনায় এরা ব্রিটিশ সরকারের চাপে পড়ে এমন এক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল যা ছিল ভারতবর্ষের যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্যের স্বার্থের পরিপন্থী। তৃতীয়তঃ, একটা বাণিজ্য সংস্থা হওয়ার দরুন কোম্পানি সস্তায় জিনিস উৎপাদন করতে চাইত ও অন্য বাজারে লাভজনক বিক্রি করতে চাইত। ইংলণ্ডে ভারতীয় পণ্যের ওপর যে অত্যধিক শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল তাতে লাভের মাত্রা ঠিক রাখার জন্য যে জিনিস কেনা হত তার উৎপাদন ব্যয় কমানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এই উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য কোম্পানি তাঁতী ও অন্যান্য হস্তশিল্পীদের ওপর একচেটিয়া অধিকার কায়েম করল এবং তাদেরকে চুক্তিবদ্ধ দামে উৎপাদন করতে বাধ্য করল। রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকার ফলেও কোম্পানি এদেরকে তার দাবির কাছে নতিস্বীকার করতে রাজনৈতিক চাপ দিতে পারত। কোম্পানি হস্তশিল্পীদের ভারতীয় অথবা বিদেশী

ব্যবসায়ীর কাছে উচ্চতর দামে জিনিস বিক্রি করায় বাধা দিত, ফলতঃ তাদেরকে কার্যত ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল। চতুর্থতঃ, কোম্পানি ভারতবর্ষের পণ্যের ওপর অন্তঃশুল্ক আরোপ করেছিল এবং মাল চলাচল সংক্রান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে এমন প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যে ভারতীয় বণিকেরা দক্ষতার সঙ্গে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য চালাতে পারত না। প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করে ও ভারতীয় বণিকদের অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য বন্ধ করে ভারতীয় বাজারে একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার হস্তগত করার মতলবে এইসব ব্যবস্থা-গুলো ভারতীয় হস্তশিল্প পণ্যের বাজার পঙ্গু করে দেয়। তাছাড়া, ১৮১৬ সালের মধ্যে ইংলণ্ডে শিল্প উৎপাদক শ্রেণী রাজনৈতিক দিক থেকে ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে ওঠে। ১৮১৩ সালের সনদ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য করার অধিকার কেড়ে নিল এবং ইংলণ্ডের সব বণিককে ভারতবর্ষে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে যেসব বণিকেরা ভারত-বর্ষে এসেছিল তাদের থেকে এই বণিকেরা আলাদা ধরনের ছিল। এইসব বণিকেরা ভারতবর্ষে উৎপাদিত জিনিস কিনতে ভারতে আসে নি বরং ইংলণ্ডের তৈরি জিনিসের বাজার খুঁজতে এবং ভারতবর্ষ থেকে ঐসব মিলে যোগান দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সন্ধানে এসেছিল। ১৮১৪ সাল থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিরাজ যা ততদিনে মূলতঃ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইংলণ্ডের শিল্প বণিকশ্রেণীর রাজনৈতিক হাতিয়ার, তাকে এমন নীতি গ্রহণ করতে হল যাতে ব্রিটিশ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ভারতীয় কাঁচামাল ব্রিটেনে আমদানি রপ্তানির সুবিধা করা যায়। তাছাড়া ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা ও তার সঙ্গে নতুন ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় "নতুন ধরনের ধনী ভারতীয়, ব্যবসায়ী, ইউরোপীয় কেতাদুরস্ত আমলা ও সফল মহাজনকুল"[১০] তৈরি হয়েছিল যাদের রুচি ছিল একেবারে আলাদা এবং যারা "জটিল এশীয় পদ্ধতির কাজকর্ম একেবারেই পছন্দ করত না কেননা তার অনেকটাই ছিল সামন্তযুগীয় জীবন-যাত্রার আদলে"[১১] এবং ফলে তাদের নতুন ধরনের জীবনযাত্রার পক্ষে উপযুক্ত ছিল না।

এইসব বিভিন্ন কারণ কিভাবে পৌর হস্তশিল্পে মারাত্মক আঘাত হেনেছিল তাই আমরা এখন দেখব।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যেসব জিনিস ইংলণ্ডে আমদানি করত সেগুলোর ওপর গুরুভার শুল্কের প্রভাব প্রতিরোধ করার জন্য এবং যতদূর সম্ভব সস্তায় জিনিস পাওয়ার জন্য কোম্পানির বণিকেরা হস্তশিল্পীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করত।[১২]

কোম্পানির এজেণ্ট ও বণিকদের অবলম্বিত নিপীড়নের উপায়, সে সঙ্গে কোম্পানির পাস করা বিধি, যেমন, বাংলাদেশের ১৭৯৩ সালের আইন, হস্ত-শিল্পীদের জীবন ও তাদের কাজের পরিস্থিতির ওপর সর্বনাশা প্রভাব ফেলেছিল। হাজার হাজার তাঁতী পরিবার তাদের জীবিকা পরিত্যাগ করতে আরম্ভ করে। Bolts উল্লেখ করেছেন, "জঙ্গলবাড়ির চারধারের জেলাগুলোতে প্রায় সাত শত তাঁতী পরিবার এই ধরনের অত্যাচারের দরুন একই সঙ্গে তাদের দেশ ও জীবিকা পরিত্যাগ করে।"[১৩]

এইভাবে দেশীয় রাজাদের জায়গা দখল করে নতুন শাসকেরা হস্তশিল্পীদের প্রায় ক্রীতদাসের অবস্থাতে পরিণত করল এবং হস্তশিল্পের স্বাধীন অস্তিত্বের পথে বাধা সৃষ্টি করল। এর ফলে ব্যাপ্তি ও দক্ষতা উভয়তই হস্তশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হল এবং শহরের হস্তশিল্পী পরিবারগুলো ক্রমেই বেশি বেশি সংখ্যায় তাদের জীবিকা পরিত্যাগ করতে শুরু করল।

দেশের মধ্যে চালানি মাসুল এবং শুল্ক সংক্রান্ত অসম নিয়ম এবং শুল্ক অফিসারদের গৃহীত বিভিন্ন উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থার কথা Sir Charles Trevelyan তাঁর বিখ্যাত **'Report on the Transit Duties'** এ উজ্জ্বল বিবরণ দিয়েছেন। "ব্যক্তিগত ও ব্যবহারিক প্রয়োজনের কমপক্ষে দু-শ পঁয়ত্রিশটি জিনিস অন্তঃশুল্কের আওতায় ছিল।"[১৪]

আবার উঠতি ব্রিটিশ শিল্পের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যে বিভিন্ন পথ অবলম্বন করা হয়েছিল তাতেও অনেকগুলো ভারতীয় শিল্প ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

কোর্ট অফ ডিরেক্টরস্ বাণিজ্যের জন্য ভারতীয় জাহাজ ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেয় এবং শুধুমাত্র ব্রিটিশ জাহাজ ব্যবহারের নির্দেশ দেয়। এই সিদ্ধান্তের ফলে ভারতীয় জাহাজ শিল্প ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। জাহাজ শিল্প পঙ্গু হয়ে যাওয়ার অন্যান্য কারণও ছিল।[১৫]

ব্রিটিশ শাসকদের নীতিতে ভারতীয় কাগজশিল্পেও এই সময় ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। তাদের নীতি ছিল ভারতবর্ষে ব্যবহারের জন্য ব্রিটিশেরা কেবলমাত্র তাদের নিজের দেশে তৈরি কাগজই কিনবে। Charles Wood-এর নির্দেশ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারকে ব্রিটিশের তৈরি কাগজ ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করেছিল। ফলে ভারতীয় কাগজ শিল্প তার সবথেকে বড় খরিদ্দার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল।

আরও একটা উল্লেখযোগ্য শিল্পের ধ্বংস বিষয়ে গ্যাড্‌গিল বলেছেন, "একটা বিশেষ ক্ষেত্রে ব্রিটিশশাসন একটা হস্তশিল্পকে ধ্বংস করেছিল—এটি হল অস্ত্রশস্ত্র, ঢাল-তলোয়ার, খোদাই ও কারুকাজের ব্যাপার—যা ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে, কচ্ছ, সিন্ধু ও পাঞ্জাবে বহুল প্রচলিত ছিল। ব্যবহার ও মালিকানায় অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা বাতিল করে দিয়ে এবং বাধানিষেধ আরোপ করে ব্রিটিশ সরকার ইউরোপীয় পর্যটক ও অন্যান্যদের জন্য অলঙ্কার তৈরি করার ক্ষেত্রেই এই শিল্পকে সীমিত রাখতে পেরেছিল।"[১৬]

লোহা গলানো শিল্পও দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ভারতীয় রাজ্যসমূহের বিলোপ ও অবক্ষয়ই হল এর ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ। এরাই ছিল এই শিল্পের প্রধান ক্রেতা। ব্রিটিশ সরকার ইংলণ্ডে এই শিল্পের উৎপন্ন আমদানি করার ওপর নিষেধমূলক শুল্ক আরোপ করেছিল এবং নতুন সরকার তার নিজের প্রয়োজনে ব্রিটিশের তৈরি লোহজ দ্রব্যের ওপর পক্ষপাতিত্ব করত। এও ছিল ধ্বংসের অন্য কারণ।

এছাড়া "একটা হঠকারী বাণিজ্য শুল্ক ও চিলি নাইট্রেটের আবিষ্কার নাইট্রেট শিল্পে ভয়ানক ক্ষতি করেছিল। বনসংরক্ষণ ও রেলওয়ে বিস্তারের জন্য কাঠ-কয়লার দাম খুব বেড়ে যাওয়ায় ও আমদানি করা অশোধিত লৌহপিণ্ডের প্রতিযোগিতার জন্য লোহা গলানো শিল্প দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।"[১৭]

বিদেশী সরকার ব্রিটিশ শিল্পের উপযোগী রাশি রাশি ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে একের পর এক শিল্প ধসে পড়তে লাগল।

বি. ডি. বসু এর মধ্যে প্রধান ব্যবস্থাগুলোকে নিম্নলিখিতভাবে সাজিয়েছেন—

"ইংলণ্ড ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পর থেকে ভারতীয় শিল্প-গুলোকে মূলতঃ এইভাবে ধ্বংস করছিল :

(১) ভারতবর্ষের ওপর ব্রিটিশের অবাধ বাণিজ্য চাপিয়ে দিয়ে
(২) ইংলণ্ডে ভারতীয় উৎপাদিত দ্রব্যের ওপর অত্যধিক শুল্ক আরোপ করে
(৩) ভারতবর্ষ থেকে কাঁচামাল রপ্তানি করে
(৪) চালানি কর ও শুল্ক চালু করে
(৫) ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের বিশেষ অধিকার দিয়ে
(৬) ভারতবর্ষে রেলওয়ে তৈরি করে
(৭) ব্যবসার গোপন তথ্য প্রকাশ করতে ভারতীয় কারিগরদের বাধ্য করে
(৮) প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে।"১৮

ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে নতুন যে বিত্তশালী শ্রেণী গড়ে উঠেছিল তার দৃষ্টিভঙ্গীও ভারতে হস্তশিল্পে আঘাত হানার আর এক কারণ।

"নব্য শিক্ষিত শ্রেণীই ছিল অভিজাতদের পরবর্তী স্বাভাবিক উত্তরসূরী। এরা ছিল মূলতঃ শহুরে ও পেশাদারী শ্রেণী, পাশ্চাত্য দেশের পেশাদার "বুর্জোয়া" অংশের সংগে এদের কিছুটা মিল আছে। এই নতুন শ্রেণী হস্ত-শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করবে এটা হয়তো আশা করা হয়ে থাকতে পারে। বস্তুত খুব সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া তারা দেশীয় শিল্পের প্রতি প্রায় সম্পূর্ণ বিমুখ ছিল। বিদেশী শাসনের একটা অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব হল বিজেতার আদর্শগুলো পরাজিতের ওপর আরোপ করা। গত শতাব্দীর শেষার্ধে এই নবসৃষ্ট ভারতীয় বুর্জোয়া ইউরোপীয় মান গ্রহণ করতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিল এবং যা কিছু ভারতীয় ছিল তার ওপর ছিল তাদের অপরিসীম ঘৃণা।··· ইউরোপীয় ফ্যাসন অনুসরণ করাই সভ্যতার পরাকাষ্ঠা বলে গণ্য হত। ফলতঃ দেশীয় শিল্পের উৎপাদন ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।···যেরকম আচরণ তারা করছিল এই শ্রেণীর পক্ষে সেইরকম আচরণ করাটাই সম্ভবতঃ স্বাভাবিক ; এরা সম্পূর্ণতই ব্রিটিশ শাসন থেকে উদ্ভূত। কিন্তু কতকগুলো ক্ষেত্রে তাদের রুচি অর্থহীন শাসনব্যবস্থা কিংবা ইউরোপীয় অফিসারদের ইচ্ছে অথবা তাদের ওপর বিরাগভাজন হবার ভয়ে প্রায় জোর করে চাপান হয়েছিল।"১৯

এইভাবে বিদেশী বাজারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আর দেশীয় রাজ্য, অভিজাত ও ধনী সমাজের দ্বারা সৃষ্ট চাহিদা থেকে বঞ্চিত হয়ে, প্রাক্তন দেশীয় রাজ্যের বদলে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী সরকারের সচেতন ও অচেতন ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে, এবং পুরানো অভিজাত ও বিত্তবান শহুরে শ্রেণীর বদলে যে নতুন বণিক শ্রেণী উঠেছে তার কাছে নিরুৎসাহিত এমনকি প্রত্যাখ্যাত হয়ে হস্তশিল্পের পতন হয় এবং প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ হস্তশিল্প প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। এই সময়ে পঞ্চাশের দশকে

গড়ে ওঠা রেলওয়ে ব্রিটিশ শিল্পদ্রব্য দেশের সদূরতম প্রান্ত পর্যন্ত পেঁছে দিতে সাহায্য করেছিল যার দ্বারা ভারতীয় বাজারে ব্রিটিশ দ্রব্যের স্থায়ী প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হল।

শত শত বছরব্যাপী সমৃদ্ধ সুসংবদ্ধ ভারতীয় হস্তশিল্পের এই করুণ পরিণতি হয়েছিল। গোটা পৃথিবী জুড়ে ভারতবর্ষের হস্তশিল্পের খ্যাতি বিস্তৃত হয়েছিল, সেই প্রাচীনকাল থেকেই যা চীন, গ্রীস, ঈজিপ্ট, পারস্য, রোম, আরব ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের লোকের ঈর্ষা ও বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল, যা যুগ যুগ ধরে ভারতকে পরিচিত করেছিল, 'ঐশ্বর্যময় ভারত' হিসেবে। আজ তারা অতীতের স্মৃতিচিহ্ন, ঔৎসুক্যের নিদর্শন, অনেক ক্ষেত্রেই যাদুঘরের দ্রষ্টব্য হয়ে আছে। তাদের স্মৃতি প্রধানত টিকে আছে কিছু নকল নিদর্শনের মাধ্যমে যা এখনও তৈরি হয় কিছু এলাকায় যেমন আগ্রা, বেনারস, আমেদাবাদ, সুরাট কিংবা রাজপুতনার কয়েকটা শহরে। পুরানো হস্ত-শিল্পীদের বংশধরেরা জীবিকার আর কোনো উপায় না পেয়ে পুরানো বৃত্তিতেই লেগে ছিল, ও ছোট ছোট পুঁজিপতি মালিকদের কারখানায় শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতিতে কাজ করে দিন গুজরাতো। ১৮৮০ সাল নাগাদ হস্তশিল্পের বিনাশ প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছিল।

ডি. আর. গ্যাড্‌গিল যেমন বলেছেন : "আশির দশকে ভারতবর্ষ দেখাতে পারত এক বিশাল দেশ যার হস্তশিল্প ছিল ক্ষয়িষ্ণু, অন্য কোনো ধরনের সংগঠিত শিল্প প্রায় ছিল না বললেই চলে, আর ফলতঃ জমির ওপর ছিল শেষ নির্ভরতা।"২০

ব্রিটিশ শাসনের আমলে ভারতীয় হস্তশিল্পের পতন ও ধ্বংসের ইতিহাস হল এই। এই হস্তশিল্প ছিল এক সময় ভারতবর্ষের মর্যাদা ও গরিমা কিন্তু তা রাজনৈতিক ও সর্বোপরি ঐতিহাসিক আর্থিক শক্তির চাপ সহ্য করতে পারে নি ও তাতেই ধ্বংস হয়ে যায়।

ভারতের শহরাঞ্চলীয় হস্তশিল্পের পতন

ইংলণ্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় পুঁজিবাদী দেশগুলোতে আধুনিক কারখানা ও যন্ত্রভিত্তিক শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে হস্তশিল্প পিছু হটতে শুরু করে। আর্থিক নির্বাচনের নিয়মানুসারে শেষোক্ত উৎপাদন পদ্ধতি উত্তরোত্তর প্রথমটিকে উচ্ছেদ করে দিয়েছিল, কেননা অর্থনীতির এক মূল নীতি অনুযায়ী যে শিল্পপদ্ধতি অধিকতর শ্রম-সাশ্রয়ী তা শেষ পর্যন্ত কম শ্রম-সাশ্রয়ী উৎপাদন পদ্ধতিকে উৎখাত করে দেয়, যেহেতু শেষেরটির উৎপাদিত দ্রব্য থেকে প্রথমটির উৎপাদিত দ্রব্য অনেক বেশি সস্তা। এইভাবে হস্তশিল্প গোটা পৃথিবী জুড়েই আধুনিক শিল্পকে পথ ছেড়ে দিয়েছিল।

ইংলণ্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোতে অবশ্য দেশীয় আধুনিক শিল্প ছিল যা দেশীয় হস্তশিল্পকে পরাভূত করেছিল ও গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। ধ্বংস-প্রাপ্ত হস্তশিল্পীগণ মোটের ওপর নতুন দেশীয় আধুনিক শিল্পে নিযুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

ভারতবর্ষে দেশীয় হস্তশিল্পের পতন ও ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে কোনোরকম দেশীয় কারখানা অথবা যন্ত্রশিল্পের উদ্ভব ঘটেনি। একটা বিদেশী সরকারের আর্থিক চাপ ও সেই সঙ্গে বিদেশী যন্ত্রশিল্পের সস্তা জিনিসের অনুপ্রবেশ হল এই ধ্বংস ও পতনের প্রধান কারণ।

কোনোরকম দেশীয় শিল্প নয়, বিদেশী শিল্পই যেহেতু ভারতবর্ষের হস্তশিল্পের ধ্বংস ডেকে নিয়ে এসেছিল, আর্থিক দিক দিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হস্তশিল্পীদের জীবিকার্জনের কোনো নতুন শিল্পোদ্যোগ ছিল না। এমনকি ১৮৫০ সালের পরও যখন আধুনিক শিল্প ভারতবর্ষে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল তখনো তা এত বেশি দ্রুত বেড়ে ওঠেনি যে ক্রমবর্ধমান ধ্বংসপ্রাপ্ত হস্তশিল্পীদের তাতে নিযুক্ত করা যেতে পারে। পরিণতিটা হয়েছিল এই যে শেষোক্তদের একটা অংশমাত্র নতুন শিল্পে নিযুক্ত হতে পারলেও বেশিরভাগকেই জমিকে তাদের জীবনযাত্রার উপায় হিসাবে বেছে নিতে হয়েছিল। তারা কৃষক প্রজা আর অধিকাংশই খেতমজুরে পরিণত হল।২১ এই হস্তশিল্পীদের একটা ক্রমহ্রাসমান গোষ্ঠী ছিল যারা মরিয়া হয়ে তাদের দ্রুত পতনোন্মুখ শিল্পকেই আঁকড়ে ধরে রেখেছিল এবং তার থেকে তাদের অনিশ্চিত জীবনযাত্রার অভাবাদি পূরণ করার জন্য দৃঢ় সচেষ্ট হয়েছিল। জিনিস বিক্রির জন্য বাজারের ওপর নির্ভরতার কারণে তারা উত্তরোত্তর ব্যবসায়ীশ্রেণীর আর্থিক কব্জায় পড়ছিল। তাদের ওপর যাদের শোষণ ছিল তীব্রতায় ক্রমবর্ধমান।

হস্তশিল্পের পরিবর্তে কোনো আধুনিক শিল্পের সমান্তরাল অগ্রগতি ছাড়াই পৌর হস্তশিল্পের বিনাশ ভারতে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করে। এতে কৃষিতে অত্যধিক চাপ পড়ে যা কৃষিনির্ভর মানুষের আর্থিক অবস্থা ও দক্ষতা উভয়তই ছিল ক্ষতিকর। ব্রিটেনের সাধারণ আর্থিক নীতি যেরকমভাবে ভারতবর্ষের পুরানো হস্তশিল্পের ধ্বংসসাধন করেছিল সেরকমভাবে কিন্তু দেশে কোনো নতুন শিল্পের অবাধ উন্নতিতে সাহায্য করেনি পাছে তা ব্রিটিশ শিল্পকেও বিপন্ন করে। এইটাই প্রধানতঃ ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে সমতার অভাব সৃষ্টি করেছিল (সপ্তম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য, আধুনিক শিল্পের প্রসার)। কেন ব্রিটেন ভারতবর্ষকে প্রধানতঃ কৃষিনির্ভর করে রাখতে চেয়েছিল তার দ্বিতীয় কারণ হল ভারতবর্ষের সস্তা কৃষিজাত কাঁচামাল তার শিল্পের জন্য প্রয়োজন। এ ব্যাপারটা ভারতবর্ষকে ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করেছিল।

ভারতীয় হস্তশিল্পের অগ্রগতির উচ্চমাত্রা মেনে নিয়েও আমরা যেন তার সীমাবদ্ধতার কথা ভুলে না যাই। প্রথমতঃ এই পৌর হস্তশিল্পগুলো যেসব জিনিস উৎপাদন করত তা মূলতঃ মধ্যযুগীয় সমাজের একটা সীমিত অভিজাত ও ধনিকশ্রেণীর বিলাসবহুল রুচির প্রয়োজনে অথবা রাষ্ট্রের সামরিক প্রয়োজনে অথবা ধর্মযাজকদের বিশেষ প্রয়োজনে বা তীর্থযাত্রীদের তীর্থক্ষেত্র দর্শনের জন্য ব্যবহৃত হত। সাধারণ মানুষের নিত্য ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন মেটাতে এই হস্তশিল্পগুলো উৎপাদন করত না। এই উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাদের উৎপাদনের পরিমাণ ও বাজার দুইই সীমিত করে রেখেছিল।২২ এমনকি যখন ভারতবর্ষ বিদেশী দেশগুলোতে তার মূল্যবান দ্রব্য রপ্তানি করত তখনও বিদেশী দেশগুলোতে সমাজের সম্পন্ন গোষ্ঠীই ছিল এর প্রধান ক্রেতা। বাজারের এই

সীমাবদ্ধতাই পৌর শিল্পের ব্যাপক অগ্রগতির পক্ষে একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সাধারণ মানুষের নিত্য প্রয়োজনের জন্য মূলতঃ উৎপাদন করলেই একমাত্র এই পৌর শিল্পের ব্যাপক অগ্রগতি সম্ভব। তাছাড়া একটা দেশের শিল্প জগতের ঐক্যসাধন তখনই সম্ভব যখন শিল্পগুলো সাধারণ মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনের জন্য বৃহদাকারে উৎপাদন করে।

অসংখ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামে বসবাসকারী অধিকাংশ ভারতীয় জনসাধারণের প্রাথমিক দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটত গ্রাম্য কারিগরদের দ্বারা স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন দ্রব্য স্থানীয়ভাবে ভোগের মাধ্যমে। শহরগুলোতে কারিগরি শিল্পগুলো বৃহদাকারে উৎপাদন করে মোটামুটিভাবে জনসাধারণের প্রাথমিক প্রয়োজন মেটাত। দেশ আর্থিক দিক থেকে সংহত ছিল না। প্রতিটি গ্রামই প্রায় স্বাধীন উৎপাদন ও ভোগের কেন্দ্র ছিল। দৈনন্দিন ও প্রাথমিক ব্যবহার্য দ্রব্যের বিনিময় তেমন উন্নত ছিল না।

পতনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য

পৌর হস্তশিল্পের পতন ও ধ্বংস আধুনিক বিদেশী ও তারপরে ভারতীয় শিল্পজাত সস্তা পণ্য হস্তশিল্পের বাজার কেড়ে নেওয়ায়, আর এরই সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য কারিগরি শিল্প পঙ্গু হয়ে যাওয়ায় খুব তাড়াতাড়ি ভারতবর্ষ এই-সব পণ্যের শিল্পবাজারে রূপান্তরিত হয়েছিল। গ্রাম থেকে গ্রামে, গ্রাম ও শহরের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষের সঙ্গে বহির্বিশ্বের বিনিময় বিস্তার লাভ করল। এই বিনিময় শুধুমাত্র বিলাসদ্রব্য অথবা সামরিক দ্রব্যের ক্ষেত্রেই সীমিত ছিল না, বরং দৈনন্দিন মানুষের ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়ল। বিনিময় সম্পর্ক গোটা ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থায় নিশ্ছিদ্রভাবে ছেয়ে ফেলল। এই ব্যাপারটা অর্থনীতিগতভাবে ভারতবর্ষের একত্রীকরণে সাহায্য করেছিল।

এটা সত্যি যে শহুরে হস্তশিল্পের বিনাশ এই শিল্পে নিযুক্ত লোকেদের অবর্ণনীয় দুর্দশা ঘটিয়েছিল, বিশেষ করে এই কারণে যে কোনো সমান্তরাল ও পর্যাপ্ত শিল্পোন্নয়ন ভারতবর্ষে ঘটেনি যা এই বিধ্বস্ত হস্তশিল্পীদের কাজে নিযুক্ত করতে পারত। এও সত্যি যে এতে ভারতীয় কৃষির ওপর শ্বাসরোধকারী চাপ সৃষ্টি হয়েছিল, যার ফলে গ্রামীণ জনসাধারণের দারিদ্র্য দ্রুত বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু জনসাধারণের এই নিদারুণ যন্ত্রণাতে ও ধ্বংস হওয়ায় দুঃখিত হয়েও এই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সত্যটি আমাদের মনে রাখতে হবে যে আধুনিক শিল্প ও বাণিজ্যের শক্তি প্রাক্-পুঁজিবাদী পৌর হস্তশিল্প ও গ্রামীণ কারিগরি শিল্পে যে ধ্বংস ডেকে এনেছিল তা ভারতবর্ষকে আর্থিক দিক দিয়ে এক সমগ্রতায় রূপান্তরিত করার পথ করে দিয়েছিল। বাস্তবিকভাবে এ একটা গোষ্ঠীকে কেবলমাত্র নয় সমগ্র জনসাধারণকে এক বিনিময় সম্পর্ক ব্যবস্থার জালে আবদ্ধ করেছিল। এইভাবে ভারতীয় জনসাধারণের জন্য এক সাধারণ ও যৌথ আর্থিক অস্তিত্ব এবং ভারতীয় জনগণের জাতিতে পরিণত হওয়ার আর্থিক সংহতি গড়ে ওঠার বস্তুগত ভিত্তি তৈরি হয়।

বিধ্বস্ত হস্তশিল্পীরা অংশত আধুনিক ভারতীয় শিল্পে যোগ দিল ও কারখানা ও যানবাহন শ্রমিকে পরিণত হল। কিন্তু এইসব শিল্পের পর্যাপ্ত প্রসার না হওয়াতে তারা মোটের ওপরে কৃষিকে অবলম্বন করল এবং কৃষক ও

খেতমজুরে রূপান্তরিত হল। তাদের প্রায়ই যথেষ্ট পুঁজি না থাকায় তারা জমি কিনতে পারত না ও স্বাধীন স্বত্ববান কৃষক হতে পারত না। এইভাবে ভারতীয় হস্তশিল্পীগোষ্ঠী যারা মধ্যযুগীয় হস্তশিল্পকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল, তারা দ্রুত লোপ পেয়ে গেল ও আধুনিক প্রোলেতারিয়েত প্রজা ও খেতমজুরের সংখ্যা বাড়িয়ে দিল। তারা ভারতবর্ষের নতুন শ্রেণীসমূহের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল যে নতুন শ্রেণী ভারতে ব্রিটিশ শাসনের আমলে নতুন পুঁজিবাদী আর্থিক সম্পর্ককে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। যত অক্ষমভাবে গড়ে উঠুক না কেন তারা ভারতীয় সমাজের পুঁজিবাদী সামাজিক আর্থিক কাঠামোর অংশ হয়ে দাঁড়াল। জাতীয় স্তরে ঐক্যবদ্ধ সেই নতুন শ্রেণীর তারা অংশ হয়ে গিয়েছিল যাদের এমনসব সমস্যার মোকাবিলা করতে হত যা শহরের সীমানা ছাড়িয়ে যেত বটেই এমনকি যা ছিল জাতীয় পরিধির অন্তর্গত। নতুন খেতমজুর, শিল্পশ্রমিক বা প্রজা বা স্বত্ববান কৃষকের একটা সাধারণ স্বার্থ ও সাধারণ সমস্যা ছিল যা প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে হস্তশিল্পীদের মধ্যে থাকতে পারে না। সর্বস্বান্ত হস্তশিল্পীরা এখন এমন শ্রেণীভুক্ত হল যা ভারতীয় জাতির অঙ্গস্বরূপ এবং তারা সমস্বার্থ ও সমস্যাসম্পন্ন জাতীয় অংশে পরিণত হল। এটা স্পষ্টতঃই একটা ঐতিহাসিক অগ্রগতি।

সূত্র নির্দেশ

১ Gadgil, পৃ. ৬।
২ উপরিউক্ত, পৃ. ৩৭।
৩ উপরিউক্ত, পৃ. ৩৮।
৪ Thompson and Garratt, পৃ. ৪৩১-২।
৫ Lecky দ্রষ্টব্য।
৬ Brooks Adams, পৃ. ২৬৩-৪।
৭ Mill, পৃ. ৩৮৫ কর্তৃক উদ্ধৃত।
৮ Major Basu দ্রষ্টব্য।
৯ Gadgil এবং Buchanan দ্রষ্টব্য।
১০ Thompson and Garratt পৃ. ৪৩৪-৫।
১১ উপরিউক্ত, পৃ. ৪৩৪।
১২ Basu, পৃ. ৮৫-৭ দ্রষ্টব্য।
১৩ Bolts, পৃ. ১৯৫।
১৪ Ramachandra Rao, পৃ. ৯৯।
১৫ A. Mehta দ্রষ্টব্য।
১৬ Gadgil, পৃ. ৪১।
১৭ উপরিউক্ত, পৃ. ৪৫।
১৮ Basu, পৃ. ১০-১১।
১৯ Gadgil, পৃ. ৪০-১।
২০ উপরিউক্ত, পৃ. ৪৩-৪।
২১ Gadgil দ্রষ্টব্য।
২২ Gadgil and Buchanan দ্রষ্টব্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গ্রামীণ কারিগরি শিল্পসমূহের পতন

প্রাক্-ব্রিটিশ গ্রামীণ কারিগরি শিল্প

আগের এক পরিচ্ছেদে যেমন দেখা গিয়েছে গ্রামীণ কারিগরি শিল্প ছিল প্রাক্-ব্রিটিশ গ্রামের সক্ষম ও মূলতঃ স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতির শিল্প এবং তা গ্রামীণ অর্থনীতির শিল্পগত চাহিদার প্রায় সবটাই মেটাত। গ্রামীণ আর্থিক স্বাধীনতার এটা ছিল শিল্পসংক্রান্ত ভিত্তি—আরেকটা ভিত্তি হল স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি। এটা বোঝা যায় এই ঘটনায় যে বেশিরভাগ কারিগরই ছিল আংশিক সময়ের কৃষক। শ্রমবিভাজন তখনও বেশি দূর এগোয় নি, তারা চাষ করত গ্রাম থেকে দেওয়া তাদের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে। কৃষকেরা বিশেষতঃ তাদের মধ্যে মেয়েরা কিছু সময় শিল্পকর্মে ব্যয় করত, যেমন সুতোবোনা ইত্যাদি।১

গ্রামীণ আর্থিক সম্পর্কের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে কারিগরদের (সম্ভবতঃ তাঁতী বাদ দিয়ে) মর্যাদা ছিল বেশিরভাগটাই গ্রামীণ গোষ্ঠীর দাসের অনুরূপ। গ্রামীণ সমাজ তাদের ছেড়ে দিত গ্রামের একটা এলাকা, আর দিত বার্ষিক কৃষি উৎপন্নের একটা অংশ। ফলে যথেষ্ট স্বাধীনভাবে তারা তাদের পণ্য নিজেদের মধ্যে বা কৃষকদের সঙ্গে বিনিময় করতে পারত না।২

কারিগরি শিল্পের মধ্যেও আবার শ্রমবিভাজন খুব সীমিত ছিল, শিল্পের বিশেষীকরণও ছিল খুব সামান্য। ফলে কারিগরদের দক্ষতা রয়ে গিয়েছিল খুব নীচু মানে। বাইরের সঙ্গে প্রতিযোগিতাও ছিল না কেননা গ্রামেই ছিল প্রায় এক একটি স্বাধীন আর্থিক কেন্দ্র। এ যে কেবলমাত্র কারিগরদের দক্ষতা ও পদ্ধতি উন্নত করার উৎসাহের অভাব ঘটাত তাই নয় পরন্তু ভারতবর্ষে শিল্পের একদেশিকতা বৃদ্ধিও আটকে দিয়েছিল।৩

গ্রামীণ কারিগরি শিল্পের পতনের কারণ

সস্তা ব্রিটিশ ও অ-ব্রিটিশ যন্ত্রে তৈরি জিনিসের অনুপ্রবেশই গ্রামীণ কারিগরি শিল্পের পতনের প্রধান কারণ। রেল ও পরে বাসের প্রবর্তন গ্রামে জিনিস পেঁছানো সহজ করে দিয়েছিল। “রেলপথ ও জাহাজ ব্যবস্থার ফলে ভারতীয় গ্রামীণ কারিগরদের চেয়ে ইউরোপীয় কলকারখানা মালিকদের পক্ষে ভালো শর্ত দেওয়া সহজ হয়েছিল। আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিশেষজ্ঞতা ও

বাণিজ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ স্থানীয় অর্থনীতিকে স্থানচ্যুত করে, অবশ্যই এটা ভারতীয় কারিগরদের বহুলাংশের পতন ঘটায়।"৪

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ও তার পরে ভারতে আধুনিক শিল্পের নিয়ত অগ্রগতি এই পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল। এই পতনের প্রক্রিয়ার একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা এর পরেই করা হলো।

কারিগরি শিল্পের পতনঃ অসম প্রক্রিয়া

গ্রামীণ কারিগরি শিল্পের ব্যতিক্রমহীন পতনের প্রক্রিয়া সামাজিক, আর্থিক ও স্থানীয় কারণে অসম ছিল।

গ্রামের তাঁতশিল্প সস্তা যন্ত্রে তৈরি বস্ত্রের অনুপ্রবেশের ফলে প্রতিকূল-ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল ও ১৮৫০ সালের পর দ্রুত তার পতন ঘটে। গান্ধী প্রমুখ ভারতীয় নেতা ও সর্বভারতীয় তন্তুবায় সমিতির (All India Spinners' Association) মতন সংগঠন তাঁতশিল্পের সপক্ষে প্রচার করার দরুন পরে এই শিল্পের পতন জোরালোভাবে না হলেও কিছুটা ব্যাহত হয়েছিল। কারখানাগুলো আবার খদ্দরের জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার করে বাজারে মিলে তৈরি খদ্দর চালু করল যা হাতে তৈরি খদ্দরের বিস্তারে বাধা দিয়েছিল।

"কলে তৈরির আপেক্ষিক সাশ্রয় অনেক বেশি হওয়ার দরুন হাতে সুতো-কাটার প্রতিযোগিতায় আসার কোনো সুযোগই নেই, এবং হাতে বোনাও বিপন্ন···

একইভাবে ভারতে তাঁতীরাও মার খেয়েছে বিদেশী এবং দেশী উভয় মিলের তৈরি সস্তা দামের দ্রব্যের জন্য।"৫

গ্রামীণ উৎপাদনে যন্ত্রের সূচনার আনুপাতিক হারে গ্রামীণ ছুতোরের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটেছিল। লোহার লাঙল ও লোহার আখমাড়াই কল প্রভৃতি নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করায় সে ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বিধ্বস্ত ছুতোরদের একাংশ আসবাবপত্র তৈরি ও শহরে গড়ে-ওঠা অন্যান্য শিল্পে ঢুকে পড়ল।

গ্রামীণ কামারদের ওপরে এই নতুন আর্থিক পরিবেশের সামান্যই প্রভাব পড়েছিল। গ্রামে তার মেরামতির কাজের চাহিদা তেমন কিছু কমে নি। গ্রামীণ কামারদের একটা অংশ অবশ্য শহরে চলে গিয়েছিল ও আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, ঢালাই কারখানা এবং অন্য এই ধরনের উদ্যোগে নিযুক্ত হয়েছিল।৬

গ্রামদেশে আর্থিক রূপান্তরের ফলে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল চামারেরা। প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে সে তার প্রতিবেশী গ্রামবাসীদের কাছ থেকে মাগনায় জীবজন্তুর মৃতদেহ পেত। ভারতবর্ষ পৃথিবীর বাজারের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর এবং ভারতবর্ষে চামড়া শিল্প গড়ে ওঠার পর মৃত জন্তুর মালিকেরা দেখল যে সেইসব শিল্পের প্রতিনিধিদের কাছে চামড়া বিক্রি করা অনেক বেশি লাভজনক, তা সে শিল্প ভারতীয়ই হোক বা বিদেশী হোক।৭ শহরের নতুন চর্মশিল্পগুলো যদিও ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ চর্মশিল্পীদের এক ছোট অংশকে কাজে নিযুক্ত করেছিল, তথাপি তাদের বড় অংশ খেতমজুর হতে বাধ্য হয়েছিল।

সস্তা নীল গ্রামীণ রঞ্জক শিল্পকে ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল ও গ্রামীণ রঞ্জকদের প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে গ্রামের এই কারিগরি শিল্প অসংশোধনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।[৮]

আলো জ্বালানোর জন্য তেলের পরিবর্তে উত্তরোত্তর কেরোসিনের ব্যবহার গ্রামীণ কলুদের বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছিল। শহরে যেসব তেল পেষাইয়ের শিল্প গড়ে উঠেছিল, যারা রান্নার কাজে ব্যবহারের জন্য তেল উৎপাদন করত, তাদের ব্যবসায় অবশ্য এতে কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েনি।

গ্রামীণ জনগণের উচ্চবিত্ত অংশের দ্বারা বিদেশ থেকে আমদানি করা কলাই-করা জিনিসপত্র এবং ভারতবর্ষে গড়ে-ওঠা তামা ও অন্যান্য শিল্পে উৎপাদিত ধাতুর পাত্রের উত্তরোত্তর ব্যবহার গ্রামীণ কুমোরদের জিনিসের চাহিদা কমিয়ে দিয়েছিল। যাহোক গরীব গ্রামবাসীরা তখনো মাটির পাত্র ব্যবহার করতে থাকায় কুমোরেরা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়নি।[৯] যেহেতু আর্থিক দিক দিয়ে ভগ্নদশাগ্রস্ত এই কুমোরেরা কোন পৌর শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারল না তাই তারা ক্রমে ক্রমে খেতমজুরে পরিণত হল।

বিভিন্ন যেসব দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল তাও গ্রামীণ কারিগরি শিল্পের পতন ঘটাতে সাহায্য করেছিল। দুর্ভিক্ষের সময় গরীব কারিগরেরা বিশেষ করে তাঁতীরা অন্য ধরনের কাজে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। কামার অথবা ছুতোরেরা যদিও বা কখনো কখনো কাজ পেত তাঁতীর মতো কারিগরদের কায়িক শ্রমই অবলম্বন করতে হত। বিপর্যয়ের অবসান ঘটার পর তাদের পক্ষে আবার শিল্পদক্ষতা অর্জন করা প্রায়ই কঠিন হয়ে পড়ত। "বহির্সাহায্যের অভাবে অনেক তাঁতীকেই দুর্ভিক্ষের চাপে তাদের নিজ ব্যবসা ত্যাগ করতে হয়েছিল। এদের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আর কখনো নিজ ব্যবসায় ফিরে আসে নি বরং তারা সাধারণ শ্রমিকের পর্যায়ে নেমে সেই সংখ্যাই স্ফীত করেছিল।"[১০]

গ্রামীণ জনসাধারণের দারিদ্র্যের জন্য কিছু কিছু শিল্প টিকে গিয়েছিল। যেমন গ্রামীণ কুম্ভকার, সে তখনও ক্রেতা পাচ্ছিল। কেননা গ্রামীণ জনসাধারণের অধিকাংশই এত দরিদ্র ছিল যে তারা ধাতু অথবা কলাইকরা বাসন কিনতে পারত না। সেই কারণেই বড় মৃৎশিল্প দেশে রয়ে গিয়েছিল।

সব গ্রামীণ শিল্পেরই অবশ্য প্রবণতাটা ছিল পতনের দিকে।

অবশিষ্ট গ্রামীণ কারিগরবৃন্দের পরিবর্তিত অবস্থা

আগে যে পরিস্থিতিতে গ্রামীণ কারিগরেরা কাজ করত এবং এখন যে পরিস্থিতিতে কাজ করছিল তার মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য গড়ে উঠেছিল। আগে তারা প্রায় গ্রামসমাজের ক্রীতদাস ছিল। তারা তাদের কাজ ও জিনিসের বিনিময়ে স্বাধীন জমি পেত এবং ফসলের সময় একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য পেত। এখন তারা পুরোপুরি না হলেও প্রধানতঃ টাকার বিনিময়ে কাজ করছিল এবং গ্রামের লোকেদের সঙ্গে স্বাধীন আর্থিক সম্পর্কে ছিল। পুরোনো থেকে এই নতুন প্রথায় পালাবদলের গতি মন্থর ছিল এবং সবসময় সম্পূর্ণও ছিল

না। তবু "যে ব্যাপারটা উল্লেখযোগ্য তা হল এই যে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ন্যায্য পাওনা ও আনুষঙ্গিক ইত্যাদি থেকে কৃষকের যে নিয়মিত আয় হত তার গুরুত্ব কমে যাওয়ার দিকেই ছিল প্রবণতা।"১১

কারিগরদের পদমর্যাদা পরিবর্তনের আর একটা দিক হল এই যে তারা উত্তরোত্তর মজুরে পরিণত হচ্ছিল। একটা দৃষ্টান্ত নিলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। আগের যুগে গ্রামের তাঁতী গ্রামের মানুষের প্রয়োজন মেটাত। তারা বাজারের জন্য উৎপাদন করত না। নতুন পরিস্থিতিতে স্থানীয় অথবা দূরের বাজারে তার জিনিস বিক্রির জন্য তাঁতী আরো বেশি করে ব্যবসায়ীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল, তাছাড়া প্রতিযোগিতা তাঁতীর যা ছিল তার চেয়ে বেশি পুঁজির প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করল। এর ফলে তাঁতী খুব তাড়াতাড়ি ব্যবসায়ীর খপ্পরে পড়ল। "প্রায়ই কর্মীরা যদিও নামে তখনও স্বাধীনই তারাই সুতো কেনে আর পোশাক বেচে, সাধারণতঃ যে ব্যবসায়ীর কাছে সে গভীর ঋণে আবদ্ধ, একমাত্র তার সঙ্গেই তার সব কাজকারবার চলতে বাধ্য।"১২ এইভাবে কৃষকের মতন কারিগরেরাও উত্তরোত্তর মুৎসুদ্দি পুঁজির অধীনস্থ হয়ে পড়ছিল।

ভারতবর্ষে গ্রামীণ কারিগরি শিল্প ও পৌর হস্তশিল্পের পতনের সঙ্গে আধুনিক শিল্পের সমসাময়িক, সমান্তরাল ও সমানুপাতিক বিস্তার ঘটেনি। যে পরিচ্ছেদে এইসব শিল্পের অগ্রগতির কথা বলা হয়েছে তাতে এর কারণগুলো উল্লেখ করা আছে।

আধুনিক শিল্পের এই অপ্রতুল উন্নতির জন্য টিকে থাকা গ্রামীণ হস্ত-শিল্পগুলো এমনকি উত্তরোত্তর ধ্বংসাবস্থা সত্ত্বেও অসংখ্য গ্রামে কেন্দ্রীভূত জনসাধারণের প্রয়োজন মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। '...এমনকি আজও ভারতের শিল্প-জনসংখ্যার বড় অংশ আসছে গ্রামীণ কারিগরদের থেকে।"১৩

গ্রামীণ কারিগরিশিল্প পুনর্গঠনের ব্যর্থ প্রয়াস

গ্রামীণ কারিগরিশিল্পের উত্তরোত্তর ধ্বংসের স্রোত প্রতিহত করার জন্য এমনকি তাদের পূর্ণশক্তি ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন প্রয়াস হয়েছিল। এই শিল্পগুলো পুনর্গঠনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষণীয় প্রচেষ্টা ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও গান্ধীর। গান্ধী প্রতিষ্ঠিত "সর্বভারত শিল্প সমিতি"র (All India Spinners' Association) লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ তাঁতশিল্পের পুনরুজ্জীবন। গান্ধী প্রতিষ্ঠিত "সর্বভারত গ্রামীণ শিল্প সমিতি'র (All India Village Industries Association) লক্ষ্য ছিল কিছুটা সংশোধিত আকারে সব কুটীরশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা।

এই প্রচেষ্টাগুলোর অবশ্য কোনো উল্লেখযোগ্য ফল দেখা যায় নি। গ্রামীণ শিল্পের আর্থিক উৎকর্ষ ও সুবিধার যুক্তির থেকে বরং জনসাধারণের স্বাদেশিক ও মানবিক আবেগের ওপর এই প্রচেষ্টার সমর্থকদের অনেক বেশি নির্ভর করতে হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ হাতে কাটা খদ্দরের কথা বলা যায়। গান্ধী

জনসাধারণকে প্রণোদিত করেছিলেন "খাদি পরতে, যদিও তা বিদেশী মিহি বস্ত্রের মতো নরম বা সুদৃশ্য নয়, অত সস্তাও নয়।"১৪ মহাত্মা গান্ধী তার সবরকমের ব্যক্তিগত প্রভাব ও এমনকি বড় রকমের আর্থিক সম্পদ সত্ত্বেও এই শিল্পগুলোকে উল্লেখযোগ্যভাবে পুনরুজ্জীবিত করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে তার বড় রকমের আর্থিক সম্পদ প্রধানতঃ ভারতীয় শিল্পপতিদের কাছ থেকেই সংগৃহীত হয়েছিল এবং অতি আধুনিক শিল্পের মুনাফা থেকেই তা এসেছিল, আর যে শিল্পগুলোর প্রসারই গ্রামীণ শিল্পের ধ্বংসের কারণ। এইসব প্রচেষ্টার বিফলতার মৌলিক কারণ হল এই যে এরা ইতিহাসের অগ্রগতির আর্থিক বিবর্তনের শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে চলছিল।

গান্ধীর প্রেরণাতেই সর্বভারত গ্রামীণ শিল্প সমিতি (All India Village Industries Association) গড়ে উঠেছিল। এর ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল যন্ত্রে তৈরি জিনিসের নির্ভরতা থেকে গ্রামকে মুক্তি দেওয়া অথবা প্রাক্-পুঁজিবাদী মৃত বা মৃতপ্রায় কারিগরি শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা। আর্থিক বিপরীত-গামিতার এই কর্মসূচী ইতিহাস ও জীবনের মূল ব্যাপারটাই উপেক্ষা করেছিল। যে অপরিবর্তনীয় মৌলিক নীতিগুলো সামাজিক জীবনযাত্রা নির্ধারণ করে এই পরিকল্পনা তার বিরুদ্ধে যেতে চেয়েছিল। ঐতিহাসিক অগ্রগতিতে উন্নত-তর কৃৎকৌশল ও আর্থিক কাঠামো আগের কারিগরি ও আর্থিক রূপকে বাতিল করে দিয়েছিল, সেই বাতিল হয়ে যাওয়া কাঠামোকেই ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছিল এই কর্মসূচী।

এই পরিকল্পনা যে প্রাক্-পুঁজিবাদী কারিগরী শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিল তার পতন প্রধানতঃ হয়েছিল যন্ত্রভিত্তিক শিল্পের অসম প্রতি-যোগিতার ফলে। যন্ত্রশিল্পের ঐতিহাসিক শক্তি নিহিত এই ঘটনায় যে এর উৎপন্ন দ্রব্য হস্তশিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যের থেকে ছিল অনেক সস্তা। দ্রব্য বিনিময়ের ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা সমাজে আর্থিক সংগ্রামে এমন উৎপাদন পদ্ধতিই বেছে নেওয়া হয় যা ন্যূনতম শ্রমে মানুষের প্রয়োজন মেটায়। বাজারের ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা সমাজে সস্তা জিনিস সবসময়ই চালু হয়, দামী জিনিসকে বাজার থেকে বাতিল করে দেয়। আর্থিক পছন্দের এই সুদৃঢ় নিয়মানুসারে কারিগরি শিল্পের পতন ঘটেছিল এবং যন্ত্রভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠেছিল।

ঐতিহাসিক অগ্রগতির সাধারণ নিয়মে বাতিল এক আর্থিক ব্যবস্থার ীবন সম্ভব নয়। প্রাক্-পুঁজিবাদী হস্তশিল্প ঐতিহাসিক অগ্রগতিতে আধুনিক শিল্প দ্বারা বাতিল হয়ে গিয়েছিল। অনুন্নত কৃৎকৌশলের ভিত্তিতে গড়া কারিগরি শিল্প ও তার ফলস্বরূপ কম উৎপাদনকে গান্ধী প্রমুখ নেতার পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস ছিল অনৈতিহাসিক আর তাই সফল হবারও কথা নয়।

চরখাকাটা, তাঁত বোনা ও কয়েকটি হস্তশিল্পের মতো কতকগুলো গ্রামীণ শিল্পের নিষ্ফল পুনরুজ্জীবনের অনেকগুলো কারণ ছিল। "বিদ্যমান নৈরাশ্য-জনক কৃষি সংগঠনের অব্যবস্থা যা জমিতে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপকে নির্বাসিত করে মজুর পর্যায়ে যারও সারা বছরের অর্ধেক সময়ে কাজ নেই, এবং শিল্প বিকাশের অভাব—এই দুই প্রদত্ত অবস্থায় চরখা, হাতের তাঁত এবং হস্তশিল্প হল···একটা সাময়িক উপশম···"১৫

এই আংশিক এবং চূড়ান্ত সীমাবদ্ধ উপশমদায়ী আর্থিক ব্যবস্থা, অবশ্য হয়েছিল "ভারতীয় অর্থনীতির বাধা ও বিকৃতির অবস্থায় চরম দুর্দশাকে মেনে নেওয়ার ভিত্তিতে আর পরিবর্তন করার নির্দেশ না দিয়ে এই দুর্দশাকে মানিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।" "একটা পুঁজিবাদী পৃথিবীতে হস্তশিল্প পুনরুজ্জীবনের কৃত্রিম প্রয়াসের আর্থিক দিক থেকে কোনো ভবিষ্যৎ নেই। খাদি ও হাতে তৈরি কাপড় মিলের কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারে না ; তাই তা দরিদ্রতম মানুষের নাগালেরও বাইরে।"১৬ সত্যি বলতে কি এই কৃত্রিম পুনরুজ্জীবন খুবই সীমিত, উপাখ্যানমাত্র। বিড়লা, বাজাজ প্রভৃতি শিল্প-গোষ্ঠী যারা এই পুনরুজ্জীবনে আর্থিক সাহায্য করেছিল তারাই এটা সম্ভব করেছিল। এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল উচ্চতর শ্রেণীর একটা গোষ্ঠী। এইসব শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য কিনে তারা স্বেচ্ছাকৃতভাবে আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করেছিল। তাদের আশা ছিল যে তাদের ত্যাগ মৃতকল্প হস্তশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করবে,* ব্রিটিশদের আর্থিক দিক থেকে আঘাত করবে ও ভারতীয় জনসাধারণের দারিদ্র্য দূর করবে। এই আশা ফলবতী হতে পারেনি, কেননা এই কর্মসূচী ঐতিহাসিক এবং আর্থিক শক্তি ও সেইসঙ্গে মানসিক প্রবণতার বিরোধী ছিল। এমনকি গান্ধী যিনি একসময় আধুনিক শিল্পের আপস-হীন বিরুদ্ধবাদী ছিলেন, তিনিও তাঁর কর্মসূচীর ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের মত সংশোধন করেছিলেন ও উৎপাদনের শর্তাধীন ও আংশিক যান্ত্রিকী-করণ মেনে নিয়েছিলেন।

গ্রামীণ শিল্পসমূহ পতনের ফল

গ্রামীণ শিল্পের উত্তরোত্তর পতন কৃষি ও শিল্পের ঐক্য বিঘ্নিত করেছিল। গ্রামীণ শিল্পের ওপর ভিত্তি করেই গ্রামীণ অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল। এর ফলে গ্রাম শিল্পদ্রব্যের জন্য বহির্বিশ্বের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। আগের মত গ্রাম আর স্বশাসিত অর্থনৈতিক একক রইল না। গ্রাম এখন জাতীয় এমনকি বিশ্ব অর্থনীতির একটা নির্ভরশীল অংশ হয়ে দাঁড়াল।

পুঁজিবাদী ভূমি-সম্পর্কের সূচনা ও নতুন নীতি যা কৃষককে ব্যক্তিগত-ভাবে রাজস্ব আদায়ের একক হিসাবে গণ্য করত তা গ্রামীণ আর্থিক স্বয়ং-সম্পূর্ণতা ভেঙে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। গ্রামীণ অর্থনীতির শিল্প-ভিত্তি গ্রামীণ কারিগরি শিল্প ধ্বংসেরও দরকার ছিল। এই উভয় ঘটনার যুগ্ম প্রতিক্রিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের ওপর গুরুতর আঘাত হানে।

---

* কিছু কিছু বামপন্থী জাতীয়তাবাদী ও সমাজবাদী গোষ্ঠী ভারতীয় মিল মালিক ও জমিদারদের খাদি ও কুটিরশিল্প আন্দোলনকে আর্থিক সাহায্য করা চতুর কৌশল বলে মনে করতেন। জমিদার ব্যবসায়ী ও মহাজন যারাই শোষণ করত, তাদের বিরুদ্ধে কৃষি-জনসাধারণের আর্থিক অসন্তোষ যাতে সংগ্রামের রূপ না পায় তাই এই কৌশল। ধনী পৃষ্ঠপোষকেরা এইভাবে গ্রামীণ জনসাধারণকে দারিদ্র্য সমাধানের অলীক কর্মসূচীতে টেনে নিয়ে যাওয়ার ফাঁদ পাতার চেষ্টা করছিল। প্রকৃতপক্ষে এই দারিদ্র্যের মূলে ছিল অত্যধিক খাজনা, ঋণ, ভূমিরাজস্ব এবং অনুরূপ অন্যান্য কারণ। ভারতবর্ষে শিল্পপতি-দের সঙ্গে জমিদার, গ্রামীণ বণিক ও মহাজনশ্রেণীর ঘনিষ্ঠ আর্থিক সহযোগিতা ছিল।

কারিগরদের উত্তরোত্তর ধ্বংস অনেক বেশিসংখ্যক কারিগরকে তাদের বংশানুক্রমে আঁকড়ে রাখা বৃত্তি পরিত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। এদের একটা গোষ্ঠী শহরে আকৃষ্ট হল এবং কলকারখানায় মজুর হয়ে দাঁড়াল অথবা তেল, চিনি, চামড়া, আসবাব তৈরি বা ঐ ধরনের শিল্পে যোগ দিয়েছিল। কিছু সংগতিপন্ন আরেকটা অংশ গ্রামেতে জমি কিনল এবং স্বত্ববান কৃষকে পরিণত হল। যাদের কোনোরকম সংগতি ছিল না তারা খেতমজুর অথবা নিঃস্ব হয়ে গেল। এর ফলে কৃষি ভারাক্রান্ত হল।

"গ্রাম ও শহরের লক্ষ লক্ষ বিধ্বস্ত কারিগর ও হস্তশিল্পী, সুতাকাটুনী ও তাঁতী, কুমোর, চামার, কামার, স্যাকরা প্রভৃতির জমিতে ভীড় করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। এইভাবে ভারতবর্ষ···কৃষি ও শিল্পের সম্মিলিত উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে ব্রিটিশ শিল্প পুঁজির লীলাক্ষেত্র রূপে কৃষিভিত্তিক উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল।"১৭ এর কারণ এই যে আধুনিক শিল্প যা বিপর্যস্ত হস্তশিল্পীদের নিযুক্ত করতে পারত তা হস্তশিল্পের ধ্বংসের সংগে সমান তালে গড়ে ওঠেনি। বিধ্বস্ত কারিগরদের একটা গোষ্ঠী তাদের ছেলেদের স্কুলে পাঠিয়েছিল যারা অল্প কিছুটা লেখাপড়া শেখার পর শিক্ষক অথবা কেরাণী হয়।

তা সত্ত্বেও আগেই বলা হয়েছে ভারতে মন্থর শিল্প প্রসারের জন্য গ্রামীণ কারিগরেরা সাধারণ সংখ্যায় কমে গেলেও দেশের মোট শিল্প জনসংখ্যার একটা বড় অংশই ছিল তারা।

স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম জাতীয় সচেতনতা বৃদ্ধি ও সার্বজনীন জাতীয় জীবনের অগ্রগতিতে ছিল একটা বাধা। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের আর্থিক বনিয়াদ ধ্বংস করে গ্রামীণ কারিগরি শিল্পের ক্রমবিলোপ এই পরিপূর্ণতার পথ সুগম করে।

"মানুষী অনুভূতির কাছে সেই অসংখ্য পরিশ্রমী প্রাচীন এবং নির্বিরোধ সামাজিক সংগঠনগুলির ভেংগে পড়া এবং টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া, দুঃখ-সাগরে নিক্ষিপ্ত হওয়া এবং সমসময়েই তাদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে···তাদের বংশানুক্রমিক জীবিকার উপায় হারানো যতই পীড়াদায়ক হোক না কেন, আমরা যেন ভুলে না যাই যে এই নির্মল গ্রাম্য সমাজগুলি···সর্বদাই ছিল প্রাচ্য স্বৈরাচারের দৃঢ় ভিত্তি, এরাই মানুষের মনকে ক্ষুদ্র অচলায়তনে আবদ্ধ রেখে-ছিল, ফলতঃ যে মন হয়েছিল কুসংস্কারের অপ্রতিরোধী হাতিয়ার, ছিল প্রথাগত বিধির চাপে, সব বৈভব আর ঐতিহাসিক শক্তির থেকে ছিল বঞ্চিত হয়ে।"১৮

ঐতিহাসিকভাবে ভারতীয় জনগণের অখণ্ড জাতীয় অর্থনীতি উদ্ভবের আগেই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতির পতন হতে থাকে। অনুরূপভাবে, সমগ্র ভারতীয় জনগণ একটি জাতিতে সংহত হবার এবং এক ও ঐতিহাসিক-ভাবে উচ্চতর সামাজিক, রাজনীতিক, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রায় উপনীত হবার আগে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং প্রায় বদ্ধ গ্রামীণ সমাজ ভেংগে পড়তে থাকে।

যেসব কারিগরেরা গ্রাম ছেড়ে এসেছিল এবং শহরে কর্মী হয়ে উঠেছিল, তারা শ্রমিকশ্রেণীভুক্ত হয়ে গেল, যে শ্রমিকশ্রেণী সমস্তরকম স্থানীয় ও প্রাদেশিক সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে জাতীয় স্তরে সংগঠিত হতে শুরু করেছিল। প্রাক্তন

কারিগরেরা ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর অংশ হিসাবে ব্যাপকতর সচেতনতা গড়ে তুলেছিল। তারা একটা জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীও গড়ে তুলেছিল।

এমনকি বিধ্বস্ত কারিগরদের সেই অংশ যারা জমি কিনেছিল ও কৃষকে পরিণত হয়েছিল, অথবা যারা সঙ্গতির অভাবে খেতমজুরে পরিণত হয়েছিল তারাও একটা ভিন্ন ও ব্যাপকতর সচেতনতা গড়ে তুলেছিল। ভারতীয় কৃষির রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা নতুন অবস্থায় তারা আর আর্থিকভাবে স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রামসমাজের সভ্য নয়, বরং তারা আর্থিকভাবে এক নতুন শ্রেণী গড়ে তুলেছিল যা ছিল ভারতীয় জাতির অবিচ্ছেদ্য অংগ। এখন একই ভূমি আইন ও ভূমিব্যবস্থার অধীন হওয়ার দরুন ভারতবর্ষ জুড়ে সব কৃষক ও খেতমজুরের স্বার্থ ছিল মোটামুটি একইরকম। এই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তাদের মধ্যে ব্যাপকতর শ্রেণীসচেতনতা ও জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠেছিল এবং সময়ে তাদের সারা ভারত কিষান সভা (All India Kisan Sabha) এবং অন্যান্য সংগঠন গড়ে তুলতে ও তাতে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

এমনকি যেসব কারিগরেরা তখনও টিকে ছিল তারা প্রাক্-ব্রিটিশযুগে যারা ছিল তাদের থেকে ভিন্ন। শেষোক্তগণ যখন কেবলমাত্র গ্রামের ক্রীতদাস ছিল ও প্রধানতঃ গ্রামের প্রয়োজন মেটাত, পূর্বোক্তগণ বাজারের জন্য উৎপাদন করত। এইজন্য তারা বহির্বিশ্বের দাম ও অন্যান্য শক্তির গতিবিধি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হত। সুতরাং তারা আর্থিক আত্মরক্ষার জন্য জাতীয় ভিত্তিতে নিখিল ভারত চরখা সংঘের মতন (All India Spinners' Association) সংগঠন গড়ে তুলে নিজেদের সংগঠিত করল। এইভাবে গ্রামীণ কারিগরদের মধ্যে একটা ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গী ও অভিজ্ঞতা গড়ে উঠেছিল। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের কারিগরদের থেকে অনেক বেশি উদ্যম ও ব্যক্তিত্ব সে দেখাত।

গ্রামীণ হস্তশিল্পের পতনের অবদান রয়েছে যে ধ্বংসে সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম ধ্বংসের এই হল মুখ্যতঃ ঐতিহাসিক দিক থেকে প্রগতিশীল ফলাফল।

সূত্র নির্দেশ

১ Gadgil দ্রষ্টব্য।
২ Gadgil, Buchanan, Wadia and Merchant দ্রষ্টব্য।
৩ Gadgil and Buchanan দ্রষ্টব্য।
৪ Buchanan, পৃ. ১৩০।
৫ উপরিউক্ত, পৃ. ৭৭-৮।
৬ Gadgil দ্রষ্টব্য।
৭ Buchanan এবং Gadgil দ্রষ্টব্য।
৮ Gadgil দ্রষ্টব্য।
৯ উপরিউক্ত।
১০ Report of the Finance Commission, 1896.
১১ Gadgil, পৃ. ১৭৫।

১২ Buchanan, পৃ. ৭৭।
১৩ Gadgil, পৃ. ১৬৩।
১৪ Gandhi, *Harijan*, ১৯ নভেম্বর, ১৯৩৮।
১৫ R. P. Dutt, পৃ. ৫১৫।
১৬ উপরিউক্ত, পৃ. ৫১৫।
১৭ R. P. Dutt, পৃ. ১২৯।
১৮ Karl Marx, পৃ. ২০-১।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আধুনিক ভারতীয় শিল্পের উদ্ভব ও প্রসার

ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্পের বিকাশ

ব্রিটিশ শাসনের আমলে ভারতে আধুনিক যন্ত্রভিত্তিক শিল্পের প্রতিষ্ঠা দেশের জাতীয় অর্থনীতিকে সংহত করার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এর ফলে প্রথম কতকগুলো সামাজিক শক্তি সৃষ্টি হয়েছিল যা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিস্তারের প্রেরণা যুগিয়েছিল। এটা সত্যি যে অনেক কারণে ভারতবর্ষের শিল্পোন্নয়ন অপ্রতুল ও ভারসাম্যহীন ছিল। তবু এই শিল্পোন্নয়ন এমন কতকগুলো জোরালো সামাজিক শক্তি সৃষ্টি করেছিল যা জাতীয় অগ্রগতিতে সাহায্য করেছে। এদের মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণটির কেবল উল্লেখ করলে বলতে হয় যে আধুনিক শিল্পের বিস্তার আধুনিক শিল্প-নগরগুলির জন্ম দিয়েছে। এই শিল্পনগরগুলো ছিল ব্যাপক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের মঞ্চ এবং সাধারণতঃ সব প্রগতিশীল আন্দোলন উদ্ভূত হওয়ার প্রধান উৎস। তাছাড়া, আধুনিক শিল্পের বিস্তারের ফলে নতুন নতুন সামাজিক গোষ্ঠী যেমন বুর্জোয়া বা প্রোলেতারিয়েত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। সমসাময়িক সমাজের আন্দোলনে এই দুটো মুখ্য শ্রেণীর নির্দিষ্ট গুরুত্ব মহান, এমনকি চূড়ান্তও ছিল।

বুর্জোয়া এবং প্রোলেতারিয়েতরাই হল আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের মূল দুটো শ্রেণী। প্রতিযোগিতা ও পণ্য উৎপাদনকে ভিত্তি করে পুঁজিবাদী অর্থনীতি যতই অগ্রসর হয় ততই মধ্যশ্রেণীর ছোট ছোট কারিগর প্রভৃতি উৎপাদকরা বাজারে শক্তিশালী শিল্পপ্রতিযোগীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না পেরে বিধ্বস্ত হয় এবং উত্তরোত্তর মজুরে পরিণত হয়। গ্রামাঞ্চলেও পুঁজিবাদী আর্থিক পরিবেশের কারণে উত্তরোত্তর দারিদ্র্যের দরুন স্বত্ববান কৃষকদের মধ্যস্তর ক্রমশ বেশি করে মহাজন, বণিক এবং অন্যান্য পুঁজিপতিদের কাছে জমির স্বত্ব হারিয়ে ফেলত এবং তাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ভূমিহীন কৃষক অথবা কৃষি সর্বহারায় পরিণত হয়।

এইভাবে যখন মধ্যবর্তী সামাজিক গোষ্ঠীগুলি টলমলে এবং বিলীয়মান সামাজিক স্তর, তখন প্রোলেতারিয়েত কিন্তু সুস্থিত এবং বিকাশমান শ্রেণী হিসেবেই থাকছে। প্রোলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে বিরোধই সুতরাং পুঁজিবাদী সমাজে মূল বিরোধ যা এই সমাজকে সচল রাখে। এই শ্রেণীসংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণী সমাজতন্ত্রকে তার লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে নেয়। এই সমাজতন্ত্র

হল এমনই এক সমাজব্যবস্থা যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মতন মজুর শ্রমিক এবং উৎপাদনের উপাদানে ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তি করে গড়ে ওঠে না, উৎপাদনের উপাদানের সামাজিক মালিকানা এবং সমস্ত শ্রমিকের অবাধ ও সহযোগী শ্রমের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে।

ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী যখন জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে তখনও স্বাধীনতাকে মনে করেছে সমাজতান্ত্রিক মুক্তির একটা দিকচিহ্ন।

ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্প বিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ব্রিটিশ শাসনের আমলে এইসব শিল্পের উদ্ভব ও বিস্তার তাদের অগ্রগতির ব্যাপকতা ও প্রকৃতি এবং তাদের সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে আমরা এখন একটা সমীক্ষা গ্রহণ করব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রেলপথ চালু হওয়ায় ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্প গড়ে ওঠার পূর্বশর্ত সৃষ্টি হয়েছিল। লর্ড ডালহৌসি তার বিখ্যাত Minute on Railways-এ রেলওয়ে প্রতিষ্ঠা করার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যটি এইভাবে বর্ণনা করেছেন:

"এর প্রবর্তনের ফলে যে বাণিজ্যিক ও সামাজিক সুবিধা ভারতবর্ষ পাবে তা বর্তমানের সবকিছু হিসাবের ঊর্ধ্বে। ইংলন্ড তুলোর জন্য চীৎকার করছে যে তুলো ভারতবর্ষ এখনই কিছু পরিমাণে উৎপাদন করে, আর গুণগতমানে যথেষ্ট ও পরিমাণে প্রচুর তুলো উৎপাদন করতে পারবে যদি একমাত্র দূরদূরান্ত থেকে রপ্তানি করার জন্য বিভিন্ন বন্দরের সংগে পরিবহনের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকত। ভারতের দূরতম প্রান্তে ইউরোপে প্রস্তুত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির সংগে সংগে বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। পৃথিবীর এই অংশে আমাদের পণ্যের বাজার খুলে যাচ্ছে। যে পরিস্থিতিতে বাণিজ্যের এই প্রসার হচ্ছে সেটা বিস্ময়কর। পণ্যের সম্ভাব্য মূল্য ও ভবিষ্যতে চাহিদার প্রসার দূরতম কল্পনাতেও এমনটা আন্দাজ করা যায় নি।"[১]

এইভাবে ব্রিটিশ শিল্পের কাঁচামাল ও বাজারের চাহিদা মেটানোর জন্যই প্রধানতঃ ভারতবর্ষে রেলপথ নির্মাণ করা হয়েছিল। এই নির্মাণ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োগের এবং ব্রিটেনের ক্রমবর্ধমান ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প পণ্য বিক্রয়ের সুযোগও করে দিয়েছিল।

রেলপথ প্রবর্তন এবং ভারতীয় বণিকশ্রেণীর হাতে মূলধন হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে এমন যথেষ্ট সঞ্চয় হওয়াতে ভারতবর্ষে ভারতীয় মালিকানায় আধুনিক শিল্প সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল।

এই অগ্রগতিতে রেলওয়ের ভূমিকা সম্পর্কে কার্ল মার্কস লিখেছেন:

"লোহা ও কয়লার অধিকারী এমন দেশের চলৎশক্তিতে একবার যন্ত্র চালু করলে তার বিস্তার আর আটকে রাখা যায় না। রেলওয়ে চলৎশক্তির সবরকম তাৎক্ষণিক ও সাম্প্রতিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য প্রয়োজনীয় সবরকম প্রক্রিয়ার প্রবর্তন ছাড়া একটা বিশাল দেশে রেলপথের বিস্তার রক্ষা করা যায় না। এর

ফলে যেসব শিল্প সরাসরি রেলের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন সব শিল্পের শাখাতেও যন্ত্রের ব্যবহার অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। তাই ভারতবর্ষে রেলব্যবস্থা হবে আধুনিক শিল্পের প্রকৃতই অগ্রদূত।"২

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতবর্ষে ব্রিটিশেরাই ছিল আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠার পথিকৃৎ। নীল, চা, কফি প্রভৃতি বাগিচা শিল্পগুলো তারাই শুরু করেছিল।

১৮৫০ থেকে ১৮৫৫ সালই হল সেই সময় যখন প্রথম সুতাকল, কয়েকটা চটকল এবং কয়লাখনি শুরু হয়েছিল। ১৮৭৯ সালে ভারতবর্ষে ৫৬টা সুতাকল ছিল। প্রধানতঃ ইউরোপীয় মালিকানায় চটকলগুলোর সংখ্যা ১৮৮২ সালে ২০তে গিয়ে দাঁড়ায়। ১৮৮০ সালে দেশে ৫৬টা কয়লাখনি চালু ছিল। ভারতবর্ষে ১৮৮০ সালে এই তিনটেই মাত্র মুখ্য আধুনিক শিল্প ছিল।

১৮৮০ থেকে ১৮৯৫ সালের মধ্যে যদিও কোনো গুরুত্বপূর্ণ নতুন শিল্প গড়ে ওঠে নি তবু পুরানো শিল্পগুলোর উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছিল। বিশেষ করে সুতীবস্ত্র শিল্পের বিস্তার লক্ষণীয় ছিল, ১৮৯৪-৯৫ সালে সুতা-কলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৪৪। সেই একই বছরে চটকলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৯ এবং কয়লাখনির সংখ্যা ১২৩।৩

রানাডের মতন জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদেরাও এই সময়কালে ভারতীয় শিল্পের নিয়ত অগ্রগতিতে অভিভূত হয়েছিলেন এবং ভারতীয় জাতির একটা বিরাট শিল্পভবিষ্যৎ দেখেছিলেন। রানাডে বলেছিলেন, "ভারতবর্ষ এখন ভালভাবেই এমন একটা পথে প্রবেশ করেছে যা পুঁজিবাদীদের উদ্বুদ্ধ করেছে যে উদ্দীপনায় সেই উদ্দীপনাতে চালিত হলে, শিল্পোত্তরণ না ঘটিয়ে পারে না।"৪

১৮৯৫ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে ভারতীয় শিল্প বিশেষ করে বস্ত্রশিল্পের বৃদ্ধির হার কমে যায়। দুটো ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের দরুন কৃষি জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার দারুণ অবনতিই এর প্রধান কারণ। আরো তাছাড়া ১৯০২ সালে তুলোর বাজারে মার্কিন ফাটকা তুলোর দাম খুব বাড়িয়ে দেয় এবং তার ফলে ভারতীয় শিল্পগুলো প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত হয়, এও একটা কারণ। এই সব প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও ভারতীয় শিল্প এই বছরগুলোতে কিছুটা মন্থর-গতিতে হলেও উন্নতি লাভ করছিল।

১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়। মুখ্যতঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই আন্দোলন শুরু করেছিল। এই আন্দোলন ভারতীয় শিল্পের বিস্তারে প্রেরণা যুগিয়েছিল। ১৯১৩-১৪ সালে সুতাকলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ২৬৪ এবং চটকলের সংখ্যা ৬৪। কয়লাখনি শিল্প যা অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলছিল তা ১৯১৪ সালে ১৫১,৩৭৬ জন শ্রমিক নিয়োগ করেছিল। এই শিল্পের বৃদ্ধি হয়েছিল প্রধানতঃ যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার এবং কারখানা শিল্পের বিস্তারের দরুন।

১৮৯০ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে নতুন কতকগুলো শিল্প শুরু হল যেমন পেট্রোলিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, শোরা ইত্যাদি। কতকগুলো চালকল এবং কাঠের কলেরও প্রবর্তন হল। এ বাদেও "ইঞ্জিনিয়ারিং, রেল কারখানা, লোহা এবং পিতলের ঢালাইখানা দ্রুত গড়ে উঠছিল।"৫

ডি. এইচ. বুকানন ১৮৯০ থেকে ১৯১৪ সালের শিল্পবিস্তারকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন :

"১৮৯০ থেকে বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতিটা বেশ দ্রুত ছিল। তুলো কাটার টাকু দু গুণেরও বেশি হয়েছিল, যান্ত্রিক তাঁত তিনচারগুণ হয়েছিল, চটকল তাঁত সাড়ে চার গুণ বেড়েছিল এবং কয়লা তোলা ছয় গুণ বেড়েছিল।"৬

এই দ্রুত অগ্রগতি সত্ত্বেও ভারতীয় শিল্প বৃদ্ধির স্তর নীচু ছিল। মুখ্যতঃ তুলা এবং চটশিল্পেই একমাত্র অগ্রগতি হয়েছিল। ভারী শিল্প ছিলই না। "ইঞ্জিনিয়ারিং বলতে ছিল শুধুমাত্র সারাই-এর কারখানা তাও প্রধানতঃ রেলের; ১৯১৪ সালের যুদ্ধের ঠিক আগে লোহা ও ইস্পাতশিল্পের সামান্যতম সূচনা হয়; কোনরকম যন্ত্র উৎপাদন ছিল না।"৭

ভারতবর্ষের শিল্পোন্নয়ন যে দ্রুততর গতিতে এগোয় নি তার কতকগুলো কারণ ছিল। দ্রুত অগ্রগতির জন্য নতুন ভারতীয় শিল্পগুলোর প্রয়োজন ছিল সংরক্ষণ ও সাহায্যের যাতে তারা ব্রিটেন, জার্মানী ও অন্যান্য দেশের শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পের সংগে সফল প্রতিযোগিতা করতে পারে। ভারতীয় সরকার সেইরকম কোনো সংরক্ষণ দেয়নি। এই সরকার ভারতীয় শিল্পগুলোকে নির্দিষ্ট কোনো সাহায্যও করেনি। ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞরাও স্বীকার করেছেন সরকারের এই নীতিই দ্রুত শিল্প অগ্রগতি ব্যাহত করার অন্যতম প্রধান কারণ।

"ভারতে শিল্প অগ্রগতি সম্পর্কে আমাদের অতীতের দলিল সবসময় খুব বাহাদুরির ছিল না। শুধুমাত্র যুদ্ধের প্রয়োজনের চাপে পড়েই সরকার খাঁটি ভারতীয় উদ্যোগের প্রতি আগেকার নিস্পৃহতার বা ঈর্ষার মনোভাব ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল।"৮

ভারতে সরকারের ওপর ব্রিটিশ আর্থিক স্বার্থের সৃষ্টি করা চাপই যে ভারতীয় শিল্পসমূহকে সাহায্য দেওয়া থেকে বাদ দেওয়ার কারণ তা ১৯২১ সালের সরকারি বার্ষিক রিপোর্টে ঘোষণা করা হয়েছিল। "যুদ্ধের কিছু আগে নতুন কারখানা খুলে এবং সরকারি ভরতুকি দিয়ে ভারতীয় শিল্পগুলোকে উৎসাহিত করার কোনো কোনো প্রচেষ্টা হোয়াইটহল থেকে সক্রিয়ভাবে বাধা দেওয়া হয়েছে।"৯

দ্রুত শিল্পোন্নয়নের পথে আর একটা বাধা হল প্রযুক্তিবিদের অপ্রতুলতা। কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল খুব সামান্য।

"সরকার ও জনসাধারণের সামনে কুড়ি বছরেরও ওপর কারিগরি শিক্ষার প্রশ্নটা ছিল। সম্ভবতঃ আর কোনো বিষয়ই নেই যার সম্বন্ধে এত লেখা বা বলা হয়েছে অথচ কাজ হয়েছে কম।"১০

১৯১৪-১৮ সালে যুদ্ধের সময় বিদেশী জিনিসের আমদানি উল্লেখযোগ্য-ভাবে কমে যাওয়াতে আর তাছাড়া, যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাতে ভারতীয় শিল্প আরও উন্নত হয়েছিল। সরকার শিল্পায়নকে তার সক্রিয় নীতি হিসেবে ঘোষণা করেছিল। ১৯১৫ সালে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ ব্যাপারটাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

"এটা আরো বেশি করে স্পষ্ট হচ্ছে যে ভারতবর্ষের শিল্পক্ষমতাকে বাড়িয়ে তুলবার জন্য যুদ্ধের পর একটা নির্দিষ্ট ও সচেতন নীতি নিতে হবে, যদি না

তাকে বিদেশী উৎপন্নের মাল খালাসের জায়গা হয়ে উঠতে হয় কারণ, যতই একথা তাদের কাছে পরিষ্কার হবে যে বড় দেশগুলোর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তাদের আর্থিক অবস্থার ওপর ততই ঐ দেশগুলো আরও বেশি করে বাজারের জন্য লড়াই করবে। ভারতীয় জনসাধারণের এই প্রশ্নের প্রতি একই মনোভাব এবং তা হিসেব-বহির্ভূত করা যায় না···

যুদ্ধের পর ভারতবর্ষ শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে সম্ভবমত নিজের জায়গা করে নেওয়ার জন্য সরকারের সংগতিতে সর্বাধিক সাহায্য দাবি করার যোগ্য বলে নিজেকে মনে করবে।"১১

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ১৯১৬ সালে শিল্প কমিশন (Industrial Commission) নিযুক্ত হয়েছিল।

১৯১৮ সালে প্রকাশিত মণ্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্টে বলা হয়েছে ঃ

"সবদিক থেকে বিবেচনা করলে শিল্পোন্নতির জন্য একটা তৎপর নীতি এখনই বিশেষভাবে প্রয়োজন। শুধুমাত্র ভারতবর্ষের আর্থিক স্থিতি আনার জন্য নয়, তার জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্যও বটে···

আর্থিক ও সামরিক উভয়যুক্তিতেই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থও চায় যে ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সম্পদ এখন থেকে আরও ভালভাবে ব্যবহৃত হোক। শিল্পোন্নত ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যকে যে কি পরিমাণ শক্তি যোগাতে পারে আমরা তা পরিমাপ করতে পারি না।"১২

বিদেশী প্রতিযোগিতা প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকায় যুদ্ধের সময় বস্ত্র এবং চটশিল্প বিস্তার লাভ করেছিল। ইস্পাতের উৎপাদন ১৯১৩ সালে ৯১,০০০ টন থেকে বেড়ে ১৯১৮ সালে ১২৪,০০০ টনে দাঁড়ায়।

একটা দেশের দ্রুত শিল্প বিকাশের জন্য গোড়াতেই দরকার সেই দেশে মৌলিক ভারীশিল্পের (মেটালার্জি ও যন্ত্রে তৈরি) উপস্থিতি। ভারতবর্ষে সেইরকম শিল্পের বাস্তব অনুপস্থিতিই যুদ্ধের সময় শিল্পবিস্তারের একটা সীমা বেঁধে দিয়েছিল।

"বুনিয়াদি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ভারী রাসায়নিক শিল্পের বাস্তব অনুপস্থিতিই ছিল ভারতবর্ষের শিল্পকাঠামোর সব থেকে দুর্বল ক্ষত।"১৩ যুদ্ধের সময় ভারতীয় শিল্প যতটা বিস্তার লাভ করা উচিত ছিল ততটা করতে পারে নি কেননা দেশে এমন কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্প ছিল না যা শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক, রঞ্জক ও অন্যান্য দ্রব্য তৈরি করত। ১৯১১ সালে জে. এন. টাটা প্রতিষ্ঠিত লৌহ ও ইস্পাতশিল্প ভারতীয় শিল্পের প্রয়োজনগুলো কেবলমাত্র অংশতঃ মিটিয়েছিল।

ভারতীয় শিল্পের যুদ্ধের সময় অগ্রগতি যথেষ্ট না হওয়ার আরো অন্যান্য কারণ ছিল, যখন মূলতঃ যুদ্ধের প্রয়োজনে জাহাজ এদিক সেদিক চলাচল করার দরুন বাইরের দেশে থেকে আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছিল। লোকনাথন তা এইভাবে বিবৃত করেছেন ঃ

"দেশীয় পুঁজি, শিল্প-নেতৃত্ব এবং কারিগরি দক্ষতার অভাব ছাড়াও উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং সম্পদের সরবরাহের মধ্যেও যথেষ্ট ফারাক ছিল। গন্ধক, তামা, দস্তা, সীসা এবং রবার ইত্যাদির সরবরাহও যথেষ্ট ছিল না। কয়লা যদিও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত তবু তা বাংলাদেশ ও

বিহারে কেন্দ্রীভূত থাকার দরুন সমভাবে বণ্টিত হত না। বাংলাদেশ ও বিহারে মোট উৎপাদনের ৯০ ভাগ উৎপাদিত হত। আবার ভারতবর্ষে এক নতুন ধরনের শিল্পনেতৃত্ব গড়ে উঠেছিল সাধারণভাবে যাকে ম্যানেজিং এজেন্সি সিস্টেম বলা হয়। এই ব্যবস্থার একটা ক্ষতিকারক প্রভাব এই ছিল যে ম্যানেজিং এজেন্টরা নতুন ও সম্ভবতঃ বিপদসঙ্কুল উদ্যোগে টাকা খাটানোর ঝুঁকি নেওয়ার প্রেরণা হারিয়ে ফেলেছিল। অন্যদিকে এই ম্যানেজিং এজেন্টরা যন্ত্রের ও যন্ত্রাংশের আমদানিকারক হিসেবে এবং ব্যবসায়ী ও বীমা দালাল হিসেবে প্রচুর কমিশন রোজগার করতে পারত। সর্বোপরি ভারতবর্ষের মতো একটা গরীব দেশে অবাধ বাণিজ্যনীতি যথোপযুক্ত ছিল না। শুধুমাত্র একটা সুসংহত সরকারি পরিকল্পনার মাধ্যমেই এমন একটা দেশের উন্নতি করা যেতে পারে···

তাই বিগত যুদ্ধ কতকগুলো প্রতিষ্ঠিত শিল্পে সাময়িক লাভ করে দেওয়া ছাড়া শিল্পায়নের পথে দেশকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কিছুই করে নি।"১৪

শিল্প কমিশনের প্রতিবেদনে কতকগুলো সুপারিশ ছিল। এর মধ্যে সব থেকে প্রয়োজনীয় হল দেশের শিল্প অগ্রগতির জন্য সরকার সক্রিয়ভাবে মনোযোগ দেবে এবং বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে শিল্পোন্নয়নকে সাহায্য করবে, যেমন যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি কর্মী গড়ে তুলবে যারা শিল্পপতিদের বিদ্যমান শিল্পবিকাশে ও দেশের নতুন গুরুত্বপূর্ণ শিল্প তৈরিতে সাহায্য ও পরিচালনা করবে। এইসব সুপারিশের মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণগুলিই অপূর্ণ থেকে গেছে।১৫

১৯১৯ সালের Reforms Act শিল্পকে প্রাদেশিক বিষয়ের আওতায় আনল। কিন্তু প্রদেশগুলো কারিগরি ও আর্থিক উভয়দিক থেকেই এত দুর্বল ছিল যে তারা উল্লেখযোগ্য শিল্পবিস্তারে সাহায্য করতে পারে নি। এই সম্বন্ধে ডি. এইচ. বুকানন বলেছেন:

"১৯১৯ সালে সংবিধান সংশোধনের সময় (শিল্পসংক্রান্ত) প্রাদেশিক সংগঠনকে করা হয়···অন্যতম 'হস্তান্তরিত বিষয়' এবং ফলে নির্বাচিত বিধানমণ্ডলীর কাছে দায়ী এমন স্থানীয় সরকারের হাতে বিষয়টি ন্যস্ত হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ এর জন্য যা পুঁজি পাওয়া গিয়েছিল তা একেবারেই যথেষ্ট নয়, কোনো উল্লেখযোগ্য নীতিও চালু করা যেতে পারে নি। অধিকন্তু শিল্পকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য প্রয়োজন সুদূরপ্রসারী সুসংহত সরকারি নীতি যা শুধুমাত্র কাঁচামাল এবং উৎপাদন পদ্ধতি সংক্রান্ত নয়, বাজার সংক্রান্তও বটে ···ভারতবর্ষে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠাপিত প্রাদেশিক দপ্তরগুলো থেকে কোনো উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যাবে কিনা তা সন্দেহজনক।"১৬

১৯২২ সালের ফিস্‌কাল কমিশন 'পক্ষপাত সংরক্ষণ নীতি' সুপারিশ চালু করার জন্য সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিল। সরকার ১৯২৩ সালে তা কার্যকর করে। এই নতুন নীতির ফলে ১৯২৩ সালে একটা শুল্ক বোর্ড (Tariff Board) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৪ সালে নবপ্রতিষ্ঠিত টাটা লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সরকারি ভর্তুকি পায় এবং সাড়ে ৩৩ শতাংশ হারে সংরক্ষণ পায়। এই শিল্পটি ছাড়া আরও অনেকগুলো শিল্প যেমন বস্ত্র, দেশলাই, চিনি এবং অন্যান্য কয়েকটা শিল্পকে বিভিন্ন প্রকারে সংরক্ষণ দেওয়া হয়েছিল।

শিল্পোন্নয়নকে সাহায্য করবার জন্য পরবর্তী সময়ে Central Bureau of Industrial Intelligence and Research প্রতিষ্ঠিত হয়।

এইসব ব্যবস্থা অবশ্য ভারতীয় শিল্পের অবাধ, দ্রুত এবং যথেষ্ট বিস্তারের জন্য আবশ্যিক পূর্বশর্ত ভারীশিল্পের বিকাশের পথে নিয়ে যায় নি। এম. বিশ্বেশ্বরাইয়া তার Planned Economy for India (1936) বইতে লিখেছেন, "বর্তমানের সব থেকে প্রয়োজনীয় যে ভারীশিল্প তা সাংঘাতিকভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে।"[১৭]

টাটা লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকে যে ভর্তুকি দেওয়া হয়েছিল তা ১৯২৭ সালে প্রত্যাহার করা হয়।

১৯২৭ সালের পর থেকে ভারতীয় শুল্ক ব্যবস্থা রাজকীয় পছন্দের নীতিতে পরিচালিত হত যা "ভারতীয় বাজারে সাম্রাজ্য-বহির্ভূত দেশ ও ভারতবর্ষ এই উভয়ের উৎপাদনের ওপরে"[১৮] মূলতঃ ব্রিটিশ পণ্যের সুবিধার জন্য কাজ করত। ১৯৩২ সালে অটোয়া চুক্তি রাজকীয় পছন্দের নীতিকে ভিত্তি করে সম্পাদিত হয়েছিল। এসবের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের পক্ষ থেকে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। কিন্তু এই বিরোধিতা সত্ত্বেও এগুলো কার্যকর হয়। Kate Mitchell বলেছেন : "এইভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের শুল্ক ব্যবস্থা ভারতীয় শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার একটা উপায় বলে মূলতঃ দাবি করলেও এমন একটা ব্যবস্থায় পর্যবসিত হয়েছিল যা ব্রিটিশ শিল্পকে ভারতীয় বাজারে প্রতিযোগিতা করার জন্য সাহায্য করেছিল। এর প্রতিদানে ভারতবর্ষ ব্রিটিশের বাজারে কাঁচা-মাল ও আধা-তৈরি দ্রব্যাদি সুবিধা দরে বিক্রি করার সুযোগ পেয়েছিল···যা ছিল প্রাক্ ১৯১৪ সালের পর্যায়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুস্পষ্ট চেষ্টা।"[১৯]

১৯২৯-৩৩ সালের আর্থনীতিক মন্দা ভারতীয় কৃষককুলকে গভীরভাবে আঘাত করেছিল। যেটুকু সোনা তাদের সঞ্চিত ছিল সেটুকুও তাদের বের করে দিতে হয়েছিল।[২০] ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারতীয় জনসাধারণের সোনা সঞ্চয় আবারও কমে গেল। এর ফলে তাদের শিল্পদ্রব্য কেনার ক্রয়ক্ষমতাও হ্রাস পেল। এ সবকিছুই শিল্পবিস্তারকে প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করেছিল।

এই ক্ষতি সম্পর্কে Kate Michell বলেছেন, "ভারতীয় কৃষকের ব্যাপক অংশের অতীত সঞ্চয় থেকে সোনা ক্ষয়ের অর্থ ভারতীয় বাজারের আরো দারিদ্র্য ও সেই সঙ্গে ভারতীয় শিল্পের মন্দা।"[২১]

এইসব অসুবিধা সত্ত্বেও দুটো যুদ্ধের মধ্যবর্তী বছরগুলোতে আধুনিক শিল্প দৃঢ়ভাবে গড়ে উঠেছিল। পরের পাতায় পরিসংখ্যানে এই সময়ের কয়েকটা উল্লেখযোগ্য শিল্পের অগ্রগতি দেখা যায়।

ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী শিল্পের বিস্তার ঘটায় বিদেশ থেকে ভারতবর্ষে সেইসব জিনিসের আমদানি কমে গেল। "সাধারণ ভোগদ্রব্যের আমদানির আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা ছিল। সাধারণের ভোগ্য জিনিসের আমদানি ১৯২৬-২৭ সালে শতকরা ৩৭ ভাগ থেকে ১৯৩৮-৯এ ২০ ভাগে নেমে গিয়েছিল।··· কাঁচামালের (যেমন বয়নশিল্পের মাল, রঞ্জক, রঙ প্রভৃতির) আমদানি অনেক বেড়ে গিয়েছিল। ১৯২২-২৩ সালে মোট আমদানি শতকরা ১৬ ভাগ থেকে ১৯৩৮-৯ সালে শতকরা ২৪ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি

পেয়েছিল। যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মূলধনী দ্রব্য যা ১৯২৬-৭ সালে মোট আমদানির শতকরা ১৯ ভাগ ছিল তা ১৯৩৮-৯ সালে বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা ২৫ ভাগ।"২২

		১৯২২-২৩	১৯৩৮-৩৯
সিমেণ্ট	টন	১৯৩,০০০	১,১৭০,০০০
কয়লা	মিলিয়ন টন	১৯	২৮·৩
তুলো	মিলিয়ন গজ	১,৭১৩·৫	৪,২৬৯·৩
চট	মিলিয়ন গজ	১,১৮৭·৫	১,৭৭৪
দিয়াশলাই	মোট বাক্স (১৯৩৪-৫)	১৬,৫০০,০০০	২১,১০০,০০০
কাগজ	টন	২৩,৫৭৬	৫৯,১৯৮
আকরিক লোহা	টন	৪৫৫,০০০	১,৫৭৫,৫০০
চিনি	টন	৮৪,০০০	১,০৪০,০৪৮
সালফ্যুরিক অ্যাসিড		৫২৯,৬৩৭	৬০৭,০০০
ইস্পাত	টন	১৩১,০০০	৯৭৭,৪০০

(Wadia and Merchant পৃ. ২৮৫-৬)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের প্রশ্নে ভারতীয়দের উত্তরোত্তর বিদেশী রাষ্ট্রের থেকে স্বনির্ভরতা এবং মূলধনী দ্রব্যের ব্যাপারে বিদেশী রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরতা প্রসঙ্গে ওয়াদিয়া এবং মার্চেণ্টের উক্তি উদ্ধৃত করা হল :

"শিল্প সংক্রান্ত প্রশ্নে যুদ্ধ বাধবার আগেকার আর্থিক পরিস্থিতি নিম্নে এইভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যায়। সংরক্ষিত শিল্পবিস্তারের ফলে মোট জাতীয় আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে নি। এইসব শিল্পের অস্তিত্ব এবং এদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা এমন পর্যায়ে উন্নীত হয় নি যাতে দেশ ভবিষ্যৎ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকবার মতো স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারে, কারণ, যদিও চিনি, তুলা, লোহা ও ইস্পাতের যোগানের ব্যাপারে আমরা বিদেশের ওপর নির্ভরশীল নই কিন্তু উৎপন্ন কাঁচামাল নেওয়ার ব্যাপারে আমরা বহুলাংশে বিদেশের ওপর নির্ভরশীল। এর চেয়েও বড় কথা এই যে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মূলধনী দ্রব্য যেগুলো ছাড়া নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, সেগুলোর ব্যাপারে আমরা বিদেশের ওপর এখনও নির্ভরশীল।"২৩

আধুনিক শিল্পের এই দ্রুত অগ্রগতি সত্ত্বেও ভারতবর্ষে শিল্পের অবক্ষয় ঘটছিল। কেননা যে হারে প্রাক্-আধুনিক দেশীয় শিল্পগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছিল তার সঙ্গে আধুনিক শিল্পের অগ্রগতি পিছিয়ে পড়ছিল। ১৯৩৬ সালে **The Economist** পত্রিকাতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিশেষ সংখ্যায় লেখা হয়েছিল যে "শিল্প-নির্ভর জনসংখ্যার অনুপাত মোটের ওপর কমের দিকে যাচ্ছিল···যদিও ভারতবর্ষে শিল্পগুলোর আধুনিকীকরণ শুরু হয়েছে তবুও এই দেশ যে 'শিল্পোন্নত' হয়েছে এখনও সেকথা বলা যায় না।"২৪

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯৩৯ সালে। এই যুদ্ধের প্রভাবে ভারতীয় শিল্পোন্নয়নে নতুন প্রেরণা এল। পরবর্তী পরিসংখ্যানে এই বিস্তারের পরিচয় পাওয়া যাবে।

জাহাজ, বিমান ও ঐরকম কয়েকটা শিল্পে তেমন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়ই নি।

যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি থাকার দরুন ভারী শিল্পের কোনোরকম বাস্তব অগ্রগতি হয় নি। এই ভারী শিল্পই হল একটা দেশের স্বনির্ভর ও দ্রুত শিল্পোন্নতির প্রাথমিক পূর্বশর্ত ও সাধারণ অর্থনৈতিক অগ্রগতির সূচক। কয়েকটা লঘু শিল্প অবশ্য এই সময়ে উন্নতি করেছিল।

	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৯-৪০	১৯৪০-৪১	১৯৪১-৪২	১৯৪২-৪৩	গড়
লোহ ও ইস্পাত	১০০	১১০	১২৫	১৫০	২০০	১৪৬
তুলা তৈরি	১০০	৯৪	১০০	১৫৩	৯২	১১০
চট তৈরি	১০০	১০৬	৯১	১০৩	৮৫	৯৬
চিনি কল	১০০	১৯১	১৬৮	১২০	১৬৩	১৬০
কাগজ	১০০	১১৮	১৪৯	১৫৯	১১২	১৩৪
বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন	১০০	১০৯	১১৫	১৩৫	১৩৫	১২৩

(এন. সি. জৈন, Indian Economy During the War, পৃ.৩১)

"এমনকি যুদ্ধকালীন সময়েও যেটুকু অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয় তাও প্রায় সবটাই ভোগ্যপণ্য শিল্পেই। পাশাপাশি মূলধনী এবং উৎপাদনের শিল্পে শোচনীয় ও আশ্চর্যজনক অবহেলা ছিল। তুলো, চিনি, কাগজ, সিমেন্ট এমনকি চামড়া এসব শিল্পই বিস্তার লাভ করেছিল যখন যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ি, রেল ইঞ্জিন, জাহাজ ও বিমান তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক শিল্পগুলোকে অবহেলা করা হয়েছে।"২৫ এবং তাছাড়া "...যুদ্ধের দরুন শিল্পের যে অগ্রগতি ঘটেছিল তা চরিত্রে বস্তুত কিছুটা কৃত্রিম ও সাময়িক, প্রকৃত এবং স্থায়ী নয়।"২৬

"মোটের ওপর এই মতের যথেষ্ট সাক্ষ্য আছে যে যুদ্ধের সময় ভারতীয় শিল্প যান্ত্রিকীকরণ ও পুনর্গঠনের দুই মাত্রাতেই তার প্রতিযোগীদের থেকে পেছনে পড়ে ছিল।... ভারতবর্ষে যুদ্ধোত্তর সময়ে যখন প্রয়োজন শিল্প বিস্তারের তখন দেখা দিল শিল্প বিনাশের বিপদ।"২৭

ট্রাস্ট ও একচেটিয়া শিল্পসংস্থার উদ্ভব

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনে আধুনিক শিল্পবিকাশের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের পর আমরা এখন এই অগ্রগতির প্রধান কতকগুলো বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করব।

এই সময়ে ভারতবর্ষের বাণিজ্য, শিল্প ও ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অগ্রগতির একটা প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল যে উদ্যোগসমূহের একটা বড় অংশই কেন্দ্রীভূত ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে।

"ভারতবর্ষে প্রায় ৯০০টি কারখানা আছে ১৯৪০ সালে এবং তা প্রায় ১৭,০০,০০০০ শ্রমিককে কাজ দেয়। ভারতবর্ষে রেজিস্ট্রিকৃত কোম্পানিগুলোতে নিয়োজিত মূলধনের মোট পরিমাণ তিনশ কোটি টাকা···

"একদল ম্যানেজিং এজেণ্ট দেড়শ কোটি পুঁজিসম্পন্ন এবং শিল্পোদ্যোগের সমস্ত ক্ষেত্র জুড়ে আছে এমন প্রায় ৫০০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে। সব শিল্পেই ক্ষমতার এই কেন্দ্রীকরণ রয়েছে।"২৮

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ইতিহাস থেকে এ ইতিহাস একেবারে বিপরীত। এইসব দেশে অগ্রগতির পরবর্তী স্তরেই কেবলমাত্র এই ধরনের কেন্দ্রীকরণ ঘটেছিল।২৯ অন্যদিকে ভারতবর্ষে শিল্প প্রতিষ্ঠার কয়েক দশকের মধ্যেই এই ধরনের কেন্দ্রীকরণ হয়েছিল।

এই কেন্দ্রীভবন সম এবং অসম জোটযুক্ত ট্রাস্ট গঠনের পথে নিয়ে যায়। এই ট্রাস্টগুলো জাতির অর্থনৈতিক জীবনের এক বড় অংশই নিয়ন্ত্রণ করত। ১৯৪০ সালে দেশে এই ধরনের প্রায় ৪০টি ট্রাস্ট ছিল যারা প্রায় ৪৫০টি প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করত যাদের পুঁজি ছিল একশ দশ কোটি টাকার ওপর। এই প্রতিষ্ঠানগুলো শিল্প, পরিবহন এবং আর্থিক ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত ছিল। Killick Nixons, Sassoons, Andrew Yule, Bradys এবং Jardine এবং Skinner ছিল কতকগুলো শক্তিশালী ব্রিটিশ ট্রাস্ট। টাটা, বিড়লা এবং ডালমিয়া ছিল কতকগুলো বৃহৎ ভারতীয় একচেটিয়া কারবার।

এই ট্রাস্টগুলো প্রায় সব ধরনের আর্থনীতিক উদ্যোগ নিয়ন্ত্রণ করত যেমন টাটা ২২টা কারবার নিয়ন্ত্রণ করত যার মধ্যে ছিল ৪টা সুতাকল, ৪টা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম কোম্পানি, ৪টা বিদ্যুৎ কোম্পানি, ১টা লোহ ও ইস্পাত কারখানা, ১টা বিমান কোম্পানি, ১টা তেল কোম্পানি, ১টা ইনসিওরেন্স কোম্পানি এবং এমনকি একটা হোটেলও। অনুরূপভাবে অ্যাণ্ড্রু ইয়ুল অ্যাণ্ড কোম্পানি যা পূর্বভারতে কাজকর্ম করত তার নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল ৫২টি কোম্পানি। এর মধ্যে ছিল ১১টি চটকল, ১১টি কয়লাখনি, ১৫টি চা বাগান, ১টা কাগজকল, ২টা রবার কারখানা, ১টা তেলকল এবং এমনকি একটা জমিদারি।৩০ এইসব দৃষ্টান্তগুলো থেকে জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে সামান্য কয়েকটা ট্রাস্টের বিস্তৃত ভূমিকা এবং জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনে এদের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে।

আবার এই স্বল্পসংখ্যক ট্রাস্টের মধ্যেও নিয়ন্ত্রণটা থাকত সামান্য কয়েকজন ডিরেক্টরের হাতে, যারা গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো দখল করে থাকতেন। মন্ত্রণার দ্বারা পরিচালন ব্যবস্থা তখন ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং এ ব্যাপারটা সামান্য কয়েকজন ডিরেক্টরকে আরও ক্ষমতাশালী করতে সাহায্য করেছিল। ১৯৪০ সালে অশোক মেহেতা এই প্রসঙ্গে লিখেছেন : "আমাদের দেশের পাঁচশত উল্লেখযোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে ২০০০ জন ডিরেক্টর। এই ডিরেক্টর পদগুলো দখল করে আছে ৮৫০ জন ব্যক্তি। কিন্তু এই পদগুলির ১০০০টি দখলে আছে···৭০ জন ব্যক্তির। এই পিরামিডের চূড়াতে আছেন ১০ জন মানুষ, যারা ৩০০টি ডিরেক্টরের পদ দখল করে আছেন। এরাই হলেন আমাদের শিল্প অর্থনীতির চরম নিয়ামক।"৩১

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় পুরুষোত্তম ঠাকুরদাসের কথা। তিনি ৫১টা প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর ছিলেন। এর মধ্যে ছিল B. E. S & T. Co., Oriental Government Security Life Insurance Co., Indian Radio and Cable communications Co., Reserve Bank of India, কয়েকটা ছাপাখানা, কয়েকটা তাঁতকল, কয়েকটা রেল কোম্পানি, Tata Hydro-Electric Co. এবং কয়েকটা ইলেকট্রিক ও অন্যান্য কোম্পানি।

আর্থিক পুঁজির প্রাধান্য

আধুনিক ধরনের শিল্প প্রবর্তনের জন্য অনেক পুঁজির দরকার হয়। এবং যেহেতু ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের পক্ষে বড় পুঁজি যোগাড় করা সম্ভব নয় তাই ব্যাঙ্ক ও বড় বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে ভারতীয় শিল্পের ওপর আর্থিক পুঁজির নিয়ন্ত্রণ গড়ে ওঠে। এইখানেই ভারতবর্ষে আজকের দিনের সব পুঁজিবাদী দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। বৈশিষ্ট্যটা হল অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে আর্থিক পুঁজির নিয়ন্ত্রণ। "এক ডজন ব্যক্তি ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানি ও বিনিয়োগ ট্রাস্টগুলোর ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণের দরুন বোম্বাই-এর শিল্পজগতে হুকুম করার স্থান দখল করে নিয়েছিল। স্যর পুরুষোত্তম ঠাকুরদাস ও তার সম্পর্কিত ভাই চুনীলাল মেহেতা প্রতিটি ট্রাস্ট ও বোম্বাই-এর প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা তাদের নিজেদের মধ্যে নিয়ে নিয়েছিল। বহু প্রতিষ্ঠানের একত্র হওয়া তারা ঠেকিয়েছে বা সহজ করে দিয়েছে, যখন যেটি করলে তাদের সুবিধে। প্রেমচাঁদ ভাইরা, জীজিবয় ভাইরা, কোসজী জেহাঙ্গীর একইভাবে তাদের আর্থিক ক্ষমতার কৃতিত্বে অনুরূপ প্রভাব ফেলেছিল।"৩২

ব্রিটিশ ও ভারতীয় উভয় আর্থিক পুঁজিই মূলতঃ পরিচালিত হত যাকে বলা হয় ম্যানেজিং এজেন্সি ব্যবস্থার মাধ্যমে। "এই ব্যবস্থাতে অপেক্ষাকৃত স্বল্পসংখ্যক ম্যানেজিং এজেন্সি ফার্ম বিবিধ শিল্প কোম্পানি ও উদ্যোগ গঠন করত, নিয়ন্ত্রণ করত এবং উল্লেখযোগ্যভাবে তাদের অর্থ যোগাত। এরাই তাদের কার্যাবলী ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করত, তাদের উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে বিক্রি করত। এইসব কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ড গৌণ, এমনকি শুধু নামমাত্র ভূমিকা পালন করত, লাভের সারভাগটা শেয়ার হোল্ডারদের কাছে নয়, চলে যেত ম্যানেজিং এজেন্টদের কাছে।"৩৩

ভারতীয় অর্থনীতির ওপর ব্রিটিশ পুঁজির ফাঁস

ভারতীয় ম্যানেজিং এজেন্সি ফার্ম থেকে ইংরাজ ম্যানেজিং এজেন্সি ফার্মগুলো অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল, Andrew Yule & Co. এবং Jardine & Skinner হল দুটো শক্তিশালী ইংরেজ ফার্ম। তাদের অধিকতর অর্থনৈতিক শক্তি ও শিল্প কোম্পানির ওপর গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এই ফার্মগুলিকে শিল্পগুলোর ওপর তাদের অধিকতর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিল এবং তা বিশেষভাবে অর্থনৈতিক দুরবস্থার সময়ে।৩৪

ব্রিটিশ ও ভারতীয় উভয় আর্থিক পুঁজিই ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার মাধ্যমেও কাজ চালাত। ১৯৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া এবং ১৯২০ সালে স্থাপিত ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া—এ দুটোই ছিল দেশের সব থেকে বেশি শক্তিশালী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান। কিছুসংখ্যক এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কও কাজ করত দেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। চাটার্ড ব্যাংক অফ্ ইণ্ডিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং চায়না এবং ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া এবং মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দেশে আরও একটা তৃতীয় ধরনের ব্যাঙ্ক ছিল—ভারতীয় যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্কসমূহ যেখানে ভারতীয় পুঁজিরই আধিক্য ছিল।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক এবং এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক মুখ্যতঃ অভারতীয় ছিল। তাদের একত্রিত আর্থিক সম্পদ ভারতীয় যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্কসমূহের আর্থিক সম্পদের থেকে বেশি ছিল। আর এই ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলো ভারতীয় নিয়ন্ত্রণে ছিল।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া ছিল দেশের সব থেকে শক্তিশালী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান। এর ব্যাপক ক্ষমতা ছিল এবং গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর ও একাধিক ডিরেক্টর ইত্যাদি মুখ্য অফিসারদের নিয়োগের অধিকারের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হত এই ব্যাঙ্ক।

কিছুসংখ্যক ভারতীয় জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ এবং রাজনীতিবিদ ঘোষণা করেছিলেন যে ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় প্রভূত ব্রিটিশ প্রাধান্য ভারতবর্ষে দ্রুত ও অবাধ শিল্পোন্নয়নের চূড়ান্ত বাধাগুলির অন্যতম। ভারতীয় মালিকানা-ভুক্ত শিল্পগুলোকে আর্থিক সাহায্য করবার জন্য ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত ব্যাঙ্ক এবং সরকার উভয়ই এমন নীতি নিয়েছিল যা মুখ্যতঃ ব্রিটিশের আর্থনীতিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত হত, ভারতীয় শিল্পবিস্তারের জন্য নয়।৩৫

এইভাবে ব্রিটিশ আর্থিক পুঁজির কর্তৃত্বময় নিয়ন্ত্রণ ভারতবর্ষের শিল্প এবং সাধারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্রুত বেগ এবং অবাধ অগ্রগতি ব্যাহত করেছিল। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দেশের দ্রুত শিল্প অগ্রগতির পক্ষপাতী ছিল এবং শিল্পোন্নয়নকে ভারতীয় জনসাধারণের বৈষয়িক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির প্রাথমিক সর্ত বলে মনে করত। ফলতঃ এই আন্দোলন ব্রিটিশ আর্থিক পুঁজি এবং সরকারের অর্থনৈতিক নীতিসমূহের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে খুবই সমালোচনাপরায়ণ হয়ে ওঠে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, উদারপন্থীরা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠন ও গোষ্ঠীগুলো যারা ভারতবর্ষকে একটা অত্যুন্নত শিল্পসমৃদ্ধ দেশে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিল তারা ভারত সরকারের ১৯৩৫ সালের আইনের বলে রচিত সংবিধানে বিভিন্ন অর্থনৈতিক রক্ষাকবচের ভীষণ সমালোচনা করেছিল। তারা বলেছিল যে প্রদেশের রাজ্যপালদের হাতে ভারতীয় মন্ত্রীদের ক্রিয়াকলাপ বাতিল করার যে অধিকার দেওয়া হয়েছিল তা শুধুমাত্র ভারতীয় অর্থনীতির ওপরে ব্রিটিশ পুঁজির বিদ্যমান আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী করবে এবং দেশের অবাধ ও দ্রুত শিল্প এবং সাধারণ অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত করবে।

ভারতীয় শিল্পের অগ্রগতি এবং সেই সঙ্গে জার্মানী, জাপান এবং ইউ. এস.এ-র মতো ব্রিটেনের অভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতিযোগিতার শক্তি বৃদ্ধি ঘটাতে ভারতীয় বাজারে ব্রিটেনের অংশ দ্রুত হ্রাস পেতে লাগল।৩৬

"১৯৩৬ সাল থেকে ভারত আর ব্রিটেনের প্রধান খরিদ্দার রইল না, যা সে গত এক শতাব্দী ধরে ছিল। ১৯৩৭ সালে এর স্থান নেমে যায় দ্বিতীয়তে এবং ১৯৩৮ সালে নামে তৃতীয় স্থানে।

ভারতের বাজারে ব্রিটেনের অংশের এই দ্রুত পতন যা ১৯১৮ পরবর্তী সময়ে সবচেয়ে দ্রুত হয়, প্রকাশ করে দেয় ঊনিশ শতকের ভারতের শিল্পপুঁজির প্রধান শোষণের ক্ষেত্র তুলা দ্রব্য রপ্তানির পতনকে।

পুরানো ভিত্তি যখন এইভাবে ধ্বংস হচ্ছিল তখনই আর্থিক পুঁজির শোষণের দ্বারা মুনাফার নতুন ভিত্তি দৃঢ়ভাবে দেখা দিচ্ছিল এবং পরিমাণেও বাড়ছিল। **Financial Times**-এর পরিমাপ অনুযায়ী ১৯২৯ সাল নাগাদ ভারতবর্ষে মোট ব্রিটিশ পুঁজির বিনিয়োগের পরিমাণ কম করে ধরলেও ছিল ৫৭৩ মিলিয়ন পাউণ্ড এবং খুব সম্ভবতঃ তা ছিল ৭০০ মিলিয়ন পাউণ্ড।"৩৭

British Associated Chambers of Commerce-এর ১৯৩৩ সালের হিসেব অনুযায়ী এই পরিমাণ ছিল ১০০০ মিলিয়ন পাউণ্ড।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ও অন্যান্য বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যই ছিল যে এখানে শিল্পায়নের স্তর এবং বিনিয়োগের পরিমাণের মধ্যে একটা অসামঞ্জস্য থেকে গিয়েছিল। এর কারণ ছিল যে বিদেশী পুঁজির একটা বড় অংশ শিল্প বহির্ভূত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হয়েছিল যেহেতু তাই ছিল বেশি লাভজনক। এমনকি শিল্পের ক্ষেত্রেও লঘু শিল্পেই এর বিনিয়োগ দেখা গেছে বেশি।৩৮

ভারতীয় শিল্পের ভারসাম্যহীন বিকাশের কারণ

দেশী পুঁজি মালিকের হাতে পুঁজির পরিমাণ আগে থেকেই বেশ কম ছিল। এই অবস্থায় এদের মধ্যে শিল্প বাদে অধিকতর লাভজনক ক্ষেত্রে বিনিয়োগের কিছুটা প্রবণতা দেখা দিল। এই প্রসঙ্গে ডি. আর. গ্যাডগিলের কথা উল্লেখযোগ্য: "একে তো ভারতীয় পুঁজির পরিমাণ ছিল খুব কম। তার ওপর কৃষি ও শিল্প উভয় দিক থেকে পুঁজি সম্বলের জন্য প্রতিযোগিতা, মহাজনী কারবার ও ব্যবসায়ে বেশি মুনাফা এবং ফসল ওঠার সময় বিশেষ রকম উঁচু হারে সুদ পাবার সম্ভাবনা থাকায় ভারতীয় পুঁজি মালিকেরা শিল্পক্ষেত্রে বড় রকমের বিনিয়োগ করায় উৎসাহ পাননি।"৩৯

ভারতবর্ষের শিল্পোন্নয়ন মন্থর, ব্যাহত ও ভারসাম্যহীন হওয়ার কতকগুলো কারণ ছিল। ইংলণ্ড, জার্মানী এবং ইউ. এস. এ. এবং অন্যান্য দেশে শক্তিশালী শিল্প গড়ে উঠলে তবেই মাত্র ভারতবর্ষে শিল্প গড়ে উঠেছিল। এর ফলে ভারতবর্ষের পক্ষে ঐসব দেশের সঙ্গে বাজারে সফল প্রতিযোগিতা করা কঠিন হত। উপরন্তু ঐসব অতি শিল্পোন্নত দেশগুলোর শিল্পসমূহ তাদের জাতীয় সরকারের সক্রিয় সমর্থন পেত। এর ঠিক উল্টোটা ঘটেছিল ভারতবর্ষে। এখানে ব্রিটিশ সরকারের অবাধ বাণিজ্যের নীতি অনুসরণ করার দরুন ১৯২৪ সাল পর্যন্ত ভারতীয় শিল্পকে কোনোরকম সংরক্ষণ দেয় নি। অন্যান্য দেশের সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিরাট শিল্পগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্য এই সংরক্ষণ খুব দরকার ছিল। এমনকি যখন Tariff Board প্রতিষ্ঠিত হল এবং পূর্বোল্লিখিত

সংরক্ষণমূলক শুল্ক চালু করা হল তখনো কিন্তু এটা ভারতীয় শিল্পকে তেমন কিছু সাহায্য করে নি কারণ এই সংরক্ষণ নীতি রাজকীয় পছন্দ নীতির সাপেক্ষে গৃহীত ছিল। যাই হোক ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের কিছুসংখ্যক শিল্প এই সংরক্ষণ নীতিতে উপকৃত হয়েছিল।

দেশে উল্লেখযোগ্য সুপ্রতিষ্ঠিত ভারী মেটালার্জি এবং যন্ত্র তৈরি শিল্পের অভাব দ্রুত শিল্পোন্নয়নের একটা এবং সম্ভবতঃ সব থেকে বড় বাধা ছিল।

ঔপনিবেশিক অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যা একে সাম্রাজ্যবাদী অর্থ-নীতির স্বার্থের অধীনস্থ করে রাখে, তা হল এখানে ব্যাপক আকারে ভারী শিল্প থাকে না। ভারী শিল্পই হল আধুনিক সমাজের অবাধ, সুষম এবং দ্রুত শিল্পোন্নয়নের প্রাথমিক সর্ত।

"কোনো দেশের প্রকৃত পরিবর্তন তখনই আসে যখন লোহা ও ইস্পাত শিল্প সফল হতে শুরু করে।...মেটালার্জি শিল্পের উন্নতির অর্থ হল প্রকৃত শিল্প বিপ্লব। ইংলণ্ড, জার্মানী এবং আমেরিকা সবাই সুতোকল শুরু করার আগেই লোহা ও ইস্পাত শিল্প প্রবর্তন করেছিল।"৪০

ভারতীয় শিল্পের অগ্রগতির আর একটা প্রধান বাধা হল কৃষি জনসাধারণের অপরিমেয় দারিদ্র্য। ভারতীয় জনগণের চার-পঞ্চমাংশ এই কৃষি জনসাধারণ এবং শিল্পপণ্যের একটা প্রকাণ্ড সম্ভাব্য বাজার এদেরই মধ্যে। যে পরিচ্ছেদে কৃষির বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে তাতে দেখা গেছে কতকগুলো ব্যাপার যেমন, ঋণ, খাজনা ও করভার ও সেই সঙ্গে কৃষি থেকে কমে যাওয়া আয় কৃষি জনসাধারণের অধিকাংশের ভয়ানক দারিদ্র্য সৃষ্টি করেছিল। আমূল কৃষিসংস্কার ছাড়া ভারতীয় শিল্প উল্লেখযোগ্যভাবে বিস্তার লাভ করতে পারছিল না। ভূমি-সম্পর্কের পুনর্বিবেচনা এবং কৃষি উন্নয়নের জন্য সরকার কর্তৃক কৃষকদের উৎপাদনে সাহায্য দেওয়া—এ সবকিছু আমূল সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত। এইভাবে এটাই বিশাল জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে এবং তাদের ব্যাপকহারে শিল্পদ্রব্য কিনতে সক্ষম করতে পারত।

ভারতীয় শিল্পোন্নয়নের অহরহ ব্রিটিশ আর্থিক পুঁজির মুখাপেক্ষী হওয়া এবং ফলতঃ ব্রিটিশ পুঁজির ভারতীয় শিল্পে অনুপ্রবেশ ও নিয়ন্ত্রণ সেই শিল্পোন্নতি প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করেছিল। প্রায়ই সরকারি সাহায্য দেওয়া হত এই সর্তে যে ভারতীয় শিল্পপতিরা ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে শিল্প যন্ত্রপাতি কিনবে এবং সাহায্য দেওয়া হত এমন সব শিল্পগুলোকে যেগুলো বাজারে অনুরূপ ব্রিটিশ শিল্পের সঙ্গে বিরোধে আসত না।

কারিগরি শিল্প প্রতিষ্ঠান কম থাকার দরুন কৃৎকৌশলী সরবরাহ যথেষ্ট হত না এবং এ ব্যাপারটা শিল্পোন্নতির পক্ষে একটা প্রধান অন্তরায় হিসেবে কাজ করছিল। জন্মলগ্ন থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্থায়ী চাহিদা ছিল শিল্পের স্বার্থে উন্নততর কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, উদারপন্থীরা ও অন্যান্য সব প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল সবাই তাদের কর্মসূচীতে কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

তাছাড়া ভারতীয় শিল্পের কেন্দ্রীভবন একচেটিয়ার পর্যায়ে পেঁছেছিল। শিল্পবিস্তারে একচেটিয়া অস্তিত্বের অসুবিধাগুলি, তাই ভারতীয় শিল্প পরিস্থিতিতে ছিল স্বাভাবিক।

ভারতীয় একচেটিয়া শিল্প এবং তার বৈশিষ্ট্য

ইউ. এস. এ, বৃটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য অতি উন্নত পুঁজিবাদী দেশের একচেটিয়া কারবার থেকে ভারতবর্ষের একচেটিয়া কারবার অনেকভাবে পৃথক ছিল। 'অবাধ প্রতিযোগিতা'কে ভিত্তি করে দীর্ঘকাল ধরে পুঁজিবাদী অর্থনীতির অগ্রগতির চরম পরিণতির ফলেই ঐসব অগ্রসর দেশে একচেটিয়া কারবারের জন্ম হয়। ভারতে পুঁজিবাদের উদ্ভব দেরিতে হওয়ায়, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক উদ্যোগসমূহ বেশি সময় না দিয়েই এবং দেশী পুঁজিবাদী বিকাশের প্রথাসিদ্ধ অ-একচেটিয়া পর্যায় না পেরিয়েই তা একচেটিয়া আকার ধারণ করেছিল। এইভাবে, উপরে উল্লিখিত দেশসমূহে একচেটিয়ার উদ্ভব হয় উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশ এবং সাধারণ অর্থনৈতিক বিবর্তনের একটা উচ্চ পর্যায়ে পেঁছবার পর, কিন্তু ভারতে তা হয় এমনকি যখন উৎপাদিকা শক্তি যথেষ্ট বিকশিত হয় নি। ভারতে একচেটিয়ার অস্তিত্ব ছিল ভারতীয় সমাজের শিল্প এবং অন্যান্য উৎপাদিকা শক্তির অপূর্ণ অবস্থার বিপরীতে। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সংগঠনের একচেটিয়া রূপের মানেই হল পরজীবিতা এবং সামাজিক-রাজনীতিক-অর্থনীতিক পশ্চাৎপদতা। আর এগুলি বিশেষ করে ভারতীয় অর্থনৈতিক বিকাশের পক্ষে ছিল ক্ষতিকর কেননা সে অর্থনীতি তখনো ছিল অতি নিম্নস্তরের।*

ভারতবর্ষের এবং অন্যান্য অগ্রসর দেশের একচেটিয়া কারবারের মধ্যে দ্বিতীয় পার্থক্য তাদের নিজ নিজ রাষ্ট্রের প্রতি সম্পর্কের মধ্যে নিহিত রয়েছে। ইউ. এস. এ, বৃটেন, ফ্রান্স এবং অন্যান্য ঐরকম দেশে একচেটিয়া কারবার সাধারণভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারের অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্যে প্রতিযোগিতার নিয়ম থেকে একচেটিয়া কারবার তৈরি হয়। একটা শিল্পের সমস্ত শাখা প্রশাখা, এমনকি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আর্থিক ক্ষেত্রে সমস্ত শিল্পই একচেটিয়া অধিকারের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণাধীন হতে পারে। একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রতিযোগিতা লোপ পায় না। বিভিন্ন একচেটিয়া অধিকার বিশ্বপর্যায়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। আর্থিক জগতের এইসব বিপুল শক্তিধর দিক্‌পালগণের সংঘর্ষ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এবং ভয়ংকর হয়ে ওঠে। এর ফলে পুঁজিবাদী জাতিসমূহের মধ্যে বিবাদ তীব্রতর হয় এবং এদের মধ্যে প্রবল আর্থিক ও সামরিক সংঘর্ষ বেধে যায়।

একচেটিয়া অধিকারের উত্থান দেখে বোঝা যায় শক্তিসমূহের ও তাদের সামাজিক চরিত্রের প্রভূত বিকাশ হয়েছে। এ থেকে আরও বোঝা যায় যে পরিকল্পিত অগ্রগতির নীতি অবলম্বন না করলে উৎপাদিকা শক্তিসমূহকে স্বচ্ছন্দে ও সাফল্যের পথে পরিচালিত করা যাবে না এটা পুঁজিবাদী মালিকেরা সচেতন বা অচেতনভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। অবশ্য উৎপাদনের উপায়সমূহ পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত মালিকানাধীন থাকলে উৎপাদনের জন্য ব্যাপক, সুবিন্যস্ত ও সর্বজনীন পরিকল্পনা সম্ভব হয় না। বর্তমান যুগের সমুন্নত উৎপাদিকা শক্তিসমূহ সমাজতন্ত্রের পথে অপরিহার্য বস্তুগত ভিত্তি হিসাবে গণ্য বটে, কিন্তু একমাত্র সমাজতান্ত্রিক-আর্থিক ব্যবস্থাতেই এইসব উৎপাদিকা শক্তির অবাধ বিকাশ সম্ভব।

উভয় নীতিই নির্ধারণ করত এমনকি সরকারী সমর্থনও তারা পেত, ভারতীয় মালিকানাভুক্ত একচেটিয়া কারবার সরকারের মূল অর্থনৈতিক নীতিগুলোকে সাধারণতঃ প্রভাবিত করত না বা করতে পারত না এবং ভারতীয় সরকার থেকে উল্লেখযোগ্য সাহায্য পেত না—যে সরকার জাতীয় সরকার না হওয়ার দরুন সাধারণতঃ ব্রিটেনের আর্থিক স্বার্থরক্ষাই চাইত।

ভারতীয় একচেটিয়াগুলোর অবস্থার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল যে তারা একটা দারিদ্র্যপীড়িত গ্রাম্য জনসাধারণ অধ্যুষিত মূলতঃ কৃষিভিত্তিক দেশে ছিল। ভারতীয় শিল্প একচেটিয়ার পক্ষে বাজারের সমস্যাটা ছিল অত্যন্ত তীব্র। ভারতীয় পুঁজিবাদী অগ্রগতির স্ববিরোধ এটাই যে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সংগঠনের উচ্চতম সংগঠন একচেটিয়া এখানে রূপ নিয়েছিল এমন এক অর্থনৈতিক পরিবেশের পটভূমিতে যা মূলতঃ আদিম ও দরিদ্র কৃষি অর্থনীতি নিয়ে গঠিত যেখানে আধা সামন্ততান্ত্রিক এমনকি প্রাক্-সামন্ততান্ত্রিক অবশিষ্টাংশও কিছু ছিল।

অন্যান্য অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশের মত ভারতবর্ষেও ব্যক্তিগত একচেটিয়া কারবারের সঙ্গে সরকারি একচেটিয়া উদ্যোগও ছিল। যাই হোক ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের সরকারি একচেটিয়া কারবারের মধ্যে একটা মূল পার্থক্য ছিল। ভারতবর্ষে রেলওয়ের মতন সরকারি একচেটিয়া উদ্যোগ এমন একটা সরকারের দখলে ছিল যে সরকার জাতীয় সরকার ছিল না। সুতরাং সেই সরকার সেইসব একচেটিয়া কারবারকেই এমনভাবে পরিচালনা করে যাতে ব্রিটিশ পুঁজিবাদী স্বার্থের সুবিধা হয়, ভারতীয় জনসাধারণের অবাধ অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য নয়। রেলওয়েকে তাই কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডলীর আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল। ইউ. এস. এ, বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি স্বাধীন দেশে যখন রাষ্ট্র কতকগুলো উদ্যোগ নিজ হাতে নিয়ে নেয় তখন এইসব উদ্যোগের আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী সরকারি নীতি স্থির করার সময় সিনেট অথবা পার্লামেন্টের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। ঐসব দেশে রাষ্ট্রক্ষমতা যতদিন পর্যন্ত পুঁজিবাদী শ্রেণীর হাতে ন্যস্ত থাকে ততদিন ঐ নীতিগুলো পুঁজিবাদী শ্রেণীর স্বার্থের অনুকূল হলেও হতে পারে কিন্তু তা কোনো বিদেশী স্বার্থের অধীন নয় যেমনটা ভারতবর্ষে হয়। ভারত সরকারের মূল আর্থিক নীতিগুলো যদিও জনমতের চাপে পরিমার্জিত হত কিন্তু তা সংশোধিত হত ভারতীয় জনসাধারণের স্বার্থেও নয় বা ভারতীয় মালিকানাযুক্ত একচেটিয়া কারবারের স্বার্থেও নয়। শুধুমাত্র ব্রিটিশ পুঁজির স্বার্থেই তা পরিমার্জিত হত।

ভারতীয় স্বার্থের পরিপন্থী বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থায় প্রতিফলিত সরকারি মুদ্রানীতিও অবাধ শিল্পবিকাশের প্রতিবন্ধকতার অন্যতম কারণ।

ভারতবর্ষের দ্রুত এবং সর্বব্যাপী অগ্রগতির পক্ষে এগুলো ছিল কতকগুলো প্রধান বাধা।

শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী শিল্প গড়ে তুলতে যে মানবিক ও বস্তুগত প্রাথমিক উপাদানগুলো লাগে ভারতবর্ষে তা ছিল এবং তা ভারতীয় জনসাধারণকে ধনী এবং স্বাধীন শিল্পসমৃদ্ধ জাতীয় জনসমাজে পরিণত করতে পারত। তবু এইসব প্রতিবন্ধকতার দরুন ভারতবর্ষ মূলতঃ দরিদ্র এবং কৃষিসমাজই রয়ে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ডি. এইচ. বুকানন্ ১৯৩৪ সালে লিখেছেন :

"শিল্পোৎপাদনের জন্য যেসব আদি উপকরণ প্রয়োজন তার সবই এই দেশে আছে। তবুও একশত বছরেরও বেশি হল বিপুল পরিমাণে কারখানাজাত পণ্য এখানে আমদানি করা হয়েছে। যেসব সাদামাটা শিল্পোৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও সংগঠন অন্য দেশে সমুন্নত হয়েছে সেরকম শিল্পের সামান্যই এখানে বিকাশ লাভ করেছে। এ দেশে পাওয়া যায় পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচা তুলা ও কাঁচা পাট; কয়লা সহজেই তোলা যায়, অত্যুৎকৃষ্ট লৌহপিণ্ডও সহজেই তোলা যায়; প্রয়োজনের অতিরিক্ত জনসংখ্যা লাভজনক কাজ না পেয়ে অনশনে থাকে; সোনা ও রুপার সঞ্চয় রয়েছে...যে আর্থিক বাজার থেকে সারা বিশ্বে বিপুল পরিমাণ অর্থ ঋণ দেওয়া হচ্ছে তার সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের মাধ্যমে যোগ রয়েছে; ব্রিটিশ বাণিজ্য জগতের যে নেতৃবৃন্দ স্বদেশে ও বিশ্বের অসংখ্য দেশে পুঁজিবাদী শিল্পের বিকাশ ঘটাচ্ছেন তাঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতার সূত্রে বিনিয়োগ করতে পারেন; অভ্যন্তরীণ বাজারও খুব ভাল...এত সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও একশ বছর কেটে যাবার পরও মোট জনসংখ্যার মাত্র দুই শতাংশের মত কারখানার কাজ করে...দেশের অধিবাসী প্রধানতঃ কৃষিজীবী।"[৪১]

সুস্থ শিল্পবিকাশের পূর্বশর্তসমূহ

দেশের সবগুলো প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল ভারতবর্ষের শিল্পায়নের দাবির সপক্ষে ছিল এবং তার জন্য চাপ দিত। শিল্পায়নকে তারা ভারতীয় জনসাধারণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, গণতান্ত্রিক সামাজিক উন্নতি ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির বস্তুগত ভিত্তি বলে মনে করত। ভারতের শিল্পায়ন কৃষির ওপর অত্যধিক চাপ লাঘবের উপায় হিসেবে স্বীকৃত ছিল। কৃষির ওপর অত্যধিক চাপই হল কৃষি দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। তাই দেশের সব সামাজিক ও রাজনৈতিক গোষ্ঠী তাদের মূলগত প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও শিল্পায়নকে তাদের কর্মসূচীর মুখ্য বিষয় হিসেবে গণ্য করত। স্বদেশী আন্দোলন, টাকার বিনিময় হারের বিরুদ্ধে লড়াই এবং ব্রিটিশের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য ১৯৩৫ সালের সংবিধান অনুযায়ী প্রদেশের গভর্নরদের প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম—এই এক সংগ্রাম যেখানে সব রাজনৈতিক দল যোগ দিয়েছিল—এই সবগুলোই ভারতবর্ষকে একটা শিল্পসমৃদ্ধ দেশে রূপান্তরিত করতে অনুপ্রাণিত ছিল। এই একই উদ্দেশ্য টাটা-বিড়লা প্ল্যান-এর মত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করেছিল, যার মধ্যে দিয়ে একজন রাজভক্ত দালাল, একজন উদারপন্থী টাটা এবং একজন গান্ধীবাদী বিড়লা এক মঞ্চে বাঁধা পড়ে।

ভারতীয় শিল্পের দ্রুত বিকাশের প্রধান বাধাগুলোর কথা আমরা উল্লেখ করেছি যেমন সরকারের মূল অর্থনৈতিক নীতি, কৃষিজীবীদের অপরিমেয় দারিদ্র্য, শিল্পদ্রব্যের সম্ভাবনাময় বাজার, ভারতীয় বুর্জোয়াদের আর্থিক দুর্বলতা এবং নিজ নিজ সরকারের সমর্থনপুষ্ট আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বী-দের সঙ্গে নিরন্তর তীব্র প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।

এই অবস্থায় অর্থনৈতিক জীবনের প্রতিটি শাখাকে নিয়ে একটা পরিকল্পিত জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মসূচীই একমাত্র নিশ্চিত, দ্রুত এবং সুষম শিল্পোন্নয়ন

ঘটাতে পারত, নিঃস্ব ও আদিম কৃষিব্যবস্থার সমৃদ্ধিশালী আধুনিক কৃষিতে রূপান্তর এইরকম একটা কর্মসূচীর অঙ্গ। এছাড়াও আছে শিল্পের আধুনিকী-করণ ও বিস্তার, ধাতব, রাসায়নিক, বৈদ্যুতিক যন্ত্র উৎপাদনকারী ও অন্যান্য অনুরূপ শিল্পের বিকাশ ; রেল, বাস ও যানবাহনের অন্যান্য উপায়ের বিস্তার ; কৃৎকৌশলী ও ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাডার (Cadre) গড়ে তোলা, কৃষিবিদদের ব্যাপক প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য জরুরী ব্যাপার। বস্তুতপক্ষে পরিকল্পিত জাতীয় অর্থ-নীতির কর্মসূচী ভারতীয় জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনের প্রকৃত প্রকৌশল আর্থনীতিক বিপ্লবের সূচনা করত। এই কর্মসূচীতে ভারতীয় উপ-মহাদেশের বিপুল বস্তুগত ও মানবিক সম্পদ একত্র করা ও তার সর্বাধিক পরিকল্পিত ব্যবহার করার বিরাট দায়িত্ব নিহিত ছিল। এইরকম একটা কর্মসূচী ছাড়া অবশ্য দ্রুত শিল্পোন্নয়ন ও সেই সঙ্গে সাধারণ অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব নয়।

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যে অর্থনৈতিকভাবে টিকে থাকা ও বিস্তারের প্রাথমিক প্রয়োজন এমনকি বুর্জোয়ারাও সেটা স্বীকার করেছিল, অথচ যাদের কাছে প্রাক্ সঙ্কট যুগে অবাধ অর্থনীতি (lassez faire)-ই ছিল 'পবিত্রদের মধ্যেও পবিত্র'।

বোম্বাই পরিকল্পনা : এর সীমাবদ্ধতা

ভারতীয় শিল্পপতিরাও জাতীয় অর্থনীতি পরিকল্পনা করা প্রধান প্রয়োজন একথা স্বীকার করেছিলেন। ভারতীয় শিল্পপতিরা যে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছিলেন বোম্বে পরিকল্পনা তাদের মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য। ঐ ধরনের পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতার অত্যাবশ্যকীয়তা উপলব্ধি করে বোম্বে প্ল্যানের উদ্যোক্তারা এই পরিকল্পনার সফল রূপায়ণের জন্য একটা জাতীয় সরকার চাইছিলেন।

বোম্বে প্ল্যানের কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি ছিল। এর প্রবক্তারা দেশের প্রচলিত ভূমি সম্পর্কের কোনোরকম আমূল সংশোধন ছাড়াই ব্যাপক শিল্প-বিস্তারের কর্মসূচী সফল করবার আশা করতেন। অথচ কৃষকদের দারিদ্র্য নিরসন ও তার ফলে তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হল ভূমি-সম্পর্কের আমূল সংশোধন। কৃষি অর্থনীতিকে আরো অবনতি এমনকি ধ্বংস থেকে বাঁচাতে এবং কৃষি জনগণকে গভীরতর দারিদ্র্য থেকে রক্ষা করতে ভূমি সম্পর্কের বৈপ্লবিক পরিবর্তন দরকার।

পরিকল্পনার উদ্যোক্তারা তাদের পরিকল্পনা পুঁজিবাদী অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যেই রূপায়ণে আশা করেছিলেন, যে কাঠামোর মধ্যে রয়েছে প্রতিযোগিতা, মুনাফার জন্য উৎপাদন, উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তিগত মালিকানা ইত্যাদি। যদিও পুঁজিবাদী ভিত্তিতে সীমিত পর্যায়ের পরিকল্পনা করা সম্ভব, কিন্তু একটা সুসংহত দেশব্যাপী পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রাথমিক প্রয়োজন হল ভূমি, শিল্প, যানবাহন এবং অন্যান্য উৎপাদনের উপাদানসমূহের সামাজিক মালিকানা। মুষ্টিমেয় কয়েকজন মালিকের লাভের পরিবর্তে জনস্বার্থের প্রয়োজনে সম্পদের অবাধ, পরিকল্পিত ও সর্বাধিক ব্যবহারের জন্য দরকার এই সম্পদ-

গুলোর ওপর গোটা সমাজেরই মালিকানা। উৎপাদনের সমগ্র উদ্দেশ্যই মুনাফার থেকে ব্যবহারের দিকে সরিয়ে আনতে হবে।

তাহলেও যেহেতু আমরা এমন একটা যুগে বাস করছি যেখানে রয়েছে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ ও পৃথিবী জুড়ে মোটামুটি ঐক্যবদ্ধ অর্থনীতি সেখানে সবচেয়ে সুপরিকল্পিত জাতীয় অর্থনীতিকেও বিশ্ব অর্থনীতির শক্তির অধীন হতে হবে। একটা সম্পূর্ণ সুপরিকল্পিত জাতীয় অর্থনীতি তাই কেবল পরিকল্পিত বিশ্বজোড়া অর্থনীতির অংশ হতে পারে মাত্র।

সে যাই হোক, বিশাল জনশক্তি এবং সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক সম্পদ সহ ভারতবর্ষের মতন একটা দেশে পরিকল্পিত জাতীয় অর্থনীতি খুবই সম্ভব ছিল। কিন্তু এই পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য যেখানে ক্ষমতা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর হাতে থাকবে না, থাকবে উৎপাদক গোষ্ঠীর হাতে আর উৎপাদনের উপাদানের থাকবে সামাজিক মালিকানা। বোম্বে প্ল্যানের ব্যাখ্যাকারীরা অবশ্য বিষয়টি স্বতন্ত্রভাবে ভেবেছিলেন :

"একথা কি আমরা বলতে পারি যে পরিকল্পনা সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে ভোগকারীর স্বার্থে অর্থনৈতিক সংগঠন নিয়ন্ত্রণের ধারণা সুনিশ্চিতভাবেই পরিত্যাগ করছে, এবং বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে পরিকল্পনার কথা ভাবছে? পুঁজিবাদী কাঠামোতে যতদিন মুনাফার উদ্দেশ্য কার্যকর থাকে, ততদিন পর্যায়ক্রমিক সংকট ও স্থায়ী বেকারত্বের সম্ভাবনাকে উৎরানো যায় না। বর্তমান পরিকল্পনার কোনোখানে আমরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এই অন্তর্লীন দুর্বলতার উল্লেখ দেখতে পাই না। কিন্তু এই পরিকল্পনার রচয়িতারা অকপটভাবেই এটা ধরে নিয়েছিলেন যে তারা আর্থিক জীবনটাকে এমনভাবে সংগঠিত করতে পারে যে কিছু অংশে পুরোটাই রাষ্ট্রের মালিকানায় ও পরিচালনায় থাকবে, কিছু অংশ শুধু পরিচালনাধীন থাকবে, আর কিছু অংশ শুধুমাত্রই নিয়ন্ত্রণে থাকবে। অন্যভাবে বলতে গেলে তারা এক ধরনের দ্বৈত অথবা মিশ্র অর্থনীতির প্রস্তাব করেছেন যার একটা ক্ষেত্র পুরোপুরি রাষ্ট্রের অধীনতা মুক্ত আর অন্য অংশ অংশতঃ রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত। কিন্তু এটা ভুলে যাওয়া হয়েছিল যে কাঠামোর এক অংশের নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা সামগ্রিকভাবে পুরো কাঠামোটারই বিরোধ বাড়িয়ে তুলতে পারে।"[৪২]

ভারতীয় শিল্পোন্নয়নের সামাজিক তাৎপর্য

অপ্রতুল ও ভারসাম্যহীন প্রকৃতি সত্ত্বেও শিল্পায়ন ভারতীয় জনসাধারণের জীবনে প্রায় একটা বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছে। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক কৃষিতে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ধরনের সূচনা, বিশ্বের বাণিজ্যিক শক্তির অনুপ্রবেশ এবং ব্রিটিশ আমলে আধুনিক যানবাহনের বিস্তারের ফলে ভারতে যে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল শিল্পায়ন তাকে সুদৃঢ় করেছিল। শিল্পায়ন ভারতীয় অর্থনীতিকে আরো একত্রিত, সুসংগতিপূর্ণ ও সংগঠিত করে তুলেছিল। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক জীবনের মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছিল এই শিল্পায়ন।

অধিকন্তু এর ফলে আধুনিক শহর গড়ে উঠেছিল। এই শহরগুলো আধুনিক সংস্কৃতি ও ক্রমবর্ধমান গণতান্ত্রিক সামাজিক জীবনের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এই শহর থেকেই সবরকম সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জাতের প্রগতিশীল আন্দোলন জন্ম নিয়েছিল।

ভারতবর্ষের প্রগতিশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীরা শিল্পায়নের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সুবিধাগুলো বুঝতে পেরেছিলেন। শিল্প ও অন্যান্য অর্থ-নৈতিক শক্তি ও সম্পদের সামাজিক সংগঠন সম্পর্কে তাদের মত আলাদা ছিল। ব্যক্তিগত উদ্যোগের অবাধ বাণিজ্য নীতি এবং বাধাহীন ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা অথবা পুঁজিবাদী বা সমাজতান্ত্রিক যেমনই হোক না কেন পরিকল্পিত জাতীয় ভিত্তিতে হবে—এ বিষয়ে তাদের মতভেদ ছিল। কিন্তু একটা ব্যাপারে এরা সবাই একমত ছিল। এরা সবাই শিল্পের দ্রুত ও সর্বব্যাপী বিস্তারের পক্ষপাতী ছিল। মূলগত অনেক বিষয়ে তাদের তীব্র মতপার্থক্য থাকলেও এই দাবি তারা সবাই মিলে একজোট হয়েই করেছিল। শিল্পোন্নতির বিভিন্ন বাধাগুলো দূর করবার জন্য তারা সবাই সম্মিলিতভাবে সংগ্রাম করেছিল। শিল্পায়নের দাবি তাই একটা জাতীয় দাবি হয়ে গিয়েছিল।

এছাড়াও আধুনিক শিল্পের প্রতিষ্ঠা সমসাময়িক সমাজের দুটো মুখ্য শ্রেণীর জন্ম দিয়েছিল—বুর্জোয়া ও প্রোলেতারিয়েত। জাতীয় আন্দোলনে এদের বিরাট তাৎপর্যের কথা পরে আলোচিত হবে।

সূত্র নির্দেশ

১ Lord Dalhousie, Minute On Railways, 1853.
২ Karl Marx, পৃ. ৬২।
৩ Gadgil পৃ. ৭৪-৭ দ্রষ্টব্য।
৪ Ranade, পৃ. ১৮।
৫ Gadgil, পৃ. ১১৭-১৮।
৬ Buchanan, পৃ. ১৩৯।
৭ R. P. Dutt, পৃ. ১৫৩।
৮ Sir Valentine Chirol, **Observer**, 2 April, 1922.
৯ **Moral and Material Progress of India, 1921,** পৃ. ১৪৪।
১০ Indian Industrial Conference-এ যুক্তপ্রদেশের লেফ্‌টনান্ট গভর্ণর Sir John Hewett-এর বক্তব্য।
১১ Dispatch to the Indian Secretary, 26 November, 1915.
১২ Montagu-Chelmsford Report পৃ. ২৬৭।
১৩ Lokanathan, পৃ. ৬।
১৪ উপরিউক্ত, পৃ. ৬।
১৫ Wadia এবং Merchant পৃ. ২৮৪ দ্রষ্টব্য।
১৬ D. H. Buchanan, পৃ. ৪৬৪।
১৭ Sir M. Visvesvaraya, পৃ. ২৪৭।

১৮ Wadia এবং Merchant, পৃ. ২৮৫।
১৯ Kate Mitchell, পৃ. ২৮৫।
২০ Varga দ্রষ্টব্য।
২১ Kate Mitchell, পৃ. ২৮৬।
২২ Lokanathan, পৃ. ৭-৮।
২৩ Wadia and Merchant, পৃ. ২৮৭।
২৪ **A Survey of India Today**, 12 December, 1936.
২৫ Jain, পৃ. ৪৮।
২৬ উপরিউক্ত, পৃ. ১২৮।
২৭ উপরিউক্ত, পৃ. ১২৮।
২৮ Asoka Mehta, পৃ. ৩।
২৯ Hobson এবং Lenin দ্রষ্টব্য।
৩০ Asoka Mehta, পৃ. ৯।
৩১ উপরিউক্ত, পৃ. ১১-১২।
৩২ উপরিউক্ত, পৃ. ১৪।
৩৩ R. P. Dutt, পৃ. ১৬৮।
৩৪ Report of the Central Banking Inquiry Committee, 1931, Vol., I, পৃ. ২৭৯।
৩৫ Visvesvaraya, পৃ. ৬৪-৫।
৩৬ Review of Trade in India in 1937-8, Dr. Gregory, Economic Adviser to the Government of India কর্তৃক প্রকাশিত।
৩৭ R. P. Dutt, পৃ. ১৪৬।
৩৮ R. P. Dutt, দ্রষ্টব্য।
৩৯ Gadgil, পৃ. ১৯৩।
৪০ Knowles, পৃ. ৪৪৩।
৪১ D. H. Buchanan, পৃ. ৪৫০-৫১।
৪২ Wadia and Merchant, The Bombay Plan, a Criticism, পৃ. ৩-৪।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আধুনিক পরিবহন এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জাগরণ

প্রাক্-ব্রিটিশ পরিবহন ব্যবস্থা

জনসাধারণকে আধুনিক জাতিতে ঐক্যবদ্ধ করতে রেল, বাস, জাহাজ ইত্যাদি আধুনিক যানবাহনের ভূমিকা বাড়িয়ে বলা যায় না। যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক যানবাহনের মাধ্যমগুলো আবিষ্কৃত হয়েছিল সেই ঊনবিংশ শতাব্দীই যে আবার জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয়ের শতক সেটা নেহাতই কাকতালীয় নয়। একথা সত্যি যে ইংরাজ এবং ফরাসীদের মত কয়েকটা জনগোষ্ঠী অষ্টাদশ শতাব্দীতেই জাতি হিসেবে গঠিত হয়েছিল। কিন্তু সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক অর্থে জাতি হিসেবে তাদের সম্পূর্ণ বিকাশ কেবলমাত্র ঊনবিংশ শতাব্দীতেই হয়েছিল। ঐ শতাব্দীতে যে আধুনিক যানবাহন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল তা ঐসব দেশগুলোকে আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে জাতি হিসেবে সংঘবদ্ধ হতে সাহায্য করেছে।[১]

ভারতবর্ষেও রেলপথ ও মোটরবাস প্রবর্তন ও প্রসার ভারতীয় জনগণকে একটা জাতিতে পরিণত হতে সাহায্য করেছিল।

যানবাহন পদ্ধতি নির্ভর করে ও নির্ধারিত হয় কোনো দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সমসাময়িক স্তরের ওপর। প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের ভারতবর্ষে ছিল অত্যন্ত দুর্বল যানবাহন ব্যবস্থা। কেননা বিজ্ঞান ও কারিগরি দিক থেকে জনসাধারণের পিছিয়ে থাকার ফলে গড়ে ওঠে নি কোনো আধুনিক শিল্প যা কেবল আধুনিক যানবাহন তৈরি করতে সক্ষম। জনসংখ্যার অধিকাংশই বাস করত গ্রামগুলোতে ও এই গ্রামগুলো ছিল আর্থিক দিক থেকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ। এর দরুন তৎকালীন যানবাহন ব্যবস্থা উন্নতি করার কোনো প্রেরণা ছিল না। দুর্বল অর্থনীতি দুর্বল যানবাহন ব্যবস্থাকে বজায় রেখেছিল এবং দুর্বল যানবাহন ব্যবস্থা সেই অর্থনীতির অগ্রগতিতে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।[২]

"অধিকাংশ লোকই বিচ্ছিন্ন গ্রামগুলোতে বসবাস করত। আয়তনে ছোট অথচ বেশি দামের কতকগুলো জিনিস যেমন, ওষুধ, সিল্ক, মূল্যবান পাথর যেগুলো খুব সহজে পরিবহনযোগ্য এবং কতকগুলো ভারী জিনিস যেগুলো সার্বজনীনভাবে ব্যবহৃত হয় বটে কিন্তু অল্প পরিমাণে যেমন লোহা ও নুন— এরকম সামান্য কতকগুলো জিনিস ছাড়া গ্রামীণ জনসাধারণ প্রায় সম্পূর্ণটাই

স্থানীয় উৎপাদনের ওপর নির্ভর করত। গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিশেষ দক্ষতা ছিলই না। সুতরাং দ্রব্য ও মানুষ উভয়েরই চলাচল কম ছিল। মাঠ থেকে শস্য তোলা এবং এর সামান্য কিছু অংশ নিকটবর্তী বাণিজ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া —এই ছিল প্রধানতঃ দ্রব্যের চলন, আর এইটি মানুষের মাথাতে অথবা জীব-জন্তুর পিঠেই হতে পারত। কিছু বেশি দূরত্বে অথবা ব্যাপকাকার চলাচলের বেলায় শুকনো সময়ে গরুর গাড়ি ব্যবহৃত হত। কিছু কিছু অঞ্চলে বিশেষ করে বাংলাদেশে গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের মোহনার সঙ্গে অনেক নদী যুক্ত থাকায় জলপথে অথবা মোটামুটি বেশি দূরত্বে যাতায়াতের ব্যবস্থা হত। উত্তরে এবং পশ্চিমে গঙ্গা এবং সিন্ধু, দক্ষিণে কৃষ্ণা এবং গোদাবরী দেশের অভ্যন্তরভাগ ছোটো নৌকার পক্ষে অধিগম্য করেছিল। মুঘল আমলে কিছু নোংরা রাস্তা ছিল যা রাজ্য এবং রাজধানীগুলোকে যুক্ত করত এবং ব্রিটিশেরাও যতদিন পর্যন্ত না শাসক হয়েছিল ততদিন রাস্তা তৈরির জন্য বিশেষ কিছুই করেনি।"৩

প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতবর্ষে যানবাহন ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল থাকায় জন-সাধারণের মধ্যে কোনো বড় রকমের ঐক্যবদ্ধ আর্থনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে ওঠে নি। সাধারণ লোকেদের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্যে ব্যাপক বিনিময় সম্ভব ছিল না যেহেতু দ্রুত যাতায়াতের কোনো সুবিধা ছিল না। কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি, কিছু ব্যবসায়ী, রাষ্ট্র কাঠামোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেউ কেউ এবং তীর্থযাত্রীরা দেশভ্রমণ করত একথা সত্যি কিন্তু তবু স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামে বসবাসকারী জনসাধারণের অধিকাংশই ক্বচিৎ এই গ্রামগুলো ছেড়ে বেরুত। জনসাধারণের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য কোনো সামাজিক বিনিময় না থাকার জন্য তাদের মধ্যে কেবলমাত্র গ্রাম অথবা জাত সচেতনতা গড়ে উঠেছিল। তারা কোনোরকম জাতীয় সচেতনতা এবং দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে পারে নি।

আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থার সূচনা

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অভাবনীয় কারিগরি অগ্রগতি ও সেই সঙ্গে আগের যুগের বাণিজ্য থেকে মূলধন পুঞ্জীভূত হওয়ার ফলে ইংলণ্ডে শক্তিশালী যন্ত্রভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠল। এই নতুন ও দ্রুত বর্ধমান শিল্পগুলির উৎপন্ন দ্রব্য তাড়াতাড়ি বিক্রি করা এবং ভারতবর্ষ ও বিশ্বের অন্যান্য জায়গা থেকে ঐসব শিল্পগুলির জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ করার নতুন সমস্যার সম্মুখীন হল ইংলণ্ডের শিল্পপতিরা।

ভারতবর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সরকার রেলপথ প্রতিষ্ঠা ও রাস্তা তৈরি করেছিল ব্রিটিশ শিল্পের স্বার্থের চাপে। লর্ড ডালহৌসি যিনি ভারতবর্ষে ব্যাপক রেলপথ তৈরির কর্মসূচী করেছিলেন তিনি তার বিখ্যাত Minute on Railways-এ রেলপথ তৈরির অর্থনৈতিক কারণসমূহ দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন।

আবার ব্রিটিশ পুঁজিবাদ উদ্বৃত্ত মূলধন পুঞ্জীভবনের সম্মুখীন হচ্ছিল প্রতিনিয়ত। এই মূলধন সবসময় লাভজনকভাবে ব্রিটেনে নিয়োগ করা সম্ভব হত না। এই উদ্বৃত্ত মূলধনের একটা বিনিয়োগ বব্যস্থার প্রয়োজন ছিল।

রেলপথ তৈরির কর্মসূচী গ্রহণ করতে হলে ভারত সরকারের মূলধনের দরকার ছিল। ব্রিটেনে পুঞ্জীভূত উদ্বৃত্ত মূলধনের একটা অংশ ভারত সরকারকে ধার দেওয়া হয়েছিল এবং এইভাবে মূলধনের একটা নির্গম পথ বের করতে পারা গিয়েছিল।

এইসব অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও ভারতবর্ষে রেলপথ প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং সামরিক কৌশলগত কারণসমূহ ছিল।

পুরোপুরি সম্পন্ন হওয়ার পর ভারতে ব্রিটিশ বিজয় ভারতবর্ষকে তার শত শতাব্দীর প্রাচীন ইতিহাসে প্রথম এক রাজনৈতিক প্রশাসনিক সমগ্রতায় ঐক্যবদ্ধ করেছিল। ব্রিটিশ রাজের সম্পাদিত এই রাজনৈতিক প্রশাসনিক ঐক্য কেবল বাহ্যিকই ছিল না।

প্রাক্-ব্রিটিশ সরকারগুলো অধিকাংশই ছিল কেবলমাত্র রাজস্ব আদায়ের আখড়া। ব্রিটিশ সরকার তেমন ছিল না ঃ তারা অভ্যন্তরীণ জীবনেও প্রবেশ করেছিল। গ্রামের অভ্যন্তরীণ বিচারবিষয়ক ও আরক্ষার স্বাধীনতা ভেঙে ফেলেছিল এবং সমগ্র দেশের জন্য এক অভিন্ন আইন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল। এই আইনগুলো কার্যকর করার জন্য সরকার তার প্রতিনিধিদের গ্রামে নিয়োগ করেছিল। বস্তুতপক্ষে স্বশাসিত গ্রামের পঞ্চায়েতদের কাছ থেকে সরকার সব ক্ষমতাই কেড়ে নিয়েছিল যে ক্ষমতাগুলো যদিও রাষ্ট্রের ছিল কিন্তু স্মরণাতীত কাল থেকে পঞ্চায়েতরাই ব্যবহার করে আসছিল।

এইভাবে ব্রিটিশেরা ভারতবর্ষে এক বিশাল শাসনযন্ত্র গড়ে তুলেছিল যা এমনকি সুদূরতম গ্রামে পর্যন্ত প্রবেশ করেছিল। ঐরকম এক শাসনযন্ত্রকে দাঁড় করানো এবং তাকে দক্ষতার সঙ্গে কার্যকর করানোর প্রয়োজনীয়তা তাদেরকে রেলপথ প্রবর্তন ও বিস্তার করতে, আধুনিক রাস্তা তৈরি করতে এবং ডাক ও তার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর করেছিল। উত্তরোত্তর ব্রিটিশ শাসনের আওতায় চলে আসা গ্রাম, শহর, জেলা এবং প্রদেশগুলোকে এক রাজনৈতিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় জড়ো করার এই প্রয়োজনীয়তাই ভারতবর্ষে রেলপথ নির্মাণেও প্রণোদিত করেছিল।

এছাড়া সামরিক কারণেও ভারতবর্ষে আধুনিক যানবাহন ব্যবস্থা প্রবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ শাসনকে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং বহিরাক্রমণ উভয়ের থেকেই রক্ষা করতে হত। প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সৈন্যদলের দ্রুত সমাবেশ ও স্থানান্তরণের জন্য যথেষ্ট রেলপথ ও আধুনিক পাকা রাস্তা তৈরি করা দরকার ছিল। সুতরাং ব্রিটেনের সামরিক প্রতিরক্ষার প্রয়োজনও রেলপথ নির্মাণের এবং মোটের ওপর আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার বিস্তারের পথেই নিয়ে গিয়েছিল।

পরিবহন ব্যবস্থার ভারসাম্যহীন বিকাশ

ভারতবর্ষে এইসব আধুনিক যানবাহন ব্যবস্থা প্রবর্তিত এবং প্রসারিত হয়েছিল ভারতীয় জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের অবাধ, স্বাভাবিক, সর্বব্যাপী অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে নয়, তা হয়েছিল মূলতঃ ভারতবর্ষে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থরক্ষার

জন্য। এর ফলে ভারতীয় পরিবহন ব্যবস্থাতে এসে গিয়েছিল একটা ঔপনিবেশিক চরিত্র যার কাঠামোটা ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ রাজধানীর ঔপনিবেশিক লেজুড়ের ভূমিকায় তৈরি করার জন্য মানিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সুতরাং এর ফলে ভারতবর্ষে দেখা গেল রেল এবং আধুনিক সড়ক ব্যবস্থার কমতি, ভারসাম্যহীন বিকৃত বিকাশ।

'পথের মাইল ভিত্তিক পরিমাপের ব্যাপারে ভারতবর্ষের তুলনামূলক অপকর্ষের দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে এই উল্লেখ করে যে ভারতবর্ষের প্রতি ১০০ বর্গমাইলে ২·২ মাইল রেলপথ এবং প্রতি মাইলে ৭৮৯৪ জন অধিবাসীর তুলনায় ভারতবর্ষের মতনই একটা বিরাট কৃষিভিত্তিক দেশ যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১০০ বর্গমাইলে ৮·৪২ মাইল রেল লাইন রয়েছে এবং প্রতি মাইলে ৪৬৯ জন অধিবাসী বাস করে। আবার কানাডা, আর্জেণ্টিনা, ইউনিয়ন অফ সাউথ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডে রেলপথের মাইল পিছু গড়ে মাত্র ৩০০ জন অধিবাসী আছে।'৪

ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে ব্রিটিশ পুঁজির অর্থনৈতিক স্বার্থ ও সেই সঙ্গে ব্রিটিশের ক্ষমতা রক্ষার ব্যাপারে রেলপথের মুখ্য ভূমিকার কথা উপলব্ধি করে সবসময় রেল নিয়ন্ত্রণের চূড়ান্ত ক্ষমতা তার প্রতিনিধির অর্থাৎ ভারতবর্ষের ভাইসরয়ের হাতে ন্যস্ত করত। এমনকি ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনও ব্যবস্থা দিয়েছে যে 'রেলপথ নিয়ন্ত্রণ ও নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং চলাচলের ব্যাপারে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ব্যবহৃত হবে কেন্দ্রীয় রেল কর্তৃপক্ষের দ্বারা। এই কেন্দ্রীয় রেল কর্তৃপক্ষ সরাসরি গভর্নর জেনারেলের অধীনে থাকবে এবং বিধানমণ্ডলীর এর ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।'

যদিও ভারতবর্ষে রেলপথ ও সড়ক নির্মাণ ব্রিটিশ স্বার্থপ্রণোদিত ছিল এবং যদিও এর ফলে অগ্রগতি অপ্রতুল ও ভারসাম্যহীন রয়ে গিয়েছিল তবু ভারতীয় জনগোষ্ঠীর ইতিহাসে এরা বাস্তবভাবে একটা প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছিল।

রেলব্যবস্থা ঐতিহাসিকভাবে প্রগতিশীল নতুন অর্থনৈতিক শক্তিগুলোকে পুরোনো ভারতীয় সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে ধ্বংস করতে সাহায্য করেছিল। এই ব্যবস্থা আধুনিক সমাজের শিল্পদ্রব্য ভারতবর্ষে প্রবেশ করাতে সাহায্য করে। ফলে গ্রামের অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা ভেঙে যায়। রেল ভারতবর্ষকে একটা অর্থনৈতিক এককে আনতে এবং ভারতবর্ষকে বিশ্বের বাজারের সঙ্গেও যুক্ত করতে সাহায্য করেছিল। এই জাতীয় অর্থনীতিই হল ভারতীয় জাতির বস্তুগত কাঠামো।

'রেলওয়ে অভাবিত সম্ভাবনাময় ছিল। বিশেষীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ সৃষ্টি করে তারা উৎপাদন ও বাণিজ্যে বিপ্লব এনেছিল, বৃহদাকার আধুনিক শিল্প প্রবর্তন সম্ভব করেছিল এবং বড় বড় বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র গড়তে অগ্রণী হয়েছিল।··· মোটের ওপর অর্থনৈতিক ঐক্যের জন্য রেল দেশ-জুড়ে ও সারা বছর ধরে দামের সমতা আনার চেষ্টা করেছিল···দুর্ভিক্ষ সমস্যা মোকাবিলার জন্য রেল দুর্ভিক্ষ ত্রাণ সংগঠনের থেকেও বেশি সক্রিয় ছিল। বিকল্প পেশা ঠিক করে দিয়ে এবং চলাচলের সুবিধা করে দিয়ে রেল ক্রীতদাস মুক্তিতেও সাহায্য করেছিল।'৫

ভারতবর্ষে রেল এবং মোটর বাস পরিবহন প্রবর্তনের কতকগুলো প্রধান লাভের কথা আমরা এখন উল্লেখ করব।

ভারতবর্ষে রেলপথ প্রবর্তন ভারতীয় পুঁজির মালিকানায় ভারতীয় শিল্পের জন্ম অবধারিত করে তুলেছিল তা সে ব্রিটিশেরা পছন্দ করুক বা না করুক। ১৮৫৩ সালে কার্ল মার্কস এইরকম বলেছেন :

'আমি একথা জানি যে ইংলণ্ডের শিল্পতন্ত্র ভারতে রেলপথ বিস্তার করতে চায়। ইংলণ্ডের উৎপাদকদের জন্য কম খরচে তুলা ও অন্যান্য কাঁচামাল টেনে আনাই এই আগ্রহের একমাত্র কারণ। লোহা ও কয়লার অধিকারী এমন দেশের চলৎশক্তিতে একবার যন্ত্র চালু করলে তার বিস্তার আর আটকে রাখা যায় না। রেলওয়ে চলৎশক্তির সবরকম তাৎক্ষণিক ও সাম্প্রতিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য প্রয়োজনীয় সবরকম প্রক্রিয়ার প্রবর্তন ছাড়া একটা বিশাল দেশে রেলপথের বিস্তার রক্ষা করা যায় না। এর ফলে যেসব শিল্প সরাসরি রেলের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন সব শিল্পের শাখাতেও যন্ত্রের ব্যবহার অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। তাই ভারতবর্ষে রেলব্যবস্থা হবে আধুনিক শিল্পের প্রকৃতই পথপ্রদর্শক।'৬

রেলপথের প্রগতিশীল তাৎপর্য

শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে রেলের ভূমিকা Joan Beauchampও উল্লেখ করেছিলেন।

'রেলপথ নির্মাণ, ভারতীয় মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, গ্রেটব্রিটেন কর্তৃক আরোপিত করের ক্রমবর্ধমান বোঝা, সেই সঙ্গে কৃষিতে ক্রমবর্ধমান চাপ, তুলো, পাট, লোহা এবং কয়লা ইত্যাদির মত কাঁচামালের উপস্থিতি যা ভারতবর্ষেই ভালভাবে কাজে লাগানো যেতে পারত—এসব কিছুই ভারতবর্ষে শিল্পায়নের আসাটাকে অপরিহার্য করে তুলেছিল...'৭

ভারতীয় বণিকশ্রেণী, জমিদার গোষ্ঠীর অংশবিশেষ এবং ধনী বুদ্ধিজীবী-দের হাতে ব্যবসা থেকে লাভের সঙ্গে রেল মিলে স্বাধীন ভারতীয় শিল্পের জন্ম সম্ভব করেছিল। এই ঘটনাটা একটা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা কেননা এর ফলেই উদ্ভব হয়েছিল জাতীয় শিল্পে বুর্জোয়া শ্রেণীর যাদের স্বার্থ তাদেরকে ব্রিটেনের সঙ্গে বিরোধে (বাজার নিয়ে বিরোধ) টেনে এনেছিল, এবং শিল্প শ্রমিকশ্রেণীর জাতীয় আন্দোলনে যাদের নির্দিষ্ট গুরুত্ব নিয়তই বেড়ে গিয়েছিল।

রেল এবং আধুনিক সড়ক কৃষি ক্ষেত্রে যথার্থই এক বিপ্লব এনেছিল। এরা কৃষি উৎপাদন বিক্রয়যোগ্য করেছিল। কৃষকেরা বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদন করতে শুরু করল। কৃষি অর্থনীতি জাতীয় অর্থনীতি এমনকি বিশ্ব অর্থনীতির একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়াল। গ্রামের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অচলা-বস্থার প্রধান কারণ গ্রামের অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা ভেঙ্গে পড়ল।

দুর্ভিক্ষের সময় রেল প্রকৃতপক্ষেই ছিল আশীর্বাদ। দেশের অন্য অংশের উদ্বৃত্ত উৎপাদন দ্রুত দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকাতে আনা যেত ও জনসাধারণের কষ্ট লাঘব হত। এসব সত্ত্বেও যদি দুর্ভিক্ষ হত তবে তা সাধারণতঃ ও মুখ্যতঃ

আক্রান্ত এলাকায় উৎপন্ন দ্রব্যের অভাব হেতু হত না। জনসাধারণের ন্যূনতম ক্রয়ক্ষমতার অভাবই ছিল দুর্ভিক্ষের কারণ।

ভারতীয় জনসাধারণকে সামাজিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থার একটা প্রচণ্ড শক্তি ছিল। রেলব্যবস্থা বিজয়গৌরবে একটা বড় বাস্তব দূরত্ব ভ্রমণ করে দেশের বিভিন্ন অংশে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে বিভেদের সামাজিক দূরত্ব ধ্বংস করতে সাহায্য করেছিল।

মোটর বাস যা কিছুটা পরবর্তী পর্বে শুরু হয়েছিল তা গ্রামের বিচ্ছিন্নতা ধ্বংস করে দিতে দারুণ ভূমিকা নিয়েছিল। 'লক্ষ লক্ষ ভারতীয় ইঁদুর যেরকম প্লেগের জীবাণু বহন করে সেরকমভাবে সবসময়ই যাত্রী বোঝাই হাজার হাজার বাস, গ্রাম থেকে শহরে যাত্রী নিয়ে যাওয়ার সময় এবং আবার ফিরে আসবার সময় আধুনিকতার বীজাণু বহন করে।'৮

রেলওয়ে এবং বাস জনসাধারণের দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দেশান্তর গমন সম্ভব করেছিল। কাজ পাবার জন্য অথবা নিজেদের সম্ভাবনা উন্নতি করার জন্য জনসাধারণ বাস ও রেলযোগে মাদ্রাজ থেকে বোম্বাই, লাহোর থেকে কলকাতা যেত। শিক্ষিত ব্যক্তিরা, ডাক্তার, শিক্ষক, কেরাণীরা চাকরির জন্য নিজ প্রদেশ ত্যাগ করে বেছে নিয়েছিল অন্য জায়গা এবং বোম্বাই-এর মতন শহরে সারা দেশের প্রায় সব প্রদেশের লোকেদের নিয়ে গঠিত বৃত্তিজীবী শ্রেণীসমূহের অধিষ্ঠান হয়েছিল।

আধুনিক যানবাহন ব্যবস্থার কল্যাণে যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবার ফলে জনসাধারণের মধ্যে মেলামেশা সম্ভব হয়েছিল। এর একটা সুগভীর ফল ছিল। যদিও একটা সময়ের জন্য পুরোনো স্থানীয় ও প্রাদেশিক দৃষ্টিভংগী থেকে গিয়েছিল, তবে তার অবসানের প্রক্রিয়াও ধীরে ধীরে শুরু হয়েছিল। পুরোনো সংকীর্ণ পটভূমি ও দৃষ্টিভংগী দৃঢ়ভাবে অতিক্রান্ত হচ্ছিল। এ ব্যাপারটা ব্যাপকতর জাতীয় সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জাতীয় স্তরে সহযোগিতা বৃদ্ধির পথ করে দিয়েছিল।

খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে গোঁড়া সামাজিক অভ্যাসগুলো ভেঙে ফেলতে রেলব্যবস্থা কার্যকর প্রমাণিত হয়েছিল। শুধুমাত্র ভাড়া দেওয়ার ভিত্তিতে রেল ছুং ও অচ্ছুৎ উভয় হিন্দুকেই পক্ষপাতহীনভাবে বয়ে নিয়ে যেত। স্পৃশ্য হিন্দুরা যদিও এতে প্রথমে আঘাত পেয়েছিল, তবে অচিরেই সেও অস্পৃশ্যদের সঙ্গে ভ্রমণের ব্যাপারে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিল, কেননা সে রেলভ্রমণের সুবিধাগুলো ছাড়তে রাজি ছিল না। এইভাবে রেল সনাতন হিন্দুদের বজ্রআঁটুনি গোঁড়ামি দুর্বল করে দিয়েছিল। রেলভ্রমণের অভ্যাস খাদ্য, পানীয়, অস্পৃশ্যতা বিষয়ে তার খুঁতখুঁতানি শিথিল করে দিয়েছিল। রেল মানুষকে পরস্পর মিশুকে করে তুলল। এই অবিরাম মেলামেশা এবং সামাজিক আদানপ্রদান আগেকার সামাজিক বিচ্ছিন্নতার অভ্যাসগুলিকে দ্রুত নষ্ট করেছিল।

রেলপথ, মোটরবাস ও অন্যান্য আধুনিক যোগাযোগের উপায় ছাড়া জাতীয় স্তরে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্ভব হত না। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন সংহত ও রক্ষা করার উপায় যদি এগুলি হয়ে থাকে, তবে এই শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় স্তরে ভারতীয় জনসাধারণের রাজনৈতিক আন্দোলন গঠন

করার বস্তুগত উপাদানের ভূমিকাও এরাই পালন করেছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, লিবারেল ফেডারেশন, ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটস্, ইয়ুথ লীগ, All India Womens' Conference, All India Students Organisations, All India Kisan Sabhas, All India Trade Union Congress প্রভৃতি রাজনৈতিক সংগঠনগুলো জন্মাতেও পারত না বা জাতীয় স্তরে কাজ করতেও সমর্থ হত না, যদি আধুনিক রেল, বাস, ডাক ও তার ব্যবস্থার সুবিধাগুলি না থাকত। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অকল্পনীয় হয়ে যেত, যদি বিভিন্ন শহর, গ্রাম, জেলা ও প্রদেশের লোকেদের দেখা-সাক্ষাৎ করা, মতবিনিময় করা ও আন্দোলনের কর্মসূচী নির্ধারণ করার ব্যাপারটা রেল সম্ভব করে না দিত। আধুনিক যানবাহন ব্যবস্থা ছাড়া কোনো জাতীয় সম্মেলনই অনুষ্ঠিত হতে পারত না।

রেল এবং বাস জনসাধারণের মধ্যে প্রগতিশীল সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক ধারণা বিস্তারে সহায়তা করেছিল, আধুনিক যানবাহনের উপায় ছাড়া বৈজ্ঞানিক ও প্রগতিশীল সাহিত্য (বই, ম্যাগাজিন, কাগজ ইত্যাদি) সারা দেশে দ্রুত বণ্টন করা যেত না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ছাপা বইগুলিই ছিল জনগণের কাছে শিক্ষা পেঁছানোর হাতিয়ার। ছাপা বই হয়তো বা হাজারে হাজারে বের করা যেতে পারত, কিন্তু রেল এবং মোটরবাসের সাহায্যে হাজার হাজার গ্রামে ও শহরে এসবের দ্রুত বণ্টন ছাড়া ঐ বইগুলো সেসব কেন্দ্রে পেঁছাতে পারত না। আধুনিক যানবাহন ব্যবস্থা ছাড়া কোনো জনশিক্ষাই সম্ভব হতে পারত না।

একটিমাত্র কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সাফল্যগুলিকে রেলের সাহায্যে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা যেতে পারত। বিজ্ঞানী, শিল্পী, সমাজবিদ্, দার্শনিক এবং অর্থনীতিবিদেরা দেশ থেকে দেশান্তরে ভ্রমণ করতে এবং জনসমক্ষে অবতীর্ণ হতে পারলে তাদের জ্ঞানের সম্পদ ও শিল্পের নান্দনিকতা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে পারত। রেল এবং বাসের মতো দ্রুত ভ্রমণের ফলেই বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনগুলির ব্যবস্থা সম্ভব যেখানে ভারতীয় মনীষা এবং শিল্পপ্রতিভার সর্বোৎকৃষ্টদের মিলন ঘটে। চরিত্রে জাতীয় এবং জাতির পক্ষে অধিগম্য এমন এক গণশিক্ষা ব্যবস্থা ও একটি সংস্কৃতিই সেইসঙ্গে নির্ভর করেছিল রেল ব্যবস্থার ওপর ঠিক ততটাই যতটা নির্ভর করত অন্যান্য উপাদানের ওপর।

পরিবহন ব্যবস্থার পূর্ণ বিকাশের পূর্বশর্ত

ভারতে যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন অবিন্যস্ত ও সীমিত ছিল। এর ফলে ভারতীয় জনগণের সংহতি দৃঢ়তর করে তোলা ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি দ্রুততর করে তোলার ব্যাপারে আধুনিক যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার সম্ভব হয়নি। আধুনিক যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক ও পর্যাপ্ত প্রসারের সমস্যা দুটো সমস্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। প্রথম রাজনৈতিক ক্ষমতা ভারতীয় জনগণের আয়ত্তভুক্ত হবার সমস্যা, দ্বিতীয় আর্থিক পুনর্গঠনের বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতীয় সমাজের উৎপা-

দিকা শক্তিসমূহের দ্রুত বিকাশ। সামগ্রিকভাবে উৎপাদনের উপায়সমূহ যদি সমাজের আয়ত্তে থাকত তা হলেই এইরকম আর্থিক বিকাশ পুরোপুরি সম্ভব হয়ে উঠতে পারত।

সূত্র নির্দেশ

১ Laski দ্রষ্টব্য।
২ D. H. Buchanan, Gadgil, O' Malley দ্রষ্টব্য।
৩ Buchanan, পৃ. ১৭৬।
৪ Soni, পৃ. ২৪।
৫ O' Malley, পৃ. ২৬৯-৭০।
৬ Karl Marx, পৃ. ৬২-৩।
৭ Joan Beauchamp, পৃ. ৪২।
৮ Basil Mathews, O' Malley কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ২৪৮।

নবম পরিচ্ছেদ

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রসারে আধুনিক শিক্ষার ভূমিকা

শিক্ষার সামাজিক তাৎপর্য

আর্থিক ক্রিয়াকলাপ ছাড়া কোনো সমাজ কখনো বাঁচতে পারে না। সমাজের সভ্যদের ন্যূনতম কায়িক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সমাজকে অবশ্যই উৎপাদন প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে। উৎপাদন করতে সক্ষম হওয়ার জন্য অর্থাৎ প্রাকৃতিক উপাদানগুলোকে মানুষের প্রয়োজনের পক্ষে উপযোগী করে রূপান্তরিত করার জন্য সমাজকে প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা উপলব্ধি অর্জন করতে হবে অর্থাৎ সমাজকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জৈবিক অস্তিত্বের জন্য মানুষের সামাজিক কর্মের প্রক্রিয়ার মধ্যেই বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, কৃষিবিদ্যা ও অন্যান্য বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে। মানুষ বড় অথবা ছোট গোষ্ঠীতে একত্রিত হয়ে এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রয়োগ করেছিল ও কৃৎকৌশল অর্থাৎ হাল ও হস্তশিল্পের যন্ত্রপাতির মতো উৎপাদনের উপাদানকে গড়ে তুলেছিল। সাম্প্রতিককালে মানুষ আশ্চর্যজনক সব উৎপাদনের জিনিস আবিষ্কার করেছে, যেমন বাষ্প-চালিত, বিদ্যুৎচালিত এবং এমনকি আণবিক শক্তিচালিত যন্ত্র।

তাই প্রতিটি সমাজ যত অনগ্রসরই হোক না কেন সব সময়ই কিছু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও প্রকৌশলের অধিকারী ছিল। সমাজের সব সময়ই একটা দর্শন অথবা বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী ছিল, তা সে যতই স্থূল হোক না কেন।

সুতরাং শত শত বছর ধরে যে প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতীয় সমাজ বিদ্যমান ছিল তা বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি ব্যতিরেকেই ছিল তা নয়। সেই সমাজ বেঁচে ছিল কৃষি ও হস্তশিল্পকে ভিত্তি করে যা আগে থেকেই স্বীকার করে নেয় জ্যোতির্বিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, গণিত এবং বলবিদ্যার মতো বিজ্ঞানগুলোকে। প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতীয় সমাজের অধিগত ছিল চিকিৎসাবিজ্ঞানও।

প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতীয় সমাজ যেহেতু অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিম্নস্তরে ছিল, তাই অর্জিত ও সঞ্চিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিমাণ ছিল কম। বিশ্বের অধিকাংশ আধুনিক মানুষই যখন সভ্যজীবনের আলো পায়নি তার শত শত বছর আগেই ভারতীয় জনসাধারণ গণিত, রসায়নবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যার মতো বিজ্ঞানে পথিকৃৎসুলভ কাজ করেছে। কিন্তু তারপর বহুবছর ধরে ভারতীয় সমাজ প্রায় একই অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্তরে অনড় হয়ে ছিল এবং ভারতীয়

জনসাধারণও উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি করেনি। এই সময়ে উপনিষদে গঠিত ভাববাদী দর্শনের নানা ব্যাখ্যা হয়েছে। প্রকৃতি বিজ্ঞান বা কারিগরিবিদ্যার ক্ষেত্রে অবশ্য তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু কাজ হয়নি।

ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষার সূচনা করে ব্রিটিশেরা ভারতীয় জনসাধারণকে বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানের ক্ষেত্রে আধুনিক পাশ্চাত্যের ব্যাপক ও গভীর সাফল্যের সংগে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

'সময় এসেছে যখন এশিয়ার কাছে ইউরোপের সভ্যতার খাতে পুরানো দেনা প্রায় শোধ করে দেওয়া হচ্ছে; আর বিজ্ঞান, প্রাচ্যে জন্ম নিয়ে এবং পাশ্চাত্যে পরিণত হয়ে, এখন চূড়ান্তপর্বে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে যাচ্ছে।'[১]

প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে দুটি ভ্রান্ত ধারণা

ভারতবর্ষে প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে দুটো ভুল ধারণা ছিল। উৎকট জাতীয়তাবাদী আর্যসমাজ ভারতবর্ষের অতীতকে এক আদর্শ গণ্য করতে চেয়ে তারা এমনকি উদ্ভট দাবি করত যে আর্যরাই বৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সবরকম জ্ঞান অর্জন করেছিল এবং শাশ্বত বেদে এ সবকিছুই নিহিত আছে। আর্যসমাজ দাবি করেছিল যে আধুনিক যুগের সব আশ্চর্য-জনক আবিস্কার, আধুনিক পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা জীববিদ্যা ও ইঞ্জি-নিয়ারিং-এর সব নীতি ও সিদ্ধান্ত সবই বেদে বর্ণিত আছে—শুধুমাত্র তাদের যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে জানলেই হলো।

আর্যসমাজের এই উৎকট জাতীয়তাবাদী দাবির পেছনে ছিল তাদের এই অজ্ঞতা যে সমস্ত জ্ঞানই ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত এবং জ্ঞানের প্রসার ঘটলেও একটা প্রদত্ত মুহূর্তে তা সীমাবদ্ধ, এবং জ্ঞানের গভীরতা এবং ব্যাপকতা নির্ভর করে জনসাধারণের অর্জিত সামাজিক অগ্রগতির স্তরের ওপর। প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতীয় সমাজ তার অস্তিত্বের প্রতিটি পর্যায়েই ছিল সামাজিক, আর্থ-নীতিক অগ্রগতির অত্যন্ত নীচু স্তরে, আর তাই অর্জিত জ্ঞানও ছিল মানব-জাতির আধুনিক অর্জিত জ্ঞানের থেকে কম।

অপরপক্ষে লর্ড মেকলের মনে বিপরীত ধরনের ভুল ধারণা ছিল। তিনি পরম অবজ্ঞাভরে সমস্ত ভারতীয় সংস্কৃতিকেই পুঞ্জীভূত অবিমিশ্র কুসংস্কার বলে মনে করতেন। তিনি জানতে চাইলেন যে ব্রিটিশরা কি "সরকারী অর্থে এমন চিকিৎসাবিদ্যার পোষকতা করবে যেটা একজন ইংরাজ ঘোড়ার ডাক্তারের কাছেও লজ্জাকর, এমন জ্যোতির্বিদ্যার পোষকতা করবে যেটা ইংলণ্ডের একটা বোর্ডিং স্কুলের ছাত্রীর কাছেও হাস্যাস্পদ, এমন ইতিহাসের পোষকতা করবে যাতে ত্রিশ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট রাজা এবং ত্রিশ হাজার বৎসরব্যাপী রাজত্বকালের কথা প্রায়ই শোনা যায় এবং এমন ভু-বৃত্তান্তের পোষকতা করবে যাতে অমৃত ও ঘৃতের সমুদ্র উল্লিখিত..."[২]

ভারতবর্ষের অতীত সংস্কৃতির এটা একটা একপেশে ছবি। এটা সত্যি যে প্রতিটি অনুন্নত সমাজেই ব্যাপকভাবে কুসংস্কার প্রবল থাকে কিন্তু কুসংস্কারের সংগে প্রতিটি সমাজে কিছু পরিমাণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও সবসময়ই থাকে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে বেঁচে থাকার জন্য উৎপাদন করতেই হবে এবং উৎপাদন

মানেই" হল কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অস্তিত্ব, তা সে যত সামান্যই হোক না কেন। কোনো সমাজই অন্যথায় টিকে থাকতে পারে না। প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে ভারতীয় সমাজ শত শত বছর ধরে যে টিকে থাকতে পেরেছিল এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে এই সমাজে কিছু বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানও ছিল। প্রতিটি সমাজের কাজই হচ্ছে বিচার বিবেচনার মাধ্যমে অতীতের কৃষ্টিকে বহন করা অর্থাৎ অতীতের কৃষ্টির বৈজ্ঞানিক উপাদান আত্তীকরণ করা।

প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা

হিন্দু সমাজ বর্ণবিন্যস্ত ছিল। এই বর্ণবিন্যাসে যেখানে প্রতিটি জাতকে নির্দিষ্ট সামাজিক কর্তব্যের ভার অর্পণ করা হত, ব্রাহ্মণ হচ্ছে সেই জাত যার ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের, পুরোহিত হিসাবে তদারকির ও শিক্ষক হিসাবে কাজ করার একচেটিয়া অধিকার ছিল। বলতে কি, তাদেরই সবরকম উচ্চতর ধর্মীয় ও বিষয় অধ্যয়নের সুযোগ ছিল। হিন্দু রাষ্ট্রের ধর্মীয় অনুশাসনে অন্য জাতের লোকের জন্য সর্বপ্রকার উচ্চতর শিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণেরা সেই উদ্দেশ্যে নির্মিত বিশেষ বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্র যেমন টোল, বিদ্যালয় এবং চতুষ্পাঠীতে পড়াশোনা করত। শিক্ষার মাধ্যম ছিল হিন্দুদের পবিত্র ভাষা সংস্কৃত, যে ভাষাতেই কেবল সব ধর্মীয় এবং উচ্চতর বৈষয়িক জ্ঞান প্রকাশ করা হত।৩

সাধারণ মানুষের জন্য প্রতিটি গ্রামে এবং শহরে মাতৃভাষায় পড়ানো হয় এমন স্কুল ছিল যেখানে প্রধানত পড়া, লেখা ও প্রাথমিক পাটিগণিত শেখানো হত। এই স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় নির্দেশও দেওয়া হত। সাধারণতঃ ব্যবসায়ীর ছেলেরা এই স্কুলগুলোর সুবিধা নিত। মেয়েরা, নিচু জাতের লোকেরা এবং কৃষকেরা প্রায় কোনোরকম শিক্ষাই পেত না। সুতরাং প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে হিন্দুদের জন্য শিক্ষা খুব সীমিত ছিল এবং ব্রাহ্মণ বাদে আর সবার জন্য শিক্ষার বিষয়বস্তুও ছিল খুব দুর্বল। ব্রাহ্মণেরা সব উচ্চশিক্ষার একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করত।

তাছাড়া ব্রাহ্মণদের নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত এই শিক্ষাব্যবস্থা সমগ্র হিন্দু সমাজের জাত কাঠামো মেনে নেওয়া বেদের অভ্রান্তত্ব বিশ্বাস করাতে ও বেদের ব্যাখ্যাতে ব্রাহ্মণদের অধিকার স্বীকার করার মাধ্যম হিসেবে কাজ করত। এই শিক্ষাব্যবস্থাতে বয়োঃজ্যেষ্ঠ, পিতামাতা, শিক্ষক ও রাজার প্রতি নিঃশর্ত বাধ্যতাও শেখানো হত। বস্তুতপক্ষে ব্যক্তিকে সমাজের ক্রমানুক্রমিক কাঠামো গ্রহণ ও স্বীকার করানো এবং তার ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ সমর্পণ করার উপায় ছিল এই শিক্ষা।৪

প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতবর্ষে মুসলমানদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা কোনো গোষ্ঠীর একচেটিয়া ছিল না। এটা হতে পেরেছিল ইসলাম ধর্মের গণতান্ত্রিক প্রকৃতির জন্য। যে কোনো মুসলমানই মাদ্রাসাতে পড়াশোনা করতে পারত। সব উচ্চ-শিক্ষাই অবশ্য আরবী ভাষায় দেওয়া হত কেননা কোরাণ এই ভাষায় লেখা হয়েছিল, অথচ আরবী ভারতবর্ষে একটা বিদেশী ভাষা। যাহোক আরো স্কুল ছিল যেখানে কোরাণ ছাড়াও মাতৃভাষা, 'ইস্লামিক কৃষ্টি ও শাসনতন্ত্রের ভাষা' ও অন্যান্য বিষয় শেখানো হত।

'এই দুই ব্যবস্থাতে' (হিন্দু ও মুসলমান) 'অনেক কিছুই এক ধরনের ছিল। তারা শিক্ষা দিত এমন এক বা একাধিক ভাষায় যা অধিকাংশ মানুষের কাছে বিদেশী। ধর্মের সঙ্গে তাদের যোগাযোগের দরুন তারা ক্ষমতা পেত, আর, অপরিবর্তনশীল কর্তৃত্বের ওপর ভিত্তি করার জন্য এরা স্বাধীন অনুসন্ধানের মনোভাবে উৎসাহ দিত না এবং পরিবর্তনেও বাধা দিত। কিন্তু একটা ব্যাপারে তারা ভীষণভাবে ভিন্ন ছিল। হিন্দু স্কুলগুলো যা সমাজের একটা প্রশ্রয়প্রাপ্ত শ্রেণীর উপযোগী করে তৈরি করা হত···মুসলমান স্কুলগুলো ···তাদের সবার কাছেই উন্মুক্ত ছিল যারা বিশ্বাস করে ঈশ্বর এক এবং মহম্মদই সেই ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ।'৫

প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতের এইসব বিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোনো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে পারত না। এই শিক্ষার উদ্দেশ্যই ছিল শিক্ষার্থীদের গোঁড়া হিন্দু অথবা মুসলমানে পরিণত করা; নিজ নিজ ধর্ম এবং ধর্মানুমোদিত সামাজিক কাঠামোর প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্যপরায়ণ করে তোলা।

ভারতবর্ষের পক্ষে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সূচনা একটা অত্যন্ত ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এটা নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ সরকারের একটা প্রগতিশীল কাজ ছিল।

আধুনিক শিক্ষার সূচনা

ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষার প্রসার সম্ভব হয়েছে তিনটে মুখ্য সংস্থার জন্য। তারা হল বিদেশী ক্রীশ্চান মিশনারীরা, ব্রিটিশ সরকার এবং প্রগতিশীল ভারতীয়রা।

খৃষ্টান মিশনারীরা ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে ব্যাপক কাজ করেছিল। তারা প্রধানতঃ ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে খৃষ্টান ধর্ম বিস্তারের জন্য ধর্মান্তরিত করার আগ্রহে উৎসাহিত হয়েছিল। তারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করত যে ভারতীয়দের ধর্মান্তরিত করার এই অভিযান একটা সভ্য করার প্রয়াস। তারা হিন্দুদের বহুঈশ্বরবাদ এবং জাতি বৈষম্যকে আঘাত করত কেননা খৃষ্টধর্ম মূলতঃ এক ঈশ্বর ও সামাজিক সমতার পক্ষে। এই মিশনারীরা ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার পথিকৃৎদের অন্যতম। তাদের প্রবর্তিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো আধুনিক বৈষয়িক শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টধর্মের ধর্মীয় নির্দেশও দিত। মূলতঃ বৈষয়িক এইসব স্কুলগুলো ভারতীয়দের একত্রিত করার কেন্দ্র হিসাবে কাজ করত এবং তারপর তাদের খৃষ্টধর্ম শিক্ষা দিত। ঘটনা অবশ্য এই যে এইসব স্কুলে পড়া ছাত্রদের অধিকাংশই আধুনিক শিক্ষা আত্মস্থ করলেও তাদের একটা সামান্য অংশই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। যদিও তাদের এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রবর্তন করার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় তবু এই মিশনারী সংগঠনগুলো ভারতীয়দের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল।৬

তবে ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষার প্রসারে ব্রিটিশ সরকারই ছিল প্রধান প্রতিভূ। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার স্কুল ও কলেজের জাল বিস্তার করে

ফেলেছিল। এইসব স্কুল ও কলেজ আধুনিক বিদ্যায় শিক্ষিত করে হাজার হাজার ভারতীয়কে পারদর্শী করে তুলেছিল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সমালোচনা এই শিক্ষার লক্ষ্য ছিল। এই শিক্ষার সীমাবদ্ধতা ও বিকৃতি সত্ত্বেও বলা যায় যে ব্রিটেন ভারতে উদার এবং কারিগরি আধুনিক শিক্ষার বিস্তার করে। ব্রিটিশরা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই এই শিক্ষার প্রচলন করেছিল, একথা ঠিক। তবুও বলতে হবে যে এর একটা প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল।

ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষার সূচনা হয়েছিল প্রধানতঃ ভারতবর্ষে ব্রিটেনের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনের প্রেরণায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিশেষ করে লর্ড ডালহৌসির আমলে ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষার যে উল্লেখযোগ্য সূচনা হয়েছিল সেটা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। এ সময়টা ছিল সেই সময় যখন ব্রিটেন ভারতীয় ভূখণ্ডের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ তার শাসনাধীন করে নিয়েছিল। এই সময় থেকেই ব্রিটেনের শিল্প উৎপাদন ভারতবর্ষে আসতে শুরু করেছিল ও ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্য ব্যাপকাকার নিয়েছিল যদিও তা ছিল ব্রিটেনের অনুকূলে।[৭]

ব্রিটিশ সরকার বিজিত ভূখণ্ডকে শাসন করবার জন্য একটা বিশাল, ব্যাপক, সুবিন্যস্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা সংগঠিত করেছিল। রাজনৈতিক শাসনের এই বিশাল যন্ত্র চালানোর জন্য বহুসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তির দরকার হল। শুধুমাত্র ব্রিটেনের থেকে এই শিক্ষিত মানুষের যোগান সম্ভব ছিল না। যারা ব্রিটিশ শাসনের প্রশাসনিক কাঠামোর কর্মী হবে তাদের শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা দরকার হয়ে পড়ল। ব্রিটিশ সরকার রাষ্ট্র কাঠামোর গুরুত্ব-পূর্ণ পদগুলোর দায়িত্ব দিত ব্রিটিশদের হাতে আর অধস্তন পদগুলো পূরণ করত শিক্ষিত ভারতীয়দের দিয়ে।

ভারতবর্ষের সংগে সম্প্রসারিত বাণিজ্যের কারণে এবং ভারতবর্ষে উত্তরোত্তর যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠা করেছিল তার জন্যও ব্রিটেনের ইংরেজী জানা কেরানী, ম্যানেজার ও এজেণ্টের দরকার হয়ে পড়ল।

এই রাজনৈতিক-প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনই প্রধানতঃ ব্রিটিশ সরকারকে ভারতবর্ষে স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য করেছিল। একমাত্র আধুনিক শিক্ষা যা আধুনিক জাতির প্রয়োজন মেটাতে পারত তা এই স্কুল কলেজগুলিতে দেওয়া হত। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি ও বাণিজ্যিক দপ্তরগুলিতে কেরানী, নতুন আইনব্যবস্থার কাঠামো ও প্রক্রিয়ায় পারংগম আইনজ্ঞ, আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী ডাক্তার এবং কারিগর ও শিক্ষকও সরবরাহ করত।

আরও কতকগুলো উদ্দেশ্য ছিল যা ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ ইংরাজ চিন্তা-নায়কদের ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষার সূচনা করতে উৎসাহিত করেছিল। এই আলোকপ্রাপ্ত ইংরাজদের প্রত্যয় ছিল যে ব্রিটিশ সংস্কৃতিই হল বিশ্বের সব থেকে উৎকৃষ্ট ও সব থেকে উদার এবং যদি ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আরো পরে সমগ্র বিশ্বে সংস্কৃতিগতভাবে 'ইংরেজিয়ানা' শেখানো যায় তাহলে তা সমগ্র বিশ্বের সামাজিক ও রাজনৈতিক একতার পথ উন্মুক্ত করে দেবে। ব্রিটিশ শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারে তারা প্রায় ধর্ম প্রচারের জেদে অনুপ্রাণিত

ছিল। Cecil Rhodes-এর নেতৃত্বে এই ধরনের ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন মেকলে। Cecil Rhodes তাঁর উইলে "ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবং তার পরিধির বাইরেও ইংরাজি ভাষা ও সংস্কৃতির বাঁধনে আবদ্ধ জনগণের শান্তির সেবায় তাঁর ধারণা বর্ণনা করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল "সমগ্র বিশ্ব-জুড়ে ব্রিটিশ শাসনের বিস্তার করা—সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ, Holy Land, ইউফ্রেটিস উপত্যকা···দক্ষিণ আফ্রিকার পুরোটা ব্রিটিশ অধিবাসীদের দখলে আনা···শেষ পর্যন্ত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হিসাবে পুনরুদ্ধার করা, সার্বভৌম পার্লামেন্টে ঔপনিবেশিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার সূচনা করা যা সাম্রাজ্যের বিচ্ছিন্ন সভ্যদের একত্রে মিলিত করতে পারে, এবং সর্বশেষে এমন এক মহান শক্তির ভিত্তি স্থাপন করা যাতে যুদ্ধ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং মানবতার সর্বোৎকৃষ্ট স্বার্থরক্ষা হতে পারে।"৮

এটি ছিল সারা বিশ্বকে ইংরেজিয়ানায় গড়ে তোলার কর্মসূচী এবং এইভাবে ব্রিটেনের নির্দেশে ও নেতৃত্বে, প্রজাপুঞ্জের রাজনৈতিক ও সামাজিক একতা অর্জনের প্রয়াস।

একদল খ্যাতিমান ইংরাজ, Mountstuart Elphinstone যাদের মধ্যে ছিলেন, মনে করতেন যে ইংরাজি শিক্ষা 'ভারতীয় জনসাধারণকে আনন্দে ব্রিটিশ শাসনে সম্মতি দেওয়ার উপযুক্ত করে তুলবে।' এই আশা করা হয়েছিল যে 'শিক্ষার দরুন বুদ্ধিবিভাস জনগণকে ব্রিটিশ শাসনের সংগে খাপ খাওয়ার এবং এমনকি এই শাসনব্যবস্থার প্রতি এক ধরনের নৈকট্যের অনুভূতি এনে দেবে। Mcuntstuart Elphinstone-এর মতে ইংরেজীতে শিক্ষার একটা রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা ছিল। জনসাধারণের সংগে তাদের পুরোপুরি বিচ্ছিন্নতার জন্য ব্রিটিশদের সরকার একটা অনিশ্চিত অবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল এবং তা সবসময়ই বিপদাপন্ন ছিল। এই সরকারের স্থিরতা আনার একমাত্র উপায় হল যুক্তিবাদী শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে তাদের নিজ নীতি ও মত প্রকাশ করা। ১৯৩৮ সালে Trevelyan তার Education of the People of India নামক পুস্তিকাতে বলেছিলেন যে ইংরেজী সাহিত্যের মূল ভাবনা ইংরেজী যোগাযোগের অনুকূল না হয়ে যায় না, কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে এটি মুক্তির সাহিত্যও বটে এবং যা জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতার ভাবনায় প্রেরণা যোগায়।'৯

বিশ্বব্যাপী ব্রিটিশ সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিয়ে দুনিয়াকে সভ্য ও ঐক্যবদ্ধ করার অবতারের ভূমিকায় ব্রিটেনের এমন একটা প্রায় উন্মত্ত বিশ্বাস আর তার সংগে ভারতে ব্রিটিশ পুঁজিবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা মিশে, ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন ত্বরান্বিত করেছিল।

ভারতবর্ষে ভারতীয়রাই ছিল আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের তৃতীয় প্রতিভূ। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ভারতবর্ষে প্রগতিশীল আধুনিক শিক্ষার পথিকৃৎ। তিনি ইংরাজী শিক্ষাকে আধুনিক পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক চিন্তা-সম্পদের চাবিকাঠি বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে ভারতবর্ষে প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া শুধুমাত্র কুসংস্কার ও স্বৈরাচারই বাড়িয়ে তুলবে। 'যদি ব্রিটিশ জাতিকে প্রকৃত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত

রাখাই অভিপ্রায় হত, তবে বেকনীয় দর্শনের দ্বারা মধ্যযুগীয় পাঠশালা পদ্ধতির অবসান সম্ভবই হত না। এই পাঠশালা পদ্ধতিই ছিল জ্ঞান বিস্তারের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। অনুরূপভাবে ব্রিটিশ ব্যবস্থাপকসভা যদি এদেশের অধিবাসীদের অজ্ঞানতার অন্ধকারে রাখতে চাইত তাহলে সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারাই এই উদ্দেশ্য সবচেয়ে সুষ্ঠভাবে সাধিত হতে পারত।'[১০]

পরবর্তীকালে অসংখ্য সংগঠন যেমন ব্রাহ্ম সমাজ, আর্য সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, আলিগড় আন্দোলন এবং দেশমুখ, চিপ্লংকর, আগরকর, মাগনভাই, করমচাঁদ, কার্ভে, তিলক, গোখলে, মালব্য, গান্ধী প্রভৃতির মতো ব্যক্তিরা দেশজুড়ে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। এটা সত্যি যে ঐ শিক্ষাব্যবস্থার কিছু কিছু ব্যাপারে তাদের সমালোচনা ছিল তবু তারা এর মূল্য স্বীকার করেছিলেন এবং কিছু কিছু পরিবর্তন সহ জনসাধারণের মধ্যে এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার সমর্থন করেছিলেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এই শিক্ষা ব্যবস্থার ধর্ম-নিরপেক্ষ প্রকৃতির সমালোচনা করতেন এবং তাদের পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে কিছু কিছু ধর্মীয় অনুশাসনও যোগ করে দিয়েছিলেন। পণ্ডিত মালব্য কর্তৃক সংগঠিত বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং সৈয়দ আহমেদ খান কর্তৃক সংগঠিত আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় এই আন্দোলনের দুটো উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। অনেকে সরকার ও মিশনারী স্কুলগুলোতে ব্যবহৃত পাঠ্য বইয়ের সমালোচনা করেছেন এই বলে যে এগুলোর লক্ষ্য ভারতবর্ষের অতীতের অবমূল্যায়ন অথবা বাস্তব-জীবন থেকে বিচ্যুত করা। এরা তার পরিবর্তে এমন এক পাঠ্যবই রচনা করে-ছিলেন যা ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। সে যাই হোক সবাই আধুনিক শিক্ষার সারবস্তু—এর কর্তৃত্ববিরোধী উদার দৃষ্টি, ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর এর গুরুত্ব, এর অন্ধ বিশ্বাস পরিহার এবং আধুনিক প্রকৃতি বিজ্ঞানের ওপর গুরুত্ব আরোপ ইত্যাদি বজায় রেখেছিল। এমনকি আর্যসমাজ (লাজপত রায় গোষ্ঠী) কর্তৃক প্রবর্তিত স্কুল ও কলেজগুলো যেগুলো ছিল বিদেশী প্রভাবের জঙ্গীবিরোধী তারাও আধুনিক শিক্ষাকে গ্রহণ করেছিল এবং তাই শেখাত। শুধুমাত্র এর সঙ্গে কিছু ধর্মীয় অনুশাসন যোগ করে দিয়েছিল যেমন বেদের ভ্রান্তিহীনতার তত্ত্ব যা বস্তুতপক্ষে যে উদার শিক্ষা তারা দিত তার নীতির বিপরীত ছিল। উদারশিক্ষার চাবিকাঠি হল পরীক্ষা ও যুক্তির সাহায্যে জিনিস বিবেচনা করা।

আধুনিক শিক্ষার অস্বাস্থ্যকর প্রতিক্রিয়া

আধুনিক শিক্ষা পেয়েছিল এমন এক অংশ ভারতীয়দের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা এক অস্বাস্থ্যকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।

নতুন শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রথম সংস্পর্শ ছিল উত্তেজক। এই সংস্কৃতির মূল যুক্তি ও মুক্তির মর্ম অবশ্য একধরনের ভারতীয়ের পক্ষে বোধগম্য হয়নি। ব্যক্তির অবাধ সৃজনী উদ্যোগকে কেবল শৃঙ্খলিত করে যে পুরানো আদর্শ ও মানদণ্ড সেগুলোকে যথার্থভাবে পরিহার করলেও

শিক্ষিত ভারতীয়রা তার পরিবর্তে ব্যক্তিগত আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার মতো কোনো যুক্তিপূর্ণ আদর্শ বা মান উপস্থাপিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। সমস্ত রকম অযৌক্তিক অলংঘনীয় নিষেধাজ্ঞার থেকে মুক্তিকে সে সহসা আবেগতাড়িত যে কোনো কাজ করার স্বাধীনতা বলে ভুল করেছিল। সে স্বাধীনতাকে মদ্যপান করা ও অস্বাস্থ্যকর যৌনজীবন প্রশ্রয় দেওয়ার ছাড়পত্র বলে ভুল বুঝেছিল। সামাজিক জীবনের পুরানো কর্তৃত্বপূর্ণ ধারণা পরিহার করেও সে কোনো নিশ্চিত সামাজিক ধারণা গড়ে তুলতে পারেনি। পুরানো সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া ছিল প্রধানত নঞর্থক। পুরানো ধরন ও দৃষ্টিভংগীর অযৌক্তিকতা সে বুঝত কিন্তু ব্যক্তিগত ও সমাজের আচরণের জন্য সে কোনো নতুন স্পষ্ট প্রগতিশীল তত্ত্ব গড়ে তুলতে পারেনি। এটা প্রায়ই ব্যক্তিগত জীবনে নৈরাজ্য আনত এবং জনসাধারণের থেকে তার বিচ্ছিন্নতা এনেছিল। জনগণকে একটা স্থবির এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামাজিক অস্তিত্ব থেকে প্রগতিশীল গতানুগতিক স্বাধীন জাতীয় জীবনে নিয়ে যাওয়ার নেতৃত্ব দিতে অগ্রগামী বুদ্ধিজীবীর ঐতিহাসিক দায়িত্ব বোধ করার পরিবর্তে সে তাদের প্রতি, তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাদ্‌পদতা সম্পর্কে এক কদর্য ঘৃণা পোষণ করেছিল। জনগণের সংগে তার এক দুস্তর ব্যবধান গড়ে উঠেছিল। সে জনগণকে চিহ্নিত করত 'বর্বর' বলে আর জনগণ তাকে বলত 'সায়েব' ও 'বিজাতীয়'।

পশ্চিমী সংস্কৃতিতে অস্বাস্থ্যকর ব্যক্তিগত আচার-আচরণ বা সাধারণ লোকের ওপর বিরাগ দেখাবার কথা নেই। আধুনিক যুক্তিবাদের শিক্ষাটা হল জীবন সম্পর্কে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভংগী অবলম্বন, স্বাস্থ্যকর ব্যক্তিগত আচার আচরণ, অন্ধবিশ্বাস পরিহার, এবং বিগতকালের সকল সংস্কৃতি ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিচারমূলক মনোভাব অবলম্বন। এর অর্থ হল যে প্রাচীন সংস্কৃতি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সর্বকালে প্রযোজ্য যা কিছু মূল্যবোধ আছে সেগুলো আত্তীকরণ করতে হবে এবং যেগুলো সাম্প্রতিক কালের অভিজ্ঞতায় ভ্রান্ত বলে পরিগণিত বা ঐতিহাসিকভাবে অপ্রয়োজনীয় অর্থাৎ পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতিতে অপ্রাসংগিক সেগুলো পরিত্যাগ করতে হবে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সামাজিক সাম্য, যৌথ প্রগতি, বিভিন্ন ধ্যানধারণা ও প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়নে যুক্তিকে বিচারের সর্বপ্রধান মানদণ্ড হিসাবে অবলম্বন, ঐকান্তিক জাতীয়তাবাদ—এইগুলিই পশ্চিমী উদারনৈতিকতার মূলনীতি। পুঁজিবাদী সামাজিক ব্যবস্থার দরুন কতকগুলি নীতি শুধুমাত্র ভাবমূলক থেকে গেছে এবং মাত্র আংশিকভাবে কার্যকর হয়েছে একথা ঠিক।১১ কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতে হবে এইনীতিগুলি মানবজাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনে পথনির্দেশক এবং মধ্যযুগীয়তা থেকে ঐতিহাসিকভাবে উন্নততর সামাজিক সংগঠন আধুনিক পুঁজিবাদের দিকে অগ্রগতির লক্ষণস্বরূপ।

শিক্ষিত ভারতীয়রা যে মানসিক ও নৈতিক সংযম পরিত্যাগ করেছিলেন এবং ভারতীয় সবকিছুর ওপর নির্বিচারে ঘৃণা পোষণ করছিলেন, তার গভীর কারণ ছিল। পুরোপুরি কর্তৃত্বপরায়ণ মধ্যযুগীয় সামাজিক কাঠামো এবং জাতি ও সামাজিক প্রথার লোহশাসন ব্যক্তিস্বাধীনতা এমনভাবে খর্ব ও রুদ্ধ করেছিল যে পশ্চিমী সভ্যতার সামাজিক মুক্তির প্রভাব আসামাত্র শিক্ষিত

ভারতীয়গণ আংশিকভাবে হলেও সর্বপ্রকার বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন। কর্তৃত্বপরায়ণ সমাজব্যবস্থা ও মতাদর্শ দ্বারা আরোপিত বাহ্যিক ও মানসিক বিধিনিষেধের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার উন্মাদনায় সাময়িকভাবে পশ্চিমী উদারনৈতিকতাকে সর্বপ্রকার শৃংখলাহীন জীবনযাত্রা পরিপোষক বলে ভুল করলেন। সামাজিক ইতিহাসের সকল রূপান্তরের সময়ই এইরকম অন্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।১২

নতুন শিক্ষাব্যবস্থার গুরুতর ত্রুটির ফলে এই অবস্থাটা আরও খারাপ হয়ে উঠল। নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজী ভাষার ওপর অতিরিক্ত জোর পড়েছিল। ফলে শিক্ষিত লোকের সংগে দেশবাসীর তফাৎ খুব বেড়ে গিয়েছিল। জাতীয় অগ্রগতির প্রশ্নে ভারতীয় জনসাধারণের প্রকৃত জীবনযাত্রা ও সমস্যাসমূহের সংগে এই শিক্ষাব্যবস্থার কোনো যোগ ছিল না। এই শিক্ষাব্যবস্থায় ব্রিটিশ শাসনের গৌরব ও মাহাত্ম প্রচার হয়েছে এবং ভারতের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনার পরিবর্তে তার নিন্দা করা হয়েছে। ইংলণ্ডের ইতিহাস চর্চার ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে জাতীয় গৌরবের উদ্দীপনা আসেনি। উপরন্তু এই শিক্ষাব্যবস্থার ফলে শিক্ষিত ভারতীয়গণ জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে শাসক জাতির সংগে একাত্মতা বোধ করতে থাকে এবং সাধারণ মানুষ সম্পর্কে তার মনে ঘৃণার উদয় হয়।

শিক্ষিত ভারতীয়দের এই অংশের মধ্যে পাশ্চাত্যের মহান যুক্তিবাদী ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অপলাপ উপলক্ষ্য করে সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি দোষারোপ করতে লাগল। এরা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিকৃত ব্যাখ্যা করে বলল পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে মদ্যপান, অস্বাস্থ্যকর যৌনজীবন, সমাজবিরোধী ও জাতীয়তাবিরোধী উদ্ধত আত্মম্ভরিতা অবাধ হয়ে উঠেছে। এইভাবে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার সারবস্তু সামাজিক মুক্তি ও যুক্তিবাদী তত্ত্বজাত বিচারমূলক মননশীলতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রভাব বিস্তার করবার চেষ্টা হতে লাগল। এরা যুক্তি দেখাল যে সামাজিক শৃংখলা রক্ষা করতে হলে ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপরে বাধানিষেধ আরোপ করতেই হবে। ব্যক্তির স্বচ্ছন্দ দৈহিক, মানসিক ও ভাবাবেগগত বিকাশের পক্ষে এইসব বাধানিষেধসমূহ বিঘ্নকর। জাতীয়তাবাদের নামে এরা সেকেলে সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং অযৌক্তিক অন্ধবিশ্বাসভিত্তিক মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করতে থাকল।

অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে এসবই ছিল ক্ষণস্থায়ী ব্যাপারমাত্র।

১৮৫৪ সাল পর্যন্ত আধুনিক শিক্ষার বিস্তার

১৮১৩ সালের আগে আধুনিক শিক্ষা পত্তনের জন্য মিশনারী গোষ্ঠীগুলোর ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কতকগুলো বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা ছিল। এই দুয়ের সম্মিলিত শিক্ষাসংক্রান্ত কাজের পরিধিও ছিল খুবই সীমিত এবং পথিকৃৎ হিসাবেই এর কিছু তাৎপর্য ছিল।

ভারতীয় প্রজাদের শিক্ষার ব্যাপারে ১৮১৩ সালের চার্টার অ্যাক্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিতে একটা ব্যতিক্রম। এই চার্টারের মাধ্যমে কোম্পানি এই

প্রথম শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করল। এতে ব্যবস্থা ছিল যে শিক্ষার জন্য 'বছরে কমপক্ষে এক লাখ টাকা আলাদা করে রাখা হবে।'১৩

কি ধরনের শিক্ষা ভারতীয়দের দেওয়া হবে সে বিষয়ে ব্রিটিশদের মধ্যে চিন্তার দুইটি ধারা ছিল। এর মধ্যে প্রথম ধারাটি পরিচিত ছিল 'ইংরেজপন্থী' নামে যার সব থেকে বড় প্রবক্তা ছিলেন মেকলে যিনি 'পশ্চিমী সংস্কৃতির দ্বারা ভারতীয় সংস্কৃতির বদল' চেয়েছিলেন এবং শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছিলেন এমন একশ্রেণীর ভারতীয় তৈরি করা যারা 'রক্তে ও বর্ণে ভারতীয় কিন্তু রুচি, মতবাদ, নীতি ও বুদ্ধিবৃত্তিতে ইংরাজ।'১৪ এই চিন্তাধারার সমর্থকরা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজীর সপক্ষেও ছিল। এই মতবাদ মিশনারী, কোম্পানির নবীন অফিসার এবং রাজা রামমোহন রায়ের মতো প্রগতিশীল ভারতীয়দের দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় ধারাটি 'প্রাচ্যপন্থী' নামে পরিচিত। এরা ভারতীয়দের মধ্যে পশ্চিমী জ্ঞানবিজ্ঞান প্রসারের কর্মসূচী মেনেও অবশ্য সংস্কৃত ও আরবী সাহিত্যে উৎসাহিত করার দৃঢ় প্রবক্তা ছিলেন। এই দ্বিতীয় ধারার অনুগামীরা আবার শিক্ষার মাধ্যমের প্রশ্নে দুটো গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, একটা গোষ্ঠী শিক্ষার মাধ্যম রূপে সংস্কৃত ও আরবীর মতো চিরায়ত ভাষার সপক্ষে ছিলেন। এই গোষ্ঠী বাংলাদেশে বিশেষভাবে শক্তিশালী ছিল, এরা ওয়ারেন হেস্টিংস ও মিণ্টোর মতামতের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। অন্য গোষ্ঠী পরিচালিত হত Munro এবং Elphinstone-এর নেতৃত্বে এরা বোম্বাইতে শক্তিশালী ছিল। এই গোষ্ঠী মনে করত যে একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিলে তবেই পাশ্চাত্য শিক্ষা জনসাধারণের কাছে পেঁছিতে পারে।

সদলবলে রাজা রামমোহন রায় মেকলে ও তার সহযোগীদের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। রাজা ১৮২৩ সালে গভর্ণর জেনারেলের কাছে একটা স্মারকলিপি পেশ করেন যাতে তিনি সরকারকে 'গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন, শারীরবিদ্যা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে আরও উদার ও বুদ্ধিদীপ্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নত করার'১৫ অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে রাজার মনোভাব ভারতীয় রাজনীতিতে পরে গড়ে ওঠা উদারপন্থী ভাবধারার অগ্রদূত। এই রাজনৈতিক উদারপন্থীরা পশ্চিমী শিক্ষাকে আদর্শস্থানীয় করেছিল এবং ভারতীয় কৃষ্টিকে হীন করার জন্য অন্যান্য জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর (পাল, ঘোষ, গান্ধী ও অন্যান্য) দ্বারা সমালোচিত হয়েছিল।

ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিক ১৮৩৫ সালে তাদের মতবাদ গ্রহণ করলে ইংরেজপন্থীদের অনুকূলে এই বিতর্কের মীমাংসা হয়। সরকারের প্রকাশিত প্রস্তাবে বলা হয় যে 'ব্রিটিশ সরকারের প্রধান লক্ষ্যই হওয়া উচিত ভারতবর্ষের দেশীয় অধিবাসীদের মধ্যে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রসার এবং শিক্ষার খাতে গৃহীত সমস্ত অর্থ শুধুমাত্র ইংরেজী শিক্ষার খাতে ব্যয় করলেই সব থেকে ভাল...' এবং আরও বলা হয় 'সব অর্থই অতঃপর দেশীয় অধিবাসীদের ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ইংরাজী সাহিত্য ও বিজ্ঞান শেখানোর জন্য ব্যয়িত হবে।'১৬

কোম্পানির সরকারের শিক্ষানীতি জনশিক্ষা ও দেশীয় গ্রামীণ স্কুলগুলোকে

অবহেলা করত। যতই সীমিত ও স্থূল হোক না কেন এই গ্রামীণ স্কুলগুলো জনসাধারণকে প্রাথমিক শিক্ষা দিত।

ইংরেজপন্থীরা বিশ্বাস করতেন নিম্নগামী অনুস্রবণ তত্ত্বে (Downward Filtration Theory)। এই তত্ত্ব অনুসারে শিক্ষিতশ্রেণীর নিজস্ব প্রচেষ্টায় ফলে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান ছড়িয়ে পড়বে।

বোম্বাইতে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার প্রবক্তাদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়। শিক্ষা পর্ষদে জগন্নাথ শংকর শেঠ, ফ্রামজী কাওয়াসজী এবং এম. আই. মাক্‌বা এই তিনজন ভারতীয় ছিলেন। এদের মধ্যে জগন্নাথ শংকর শেঠ তার প্রতিবেদনে বলেন 'আমি নিশ্চিত হয়েছি যে পশ্চিম ভারতের মানুষ প্রয়োজনীয় বিষয় জানাবার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা ইংরেজীর চেয়ে বেশি সুবিধার অধিকারী। একথা অস্বীকার করা যায় না যে বিদেশী ভাষার থেকে তাদের নিজেদের ভাষার যে কোনো বিষয়ই তাদের পক্ষে গ্রহণ করা কম অসুবিধাজনক। আমি ইংরেজী পড়ানো মোটেই নিরুৎসাহিত করতে চাই না, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে তা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে।'[১৭]

বোম্বাইয়ের বিতর্কের একটা ফল হয়েছিল। কলেজ পর্যায়ে ইংরেজিকেই শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম করা হলেও মাধ্যমিক পর্যায়ে মাতৃভাষার ব্যবহার অব্যাহত ছিল।

উডের ডেসপ্যাচ থেকে লর্ড কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয় আইন

ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসের প্রথম পর্যায় ১৮৫৪ সালে উডের ডেসপ্যাচের সংগে সমাপ্ত হয়। এই ডেসপ্যাচ শিক্ষা বিষয়ে তৎকালীন সময়ের সব বিতর্কগুলিকে এক সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভংগীর মধ্যে সমাধান করে। এই ডেসপ্যাচকে সাধারণভাবে ভারতীয় শিক্ষার মহাসনদ বলা হত, কেননা এতে সরকারের প্রতি কতকগুলো বৃহত্তর কর্তব্য ধার্য হয়েছিল। অবশ্য পরবর্তী বছরগুলোতে একে কার্যকর করা যথোপযুক্ত হয়নি বলে ভারতীয় সমালোচকরা মনে করতেন।

Dispatch-এ বলা হয়েছিল যে ভারতবর্ষে শিক্ষাব্যবস্থা সংগঠিত হয়েছিল তিনটে উদ্দেশ্যে (১) পশ্চিমী সংস্কৃতি বিস্তার করা (২) শাসনকার্যের জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষিত কর্মচারী যোগাড় করা (৩) সার্বভৌমের প্রতি ভারতীয় প্রজাদের কর্তব্য পালন।[১৮]

শিক্ষার মাধ্যম বিষয়ে বিতর্কের ব্যাপারে Dispatch এই সিদ্ধান্তে এসেছিল যে (১) কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজীই ব্যবহৃত হবে (২) ইংরেজী এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষা—উভয়ের মাধ্যমেই মাধ্যমিক শিক্ষা দেওয়া হবে (৩) আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিক্ষাও উৎসাহিত করতে হবে, এই লক্ষ্য রেখে যাতে সময়কালে উচ্চতর শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সেগুলি ব্যবহার করা যায়। সরকারের ভারতীয় সমালোচকরা এই শেষ দুটি সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে কার্যকর না করার জন্য সরকারের ওপর দোষারোপ করেছিল।[১৯] Dispatch-এ আরও বলা হয়েছিল যে জনসাধারণ ও নারী জাতির শিক্ষার ব্যাপারে সরকার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব নেবে।

১৮৫৪ সালের এই Wood-এর **Education Dispatch-ই** ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোর ভিত্তি তৈরি করেছিল। ১৮৫৪ সালের পরই শিক্ষা বিস্তার একটা প্রেরণা পায়।

সে যাই হোক ১৮৮০ সালের পরই ভারতবর্ষে শিক্ষার দ্রুত বিস্তার ঘটেছিল। ১৮৮০ সাল থেকে দেশে ব্যাপকভাবে শিক্ষামূলক কাজ আরম্ভ হয় ; এই কাজ সংগঠিত করে মিশনারীরা, সরকারের শিক্ষাদপ্তর ও প্রগতিশীল ভারতীয়রা। এদের মধ্যে ১৯০১-২ সালে ভারতবর্ষে শিক্ষা বিস্তারে ভারতীয় ব্যক্তিগত উদ্যোগের অংশ ছিল সবচেয়ে বেশি।২০

সত্তরের দশকে তিলক ও আগরকর বোম্বাই প্রেসিডেন্সি বিভাগে Deccan Education Society প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের নিজেদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এটা ছিল চমৎকার দৃষ্টান্ত। এই Society-র প্রতিষ্ঠাতাগণ ভারতীয় জনসাধারণের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে আধুনিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বুঝতে পেরেছিলেন। তাদের আরও লক্ষ্য ছিল এই সমাজকে কেন্দ্র করে একদল নিঃস্বার্থ শিক্ষিত ভারতীয় জড়ো করা যারা শিক্ষা এবং অন্যান্য জাতীয় কাজে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করবে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দুই বিখ্যাত নেতা তিলক ও গোখলে সহ বেশ কিছুসংখ্যক স্বদেশপ্রেমী ভারতীয় এই Society-র কার্যাবলীর সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

বিজপুরকর সম্বন্ধেও বিশেষভাবে বলতে হয়। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে তালেগাঁওতে একটা রাষ্ট্রীয় স্কুল শুরু করেন। শিক্ষা বিষয়ে ভারতীয়দের করা স্বাধীন পরীক্ষানিরীক্ষাগুলির মধ্যে এটাই সম্ভবতঃ প্রথম। পরবর্তীকালে পরিকল্পিত ও সংগঠিত 'বিদ্যাপীঠ' এবং ওয়ার্ধা শিক্ষা প্রকল্পের মত শিক্ষাগত পরীক্ষানিরীক্ষার এটি পথপ্রদর্শক।

এই স্কুলটিতে কারিগরি শিক্ষা দেওয়া হত। ইতিমধ্যে ভারতীয় শিল্পও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা এই শিল্পগুলোতে কৃৎকৌশলী সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে প্রণোদিত ছিল যাতে করে বিদেশী কৃৎ-কৌশলীদের প্রতি নির্ভরতা কমানো যায়। আরো একটা লক্ষ্য যা সম্ভবতঃ তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা হল দেশে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রয়োজনে কারিগরের চাহিদা মেটানো যারা আন্দোলনের স্বার্থে অস্ত্রশস্ত্র গড়ে দিতে পারে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে দেশীয় স্কুল ব্যবস্থার দ্রুত পতন ঘটে। প্রধানতঃ দুটো কারণে এটা হয়েছিল : (১) সরকারী আর্থিক সাহায্য না পাওয়া, (২) শুধুমাত্র যারা ঐ নতুন স্কুলগুলোতে শিক্ষা পেত তারাই চাকরির উপযোগী বলে বিবেচিত হত। এমনকি ব্যক্তিগত নিয়োগকারীরাও তাদেরই পছন্দ করত।

তৃতীয় পর্যায়, ১৯২১ সাল পর্যন্ত

১৯০১ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত সময়টা ছিল রাজনৈতিক বিক্ষোভের সময়। এই সময়েই শুরু হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, মোরলে-মিন্টো রিফর্ম, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, হোমরুল এবং অসহযোগ আন্দোলন। এটা ছিল ভারতীয়

জনগণের মহান জাতীয় জাগরণের সময় যখন গড়ে উঠেছিল তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা আর বাড়ছিল ব্রিটিশ সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে সমালোচনার মনোভাব—শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি এই সবক্ষেত্রেই।

১৮৮০ থেকে ১৯০১ সালের মধ্যে শিক্ষার বিস্ময়কর অগ্রগতি হয়েছিল। লর্ড কার্জন এবং অন্যান্যরা গুণগত পরিপ্রেক্ষিতে এই অগ্রগতির সমালোচনা করেছেন। তাঁরা বলেছিলেন যে ১৮৮০ সালের পর শিক্ষার মান উল্লেখযোগ্য-ভাবে নেমে গিয়েছে। ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল অকেজো, শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে বিদেশী কৃষ্টি আত্মস্থ করার এক সহজাত অক্ষমতা আছে এবং দৃঢ়চেতা মানুষ গড়ার দৃষ্টিভংগী নিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে।২১

অন্যদিকে ভারতীয় সমালোচকরা ভারতীয় জনসাধারণের সার্বজনীন সংস্কৃতির স্বার্থে শিক্ষার পরিমাণগত বিস্তারের ওপরই গুরুত্ব আরোপ করতেন। তাদের মতে মানের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে শিক্ষা সংকোচনের কোনো প্রয়োজন ছিল না বরং যা দরকার ছিল তা হল স্বতঃস্ফূর্ততার ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষার দ্রুত বিস্তার করা এবং জনসাধারণের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন।

'সরকার যেন না ভাবে যে কলেজীয় শিক্ষা সর্বোচ্চ মানের না হলে···তা হয়ে যাবে অর্থহীন এবং এমনকি মারাত্মক ক্ষতিকর, এবং দ্বিতীয়ত আমাদের স্নাতকদের সাফল্যকে যেন বোধির ক্ষেত্রে এই শিক্ষার উপযোগিতা নির্ধারণে একমাত্র বা এমনকি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি বলে ধরা না হয়। আমি মনে করি···যে, ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে, সমস্ত পশ্চিমী শিক্ষাই মূল্যবান এবং দরকারী···। আমার কাছে পশ্চিমী শিক্ষার মহত্তর সৃষ্টিগুলি ভারতের বর্তমান অবস্থায় শিক্ষার ততটা উৎসাহের কারণ নয়, যতটা পুরানো দুনিয়ার ধ্যানধারণার দাসত্ব থেকে ভারতীয় মনের মুক্তির কারণ···। এই উদ্দেশ্যে, সর্বোচ্চ শিক্ষাই নয় শুধু সমস্ত পাশ্চাত্য শিক্ষাই প্রয়োজনীয়।'২২

ভারতীয় সমালোচকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার ব্যাপারে ব্যক্তিগত উদ্যোগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন।

বিপিনচন্দ্র পাল এবং অরবিন্দ ঘোষ ও তাঁর ভাইয়ের মত চরমপন্থীরা শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করত যে এই শিক্ষা বিজাতীয় শিক্ষা দিচ্ছে। তাদের সমালোচনার কথা পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রায় সব ভারতীয়ের আপত্তি সত্ত্বেও ১৯০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হয়। এতে অন্যান্য নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে কলেজ অনুমোদনের শর্তাবলী আরো কড়াকড়ি করা হয়। এই আইন ইউনিভার্সিটি সেনেটে যেসব বিধি প্রণয়ন করবে সেগুলোর ব্যাপারে, অধিকাংশ ফেলো মনোনয়নের ব্যাপারে এবং কলেজের অনুমোদন ও অননুমোদনের ক্ষেত্রে সরকারের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত করেছিল। সমালোচকরা মন্তব্য করেছিলেন যে এই আইনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শুধুমাত্র একটা সরকারী দপ্তরে পর্যবসিত হয়েছিল।

শিক্ষার অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে আরো অবনতি ঘটেছিল ১৯০৪ থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে সংশোধিত গ্র্যান্ট-ইন-এড বিধির কারণে। এতে মাধ্যমিক স্কুলের বিস্তারে দারুণ ক্ষতি হয়েছিল। পরিশেষে বাধ্যতামূলক শিক্ষা

সম্পর্কে গোখলের উত্থাপিত বিল (প্রাথমিক শিক্ষার মহাসনদ হিসেবে বর্ণিত) গৃহীত না হওয়ায় ভারতীয় জনসাধারণকে শিক্ষিত করার সব আশা বিনষ্ট হয়ে যায়।

সরকারের শিক্ষানীতির ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান অসন্তুষ্টি ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষাদপ্তর নিয়ন্ত্রিত করার একটা ইচ্ছা জাগ্রত করে তুলেছিল। এই অসন্তোষ কিছু কিছু নেতার মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে নতুন স্বাধীন পরীক্ষানিরীক্ষা সংগঠিত করার প্রেরণা এনেছিল।

চতুর্থ পর্যায়, ১৯২১-১৯৩৯

দ্বৈতশাসনের সময়ে ১৯২১ সালে শিক্ষা দপ্তরটা ভারতীয় মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসা হয়। এই ব্যবস্থায় প্রাদেশিক সরকারদের শিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচী গ্রহণ ও কার্যকরী করার ব্যাপারে অনেক বেশি স্বাধীনতা ছিল। এর ফলে ১৯২১ সালের পর শিক্ষা বিস্তারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছিল।

আর্থিক সম্পদের সীমাবদ্ধতা অবশ্য অচিরেই এই অগ্রগতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। ১৯০১-২১ সালের মধ্যে শিক্ষার জন্য ভারত সরকারের নির্দিষ্ট অনুদান বন্ধ করে দেওয়া, আর এর সঙ্গে বিশ্বব্যাপী মন্দার দরুন আর্থিক অসুবিধা একজোট হয়ে শিক্ষা বিস্তারের বড় বড় প্রকল্পগুলি চালানো দুঃসাধ্য করে তোলে।

১৯২১ থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে অবশ্য শিক্ষার দ্রুত অগ্রগতি হয়েছিল। নিচের পরিসংখ্যানে এই ছবি পাওয়া যায়।

শিক্ষার পরিসংখ্যান ১৯২১-২ এবং ১৯৩৬-৭

প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		ছাত্রসংখ্যা	
	১৯২১-২	১৯৩৬-৭	১৯২১-২	১৯৩৬-৭
বিশ্ববিদ্যালয়	১০	১৫	সংখ্যা পাওয়া যায় নি	৯,৬৯৭
কলা মহাবিদ্যালয়	১৬৫	২৭১	৪৫,৪১৮	৮৬,২৭৩
বৃত্তিমূলক মহাবিদ্যালয়	৬৪	৭৫	১৩,৬৬২	২০,৬৪৫
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৭৫৩০	১৩,০৫৬	১১,০৬,৮০৩	২২,৮৭,৮৭২
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৫৫,০১৭	১,৯২,২৪৪	৬১,০৯,৭৫২	১,০২,২৪,২৮৮
বিশেষ বিদ্যালয়	৩,৩৪৪	৫,৬৪৭	১,২০,৯২৫	২,৫৯,২৬৯
অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান-সমূহের মোট সংখ্যা	১,৬৬,১৩০	২,১১,৩০৮	৭৩,৯৬,৫৬০	১,২৮,৮৮,০৪৪
অননুমোদিত প্রতিষ্ঠানসমূহ	১৬,৩২২	১৬,৬৪৭	৪,২২,৩৬৫	৫,০১,৫৩০
মোট সংখ্যা	১,৮২,৪৫২	২,২৭,৯৫৫	৭৮,১৮,৭২৫	১,৩৩,৮৯,৫৪৭

(উপরিউক্ত সংখ্যাগুলো ব্রিটিশ ভারতের, বার্মাকে বাদ দিয়ে)

শিক্ষাদপ্তর ভারতীয়ের নিয়ন্ত্রণে থাকা ছাড়াও আরও কতকগুলো কারণ ছিল যাতে শিক্ষা বিস্তারের ব্যাখ্যা মেলে। এই সময়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতাও এই করণগুলির অন্যতম।২৩

জনশিক্ষার দ্রুত বিস্তার এই সময়ের একটা সবথেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অধিকাংশ প্রদেশে বাধ্যতামূলক শিক্ষাসংক্রান্ত একাধিক আইন পাশ হয়েছিল। যেখানে যেখানে এই আইনগুলো ছিল সেখানে সেখানে কমবেশি এই আইন-গুলো কার্যকরও করা হয়েছিল। নিচের পরিসংখ্যানে ১৯২২ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে প্রার্থমিক শিক্ষা বিস্তারের চিত্র দেখা যায়।

প্রার্থমিক শিক্ষার পরিসংখ্যান

	১৯২১-২	১৯২৬-৭
প্রার্থমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১,৫৫,০১৭	১,৮৪,৮২৯
প্রার্থমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	৬১,০৯,৭৫২	৮০,১৭,৯২৩
প্রার্থমিক শিক্ষাখাতে ব্যয় (প্রত্যক্ষ)	৪,৯৪,৬৯,০৮০ টাকা	৬,৭৫,১৪,৮০২ টাকা

১৯২৭ সালের পর প্রার্থমিক শিক্ষার অগ্রগতির হার হ্রাস পেতে আরম্ভ করে। অর্থনৈতিক মন্দা যা পরবর্তী বছরগুলোতে প্রচণ্ড আকার নেয় তা এর অন্যতম প্রধান কারণ। এর ফলে প্রার্থমিক শিক্ষার বিস্তারের জন্য কতকগুলো পরিকল্পনা ত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয়। প্রার্থমিক শিক্ষা বিস্তার হ্রাস পাওয়ার আর একটা কারণ হল **Hartog Committee**-র সুপারিশ। এতে সরকারকে প্রার্থমিক শিক্ষা 'পরিব্যাপ্ত' না করে সংহত করার দিকেই জোর দিতে বলা হয়েছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গী সাধারণভাবে বেসরকারী মতামতে সমালোচিত হয়েছিল। বেসরকারী মতামতে সাক্ষরতা ও শিক্ষার সংখ্যাগত প্রসার চাওয়া হয়েছিল। 'টুপটাপ করে নয়, শিক্ষাকে অঝোরে ঝরতে হবে।'

'অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্তই শুধু নয় তাদের শিক্ষার ইতিহাসও দেখায় যে সমস্তরকম শিক্ষাসংস্কারের থেকে দ্রুত শিক্ষা বিস্তার আগে হতে হবে। জন-শিক্ষার ব্যাপারে সবথেকে বড় সত্যটা ভারতবর্ষ কখনো উপলব্ধি করতে পারেনি যে ধীর অগ্রগতি কোনো অগ্রগতিই নয়।'২৪

১৯২১ থেকে ১৯৩৭ সাল এই সময়ের মধ্যে বিশিষ্ট ভারতীয় শিক্ষাবিদ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিখ্যাত নেতাদের দ্বারা শিক্ষা ব্যাপারে কতকগুলো পরীক্ষানিরীক্ষা দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুরু করেন বিশ্বভারতী। কার্ভে সংগঠিত করেন এস এন ডি টি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, জামিয়া মিলিয়া, কাশী বিদ্যাপীঠ এবং তিলক মহারাষ্ট্র বিদ্যাপীঠ ইত্যাদি হল এইসব উদ্যোগের মধ্যে মুখ্য।

১৯৩৭ সালের পর তিনটি বিখ্যাত ঘটনা ঘটে যা ভারতীয় জনসাধারণের জীবনে দারুণ প্রভাব ফেলে (১) ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের সূচনা (২) ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (৩) ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক ঝড় বয়ে যায় এবং তার পরবর্তী ঘটনাসমূহ।

স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন মোটের ওপর প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে একটা প্রেরণা জুগিয়েছিল। তবে গান্ধীবাদী ভাবধারার ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার বিদ্যামন্দির প্রকল্প গোছের পরীক্ষানিরীক্ষা যা কোনো কোনো প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীরা চালু করেছিল তা বুদ্ধিজীবীদের কিছু কিছু গোষ্ঠী ও সেই সঙ্গে অহিন্দু সমাজের দ্বারা তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছিল। সমগ্র ভারতীয় জনসাধারণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ওপর অন্য দুটো ঘটনার খুব সুদূরপ্রসারী ফল ছিল।

ভারতে প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপত্তির প্রধান কারণসমূহ

আগেই বলা হয়েছে ব্রিটেনের প্রয়োজন মেটানোর জন্যই ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছিল। তাই এর অগ্রগতি নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং ভারতীয় জনসাধারণের প্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে এর প্রকৃতিও ছিল অসন্তোষজনক। যেহেতু আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তন করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনকাঠামোর জন্য ইংরেজী জানা লোক সরবরাহ করা, তাই জনশিক্ষার ব্যাপারটা বরাবরই খুব উপেক্ষিত হয়েছে।

ব্রিটিশ শাসনের এক শতকেরও বেশি অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও ১৯১১ সালে ভারতীয় জনসাধারণের ৯৪ শতাংশ এবং ১৯৩১ সালে ৯২ শতাংশ লোকই রয়ে গিয়েছিল নিরক্ষর। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যা ছিল এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ অর্থাৎ ১৯৩৪-৫ সালে সমগ্র জনসাধারণের মাত্র ৪.৯ শতাংশ। এর মধ্যেও প্রাথমিক স্কুলে যারা পড়ত তাদের দুই-তৃতীয়াংশ স্কুলে প্রথম বছরের পর আর পড়ত না এবং এক-পঞ্চমাংশেরও কম শেষ বছরটা পর্যন্ত পড়তে পারত।'[২৫]

'প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিশুই শিক্ষাধীন থাকে মাত্র তিন থেকে চার বছরের জন্য ; এবং এর বেশির ভাগ সময়টাই প্রতি পাঁচজনে চারজন আটকে থাকে সবচেয়ে নিচু ক্লাসে। ফলত এই সংক্ষিপ্ত সময়ের শিক্ষা শেষ হয়ে গেলেই নিরক্ষরতার কোলে ফিরে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়।'[২৬]

জনসাধারণের মধ্যে নিরক্ষরতা এবং তার ফলস্বরূপ অজ্ঞতা অপরিহার্যভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রগতিতে বাধা দিয়েছিল।

১৯৪১-২ সালে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ুয়া ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১,৫৯,২৫৪ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ০·৫ শতাংশ।

অনগ্রসর দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি নির্ভর করে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত কর্মীদের ওপর। ১৯৩৪-৩৫ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি বা বাণিজ্যে স্নাতক ছাত্রের সংখ্যা ছিল মাত্র ৯৬০ জন। 'কারিগরি শিক্ষার স্বল্পতাটাই ছিল সবথেকে বেশি। কৃষি, বাণিজ্য ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতির মত ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ভারতের জনসংখ্যার এক-শতাংশ বাস করে এমন জনবিরল মার্কিন রাজ্য আইওয়াতেও বেশি ছাত্র পড়ে।'[২৭]

জাতীয়তাবাদী নেতাদের সমালোচনার আর এক লক্ষ্য ছিল শিক্ষার ব্যয়-বহুল চরিত্র। ভারতীয় জনসাধারণ ছিল অত্যন্ত গরীব এবং ব্যয়বহুল শিক্ষার

ভার তারা বহন করতে পারত না। এই কারণেই লর্ড কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলি শিক্ষাকে অনেক বেশি কার্যকরী করা সত্ত্বেও ব্যয় বাহুল্যের দরুন জনসমালোচনার বিষয় হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতারা সন্দেহ করতেন যে লর্ড কার্জন শিক্ষাকে আরো বেশি দক্ষ করার অছিলায় সীমিত করতে চাইতেন কেননা তিনি জানতেন শিক্ষার বিস্তার 'রাজদ্রোহের জন্ম দেয়'। এমনকি অভারতীয়রাও লক্ষ্য করেছিলেন যে ব্রিটিশ অফিসাররা ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারকে রাজনৈতিক আলোড়নের জন্য দায়ী করতেন। 'ভারতবর্ষে অনেক কর্মকর্তাই আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষা উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলবে এবং শাসন করার সমস্যাটা অনেক বেশি কঠিন করবে··· মোদ্দা যুক্তিটা সবসময়েই ছিল আর্থিক।'২৮ সব উচ্চতর শিক্ষাই ব্যয়ের কারণে ভারতীয় জনসাধারণের অধিকাংশের আয়ত্তের বাইরে ছিল।

শিক্ষা খাতে সরকারের কম ব্যয়ের জন্যও ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা সরকারের সমালোচনা করত। রাজ্যের মোট রাজস্বের গড়ে এক-তৃতীয়াংশ যখন সামরিক খাতে ব্যয়িত হত শিক্ষা খাতে খুব কম বরাদ্দ হত।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা আরো অনেক দিক থেকে এই শিক্ষার সমালোচনা করতেন। তাদের মতে এই শিক্ষা ছিল ভারতীয় জীবনের বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন। এতে ভারতীয় জীবনের, রাজনৈতিক দাসত্বের এবং ভারতীয় সমাজের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতার প্রকৃত কারণসমূহের যথার্থ পরিচয় দেওয়া হত না। এই শিক্ষা ভারতীয় সমস্যা উত্থাপন করত না এবং জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতে তার কোনো সমাধানও দেখাত না। এই শিক্ষা ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের একটা বিকৃত বিবরণ হাজির করত, ভারতবিজেতা ব্রিটিশের জয়গান করত এবং এমন বর্ণনা করত যেন তারাই ভারতবর্ষকে সভ্য করেছে। জাতীয় গর্ব ও আত্মসম্মান দুর্বল করার প্রবণতা ছিল এর। তাছাড়া এই শিক্ষা যেহেতু ব্রিটিশদের প্রয়োজনে একটা বিদেশী ভাষা ইংরেজীর মাধ্যমে দেওয়া হত, তাই দ্রুত জ্ঞান আয়ত্ত করা পিছিয়ে দিচ্ছিল এই শিক্ষা এবং শিক্ষিত ভারতীয় ও ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা বড় ফারাক সৃষ্টি করছিল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা শিক্ষাব্যবস্থার সংগঠনের ও পদ্ধতিরও সমালোচনা করত।

'জনশিক্ষা অবহেলা কেবল এইটাই দেখায় ভারতবর্ষের নতুন শাসকবর্গ "সামাজিক উন্নতি" করতে এ দেশে আসেনি। আর ইংরেজীর ওপর বাড়াবাড়ি রকমের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, প্রতিটি কেরানী এবং সিভিল সার্জেন্টদের ইংল্যন্ড থেকে আমদানি করার পরিবর্তে স্থানীয়ভাবে কিছুসংখ্যক নিম্নতন অফিসার সৃষ্টি করে শাসনতন্ত্রে ব্যয় সংকোচের ইচ্ছের স্বাভাবিক পরিণতিতে।

'···শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল...মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভারতীয় যুবকদেরকে ব্রিটেনের মাহাত্ম্য ও জাঁকজমকে অভিভূত করা এবং একটা বিদেশী আমলাতন্ত্রের যোগ্য চাকর হিসাবে তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলা। এটা ছিল একটা অভিশপ্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষা : যে শিক্ষাতে ইংরেজী পদবিন্যাস, সেক্সপীয়রের নাটক এবং ইংলন্ডে যারা রাজত্ব করছে সেইসব রাজারানীদের রাজত্বকালের তারিখ—এইসব বিষয়ের ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।'২৯

'শুরু থেকেই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার শিক্ষার গতিকে নিয়ন্ত্রিত

করতে চেয়েছে এবং তার উদ্দেশ্য সবসময়ই ছিল দেশে তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বনিয়াদটা পোক্ত করে তোলা।'৩০

জাতীয় ধারায় সমান্তরাল শিক্ষাব্যবস্থা সংগঠিত করার অনেক প্রয়াস ভারতীয় জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীরা করেছিল বটে কিন্তু তাতে কোনো উল্লেখযোগ্য সাফল্য হয়নি।

জাতীয় শিক্ষার প্রকল্পগুলো সফল না হওয়ার অনেকগুলো কারণ ছিল। বেসরকারী এবং সরকারী উভয়ক্ষেত্রেই চাকরি পেতে হলে যেহেতু সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি এবং ডিপ্লোমার দরকার হত তাই সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অননুমোদিত স্বাধীন জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বেশিসংখ্যক ছাত্র টানতে পারত না। আমেদাবাদে গান্ধী প্রবর্তিত গুজরাট বিদ্যাপীঠের অবলুপ্তি এর অন্যতম দৃষ্টান্ত। নিয়মানুসারে এই কলেজের স্নাতক অথবা গ্রাজুয়েটরা বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটের সমতুল্য বলে বিবেচিত হত না। এমনকি কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন নিয়োগকর্তারাও সেরকমটা মনে করতেন।

কোন্ নীতির ওপর ভিত্তি করে জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা গড়ে তোলা যেতে পারে সে বিষয়েও ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা কখনো একমত ছিলেন না। মালব্য, গান্ধী এবং আর্য সমাজের লোকেরা সরকারি স্কুল ও কলেজগুলোতে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার ত্রুটি খুঁজে বেড়াতেন। তারা শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে ধর্মীয় অনুশাসনের পক্ষপাতী ছিলেন (হিন্দুদের জন্য গীতা এবং মুসলমানদের জন্য কোরান)। জওহরলালের মত নেতারা পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাই পছন্দ করতেন কেননা তার মতে শিক্ষার একটা যুক্তিগত ভিত্তি থাকা দরকার, অন্যদিকে ধর্ম কেবল বিশ্বাস ও অনুভূতি ভিত্তি করে চলে।

বস্তুতপক্ষে সরকারী শিক্ষার ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতির সমালোচনা করে গান্ধীর মত নেতারা সেই শিক্ষার প্রগতিশীল দিকটারই সমালোচনা করতেন। ধর্মীয় অনুশাসন শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে যুক্ত করার সম্পর্কে তাঁদের পরামর্শ ছিল প্রতিক্রিয়াশীল। গান্ধী বিদ্যামন্দির প্রকল্প তৈরি করেন যা ছিল ভারতের জন্য একটা জাতীয় শিক্ষা প্রকল্প। তিনি ঐ প্রকল্পকে শিক্ষার পলিটেকনিক স্কীম বলে অভিহিত করেছেন কেননা এতে পুঁথিগত শিক্ষার সঙ্গে শিল্পের যোগ আছে যাতে ব্যক্তির সর্বব্যাপী অগ্রগতি হয়। পলিটেকনিক শিক্ষার নীতিটা খুবই প্রগতিশীল কিন্তু ইউরোপে যখন এই নীতি উদ্ভাবিত হয় তখন তা বোঝাত আধুনিক পুঁথিগত শিক্ষা ও আধুনিক শিল্পের সমন্বয় ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শিক্ষা। অন্যদিকে গান্ধী তার পরিকল্পনাতে এক বাহ্যিক ধর্মীয় আবরণের মাত্রা সহ আধুনিক শিক্ষাকে যোগ করেছিলেন প্রাগাধুনিক হস্তশিল্পের সঙ্গে। এটা যেন ছিল আধুনিক শিক্ষা (আধুনিক সামাজিক-আর্থনীতিক অবস্থার ফসল ও দিশারী) ও অতীতকালের প্রাক্-আধুনিক হস্তশিল্পের পরিণয়। এইরকম শিক্ষা পরিকল্পনা অবাস্তব ও অনৈতিহাসিক হওয়ার জন্য সমর্থন পায়নি। সে যাই হোক ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের প্রধান সমালোচনাগুলো সঠিক ছিল।

জনশিক্ষা ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 'এটা স্পষ্ট যে একটা অজ্ঞ এবং অশিক্ষিত জাতি কখনো স্থায়ী উন্নতি লাভ করতে পারে না এবং জীবনে পিছিয়ে পড়তে বাধ্য। সুতরাং যা আমরা চাই

এবং জরুরীভাবেই চাই তা হল সবার আগে প্রাথমিক স্কুলের ব্যাপক বিস্তার এবং জনগণের একটা ফলপ্রদ এবং সামগ্রিক প্রাথমিক স্কুল ব্যবস্থা ; এই কাজ সম্পন্ন করতে যত দেরি হবে ততই বিশ্বের জাতিগুলোর মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিতে আমাদের অসুবিধা হয়ে উঠবে অনতিক্রম্য।'৩১ জাতির উন্নতির জন্য জনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ নির্দিষ্টভাবেই করা হয়েছে। তখন থেকে সব প্রগতিশীল ভারতীয়রাই সেই দিকে উত্তরোত্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্যও প্রচার অভিযান চালানো হয়েছিল। গ্রামের মধ্যে সাক্ষরতা বিস্তারের জন্য ছাত্রদল গ্রীষ্মকালে গ্রামে যেত। সেই একই উদ্দেশ্যে শহরে শ্রমিকদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় সংগঠিত করা হয়েছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, সোশ্যাল সার্ভিস লীগ এবং সর্বভারতীয় ছাত্র সংগঠনসমূহ এবং অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠান একই উদ্দেশ্যে তাদের কাজের মাত্রা বাড়িয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কাজটা এতই বড় ছিল যে তারা এর প্রান্তটুকুই মাত্র স্পর্শ করতে পেরেছিল।

আধুনিক শিক্ষার প্রগতিশীল সত্তা

আগে উল্লেখিত ত্রুটিগুলি সত্ত্বেও ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষার সূচনা ব্রিটিশ শাসনের একটা প্রগতিশীল কাজ। এই শিক্ষাব্যবস্থা প্রকৃতিতে ছিল ধর্মনিরপেক্ষ, উদার, জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্যই ছিল উন্মুক্ত ; প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের শিক্ষাব্যবস্থা এরকমটা ছিল না। কিন্তু সর্বোপরি এই শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল সেই চাবিকাঠি যা ভারতীয়দের সামনে আধুনিক পশ্চিমী যুক্তিবাদী ও গণতান্ত্রিক চিন্তার মহান সম্পদ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সব পথপ্রদর্শকরা ও পরবর্তী সব নেতারাই ভারতীয় সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে থেকেই যে এসেছিলেন এটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়।

'উঠতি প্রজন্ম ইউরোপীয় শিক্ষাকে বিস্ময়কর গ্রহণযোগ্যতার সঙ্গে আত্মস্থ করেছিল। তারা খুব তাড়াতাড়ি জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক এবং সমাজ-তান্ত্রিক মতাবলম্বী হয়ে উঠেছিল। Cavour, Mazzini, Kossuth, Parnell এবং Mill তাদের শিক্ষক ও নায়ক হয়ে দাঁড়ান। ইংরেজ সরকার ভারতীয় স্কুলে উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের ইতিহাস পড়ানো নিষেধ করে দিয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই তা খুব দেরী হয়ে গিয়েছিল। প্রক্রিয়াটা আর থামানো গেল না এবং এই সময়েই তা খুব তাড়াতাড়ি একটা নতুন মোড় নিল। ইউরোপীয় কৃষ্টির সঙ্গে অধিকতর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে গিয়েছিল এবং তা আর বিনা প্রশ্নে গৃহীত হচ্ছিল না··· যে ইউরোপীয় লেখকরা নিজেরাই ইউরোপের সমালোচনা করতেন সেই রাস্কিন, কার্লাইল, তলস্তয় প্রমুখ এতে তাঁদের ভূমিকা পালন করেছিলেন।'৩২

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ আধুনিক শিক্ষার কোনো উত্তরাধিকার নয়

কিছু কিছু ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ এবং লেখকরা দাবি করেন যে ভারতবর্ষে ব্রিটিশেরা যে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিল, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ হল

তারই ফল। তারা জোরের সংগে বলেছেন যে পশ্চিমী লেখকদের প্রচারিত মুক্তির মতবাদ চর্চা ও গ্রহণ করতে সাহায্য করেছিল আধুনিক শিক্ষা এবং সেই কারণেই ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য প্রেরণা এসেছিল।

ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রগতিশীল ভূমিকা স্বীকার করেও এই সিদ্ধান্ত করা ভুল হবে যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এই শিক্ষারই ফল।

বস্তুতপক্ষে ব্রিটিশ অধিকারের ফলে ভারতবর্ষে যে নতুন বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল এবং ভারতীয় সমাজে যে নতুন সামাজিক শক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল তারই বহিঃপ্রকাশ হল ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। স্বার্থগুলোর বস্তুগত বিরোধের ফলেই জন্ম হয়েছিল এই জাতীয়তাবাদের। ব্রিটেনের স্বার্থটা হল ভারতবর্ষকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তার অধীনস্থ করে রাখা, আর ভারতীয় জনসাধারণের স্বার্থ হল ভারতীয় সমাজের অবাধ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে নির্বিঘ্নে রাখা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ জাতীয় আন্দোলন রূপে দানা বাঁধে। সেই সময়ের মধ্যে দেশে শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে উঠতে লাগল এবং ভারতীয় শিল্পের উদ্ভবের সংগে সংগে বণিকশ্রেণীর উদ্ভব হল। এই শ্রেণীরাই ছিল জাতীয় আন্দোলনের উদ্যোক্তা এবং তাদের প্রচারপত্রে তারা চাকরির ভারতীয়করণ, ভারতীয় শিল্পের সংরক্ষণ, রাজস্ব সংক্রান্ত স্বাধিকার ইত্যাদি দাবি পেশ করত। অর্থনীতি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ও ভারতীয় স্বার্থের সংঘর্ষের ফলেই আন্দোলনগুলো গড়ে উঠেছিল। স্বার্থের এই বিরোধই ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভবের কারণ।

'ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন গড়ে ওঠে···সাম্রাজ্যবাদ এবং তার শোষণ-ব্যবস্থার পরিস্থিতির মধ্য থেকেই···শিক্ষাব্যবস্থা যাই হোক না কেন, ভারতীয় বুর্জোয়ার উদ্ভব এবং ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে তাদের ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা ছিল অপরিহার্য; ভারতীয় বুর্জোয়ারা যদি শুধুমাত্র সংস্কৃত বেদে শিক্ষালাভ করত এবং বর্তমান সব চিন্তাধারা থেকে আশ্রমিক বিচ্ছিন্নতায় থাকত তবু তারা সংস্কৃত বেদ থেকেই নিশ্চয় তাদের সংগ্রামের প্রেরণাদায়ক নীতি ও ধ্বনি খুঁজে পেত।'৩৩

বস্তুতপক্ষে বিপিনচন্দ্র পালের মতো বামপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতারা হিন্দুধর্মের নবভাষ্যে জাতীয়তাবাদের দেবত্বের প্রকাশ দেখেছিলেন।

বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রিটেনের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল। শিল্পপতিরা চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের নির্বাধ শিল্পায়নের এবং দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণের জন্য স্বাধীনতা। শিক্ষিত শ্রেণীরা চেয়েছিলেন চাকরির ভারতীয়করণ, যেহেতু উচ্চ পদগুলো অধিকাংশই ব্রিটিশদের দখলে ছিল। কৃষিজীবীরা চেয়েছিলেন ভূমিরাজস্ব হ্রাস। শ্রমিকেরা চেয়েছিলেন কাজের উন্নততর অবস্থা এবং বাঁচার মতো মজুরি। গোটা জাতটা চেয়েছিল সভা-সমিতি করার স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, বিধানসভা, নির্বাচিত বিধানমণ্ডলী, প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান, ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস, হোম রুল এবং পরিশেষে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। ব্রিটেন এবং ভারতের এইসব স্বার্থের বিরোধের ফলেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ জন্ম নিয়েছিল।

একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে অনেক জাতীয়তাবাদী নেতার পশ্চিমের গণতান্ত্রিক ভাবধারা আত্মস্থ করাই তাদেরকে জাতীয় আন্দোলনে গণতান্ত্রিক কাঠামো ও লক্ষ্য আনতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাদের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন স্বরাজ অর্জনের পর প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মতন রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এবং স্বৈরাচারী সামাজিক ব্যবস্থা কায়েম করতে চায় নি। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মোটের উপর আধুনিক উদারনীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। এই নীতিগুলো হল নির্বাচন, গণতান্ত্রিক কমিটি, অধিকাংশের মতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি। স্বাধীন ভারতবর্ষের জন্য এই আন্দোলন গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থার স্বপ্ন দেখেছিল।

এইভাবে আধুনিক শিক্ষা প্রত্যক্ষভাবে যদি নাও হয়, পরোক্ষভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে গণতন্ত্রমুখী করে দিয়েছিল।

আধুনিক শিক্ষা, সুবিধা

ইংরেজী জানার সুবিধা প্রায় পরিমাপ করা যায় না। আধুনিক ইংরেজী জানার ফলেই আয়ত্ত হয়েছে ইংরেজী সাহিত্য যা বিশ্বের সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালী সাহিত্য না হলেও অন্যতম ঐশ্বর্যশালী নিশ্চয়ই। এটি ব্রিটিশ জাতির সাহিত্য যে ব্রিটিশ জাতি ইতিহাসে প্রথম আধুনিক জাতি যে সেই অত আগে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধেই মধ্যযুগীয় রীতিনীতি ধ্বংস করে ও পরিত্যাগ করে। মধ্যযুগীয়তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় ব্রিটিশ জাতি আধুনিক গণতান্ত্রিক, বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী কৃষ্টির ভিত্তি স্থাপন করেছিল। পরবর্তীকালে সার্থকতার সময়ে ব্রিটিশ জাতি এই সংস্কৃতি আরো সমৃদ্ধ ও উন্নত করেছিল। রাজার ঈশ্বরদত্ত অধিকার তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রের সর্বেশ্বরত্বের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ জাতির সংগ্রামে জনসাধারণের সার্বভৌমিকতা এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধারণা গড়ে ওঠে। মধ্যযুগীয় ধর্মের সংস্কারবদ্ধ মতাদর্শের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ জাতির সংগ্রামে গড়ে ওঠে আধুনিক যুক্তিবাদিতা। দাসপ্রথা এবং উত্তরাধিকারের নীতিভিত্তিক মধ্যযুগীয় উচ্চনীচ স্তর সমন্বিত সামাজিক কাঠামোর বিরুদ্ধে এরাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের তত্ত্ব ঘোষণা করে। পরন্তু এদের হাতেই সুসমৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছিল। আধুনিক পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, কৃষিবিদ্যার মতো আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের সৃষ্টি হয় এবং চিকিৎসাশাস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় বিপুল অগ্রগতি হয় এবং সমাজবিজ্ঞান—আধুনিক সমাজতত্ত্বের পত্তন হয়।

ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে সামাজিক প্রচেষ্টার প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্রিটেন বড় বড় চিন্তানায়কদের জন্ম দিয়েছিল। ব্রিটেন বেকনের জন্ম দিয়েছিল যিনি সামাজিক ও প্রাকৃতিক উভয়েরই পদ্ধতি ও ঘটনার আলোচনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সূচনা করেছিলেন—একে বলা হত আরোহী পদ্ধতি। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে কর্মই হল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উৎস এবং যে কোনো তত্ত্বের যাথার্থ্য বিচারের মাপকাঠি। তার তত্ত্ব অবরোহী যুক্তির তত্ত্বে এক দারুণ আঘাত হেনেছিল এবং প্রকৃতি ও সমাজ উভয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে দ্রুত ও প্রকৃত অগ্রগতির পথ করে দিয়েছিল।

বেকনের পর ব্রিটেন গভীর চিন্তানায়কদের এক জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর জন্ম দিয়েছিল। যেমন ডারউইন যিনি সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের একটির আবিস্কর্তা, যে তত্ত্ব জৈব জীবনের বিশেষতঃ মনুষ্য প্রজাতির অভিব্যক্তিবাদ হিসেবে পরিচিত। মানুষের উদ্ভব সম্বন্ধে ধর্মীয় গালগল্পের যে ব্যাখ্যা আছে এই তত্ত্ব তাতে মরণ আঘাত হেনেছিল। আর জন্ম দিয়েছিল প্রগাঢ় সমাজ-বিজ্ঞানী স্পেনসর, মহান দার্শনিক লক, দার্শনিক নৈরাজ্যবাদের পথিকৃৎ গডউইন, স্বৈরতন্ত্রের অদম্য শত্রু এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণ সার্বভৌমতার প্রবল সমর্থক জন স্টুয়ার্ট মিল, আধুনিক অর্থবিজ্ঞানের জনক আডাম স্মিথ, মেধাবী গণিতিক, পদার্থবিদ এবং দার্শনিক নিউটন; কার্লাইল এবং রাস্কিন, যারা উভয়েই ছিলেন আধুনিক সমাজের অবাধ সামাজিক অবিচারের নির্দয় সমালোচক, যদিও সমস্যার সামাজিক সমাধানের অতীতে ফিরে যাওয়ার প্রবণতার প্রতিক্রিয়াশীলতার ব্যাখ্যাকার; ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদদের মধ্যে সম্ভবতঃ সবথেকে বেশি সাহসী ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষক রিকার্ডো; আধুনিক সময়ের দুই বিখ্যাত ঐতিহাসিক গিবন এবং বাক্‌ল, বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক Hobhouse, Rivers. Briffault, Gordon Childe এবং Ginsberg; পৃথিবী বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল; সামাজিক-প্রাকৃতিক ইতিহাসের অভিব্যক্তির প্রক্রিয়ার স্বচ্ছন্দ লিপিকার এবং আকর্ষণীয় সামাজিক উপন্যাসের অনবদ্য ও কল্পনাময় লেখক এইচ. জি. ওয়েলস্; সামাজিক ব্যঙ্গের অমর স্রষ্টা বার্নাড শ; বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতির্বিদ এডিংটন এবং জীনস; বিশ্বস্বীকৃত প্রাণিবিজ্ঞানী হলডেন যিনি এখন ভারতীয় নাগরিক; বিশ্বপরিচিত বিজ্ঞানীর দল যেমন আলডুস ও জুলিয়ান হাক্সলে, লেভি এবং বার্ণেল এবং আরও অনেক। এই চিন্তানায়কেরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের জ্ঞান সমৃদ্ধ করেছে ও ঐশ্বর্যশালী আধুনিক বিশ্ব সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

ইংরেজীতে গণতান্ত্রিক সাহিত্য পাঠ করেছিল এবং এর গণতান্ত্রিক নীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল এমন শিক্ষিত ভারতীয় অতীতের সব প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিল যেমন জাত ও স্বৈরাচারী সামাজিক দর্শন যা ব্যক্তিকে দাসে পরিণত করতে চায় এবং তার স্বাধীন উদ্যোগকে দমন করে। সে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে ভারতীয় জনসাধারণের স্বাধীন জাতীয় অবস্থিতির কথাও চিন্তা করত। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের ঔপনিবেশিক অবস্থানের উত্তরফল ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে এই চিন্তা এক গণতান্ত্রিক লক্ষ্য এনে দিয়েছিল। আন্দোলন গড়েও উঠেছিল গণতান্ত্রিক ভিত্তিতেই যেমন নির্বাচন ও নির্বাচিত কমিটির নীতি ও পদ্ধতির ভিত্তিতে এবং দাবী হল সেইগুলো যেমন ভোটাধিকার ব্যাপকতর করা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, বক্তৃতা করা ও সভা সমিতি করার স্বাধীনতা, প্রতিনিধিমূলক সরকার, জনসাধারণের কাছে দায়ী শাসকবর্গ ইত্যাদি।

ইংরেজী ভাষার পড়াশোনা তাই সেই ভাষাতে সামাজিক মুক্তি, স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী দার্শনিক সাহিত্য পাঠের একটা সুযোগ দিয়েছিল। এই পড়াশোনা একটা গণতান্ত্রিক এবং যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীও গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। সামাজিক মুক্তির দর্শন, ব্যক্তি ও জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করার উপায় হয়ে উঠলে যুক্তিবাদী দর্শন অন্ধ কুসংস্কার থেকে, অনেক ঠাকুর-

দেবতার হাত থেকে, অদৃষ্টবাদ থেকে এবং পারলৌকিকতা থেকে মনকে মুক্ত করার হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় ভারতীয় সাহিত্য জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে কোনো কাজ অন্তর্ভুক্ত করে নি। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার জন্য ভারতীয় জনসাধারণ সামাজিক অথবা রাজনৈতিক দিক দিয়ে জাতিগতভাবে সংহত ছিল না একথা অপরিহার্য এবং ঐতিহাসিক দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

ইংরেজী ভাষা শিক্ষা মূল্যবান বৈজ্ঞানিক রচনাবলীতে সন্নিবেশিত গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী চিন্তার ঐশ্বর্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের অধীনে পরাধীনতার অবস্থার মধ্যে থেকে শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদ জাগ্রত হয়েছিল। এইসব রচনাবলী পাঠে সেই সদ্যোজাত জাতীয়তাবাদ আরো পরিষ্কার, আরো স্পষ্ট ও এমনকি উদ্দীপিত অগ্নিতে পরিণত হয়েছিল।

এছাড়া ইংরেজী ভাষার জ্ঞান অ-ইংরেজী ভাষা-ভাষীদের বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক এবং সাহিত্য শিল্পকৃতীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশগুলি শিক্ষিত ভারতীয়দের আয়ত্তের মধ্যে এনেছিল।

ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে সে Democritus, Heraclitus, Plato, Aristotle, Spinoza, Descartes, Leibnitz, Kant, Comte, Nietzche, Hegel, Max Stirner, Benedetto Croce, Oswald Spengler, কাল মার্কসের দার্শনিক চর্চার চিন্তা করতে পারত। সে Plato, Machiavelli Diderot, Hobbach. Helvetius, Voltaire এর সামাজিক তত্ত্বসমূহ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের অন্যান্য ভাবাদর্শগত চিন্তা আর অগুস্ত কোঁৎ, সাঁসিমঁর চিন্তা, সমাজতন্ত্রী মার্কস এবং এঙ্গেলস্, নৈরাজ্যবাদী বাকুনিন্, সিন্ডিক্যালিস্ট প্রুধ এবং অন্যান্যদের তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে পারত। সে অনুবাদের মাধ্যমে অ-ইংরেজীভাষী বিশ্ববিখ্যাত গাণিতিক ও দার্শনিক যেমন আইনস্টাইন, Dirac, Schrodinger এবং Heisenberg এর রচনাবলী পড়ে তার বৈজ্ঞানিক ভাবনা সমৃদ্ধ করতে পারত। অনুবাদের মাধ্যমে সে প্রথম শ্রেণী অ-ইংরেজীভাষী সাহিত্যিক যেমন Chekhov, Dostoevski, Turgenev, Gogol, Maxim Gorky, Emile Zola, Balzac, Flaubert, গ্যে, দ্যে, মঁপাসা, Anatole France, ভিক্টর হুগো, Moliere, Proust, Heine, Goethe, ইবসেন, Maeterlinck, Sanders এবং অন্যান্যদের সৃষ্ট সাহিত্য পড়তে পারত। তাই একজন শিক্ষিত ভারতীয় ইংরাজীর সাহায্যে অ-ইংরেজীভাষীদের সাংস্কৃতিক কাজকেও তার সম্পদে পরিণত করতে পারত।

বিশ্বের সংস্কৃতি আত্মস্থ করতে শিক্ষিত ভারতীয়দের শুধুমাত্র বিপুল জ্ঞানার্জনেই সহায়তা হয়েছিল এমন নয়, বরং একটা বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী এবং পরিপ্রেক্ষিতও গড়ে উঠেছিল। এ তাকে দিয়েছিল বিশ্ব অগ্রগতির সঙ্গে ঐক্যবোধ, একটা বিশ্ববোধ। ভারতীয় সামাজিক অগ্রগতির বিচ্ছিন্নতার ধারণা অথবা ভুল ধারণা থেকে সে মুক্ত হতে পেরেছিল। ভারতীয় জাতীয় অগ্রগতিকে

বিশ্ব অগ্রগতির অংশ হিসাবে সে বুঝেছিল। ভারতীয় সমাজবিকাশের নিজস্ব স্বাধীন এবং বিশেষ নিয়ম ছিল যা বিশ্বের অগ্রগতির সঙ্গে যুক্ত নয়, এই ভুল ধারণা থেকে সে মুক্ত হতে পেরেছিল। জাতীয় বৈশিষ্ট্য অবজ্ঞা না করেও সে বুঝতে পেরেছিল যে, যে আইন অন্যান্য সমাজের অগ্রগতিকে নিয়ন্ত্রিত করে সেই একই আইন ভারতীয় সমাজকেও নিয়ন্ত্রিত করে।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অধিকার ও শাসনের ফলে সৃষ্ট নতুন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ভারতীয়দের সামনে এমন সব সমস্যা উপস্থিত করল যা ছিল একদম নতুন এবং যার সমাধান পুরানো ভারতীয় সংস্কৃতির তত্ত্ব ও পদ্ধতির দ্বারা হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় নতুন অর্থনৈতিক পরিবেশ থেকে উদ্ভূত জাতীয় অর্থনৈতিক কর্তব্য যেমন ভারতবর্ষের অধিকতর শিল্পায়ন, সমৃদ্ধ কৃষির বিকাশ ইত্যাদির সমাধানে রানাডে, গোখলে, গ্যাডগিল, কে. টি. শাহ প্রমুখের মত ভারতীয় অর্থনীতিবিদেরা অ্যাডাম স্মিথ্, রিকার্ডো, লিস্ট অথবা মার্কসের মত অর্থনীতিবিদদের তত্ত্বগত রচনার দিকে ঝুঁকত। অর্থ-শাস্ত্রের প্রাচীন রচয়িতা চাণক্য অথবা মহাভারতের অমর রচয়িতা ব্যাস আধুনিক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে তাকে তাত্ত্বিক কোনো উপকরণ দিয়ে সাহায্য করতে পারত না।

বুদ্ধিজীবীরা জনসাধারণের ওপর দারুণ মতাদর্শগত প্রভাব ফেলত। ভারতবর্ষে অগ্রসর বুদ্ধিজীবী যারা ইংরেজী পড়ার মাধ্যমে আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্বজ্ঞান গ্রহণ করেছিল তারা তাদের নিজেদের লোকের কাছে তা সঞ্চারিত করে দিতে আরম্ভ করে। তাদের মধ্যে অনেকে উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক মূল্য-সম্পন্ন, সাহিত্য শিল্প গুণান্বিত এবং রাজনৈতিক, আর্থনীতিক ও সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ লেখা বিভিন্ন স্বদেশী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। ইংরেজী বইয়ে যেসব চিন্তাধারা ও বৈজ্ঞানিক তথ্য তারা পড়েছিলেন সেগুলোকে নিয়ে মাতৃভাষায় স্বাধীনভাবে বইও লিখেছিলেন তাঁরা। এতে ইংরেজী না জানা শিক্ষিত মানুষদের বিশ্বের ব্যাপক জ্ঞান আহরণে উত্তরোত্তর সুবিধা হয়েছিল। এদের মধ্যে কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী আবার বৈঠক ও বক্তৃতার সাহায্যে নিরক্ষরদের মধ্যেও নতুন ধারণা ও তথ্য বিস্তার করে দিয়েছিলেন। এতে সাধারণ মানুষদের দৃষ্টির প্রসারতা ও জ্ঞান সমৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল।

ইংরেজী ভাষা ভারতবর্ষ জুড়ে শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে সংবাদ সংযোগের মাধ্যম হিসাবে জাতীয় স্তরে সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে মত বিনিময় করাতে দারুণ কাজ করেছিল। বিভিন্ন জাতীয় মহাসম্মেলন ও সভা-সমিতিতে বিশেষ করে প্রাথমিক পর্যায়ে, ইংরেজী ভাষা প্রকাশ মাধ্যম হিসাবে খুবই দরকারী প্রমাণিত হয়েছিল।

ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষার সূচনার প্রগতিশীল ভূমিকা এবং তার ফল-স্বরূপ আধুনিক সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ এতেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে বস্তুতপক্ষে সব প্রগতিশীল আন্দোলনের নেতারাই তা সে আন্দোলন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় অথবা সাংস্কৃতিক যাই হোক না কেন ছিলেন ইংরেজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী। ক্রমশঃ ব্যাপক ও তীব্র হয়ে ওঠা জাতীয় আন্দোলনের সব পথিকৃৎ ও নেতারাই ছিলেন ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয়।

সুস্থবিকাশের পূর্বশর্তসমূহ

আধুনিক বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ সত্ত্বেও ভারতীয় জনসাধারণের অধিকাংশই রয়ে গিয়েছিল নিরক্ষর। এর মুখ্য কারণ ছিল তাদের নিদারুণ দারিদ্র্য। গণনিরক্ষরতা দূরীকরণ, তাই ভারতীয় জনসাধারণের গণ-দারিদ্র্য দূরীকরণের সমস্যার সঙ্গে জড়িত।

আমরা দেখেছি ভারতীয় অর্থনীতির ঔপনিবেশিক চরিত্র ও ফলত ভারতীয় সমাজের উৎপাদিকা শক্তির ধীর অগ্রগতি এবং তাছাড়া তৎকালীন ভূমি ব্যবস্থা ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক ভারতীয় জনসাধারণের এই নিদারুণ দারিদ্র্য সৃষ্টি করেছে। গণদারিদ্র্য দূর করা, তাই, বোঝায় জাতীয় স্বাধীনতা, কায়েমী স্বার্থসম্পন্নদের বদলে ভারতীয় জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা এবং জাতীয় সামাজিক অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের একটা সুসংহত পরিকল্পনা। ঐ ধরনের পরিকল্পনা পুরোপুরি সফল হতে পারে যদি উৎপাদনের উপাদানের মালিকানা সমাজের হাতে থাকে। স্বাধীন এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অবস্থায়ই কেবল একটা দেশ এমন এক আর্থিক বাজেট তৈরি করতে পারে যা গণশিক্ষা ও অন্যান্য সমাজসেবার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেবে।

গণনিরক্ষরতা পুরোপুরি সমাধানের সমস্যা অধিকন্তু ভারতীয়দের মধ্যে সমসাময়িক যুগের ঐশ্বর্যশালী বৈজ্ঞানিক ও শিল্পসংস্কৃতির ব্যাপক বিস্তার তাই জাতীয় স্বাধীনতা ও উৎপাদন পদ্ধতির সামাজিক মালিকানার ওপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে খুব নিবিড়ভাবে জড়িত।

শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে চরমপন্থী রাজনৈতিক ধারণার বিস্তারে ব্রিটিশ সরকার প্রায়ই ভীত ছিল। এর জন্য শাসনতান্ত্রিক উপায় নেওয়া হয়েছিল এবং ভারতবর্ষে বিদেশী সাহিত্যের অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিল। কোনো কোনো সময় ইতালির জাতীয়তাবাদী নেতা 'ম্যাজিনির জীবন'-এর মত রচনার অনুপ্রবেশও নিষিদ্ধ জারি করা হয়েছিল। আধুনিক ইউরোপীয় চিন্তাধারার বিশেষ বিশেষ অংশের বিস্তারে ব্রিটিশ সরকার এরকম বাধা দেওয়া সত্ত্বেও এটা স্বীকার করতে হবে যে ইংরেজী ভাষার জ্ঞানই ভারতীয়দের আধুনিক ইউ-রোপীয় সাহিত্য পড়তে সাহায্য করেছিল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সদাই সংগ্রাম করেছে সব ধারার আধুনিক ইউরোপীয় চিন্তার সঙ্গে নির্বাধ সংযোগের স্বাধীনতার জন্য।

এইভাবে আধুনিক শিক্ষা একটা দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। শুরুতে ব্রিটেনের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য এমনকি ব্রিটিশ শাসক ও ভারতীয় শাসিতদের বন্ধন শক্তিশালী করে তোলবার জন্য প্রবর্তিত হলেও এই শিক্ষাব্যবস্থা সেই শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সংগ্রামেও সাহায্যও করেছিল।

সূত্র নির্দেশ

১ Trevelran, পৃ. ১৬৮।

২ Macaulay's Minute, 1935, Thompson and Garrat-এ উদ্ধৃত, পৃ. ৬৬১।

৩ O' Malley, পৃ. ১৩৮।
৪ উপরিউক্ত, পৃ. ১৩৮।
৫ উপরিউক্ত, পৃ. ১৩৯।
৬ Syed Nurullah and Naik, পৃ. ৯২।
৭ Thompson and Garrat, দ্রষ্টব্য।
৮ Hans Kohn, পৃ. ৯৪-৫।
৯ O' Malley, পৃ. ৬৫৮-৯।
১০ Raja Ram Mohan Roy, পৃ. ৪৭১-৪।
১১ Laski, পৃ. ১৮।
১২ Hans Kohn, পৃ. ১১৭ দ্রষ্টব্য।
১৩ Syed Nurullah and Naik, পৃ. ৪৯।
১৪ Macaulay, Margarita Barns কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ.
১৫ Syed Nurullah and Naik, পৃ. ৬৭।
১৬ Selections from Educational Records, Vol. I, পৃ. ১৩০-১।
১৭ Selections from Educational Records, Vol. II, পৃ. ১৬-৭।
১৮ Syed Nurullah and Naik, পৃ. ১৭৯।
১৯ উপরিউক্ত, পৃ. ১৮১।
২০ উপরিউক্ত।
২১ উপরিউক্ত, পৃ. XX।
২২ Gokhale's Speeches, পৃ. ২৩৪-৫।
২৩ Report of the Hartog Committee, পৃ. ৩১ and Quinquennial Review of the Progress of Education in India, ১৯২৭-৩২, Vol. I, পৃ. ৩।
২৪ Parulekar, পৃ. ১১০-১১।
২৫ Dutt, ৭৮।
২৬ Moral and Material Progress and Condition in India, ১৯২৩-৪, পৃ. ২২৭।
২৭ Buchanan, পৃ. ৪৭৯।
২৮ উপরিউক্ত, পৃ. ৪৮০।
২৯ Shelvankar, পৃ. ৫৪-৫।
৩০ B. C. Pal, Buch কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ১৫০।
৩১ Gokhale, পৃ. ৭৪-৫।
৩২ Hans Kohn, পৃ. ১১৮।
৩৩ Dutt, পৃ. ২৭১।

দশম পরিচ্ছেদ

ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ঐক্য

প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতবর্ষে মৌলিক রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ঐক্যের অভাব

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অধিকারের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ পরিণতি হল একটা কেন্দ্রশাসিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এই কেন্দ্রশাসিত রাষ্ট্রব্যবস্থাই ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম একটা বাস্তব এবং মৌলিক রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক একতা এনেছিল।

প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতবর্ষে এই ধরনের ঐক্যের অস্তিত্ব ছিল না। দেশ তখন অসংখ্য সামন্ত রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল প্রায় পাকাপাকিভাবেই। এই সামন্ত রাষ্ট্রগুলো নিজেদের রাজ্যসীমা বাড়ানোর জন্য প্রায়ই নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম করত। এটা সত্যি যে অশোক, সমুদ্রগুপ্ত এবং আকবরের মতো বিশিষ্ট সম্রাটেরা সম্পূর্ণ ভারতবর্ষকে এক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থার অধীনে আনার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। তবে যখন তারা ভারতবর্ষের একটা বৃহত্তর অংশকে তাদের শাসনাধীনে আনতে সফলও হয়েছিলেন তখনও নামমাত্র রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ঐক্য অর্জিত হয়েছিল। কেননা যে অসংখ্য স্বয়ংশাসিত গ্রামগুলোতে ভারতীয় জনসাধারণের অধিকাংশ বসবাস করত সেই গ্রামগুলো কিন্তু এতে প্রভাবিত হয়নি। বস্তুতপক্ষে স্মরণাতীত কাল থেকেই এই গ্রামগুলোর কতকগুলো স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্র বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় বলীয়ান হয়েছিল। গ্রামসমিতি ছিল কার্যতঃ গ্রামীণ জনসাধারণের সরকার।

"গ্রামগুলোর এমন একটা সংগঠন ছিল যা তাদেরকে আত্মনির্ভর ও স্বশাসিত করে তোলার মতো করে পরিকল্পিত ছিল। তাদের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা ছিল ঢিলেঢালাভাবে সংগঠিত সরকার ব্যবস্থারই একটা অংশ যেখানে সার্বভৌম ক্ষমতা সমষ্টিগত ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের সীমিত ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিত। প্রতিটি গ্রাম তার অধিবাসীদের সামাজিক ক্রিয়াকর্মের সমন্বয় সাধন করত এবং প্রতিটি গ্রামই ছিল এক একটা স্বাধীন একক।"১

প্রাক্-ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে যে সক্রিয় রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক একতা গড়ে উঠতে পারে নি তার প্রধান কারণগুলি হল সংহত জাতীয় অর্থনীতি এবং সুদক্ষ, বিস্তৃত ও ব্যাপক যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব। ইউরোপীয়

দেশগুলোতে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভবের ইতিহাসে দেখা যায় কিভাবে ঐ ধনের রাষ্ট্রকাঠামোগুলো সংহত জাতীয় অর্থনীতির অগ্রগতি এবং দ্রুত ও দক্ষ যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত।২

একথা সত্যি যে প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতবর্ষেও ঐক্যের একটা ধারণা ছিল এবং তা বিকশিতও হয়েছিল। কিন্তু সেই ঐক্যকে দেশের ভৌগোলিক ঐক্য এবং হিন্দুদের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক একতা বলেই ভাবা হয়েছিল। ভারতবর্ষ 'ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক এই উভয়তই একটা নির্বাচ্ছিন্ন ব্যাপার।'৩

ও'ম্যালি যেমন বলেছেন, 'যাদের কোনো সাধারণ ভাষা ছিল না এবং যারা সামাজিক দিক দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রভাবে বিভক্ত ও রাজনৈতিক দিক দিয়েও বিভক্ত কিন্তু যাদের একই ধর্মের প্রতি সাধারণ সহানুভূতি ছিল, হিন্দুধর্ম প্রকৃত-পক্ষে তাদের মধ্যে কিছুটা ঐক্য সৃষ্টি করে।'৪

কিন্তু প্রদত্ত সামাজিক ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে সমগ্র ভারতীয় জনসাধারণের রাজনৈতিক ঐক্যের ধারণা গড়ে ওঠে নি এবং তা গড়ে উঠতে পারেও না। জনসাধারণ সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে একত্রিত ছিল না। তাই তারা রাজনৈতিক দিক থেকেও অখণ্ড ছিল না।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশেরা এমন এক রাষ্ট্রকাঠামোর প্রবর্তন করেছিল যা একেবারে নতুন ধরনের। এই রাষ্ট্রকাঠামো ছিল অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত এবং দেশের সুদূরতম প্রান্ত পর্যন্ত তার শাখা বিস্তৃত ছিল।

আইনগত ঐক্য

ব্রিটিশেরা ভারতে যে আইনের শাসন প্রবর্তন করেছিল সেটা ছিল সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। ব্রিটিশেরা আইন প্রণয়ন করত ও আইন লিপিবদ্ধ করে রাখত। এই আইনগুলো রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের পক্ষে প্রযোজ্য ছিল এবং রাষ্ট্রের বিচার বিভাগের ক্রমোপর্যায়ভুক্ত আদালতসমূহের মাধ্যমে তা কার্যকর হত। রাষ্ট্রনিযুক্ত বিচার বিভাগীয় আধিকারিকগণ রাষ্ট্রের বিভিন্ন সূত্রবদ্ধ আইনগুলোর ব্যাখ্যা করত ও প্রতিটি গ্রামে, নগরে ও শহরে তা চালু করত। দেশে এইভাবে নিম্নতন আদালত, জেলা আদালত ও হাইকোর্ট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যার চরমসীমায় ছিল ফেডারেল কোর্ট ও প্রিভি কাউন্সিল।

নতুন ধরনের এই আইন ও বিচারব্যবস্থা চালু করবার সময় ব্রিটিশদের প্রথাগত আইন যা প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে বর্তমান ছিল তাকে বর্জন করতে হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার গ্রাম ও জাতিসমিতির কাছ থেকে তাদের প্রথাগত আইন কার্যকরী করার ক্ষমতাও কেড়ে নিয়েছিল। সম আইনব্যবস্থা না থাকার দরুন জায়গায় জায়গায় এই ব্যবস্থা ভিন্নও হত।

প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে যে প্রথাগত আইনব্যবস্থা চালু ছিল তা জাতিতে জাতিতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পার্থক্য করত। কেননা প্রথাগত আইন চালিত হত সেই ধর্মের অনুশাসনে যা জাতগত শ্রেণীভেদ ও অন্যান্য প্রভেদগুলো পবিত্রজ্ঞানে অনুমোদন করত। তার বিপরীতে ব্রিটিশদের প্রবর্তিত আইন-ব্যবস্থা মোটামুটি সকলের জন্যই সম ছিল।

নতুন আইনব্যবস্থার ভিত্তি ছিল রাষ্ট্রীয় আইনের চোখে সমস্ত নাগরিকের গণতান্ত্রিক সাম্যের ধারণা। প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতবর্ষে একই অপরাধের জন্য অ-ব্রাহ্মণ অপরাধীর থেকে ব্রাহ্মণ অপরাধী অপেক্ষাকৃত কম শাস্তি পেত। নতুন আইনে যে জাতের বা বর্ণের হোক না কেন সমস্ত নাগরিককে আইনের সামনে সমান বলে গণ্য হত। রাষ্ট্রের সব জায়গাই এই আইনের আওতায় ছিল ইওরোপীয়দের অনুকূলে কিছু পক্ষপাতমূলক আইন থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশেরাই প্রথম ভারতবর্ষের ইতিহাসে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে আইনগত একতা স্থাপন করেছিল।

শাসনতান্ত্রিক ঐক্য

ব্রিটিশেরা ভারতবর্ষে আরও একটা প্রগতিশীল কাজ সম্পন্ন করেছিল, তাহল দেশের প্রশাসনিক ঐক্য। তারা সরকারি চাকরির পর্যায়ক্রমিক শ্রেণীবিভাগ প্রবর্তন করেছিল যা দেশকে প্রশাসনিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করে। সেই অনুসারে রাজকীয়, প্রাদেশিক ও অধস্তন পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল যা নিয়ে গঠিত ছিল কেন্দ্রশাসিত রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রশাসনিক অংশ। প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতবর্ষে এমনকি যখন কোনো একজন সম্রাট দেশের বেশিরভাগ এলাকাই তার শাসনাধীনে আনত ও তখনো দেশের কোনো প্রকৃত মৌলিক প্রশাসনিক ঐক্য হত না। কেননা সম্রাটের প্রতিনিধিবর্গ এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা যারা দেশের বিভিন্ন অংশে কাজে নিযুক্ত থাকত তারা যৌথ গ্রাম থেকে ভূমি রাজস্ব আদায় করা, সৈন্য বসানো, মুখ্য প্রতিনিধিদের বা গিল্ডের মাধ্যমে সম্রাটের প্রাপ্য নজরানা শহরবাসীদের কাছ থেকে আদায় করা অথবা কখনো কখনো সেচব্যবস্থা ও রাস্তা নির্মাণ করা ছাড়া জনসাধারণের জীবন নিয়ে কখনো মাথা ঘামাত না। কোনো একটা বিশেষ গ্রামের ব্যাপারে জাতি এবং গ্রামসমিতিই ছিল কার্যত সরকার ও প্রশাসনিক সংস্থা, এই সমিতিগুলো গ্রামের মধ্যে কৃষক পরিবারগুলির মধ্যে জমি বণ্টন তত্ত্বাবধান করত। প্রধানতঃ কারিগর ও কৃষকদের নিয়ে গঠিত এর সভ্যদের পারস্পরিক সম্পর্কও নিয়ন্ত্রণ করত এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিরোধের নিষ্পত্তি ইত্যাদি বিষয়ে নজর দিত। রাষ্ট্র শুধু গ্রামের উৎপাদনের নিজ অংশ দাবি করত এবং গ্রামসমাজের হাতেই গ্রামের শাসনভার ছেড়ে দিত। এই ব্যবস্থা ব্রিটিশ প্রবর্তিত নতুন শাসনব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই নতুন শাসন-ব্যবস্থাতে গ্রাম ও জাতি সমিতির কাছ থেকে তাদের কার্যাবলী ও ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং সরকার গ্রামের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারের প্রশাসনিক দায়িত্বও গ্রহণ করেছিল যা তখন সরকার নিযুক্ত কর্মচারিরা পালন করত। এই কর্ম-চারিরা গ্রামসমাজের কাছে দায়ী ছিল না, ছিল কেন্দ্রশাসিত রাষ্ট্রের কাছে। এইভাবে স্বয়ংশাসিত গ্রাম রূপান্তরিত হল দেশব্যাপী বর্তমান একটা শাসন-তান্ত্রিক ব্যবস্থার একক এক অংশে।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠা দেশে একটা ব্যাপক এবং মৌলিক রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক এবং আইনগত ঐক্য সৃষ্টি করেছিল যা ভারতবর্ষের ইতিহাসে ছিল প্রথম। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনে যে নতুন ধরনের অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হয় তার জন্য ঐরকম একটা রাষ্ট্রকাঠামোর দরকার ছিল। ভারতবর্ষে

পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক রূপান্তর অসংখ্য পৃথক গ্রামীণ অর্থনীতিকে ভেঙেগ দিয়েছিল, এক বিনিময় সম্পর্কের সাহায্যে ভারতীয় জনসাধারণকে আর্থনীতিক দিক দিয়ে সংযুক্ত করে দিল এবং চুক্তিতে তাদের আর্থনীতিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি করে দিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে ব্রিটিশ সরকার একটা নতুন ধরনের ভূমিব্যবস্থা তৈরি করেছিল ও অর্থভিত্তিক অর্থনীতির সূচনা করেছিল। নতুন ভূমি সম্পর্ককে রক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং নতুন ব্যবস্থায় অপরিহার্যভাবে উদ্ভূত যেসব চুক্তিবন্ধ আদান-প্রদান যেমন জমির কেনাবেচা অথবা বন্ধক সেগুলোও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অভিন্ন আইনব্যবস্থা গড়ে তুলতেই হয়েছিল।

অভিন্ন মুদ্রাব্যবস্থা প্রচলন

ব্রিটিশ শাসনের সময়ে দেশের সব উৎপাদনই বাজারে বিক্রয়ের জন্য উৎপাদিত পণ্য হয়ে উঠল। ভারতবর্ষ আগের থেকে অনেক বেশি ব্যাপকভাবে বিশ্ববাজারের সংগে জড়িত হল। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য উভয়ই পরিমাণ ও পরিধিতে বেড়ে গিয়েছিল। আবার পুঁজিবাদী ভিত্তিতে দেশে আধুনিক শিল্পও বিকাশ লাভ করছিল। এরকম একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে অপরিহার্যভাবে চুক্তি এবং অন্যান্য সম্পর্কের বিশাল জাল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নতুন রাষ্ট্রকে অনেক আইন প্রণয়ন করতে হয়েছিল। এইভাবে একটা নতুন আইন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল যা প্রজাকৃষক ও জমিদার, শ্রমিক ও মালিক, ব্যাপারী, ব্যবসায়ী এবং ব্যাঙ্কমালিকদের মধ্যে সমানভাবে কাজ করত এবং তাদের সবরকম জটিল ও বহুবিস্তৃত লেনদেন নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রকে গুচ্ছের আইন প্রণয়ন করতে হল। এই আইনব্যবস্থা আবার ভারতবর্ষের সংগে অন্যান্য দেশের নিরন্তর চালু বাণিজ্য ও অন্যান্য বিষয়ে সম্পর্কও নির্ধারণ করত। এই নতুন অর্থনীতিতে দেশব্যাপী অভিন্ন মুদ্রাব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তাও দেখা গিয়েছিল।

নতুন রাষ্ট্র শিক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিল। এটা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল কেননা নতুন অর্থনীতি এবং প্রশাসন কার্যকর করার জন্য আধুনিক উদার বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষদের প্রয়োজন ছিল।

প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের যে কোনো রাষ্ট্র থেকে ব্রিটিশ প্রবর্তিত এই নতুন রাষ্ট্র ভারতবর্ষ ও ভারতীয় জনসাধারণকে ব্যাপকতরভাবে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। এই প্রথম ভারতীয় জনসাধারণ তাদের আর্থনীতিক ও সামাজিক জীবনের এক বড় অংশকে সার্বিক ও সমতার ভিত্তিতে চালু আইনব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে আসতে দেখল।

ঐক্য সাধন : প্রধান ত্রুটিসমূহ

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন ভারতীয় জনসাধারণের রাজনৈতিক, আইনগত ও প্রশাসনিক ঐক্য সম্পন্ন করলেও এই একত্রীকরণের কতকগুলো ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা ছিল। আমরা তাদের প্রধানগুলিরই উল্লেখ করব।

প্রথমত ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ভারতীয় ভূখণ্ড বেশি বেশি করে প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসনে একই রাষ্ট্রের অধীনে আনার প্রক্রিয়া চললেও সেই বছরেই মহারানী ভিক্টোরিয়ার ভারতবর্ষের শাসনভার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটিশ-রাজ নিজ হাতে তুলে নেয় এবং ঘোষণায় জারি করা হয় যে টিকে থাকা সামন্ত রাজাদের রাজ্য অধিগ্রহণ ব্যবস্থা যেন পরিত্যক্ত হয়। ক্ষমতায় বলীয়ান ব্রিটিশশক্তি এই টিকে থাকা রাষ্ট্রগুলোকে নিশ্চিহ্ন করতে পারত। কিন্তু এগুলোর অস্তিত্ব বজায় রেখে এদেরকে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ প্রাধান্যের নির্ভর-যোগ্য সমর্থকে রূপান্তরিত করা হয়।

এই অসংখ্য ছোটবড় সামন্তরাজ্যের চিরস্থায়ী করণের ফলে এক রাষ্ট্রের অধীনে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক একতা আনার ঐতিহাসিক প্রগতিশীল পদ্ধতি সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভারতবর্ষ দুটো অংশে বিভক্ত হয়ে ছিল—একটা সামন্ত শাসিত, অন্যটা ব্রিটিশ সরকার শাসিত। এ প্রসঙ্গে Coupland বলেছেন : 'এইভাবে ভারতবর্ষ দুটো সুস্পষ্ট আলাদা ভাগে বিভক্ত হল যেখানে সরকারের ভিত্তি ও রূপ ছিল একেবারে আলাদা।'[৫] Coupland আরো বলেছেন, 'ভারতীয় রাজ্য এবং ব্রিটিশ শাসিত রাজ্যগুলির সীমানা বিভাগ ভৌগোলিক সীমারেখা অগ্রাহ্য করেই হয়েছে···রাজ্যগুলো মানচিত্র জুড়ে অসংলগ্নভাবে ছড়ানো। মাঝে মধ্যেই ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চল সামন্তরাজ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।'[৬]

এইসব রাজ্যগুলো অধিকাংশই স্বৈরতন্ত্রী রাজাদের শাসনে থাকলেও তাদের অর্থনৈতিক কাঠামোতে একটা রূপান্তর দেখা গিয়েছিল। ব্রিটিশ ভারতবর্ষে যে নতুন ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল তারা সাধারণত সেগুলো চালু করেছিল। এইসব রাজ্যের ভূখণ্ড থেকেও স্বনির্ভর ও স্বশাসিত গ্রাম প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বরোদা, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুরের মতো কতকগুলো অগ্রসর রাজ্যে এমনকি ব্রিটিশ ভারতবর্ষের প্রায় অনুরূপ শাসনব্যবস্থাও চালু করা হয়েছিল। তারা অভিন্ন আইন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল এবং সেই আইন কার্যকরী করার জন্য আদালতও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সে যাই হোক এইসব রাজ্যগুলোতে এত ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সরকার ও শাসন ছিল যে এরা ব্রিটিশ ভারতবর্ষ থেকে এবং একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্নই রয়ে গিয়েছিল।

ব্রিটিশ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক একতার আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, যে রাষ্ট্রযন্ত্র এই ঐতিহাসিকভাবে প্রগতিশীল কাজ সমাধা করেছিল তা বিভিন্ন পর্যায়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের তৈরি আইনের ভিত্তিতে রচিত নানা সংবিধান অনুসারে গড়ে উঠেছিল। এই সংবিধানগুলি যা ব্রিটিশ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রকাঠামোর রূপ দিয়েছিল তা ভারতীয় জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি দের কোনো গণপরিষদে স্থিরীকৃত হয়নি। এর ফলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার সেক্রেটারী অফ্ স্টেটের মাধ্যমে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে আইনত ও কার্যত দায়ী ছিল, যে ভারতীয় জনসাধারণকে তারা শাসন করত তার প্রতি কোনো দায় তার ছিল না। ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষে এইটাই ছিল রাষ্ট্রকাঠামোর অপরিহার্য অগণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য।

নতুন রাষ্ট্রটি ছিল ঐতিহাসিকভাবেই ভারতে ব্রিটিশ বিজয়ের ফলে উদ্ভূত। ওপরে উল্লিখিত ত্রুটিগুলি হল সেই ঘটনারই আবশ্যিক পরিণতি। এই নতুন

রাষ্ট্র তৈরিই হয়েছিল প্রধানত ও মূলত ব্রিটিশ পুঁজিবাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থের প্রয়োজন মেটাতে এবং তার তল্পি বহন করতে। সুতরাং ঐতিহাসিক দিক থেকে কতকগুলো প্রগতিশীল বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশ শাসনের অপরিহার্যভাবে কতকগুলো মূলগত ও গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি ছিল।

দেশীয় জনগণকে শাসন করছে একটা বিদেশী রাষ্ট্র—এই বিরোধটাই ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠার অন্যতম কারণ।

"ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের উপস্থিতি শুধুমাত্র সব ভারতীয় জনসাধারণকে শক্তিশালী একই সরকারের আওতায় এনে এবং পাশ্চাত্য ধারণা সুলভ করে দিয়ে ভারতীয় জাতীয় চেতনা উদ্দীপিত করেনি। যারা নিজেরাই জাতীয়তা ও বর্ণ সম্পর্কে তীব্রভাবে সচেতন এমন একটা বিদেশী জাতির আক্রমণের স্বাভাবিক ফল সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রজাদের মধ্যে অনুরূপ চেতনা উদ্দীপিত হওয়ায়···

"···ভারতীয়রা যে এক সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্রিটিশ শাসন যে শুধুমাত্র এই চেতনা তাদের এনে দিয়েছিল তাই নয়, তাদের কতকগুলো সাধারণ স্বার্থ এবং দাবিও সৃষ্টি করেছিল।"৭

ভারতীয় জনসাধারণ যতই রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন হতে শুরু করেছিল ততই তারা বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত করছিল। এই দাবিগুলো হল প্রশাসনিক সংস্কার, চাকুরিতে ভারতীয় নিয়োগ, প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান, বর্ণবৈষম্য দূরীকরণ, ভোটাধিকার, নির্বাচিত আইনসভা ও আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ শাসন বিভাগ, নাগরিক স্বাধীনতা, স্বয়ংশাসিত উপনিবেশের ধরনের সংবিধান এবং পরিণতিতে ভারতীয় জনসাধারণের জন্য সংবিধানকে রূপ দেওয়ার পূর্ণ অধিকার সহ একটি গণপরিষদ।*

* ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বহুশ্রেণীভিত্তিক ছিল এবং তা বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে চালিত হত। প্রতিটি সামাজিক গোষ্ঠী অথবা শ্রেণী তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হত এমন দাবি পেশ করত। যাহোক সাধারণভাবে এই গোষ্ঠীগুলো আবার সমস্বার্থসম্পন্ন কতকগুলো দাবি যেমন নাগরিক স্বাধীনতা, স্বরাজ প্রভৃতির জন্য ঐক্যবদ্ধ হত।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যখন স্বাধীনতার অথবা ভারতীয় জনসাধারণের জন্য সার্বভৌম রাষ্ট্র দাবি করার পর্যায়ে পেঁছিল তখন বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী নানা রাজনৈতিক দলের ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রকাঠামোর প্রকৃতি সম্পর্কে নিজ নিজ ধারণা ছিল। মুসলিম লীগ ভারতবর্ষকে হিন্দু ও মুসলমান রাষ্ট্রে ভাগ করার পক্ষপাতী ছিল, এই মুসলিম লীগের কথা বাদ দিলে অগ্রসর রাজনৈতিক গোষ্ঠী ও সংগঠনগুলি ভারতীয় জনসাধারণের এক রাষ্ট্র (জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অবশ্য স্বীকার করে নিয়েই) রাখার পক্ষপাতী ছিল যেটা ব্রিটিশ শাসনে সম্পন্ন হয়েছিল। যাহোক যখন এদের মধ্যে কেউ কেউ আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক ভারতীয় রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিল তখন All India Trade Union Congress এবং অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দলগুলো সমাজতন্ত্রী অর্থনীতির ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের পক্ষপাতী ছিল।

বস্তুতপক্ষে এই দাবিগুলো রাষ্ট্রকাঠামোকে গণতান্ত্রিক করতে চেয়েছিল এবং বিভিন্ন মাত্রায় ব্রিটিশের কাছ থেকে প্রশাসনিক উদ্যোগ ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ভারতীয় জনগণের হাতে সরিয়ে আনতে চেয়েছিল আর এইভাবে জাতীয় আন্দোলন প্রকৃতই একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলন হয়ে উঠেছিল।

এটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে ব্রিটিশের দ্বারা সম্পন্ন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ঐক্য যা ভারতীয় সমাজের একটা ঐতিহাসিক অগ্রগতি সূচিত করে তা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বজায় রাখতেই চেয়েছিল। এই আন্দোলন প্রাক্-ব্রিটিশ সামন্ততান্ত্রিক ভারতের স্বয়ংশাসিত গ্রামের পুনরুজ্জীবন চায় নি, সাধারণ রাজনৈতিক ও সামন্ততান্ত্রিক অনৈক্য ফিরিয়ে আনতে চায় নি। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা রাষ্ট্রকাঠামোকে একটা গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। এর সব থেকে প্রগতিশীল গোষ্ঠী-স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত তাদের লক্ষ্য স্থির করেছিল যার অর্থ ভারতীয় জনসাধারণের জন্য একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র।

সূত্র নির্দেশ

১ O'Malley, পৃ. ৩-৪
২ Carr দ্রষ্টব্য।
৩ O'Malley, পৃ. ১।
৪ উপরিউক্ত, পৃ. ১।
৫ Coupland, পৃ. ৭।
৬ উপরিউক্ত, পৃ. ১৪।
৭ Carr, পৃ. ১৫৩।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ভারতবর্ষে নতুন সামাজিক শ্রেণীসমূহের উদ্ভব

নতুন সামাজিক শ্রেণীর অসম উদ্ভব

ভারতবর্ষে নতুন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব ব্রিটিশ শাসনকালে প্রবর্তিত নতুন সামাজিক অর্থনীতি, নতুন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্র এবং নতুন ধরনের শিক্ষাবিস্তার—এসবের প্রত্যক্ষ ফল।১

অতীতে ভারতীয় সমাজে এই শ্রেণীগুলো অপরিচিত ছিল যেহেতু তারা মূলত ব্রিটিশ অধিকার এবং ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে ব্রিটিশ ও বিশ্ব অর্থনীতির প্রভাবে গড়ে ওঠা নতুন পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর ফসল। ভারতীয় সমাজের আমূল পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক রূপান্তরণের দরুন ভারতীয় জনসাধারণ নতুন সামাজিক গোষ্ঠীতে, নতুন শ্রেণীতে পুনর্বিন্যস্ত হয়েছিল।

দেশের বিভিন্ন অংশে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভবের প্রক্রিয়াটা অবশ্য অসমান ছিল। কেননা নতুন সামাজিক অর্থনীতি সময় ও গতি উভয়তই সমানভাবে বিস্তার লাভ করে নি যেহেতু তা ছিল ভারতবর্ষে ব্রিটেনের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রসারের ওপর নির্ভরশীল। ব্রিটিশের ভারতবিজয় এবং ফলতঃ আর্থিক রূপান্তর যুগপৎ ঘটা একটিমাত্র ঘটনা নয়। ভারত ব্রিটেনের অধীনস্থ হয়েছিল দফায় দফায় এবং বিভিন্ন পর্যায়ে। রাজনৈতিক অধীনতার ক্রমানুসারে দেশের বিভিন্ন অংশ নতুন পুঁজিবাদী ভিত্তিতে অর্থনৈতিকভাবে কমবেশি রূপান্তরিত হচ্ছিল। সুতরাং যে যে এলাকা আগে ব্রিটিশের প্রভাবাধীনে এসেছিল সেই সেই এলাকায় নতুন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভবও অপেক্ষাকৃত আগে হয়েছিল। ব্রিটেনের ভাগ্যে বঙ্গদেশই প্রথম পুরস্কার। এই বঙ্গদেশেই ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে সবার আগে জমিদারী প্রথার রূপে জমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সূচনা করেছিল। সুতরাং এই বঙ্গদেশেই সবার আগে নতুন সামাজিক শ্রেণীর অন্যতম দুটো শ্রেণী জমিদার ও প্রজার উদ্ভব ঘটেছিল। এই বঙ্গদেশ ও বোম্বাইতে চট ও সুতোকলের মাধ্যমে প্রথম শিল্পোদ্যোগ আরম্ভ হয়েছিল। এর ফলে উদ্ভূত হল আরো নতুন সামাজিক শ্রেণীর : শিল্পপতি ও শ্রমিক। আবার এই একই কারণে ব্রিটেন এইসব প্রদেশে একটা জটিল, বিস্তৃত, শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল এবং নতুন সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছিল, আধুনিক চিকিৎসা,

আইন ইত্যাদি আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্য। এর ফলে এইসব জায়গাতেই সবার আগে পেশাগত শ্রেণীর বিস্তার ঘটেছিল।২

যাই হোক যেহেতু ব্রিটিশের ভারতবর্ষ অধিকার শেষ পর্যন্ত সমগ্র দেশেই কায়েম হয়ে গেল সেইহেতু নতুন সামাজিক অর্থনীতি, শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং আধুনিক শিক্ষা সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। ফলতঃ জাতীয় স্তরে নতুন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটল।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভবের প্রক্রিয়াটাও একরকমের ছিল না, কেননা কোনো কোনো সম্প্রদায় প্রাক্-ব্রিটিশ যুগেই নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষাগত বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিল। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ মুৎসুদ্দি ও ব্রাহ্মণদের কথা বলা যায়। প্রাক্-ব্রিটিশ সমাজে মুৎসুদ্দিরা মূলতঃ বণিক ও মহাজন ছিল এবং ব্রাহ্মণেরা ছিল হিন্দুসমাজের শিক্ষার তত্ত্বাবধায়ক। নতুন সামাজিক পরিস্থিতিতে মুৎসুদ্দিরাই অন্যতম প্রথম গোষ্ঠী (আরেকটি হল পার্শী) যারা আধুনিক পুঁজিবাদী বাণিজ্য ও ব্যাঙ্কিং অবলম্বন করে নতুন সামাজিক শ্রেণী হিসাবে গড়ে উঠেছিল। যাদের বলা যায় বাণিজ্যিক ও আর্থিক পুঁজিপতি। অনুরূপভাবে ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষা যারা গ্রহণ ও আত্তীকরণ করেছিল ব্রাহ্মণেরা ছিল তাদের পুরোধা। এরা একটা আধুনিক বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে তুলেছিল। প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে মুসলমান সমাজের অপেক্ষাকৃত উঁচু পর্যায়ের লোকেরা মোটের ওপর মধ্যযুগীয় ব্যবসা অথবা মহাজনী বৃত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল এবং প্রধানত সামরিক ও সামন্ততান্ত্রিক বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিল। তাছাড়া, তারা অধিকাংশই উত্তর ভারতে বসবাস করত যে উত্তর ভারত বেশ কিছু পরে ব্রিটিশ শাসনাধীনে এসেছিল। বঙ্গদেশের বিশাল মুসলমান জনসংখ্যা প্রধানত অপেক্ষাকৃত গরীবশ্রেণীর ছিল। সুতরাং মুসলমান সমাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে আধুনিক বুদ্ধিজীবী, আধুনিক শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী এবং বুর্জোয়া-শ্রেণী উদ্ভূত হয়েছিল হিন্দু সমাজের থেকে কিছুটা দেরীতে।৩ (নবম ও ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

নতুন সামাজিক শ্রেণীসমূহ

ব্রিটিশ শাসনের আমলে ভারতীয় সমাজে যে নতুন সামাজিক শ্রেণীগুলির উদ্ভব হয়েছিল আমরা এর পর তার উল্লেখ করব। কৃষি এলাকাতে প্রধানত ছিল (১) ব্রিটিশ সরকার সৃষ্ট জমিদারশ্রেণী (২) অনুপস্থিত ভূস্বামী (৩) জমিদার ও অনুপস্থিত ভূস্বামীদের অধীনে প্রজাগণ (৪) উচ্চতর মধ্য এবং নিম্নতর পর্যায়ে বিভক্ত স্বত্ববান কৃষকশ্রেণী (৫) কৃষি শ্রমিক (৬) আধুনিক বণিকশ্রেণী (৭) আধুনিক মহাজনশ্রেণী।

শহর এলাকাতে ছিল প্রধানত (১) শিল্পগত, বাণিজ্যগত এবং অর্থগত আধুনিক পুঁজিপতিশ্রেণী (২) শিল্প, পরিবহন, খনি এবং এইরকম সব উদ্যোগে নিযুক্ত আধুনিক শ্রমিকশ্রেণী (৩) আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত ছোট ব্যবসায়ী এবং দোকানদারশ্রেণী (৪) বৃত্তিভোগী শ্রেণী যেমন কৃৎকৌশলী, ডাক্তার, আইনজীবী, অধ্যাপক, সাংবাদিক, ম্যানেজার, কেরানী এবং

অন্যান্যরা যাদের নিয়েই গঠিত ছিল বুদ্ধিজীবীশ্রেণী এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-শ্রেণী।

নতুন সামাজিক শ্রেণী উদ্ভবের সঙ্গে সংশিলষ্ট শক্তিসমূহ

নতুন শ্রেণীগুলোর উদ্ভব হয়েছিল প্রধানত ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন আইনের দ্বারা (যেমন নতুন ধরনের জমি সম্পর্ক) ভারতবর্ষে ঘটে যাওয়া মূলগত অর্থনৈতিক রূপান্তরণ, বাইরের পুঁজিবাদী বিশ্বের বাণিজ্যিক ও অন্যান্য শক্তির ভারতীয় সমাজে অনুপ্রবেশ এবং ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্প প্রবর্তনের দরুন।

জমিদারী এবং রায়তওয়ারী ব্যবস্থার মাধ্যমে জমিতে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ব্যক্তিগত সম্পত্তি পত্তনের ফলে বিরাট ভূসম্পত্তিসম্পন্ন জমিদার এবং স্বত্ববান কৃষক এই দুই শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। আবার জমি ইজারা দেওয়ার অধিকার সৃষ্টি থেকে প্রজা ও উপপ্রজা এই ধরনের শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। জমি কেনা-বেচা করার অধিকার সৃষ্টি এবং সেই সঙ্গে জমিতে মজুর ভাড়া করা ও নিযুক্ত করার অধিকার সৃষ্টি করার ফলে এমন এক পরিস্থিতি হয়েছিল যা অনুপস্থিত জমিদারশ্রেণী এবং কৃষি শ্রমিকের বিস্তার ঘটিয়েছিল।

১৮৫৩ সালে মার্কস যেমন লিখেছিলেন, "জমিদারী এবং রায়তওয়ারী উভয় ব্যবস্থাই ব্রিটিশ প্রভাবিত অনুশাসনের কৃষি বিপ্লবের পরিণতি এবং একে অপরের বিরুদ্ধভাবাপন্ন—একটা হল কুলীন—আরেকটা হল গণতান্ত্রিক। একটা হল ইংরেজ জমিদারী প্রথার ব্যঙ্গমূর্তি, আরেকটা ফরাসী স্বত্ববান কৃষক ব্যবস্থার; কিন্তু অত্যন্ত ক্ষতিকর হল এই যে উভয়েই অত্যন্ত বেশি পরস্পর-বিরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও উভয় ব্যবস্থাই যারা জমি চাষ করে তাদের জন্য তৈরি হয়নি অথবা জমির মালিক যারা তাদের জন্যও তৈরি হয়নি, হয়েছিল সরকারের জন্য যে সরকার এদেরকে চাপ দেয়।[৪]

নতুন কৃষি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যুক্তিসংগত পরিণতি হিসাবে জমিদারী এলাকাতে জমিদার এবং প্রজাকৃষকদের মধ্যে অন্তবর্তী শ্রেণীসমূহের একটা স্তর গড়ে উঠেছিল এবং রায়তওয়ারী এলাকাতে মহাজন, অনুপস্থিত ভূস্বামী এবং বণিক ইত্যাদি অন্তর্বর্তী শ্রেণীসমূহের একটা কাঠামো কৃষক এবং রাষ্ট্রের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু কতকগুলো কারণ আছে যেজন্য ভারতবর্ষে ইংলণ্ড এবং ইউ এস এ-র অনুরূপ এক বিরাট পুঁজিবাদী জমিদারশ্রেণীর উদ্ভব হতে পারেনি অথবা ফ্রান্সের মতো সমৃদ্ধ স্বত্ববান কৃষকের এক বিরাট শ্রেণী ভারত-বর্ষে উদ্ভূত হয়নি। এর কারণগুলো কৃষির পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে।[৫]

এর পরিবর্তে কৃষি এলাকাতে জমিদার, প্রজা, স্বত্ববান কৃষক এবং খেত-মজুরের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক মহাজন, কৃষককে বাজারের সঙ্গে যুক্ত করার অন্তর্বর্তী শ্রেণীর বণিক, অনুপস্থিত ভূস্বামী যে শুধুমাত্র খাজনা আদায় করতেই উৎসাহী—এইরকম সব শ্রেণী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই শ্রেণী এবং গোষ্ঠীগুলো প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতীয় সমাজে ছিল না।

যদিও প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতবর্ষে গ্রামাঞ্চলে মহাজন ও বণিকশ্রেণী ছিল তবু পুরানো অর্থনীতিতে তাদের কার্যাবলী ও অবস্থা নতুন অর্থনীতির কার্যাবলী

এবং অবস্থার থেকে অনেকাংশেই আলাদা ছিল। পুরাতন ভারতীয় সমাজে মহাজন অত্যন্ত নগণ্য ভূমিকা নিত। সে মাঝে মাঝে গ্রামের কৃষক অথবা কারিগরকে টাকা ধার দিত কিন্তু গ্রামপঞ্চায়েতই সুদটা কড়াকড়িভাবে ঠিক করে দিত। এমন অবস্থা যদি হত যে কৃষক সুদের দাবি মেটাতে পারত না, তবুও মহাজন কৃষকের জমি অথবা গবাদি পশু অধিকার করতে পারত না কেননা জমি শুধুমাত্র গ্রামসমাজেরই সম্পত্তি ছিল। ঠিক একইভাবে পুরানো সমাজে গ্রাম যেসব জিনিস উৎপাদন করতে পারত না, গ্রামীণ বণিক সেগুলো যুগিয়ে দিয়ে কেবলমাত্র গ্রামের শক্তি বৃদ্ধি করত। নতুন ভূমিব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে, জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হলে, কৃষিজ দ্রব্য পণ্যে পরিণত হলে এই বণিকদের ভূমিকার গুরুত্ব বেড়ে গেল এমনকি পরিবর্তিত হয়ে গেল। কৃষকের শস্য ভারতবর্ষ ও বিশ্বের বাজারে বিক্রির জন্য অন্তর্বর্তী হিসাবে বণিকশ্রেণী কৃষকের কাছে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াল।৬

কৃষি এলাকাতে আধুনিক বণিক ও মহাজনদের ভূমিকা যেহেতু পরিবর্তিত হয়েছিল সেহেতু এদেরকে নতুন পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত নতুন শ্রেণী হিসাবে গণ্য করা যেত। মধ্যযুগীয় প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতীয় সমাজের সামাজিক অর্থনীতিতে তারা যে কাজ করত এখন তার থেকে অনেক আলাদা কাজ করে। আধুনিক বণিক বুর্জোয়াশ্রেণীও হল আর একটা নতুন বিবর্তন।

ব্রিটিশ শাসনের আমলে ভারতবর্ষের সব উৎপাদনই বাজারের জন্য উৎপাদিত হত তা সে গ্রামীণ বা শহুরে, কৃষিজ বা শিল্প যাই হোক না কেন। এর ফলে অভ্যন্তরীণ বাজার বিস্তারলাভ করেছিল এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে নিযুক্ত এক বিরাট বণিক শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। এ বাদেও ব্রিটিশ যুগে ভারতবর্ষ আগের থেকে অনেক বেশি ব্যাপকভাবে বিশ্বের বাজারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। এর ফলে এক বিরাট বণিকশ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল যাদের কাজ ছিল ভারতবর্ষ থেকে এবং ভারতবর্ষের মধ্যে জিনিস রপ্তানি আমদানি করা। এইভাবে দেশে বণিক বুর্জোয়াশ্রেণীর সৃষ্টি হল যারা ব্যাপক অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যে নিযুক্ত থাকত।

এটা সত্যি যে প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতবর্ষে অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য দুইই ছিল, কিন্তু আগেই দেখা গেছে যে তাদের পরিমাণ ও পরিধি খুব সীমিত ছিল। এর ফলে প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতবর্ষে অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত বণিকশ্রেণী ছিল খুব ছোট। দেশের অর্থনীতিতে এদের তাৎপর্য ও গুরুত্ব খুব বেশি ছিল না।

নতুন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দরুন যে নতুন বণিকশ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল তারা ছিল প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে তাদের পূর্বসূরীদের থেকে ভিন্ন ধরনের। নতুন বণিকশ্রেণী দেশে গ্রামীণ ও শহুরে কৃষিগত ও শিল্পগত সবরকমের উৎপাদন নিয়েই কারবার করত। তারা জমিদার, প্রজা এবং স্বত্ববান কৃষকের কাছ থেকে কৃষি উৎপন্ন ক্রয় করত এবং তা ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করত। তারা আধুনিক শিল্পোদ্যোগের মালিকদের কাছ থেকে শিল্পদ্রব্য কিনত এবং সেই একইভাবে ভারতীয় ও বহির্বিশ্বের বাজারে তা বিক্রি করত। প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতবর্ষে বণিকের ভূমিকা ছিল খুব নগণ্য কেননা দেশের উৎপাদিত

দ্রব্যের অধিকাংশই বিক্রয়যোগ্য ছিল না, আধুনিক এবং নতুন বণিকশ্রেণীর ভূমিকা কিন্তু হলো খুবই প্রবল।৭

রেলপথ প্রতিষ্ঠা এবং ভারতীয় ব্যবসায়ী, জমিদারদের এক অংশ আর পেশাদার শ্রেণীর সম্পন্ন অংশের হাতে মুনাফা এবং সঞ্চয় একত্র হওয়ায় ও তা মূলধন হিসাবে কাজে লাগায় ভারতীয় মালিকানায় সুতাকল, খনি এবং অন্যান্য শিল্পের উদ্ভব ঘটেছিল এবং দেশের মধ্যে শিল্প বুর্জোয়াশ্রেণী গড়ে উঠেছিল। এই শ্রেণীর সংগে সংগে অপরিহার্যভাবেই এসে পড়েছিল ভারতবর্ষে নতুন শ্রমিকশ্রেণী। ভারতীয় সমাজে এখন নতুন নতুন শ্রেণী অন্তর্ভুক্ত হল যেমন মিল মালিক, খনি মালিক এবং নতুন পুঁজিবাদী উদ্যোগের, আরো সব মালিকেরা এবং সেই সংগে কারখানা শ্রমিক, খনি শ্রমিক, রেলওয়ে শ্রমিক এবং বাগিচা শ্রমিক। প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতীয় সমাজে এই শ্রেণী এবং গোষ্ঠীগুলো ছিল না বা থাকতে পারত না, কেননা তখন কোন আধুনিক কারখানা, খনি, বাগিচা অথবা রেলওয়ে ছিল না।

এইভাবে ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্প বিস্তারের সংগে সংগে আধুনিক বুর্জোয়া এবং শ্রমিক এই নতুন শ্রেণী দুটির উদ্ভব ঘটল।৮

ভারতীয় শিল্পগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং দ্রুতহারে বিস্তার লাভ করেছিল কেবল উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দশকগুলিতে এবং তার পরে। ঐসব শিল্পগুলো যত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল শিল্পবুর্জোয়া এবং শ্রমিকশ্রেণী সেই অনুপাতে বিস্তার লাভ করছিল।

আধুনিক আইনজীবী, চিকিৎসকগণ, আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংগে যুক্ত শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ, আধুনিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উদ্যোগে নিযুক্ত ম্যানেজার ও কেরানীগণ, রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রে নিযুক্ত অফিসার, ইঞ্জিনিয়ার, রসায়নবিদ, প্রযুক্তিবিদ, কৃষিবিজ্ঞানী, সাংবাদিক এবং অন্যান্যদেরকে নিয়ে গঠিত ছিল বৃত্তিভোগী শ্রেণী। ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় সমাজে এরা গড়ে তুলল আরেকটা নতুন সামাজিক গোষ্ঠী। এই নতুন অর্থনীতি, সামাজিক এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন ছিল কিছু শিক্ষিত ব্যক্তির যারা আধুনিক আইন, কারিগরি, চিকিৎসা, অর্থনীতি, শাসনতান্ত্রিক বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে পারংগম। বস্তুতপক্ষে নতুন বাণিজ্যিক উদ্যোগ ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অত্যধিক চাপের কারণেই ব্রিটিশ সরকারকে ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষার সূচনা করতে ও উত্তরোত্তর বেশি করে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়তে উদ্বুদ্ধ করেছিল। নতুন রাষ্ট্র ও সমাজের প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে আইন বিষয়ক, বাণিজ্যিক ও সাধারণ উদার শিক্ষাদানের জন্য স্কুল ও কলেজ চালু করা হল। এইভাবে সমাজ যতই এগোতে লাগল ততই ভারতবর্ষে পেশাদার শ্রেণী সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে লাগল।৯ আধুনিক কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, অর্থ, শাসনতন্ত্র, ছাপাখানা ও নতুন সামাজিক জীবনের আরো অন্যান্য শ্রেণীর সংগে সংশ্লিষ্ট এই ধরনের সামাজিক গোষ্ঠী প্রাক্-ব্রিটিশ সমাজে ছিল না কেননা এই ধরনের সামাজিক, আর্থিক শ্রেণীব্যবস্থা তখন বর্তমান ছিল না।

প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতবর্ষে গ্রাম পঞ্চায়েত ও জাতসমিতি গ্রামের মধ্যেকার সব রকম বিচারবিষয়ক, প্রশাসনিক এমনকি অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম করত। সম্পূর্ণভাবে গ্রামের পুরোহিত ও স্কুল শিক্ষক নিয়ে গঠিত ছিল গ্রামের বুদ্ধিজীবী

সম্প্রদায়। এরা আবার গ্রাম সমাজের কর্মী ছিল এবং জনসাধারণের ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ—এই উভয় সাংস্কৃতিক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখত। শহরে বাস করত উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত ও মৌলবী, বড় বড় শিল্পী ও সাহিত্যিক, জ্যোতির্বিদ ও জ্যোতিষী, তৎকালীন চিকিৎসা বিজ্ঞানে পারদর্শী বৈদ্য ও হাকিমেরা এবং নিজ নিজ শিল্পে পারঙ্গম কারিগরেরা। এই গোষ্ঠীগুলো আবার রাজন্যবর্গ, অভিজাত সম্প্রদায় ও ধনী বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় সমৃদ্ধি লাভ করেছিল এবং প্রধানতঃ এই পৃষ্ঠপোষকদের প্রয়োজনই মেটাত। ব্যাপক জনসাধারণ সুবিধা ভোগ করতে পারে সাধারণত এমনভাবে তারা তাদের দক্ষতার প্রয়োগ করত না। তাদের শিল্পগত, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি ক্ষমতা মোটের ওপর তাদের রাজকীয় ও অন্যান্য প্রভুর কাছেই ছিল আবদ্ধ।১০

নতুন সমাজের প্রয়োজনে ব্রিটিশ শাসনের আমলে সমৃদ্ধ আধুনিক পাশ্চাত্য কৃষ্টি ও শিক্ষাবিস্তার লাভের ফলে যে আধুনিক পেশাদারী শ্রেণীগুলির উদ্ভব হয়েছিল তারা প্রাক্-ব্রিটিশ সমাজের থেকে ভীষণ আলাদা। আর্থিক দিক থেকে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা তা সে শৈল্পিক, বৈজ্ঞানিক অথবা কারিগরি যাই হোক না কেন যে কোনো নাগরিক এর জন্য মূল্য দিতে পারলে তা ভোগ করতে পারত। সামাজিক দিক থেকে ভারতবর্ষে গড়ে ওঠা নতুন পুঁজিবাদী সমাজের এরা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল। আবার এই পেশাদারী শ্রেণীরা আধুনিক জ্ঞান ও আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও কলায় শিক্ষিত হত। এদের মধ্যে ছিল আইনজ্ঞেরা যারা ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত নতুন আইন ও বিচার ব্যবস্থা নিয়ে পড়াশোনা ও কাজ করত, ছিল চিকিৎসকেরা যারা আধুনিক চিকিৎসায় শিক্ষিত, ছিল আধুনিক কারিগরি বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত ইঞ্জিনিয়ারের দল, ছিল শিক্ষক ও অধ্যাপক যারা পাশ্চাত্যে উদ্ভাবিত আধুনিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক, প্রাকৃতিক ও অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করত। আর ছিল সাংবাদিক ও লেখক যারা সংবাদপত্র সম্পাদনা করত ও বই প্রকাশ করত যা বাজারে বিক্রি হত এবং যার বিষয়বস্তু হাজার হাজার মানুষ গ্রহণ করত। রাজনৈতিক দিক থেকে ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সংহত ভারতবর্ষের বিরাট ও জটিল অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা করবার জন্য ছিল ম্যানেজার ও অফিসারেরা। এরা এমন সব জটিল সমস্যার মোকাবিলা করত যে সমস্যাগুলো সমগ্র জাতির জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিল। বস্তুতপক্ষে ভারতীয় সমাজে একটা নতুন সামাজিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল যা প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের ক্ষুদ্র গোষ্ঠী থেকে আলাদা ধরনের ছিল যে যুগে একজন স্কুল শিক্ষক একজন ডাক্তার অথবা একজন শিল্পীর প্রতিভা ও ক্ষমতা ছিল নিম্নমানের এবং রাজন্য-বর্গ, পৃষ্ঠপোষকদের একচেটিয়া অথবা ছোট গ্রামসমাজের কুক্ষিগত।

উপরে উল্লিখিত এইসব নতুন শ্রেণী ছাড়াও শহরাঞ্চলে প্রতিটি শহরে ও নগরে ছোট ব্যবসায়ী ও দোকানীদের একটা বড় শ্রেণী ছিল। আধুনিক শহর ও নগরের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল।

অবশিষ্ট পুরাতন শ্রেণীসমূহের অবস্থান্তর

ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষের সামাজিক অর্থনীতি যদিও মধ্যযুগীয় থেকে আধুনিক পুঁজিবাদী ভিত্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিল, যা ভারতীয় সমাজের এক

ঐতিহাসিক অগ্রগতি সূচনা করে তবু এই রূপান্তর, ফ্রান্স, ইংলণ্ড অথবা ইউ এস এ প্রভৃতি দেশের মতো তত গভীর ও ব্যাপক হয়নি। যে যে কারণে এই অগ্রগতি বিঘ্নিত হয়েছিল তা ভারতীয় অর্থনীতি সংক্রান্ত পূর্ব পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হয়েছে।

এই শিল্পোন্নয়ন যথেষ্ট না হওয়ার দরুন পুরানো অর্থনীতির অবশিষ্টাংশ কিছু কিছু জিনিস তখনো দেশে টিকে গিয়েছিল। প্রাক্‌-পুঁজিবাদী হস্ত-শিল্প এবং গ্রামীণ কারুশিল্প এর উদাহরণ। পুরানো অর্থনীতির অব-শিষ্টাংশের অনুরূপ প্রাক্‌-পুঁজিবাদী ভারতীয় সমাজের কিছু কিছু শ্রেণী—গ্রামীণ কারিগর, শহুরে হস্তশিল্পী টিকে গিয়েছিল এবং নতুন শ্রেণীগুলোর সঙ্গে সহ-অবস্থান করছিল।

এটা লক্ষ্য করতে হবে যে নতুন সমাজে পুরানো শ্রেণীগুলোর এই অবশেষ কিন্তু কাজে কর্মে প্রাক্‌-ব্রিটিশ যুগের মতো ছিল না। নতুন পুঁজিবাদী পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পরিবেষ্টিত হয়ে তাদের কতকগুলো নতুন বৈশিষ্ট্য এসেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রামীণ কারিগরদের কথা বলা যায়। এই শ্রেণীটা তখনো সংখ্যায় অসংখ্য ছিল। তারা অতীতের গ্রামসমাজের ক্রীতদাসের মত কাজ করত না। বরং সাধারণতঃ নিজ দ্রব্য বাজারে নিয়ে আসত। অনুরূপ-ভাবে শহুরে হস্তশিল্পী যারা তখনো বেশ একটা সংখ্যায় ছিল তারাও আর অতীতের মত রাজন্যবর্গ, ধনী অথবা অভিজাতদের জন্য বিশেষ করে কাজ করত না। তারাও তাদের তৈরি জিনিসগুলো সাধারণ বাজারে নিয়ে আসত। যাই হোক, কারিগরিতে এমনকি সংগঠনেও তারা তাদের পুরানো বৈশিষ্ট্য-গুলো বজায় রেখেছিল।

ছোট বড় ভারতীয় রাজন্যবর্গ যারা ভারত ভূখণ্ডের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি শাসন করত তারাও ছিল প্রাক্‌-ব্রিটিশ ভারতীয় সমাজের আর একটা শ্রেণী। এরাও টিকে গিয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার রাজনৈতিক কারণে এই শ্রেণীকে চিরস্থায়ী করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার দরুনই এরা টিকে থাকতে পেরে ছিল। এই রাজন্যবর্গ রাজসভার জাঁকজমক বজায় রেখেছিল, সামন্ততান্ত্রিক উৎসবাদি করত এবং পুরানো সামন্ত যুগের আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা বজায় রেখে-ছিল। কিন্তু কতকগুলো মুখ্য বৈশিষ্ট্যের জন্য এই রাজন্যবর্গকে প্রাক্‌-ব্রিটিশ যুগের রাজন্যবর্গ থেকে আলাদা হতেই হয়েছিল। এদের অধিকাংশেরই কোনো সার্বভৌম ক্ষমতা ছিল না। তাদের রাজ্যের সব মুখ্য কাজকর্ম এবং ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল অথবা সর্বোচ্চ ব্রিটিশ ক্ষমতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। যে অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর এই রাজ্যগুলোর ভিত্তি ছিল তা প্রাক্‌-ব্রিটিশ যুগের রাজ্যগুলোর অর্থনৈতিক কাঠামো থেকে মোটের উপর আলাদা ছিল। বস্তুতপক্ষে ভূমিদাস প্রথার মতো পুরানো অর্থনীতি ও সামাজিক সম্পর্কের কিছু কিছু প্রথা অবশিষ্ট থাকলেও এইসব রাজ্যের অর্থনীতি মূল-গতভাবেই ভারতবর্ষের জাতীয় অর্থনীতিরই একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অগ্রসর রাজ্যগুলোতে আধুনিক আইনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। যদিও তাদের অনেকগুলোতেই স্বৈরাচারতন্ত্র দিব্য চলছিল।

এইসব রাজ্যে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ছিল না, বা থাকলেও খুব সীমিত পরিমাণে ছিল। এই বাধা জনসাধারণের সামাজিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ব্যাহত করেছিল।

এইসব কারণের জন্য এইসব রাজ্যের ভারতীয় রাজন্যবর্গকে প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতের পুরানো রাজন্যবর্গের সঙ্গে এক করে দেখা যেতে পারে না। যদিও এইসব রাজ্যগুলো তখনো আর্থনীতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে আধুনিক হয়ে ওঠে নি তবু এরা প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতের রাজ্যগুলির অনুরূপ হুবহু ছিল না।১১

ভারতীয় রাজন্যবর্গ খাঁটি মধ্যযুগীয় অভিজাত শ্রেণীও ছিল না যারা শুধু-মাত্র জমি থেকে পাওয়া খাজনাতেই জীবনযাপন করত। এদের মধ্যে কেউ কেউ আধুনিক বাণিজ্য, শিল্প ও আর্থিক সংস্থাগুলিতে টাকা খাটিয়েছিল, এমনকি তাদের রাজ্যসীমার বাইরেও পর্যন্ত। সেই পরিমাণে এই রাজন্যবর্গ নতুন পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে আধুনিক পুঁজিপতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল।

এই নতুন ভারতীয় রাজন্যবর্গরা হল প্রাক্-ব্রিটিশ সমাজের পুরানো শ্রেণীরই রূপান্তরিত অস্তিত্ব। ভারতীয় সমাজে যেসব নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল এরা তাদের সঙ্গে সহাবস্থান করছিল।

এই পুরানো শ্রেণীর অবশিষ্টাংশ কিছুটা পরিবর্তিত রূপে নতুন শ্রেণীর পাশাপাশি টিকে থাকলেও ভারতীয় সমাজকে অত্যন্ত জটিল করে তুলেছিল। এই নবসৃষ্ট সমাজের মধ্যে ছিল নিজ নিজ স্বার্থের জন্য সংগ্রামরত বিভিন্ন এবং পরস্পরবিরোধী সামাজিক শক্তিগুলো। ভারতীয় জনসাধারণ হয়ে উঠল পুরানো ও নতুন শ্রেণীর এক বহুবর্ণ মিশ্রণ। অতীত ও বর্তমানের বিভিন্ন সমাজের সামাজিক গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত হল নতুন ভারতীয় সমাজ। এরই সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিগত যুগের বিশ্বজ্ঞান, পুরানো দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর মধ্যে ঢুকে পড়েছে অথচ এই আধুনিকতার জন্ম সাম্প্রতিক সামাজিক ভিত্তিতে। এই হল অন্যতম কারণ যাতে ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় সচেতনতা ও জাতীয় একতার ধীর অগ্রগতির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

আমরা এখন এই নতুন শ্রেণীর মধ্যে যারা গুরুত্বপূর্ণ তাদের স্বার্থ, বৈশিষ্ট্য, সমস্যা, কর্মসূচী, সংগঠন এবং আন্দোলনগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করব।

জমিদার : স্বার্থ ও সংগঠন

আমরা আগেই দেখেছি জমিদারেরা বহুলাংশেই ব্রিটিশ সরকারের সৃষ্টি।১২ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ লিখেছেন, 'যে জমিদারদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়েছিল তারা লর্ড কর্ণওয়ালিশের তৈরি অভিজাত শ্রেণী। এরা সম্পূর্ণ-ভাবেই রাষ্ট্রের সৃষ্ট।১৩ এই কারণে জমিদারেরা সবসময়ই ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন করত এবং বিরোধিতা করত কেবল তখনই যখন তাদের জমিদারী অধিকারে হাত পড়ত। ব্রিটিশ সরকার তাদের পক্ষ থেকে এদেরকে বিশ্বাসযোগ্য অনুগত শক্তি বলে মনে করত এবং এদেরকে দাক্ষিণ্য করত। 'স্যর লরেন্স

তালুকদারদের তাঁর ক্ষমতায় সম্ভব সবরকম মনোযোগ দিয়েছেন ও বিবেচনা করেছেন।'১৪ লর্ড লিটন স্পষ্টতই বলতেন যে অভিজাত জমিদার সহ ভারতীয় সমাজের রক্ষণশীল শক্তির উচিত ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের সমর্থন করা (দশম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ব্রিটিশ সরকার-প্রবর্তিত বিভিন্ন সংস্কার ও সাংবিধানিক পরিকল্পনাতে জমিদারদের বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়েছিল (দশম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। কি বিধানসভাতে কি জাতীয়তাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের সংগ্রামের সময় এই জমিদারশ্রেণীর রাজনৈতিক ভার ব্রিটিশ সরকারের পক্ষেই ছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যখন উদারপন্থী, চরমপন্থী ও গান্ধীর অধীনে গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি, শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবি অথবা স্বরাজের দাবি পেশ করেছিল অথবা এই দাবি পূরণ করবার জন্য পার্লামেণ্টীয় অথবা পার্লামেণ্ট বহির্ভূত সংগ্রাম সংগঠিত করেছিল তখন এই জমিদারী অভিজাত সম্প্রদায় সবসময়ই সরকারকে সমর্থন করত (অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এর কারণ হল এই যে জমিদারী অভিজাত সম্প্রদায় আশঙ্কা করেছিল যে সামাজিক, রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক যেকোনো রকমের গণতান্ত্রিক রূপান্তর তাদের শ্রেণীস্বার্থকে এবং এমনকি তাদের অস্তিত্বও বিপন্ন করবে।

জমিদারেরা মোটের ওপর রক্ষণশীল ও উদ্যোগহীন ছিল। তারা তাদের প্রধান সংগঠন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তোলে ১৮৫১ সালে। ই. এস. মণ্টেগু ১৯৩০ সালে প্রকাশিত তাঁর Indian Diary-তে এই সংগঠনকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হল মোটামুটি একটা রক্ষণশীল প্রতিষ্ঠান। এর নেতা হলেন বর্ধমানের মহারাজা—যিনি একজন রক্ষণশীল ভারতীয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ব্রিটিশ সংস্পর্শের প্রতি তার তীব্র অনুরাগ ছিল। শুধুমাত্র একটা নিষ্ক্রিয় নীরব আনুগত্য স্বীকার নয়, এই শাসনব্যবস্থার প্রতি তাঁর ছিল দৃঢ় বিশ্বাস…তিনি একজন বড় ও খুব ধনী জমিদার ছিলেন এবং এক স্বাধীন নেতা হওয়ার ইচ্ছে ছিল তার।'১৫

ভারতীয় রাজন্যবর্গই হল প্রথম যারা ব্রিটিশ-প্রবর্তিত রাষ্ট্রকাঠামোর সংগে যুক্ত হয়েছিল। ১৮৬২ সালে পাতিয়ালার মহারাজা এবং বারানসীর মহারাজা গভর্ণর জেনারেলের বিধানসভায় মনোনীত হল। এরপর মনোনীত হয় জমিদার গোষ্ঠী। এই সম্পর্কে কে. বি. কৃষ্ণ বলেছেন, 'রাজা থেকে শুরু করে জমিদার, অবসরপ্রাপ্ত অফিসার, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগী শ্রেণীদের থেকে একগাদা মনোনয়ন দেওয়া যেতে পারে।'১৬

ভারতীয় জনসাধারণের জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে এমন সব মূলগত প্রশ্নে জমিদারেরা মোটের ওপর অগণতান্ত্রিক অবস্থান গ্রহণ করত। বিপিন চন্দ্র পাল লিখেছেন, 'লর্ড লিটনের প্রেস অ্যাক্টের বিরোধিতা করবার জন্য ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন টাউন হলে কলকাতাবাসীদের এক জনসভা ডাকে। বাঙালী জমিদারদের নিয়ে গঠিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এই জনসভায় যোগ দিতে অস্বীকার করে। কিন্তু শুধুমাত্র কলকাতা ও বাংলার শিক্ষিত লোকেরাই নয় প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য প্রদেশের শিক্ষিত লোকেরাও ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের এই প্রতিবাদের পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন।'১৭

যেহেতু জমিদারেরা জমি থেকে আয়ের একটা মোটা অংশ আত্মসাৎ করত

তাই জমিদারী এলাকাতে প্রজাকুলের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটছিল। তাই কৃষকেরা যখন উত্তরোত্তর দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হচ্ছিল কৃষিও উপযুক্ত সার ও বীজ ইত্যাদির অভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছিল। জাতীয়তাবাদী নেতারা এবং ব্রিটিশ রাজনীতিবিদরাও জমিদারী এলাকাতে কৃষি অর্থনীতির এই সঙ্গীন অবস্থা এবং কৃষি জনসাধারণের ভয়াবহ দারিদ্র্যের কথা স্বীকার করেছেন।

ভারতীয় এবং বিদেশী সমালোচকরা সবাই জমিদারতন্ত্রের সমালোচনা করেছেন যে জমিদারেরা ভারতীয় অর্থনীতিতে কোনো উৎপাদনশীল ভূমিকা নেয়নি। তারা জমিদারী ব্যবস্থার অপসারণ না হলেও পুনর্গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। ভারতীয় কৃষির পুনরুজ্জীবন ও অগ্রগতির ব্যাপারে তাঁরা একে অপরিহার্য প্রয়োজন বলে মনে করতেন। এই কৃষির উপরই ভারতীয় জনসাধারণের অধিকাংশের অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ভর করত।[১৮]

দ্বিতীয়ত, জমিদারেরা মোটামুটি সবাই সুদূরপ্রসারী সামাজিক পরিবর্তনের বিরোধিতা করতেন। দারভাঙ্গার মহারাজা অগণতান্ত্রিক জাতপ্রথা চিরস্থায়ীকরণের পক্ষপাতী ছিলেন এই যুক্তিতে যে সভ্যতাকে কলুষিত করার শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে প্রকৃষ্টতম এবং নিশ্চিততম রক্ষাকবচ হল জাতপ্রথা (চতুর্দশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য 'জাতপ্রথার বিরুদ্ধে জেহাদ')। কিছু কিছু শিক্ষিত জমিদারেরা গণতান্ত্রিক সামাজিক প্রগতির জন্য এই আন্দোলনকে সমর্থন ও সহায়তা করলেও শ্রেণী হিসাবে তারা জাতপ্রথার বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়াশীল বিরোধিতার মনোভাব নিয়েছিল। ভূসম্পত্তির সঙ্গে যুক্ত শ্রেণীগুলি অথবা যে জাতি কৃষিকেই জীবিকা হিসাবে অবলম্বন করে তারা সাধারণত বাণিজ্যিক ও শিল্পগত গোষ্ঠীর তুলনায় গোঁড়া হয়। Tawney তাঁর Religion and the Rise of Capitalism-এ বলেছেন, 'যে জাতি মূলতঃ জমিকে অবলম্বন করে থাকে তার মনোভাব বাণিজ্যিক সমাজের মনোভাব থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। সবই যথাযথ চললে বণিক সমাজে নিরবচ্ছিন্ন প্রসার স্বাভাবিক বলেই ধরে নেওয়া হয়, নিয়তই খুলে যায় নতুন দিগন্ত, এবং রাজনীতির ধরতাই বুলিই হয় উদ্যোগকে উৎসাহিত করা। জমিভিত্তিক সমাজে একের পর এক প্রজন্ম যে জায়গায় পৌঁছয় তা খুবই সীমিত; আন্দোলন মানেই বিশৃঙ্খলা...এবং কূটনীতিবিদদের লক্ষ্যই হল সামাজিক বিপর্যয় প্রতিহত করা, ব্যক্তিগত উদ্যোগকে পরিপুষ্ট করা নয়।'[১৯]

ভারতীয় জমিদারেরা বিশেষ জোরের সঙ্গে সংস্কার ও প্রগতির প্রতি এই বিরোধের মনোভাব দেখাত।

ভারতীয় সমাজের গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কর্মসূচী নিয়ে যতই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠতে লাগল এবং পরবর্তীকালে যতই কৃষক প্রজা ও খেতমজুরের আন্দোলন গড়ে উঠতে লাগল ততই জমিদারেরা তাদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার জন্য আগের থেকে বেশি করে ব্রিটিশ সরকারের উপর নির্ভর করতে শুরু করল। তাদের নিজ সংগঠনের মাধ্যমে তারা আইনসভায় যথাযোগ্য প্রতিনিধিত্ব দাবি করত।

প্রজা : স্বার্থ ও সংগঠন

জমিদারী প্রথা সৃষ্টি যুগপৎভাবে ভারতবর্ষে প্রজাশ্রেণী সৃষ্টি করল। নির্বিচারে কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা হত। তারা দারিদ্র্যে নির্মজ্জিত হত এবং জমিদারদের হাতে নিপীড়িত হত।

কালক্রমে জমিদার ও চাষবাসকারী প্রজার মধ্যে বহু অন্তবর্তীশ্রেণী গড়ে উঠল। এতে প্রজা কৃষকদের অবস্থার উত্তরোত্তর অবনতি ঘটছিল। ১৮৫৯ ও ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের লক্ষ্য ছিল কৃষকদের অবস্থার উন্নতি সাধন করা। আইন অবশ্য বিশেষ কিছু করতে পারেনি। প্রজাকুলের অধিকাংশই উত্তরোত্তর আরো খারাপ অবস্থার মধ্যে জীবনযাপন করতে লাগল।

জমিদারী এলাকার প্রজা ছাড়াও রায়তওয়ারী এলাকাতে এক নতুন ধরনের প্রজাশ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। স্বত্ববান কৃষকের মধ্যে উত্তরোত্তর দারিদ্র্য বেড়ে যাওয়াতে জমি দ্রুত তাদের হাত থেকে অনুপস্থিত জমিদারদের হাতে চলে যাচ্ছিল।

ক্রমশঃ বিভিন্ন প্রদেশের কৃষকদের মধ্যে একটা জাগরণ শুরু হল।[২০] উত্তরপ্রদেশ, বিহার, বাংলা ও অন্যান্য এলাকাতে এরা প্রজাসমিতি গড়ে তুলেছিল অথবা কিসানসভাতে যোগ দিয়েছিল। এই কিসানসভাগুলো গড়ে উঠেছিল কৃষক, প্রজা ও খেতমজুর—যারাই জমিতে কাজ করত তাদের নিয়ে। এই প্রজাসমিতি ও কিসানসভাগুলো প্রজাদের নির্দিষ্ট অভিযোগ ও দাবিগুলি সূত্রবদ্ধ করত এবং এমনকি এই দাবিগুলি সমর্থনের জন্য আন্দোলনও সংগঠিত করত। যেহেতু জওহরলাল নেহেরু, প্রফেসর এন. জি. রঙ্গ এবং স্বামী সহজানন্দের মত দৃঢ় জাতীয়তাবাদীরা এইসব সমিতি, সভা এবং আন্দোলনের সংগঠক ছিলেন তাই প্রজাগণ ও সেই সঙ্গে আর যারা জমিতে কাজ করত তারা সবাই জাতীয়তাবাদী প্রচারের প্রভাবে এসে পড়েছিল এবং তাদের নিজেদের শ্রেণীর চাহিদা নিয়ে নিজ পতাকাতলে উত্তরোত্তর বেশি করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগদান করছিল। অর্থনৈতিক দিক থেকে ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনগ্রসর প্রজাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী প্রেরণা দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। কিসানসভাগুলো ও প্রজাসমিতিগুলো শুধুমাত্র যে ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনা করতে আরম্ভ করল তাই নয় তারা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেরই সমালোচনা করত এই বলে যে এরা মোটামুটি জমিদারদের স্বার্থরক্ষাতেই আগ্রহী ছিল। তারা তাদের দাবিপত্র তৈরি করল যেমন খাজনা হ্রাস করা, জমিদারদের পীড়নে বেআইনী আদায় বন্ধ করা, নির্বিচারে খাজনা আদায় বন্ধ করা ইত্যাদি। এমনকি কিসানসভারাও একথা বলত যে জমিদারী প্রথা অপব্যয়ী, অপটু, অবিচারপূর্ণ ও জাতীয় স্বার্থের বিরোধী।

মালিকানা স্বত্ববান কৃষক : তাদের উপভাগসমূহ, স্বার্থ ও সংগঠন

রায়তওয়ারী ব্যবস্থায় জমিতে সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষে মালিকানা স্বত্ববান কৃষকশ্রেণী সৃষ্টি করেছিল। অর্থনৈতিক শক্তি অনুসারে

স্বত্ববান কৃষকেরা উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন—এই তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। অত্যধিক খাজনা, ক্ষুদ্র জোত, জমি খণ্ডীকরণ ক্রমবর্ধমান ঋণগ্রস্ততা এবং আরো অন্যান্য কারণ যা আগে বিবৃত করা হয়েছে—এ সবের জন্য মালিকানা স্বত্ববান কৃষক-শ্রেণী শুরু থেকেই ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হচ্ছিল। এরা স্থায়ী বিচ্ছিন্নতার অবস্থায় ছিল। এর মধ্যে একটা স্বতন্ত্র করার প্রক্রিয়া সবসময়ই চলে আসছিল। মালিকানা স্বত্ববান কৃষককুলের একটা অতি সামান্য অংশ যখন ধনী কৃষকের পর্যায়ে উন্নীত হচ্ছিল, তাদের একটা বড় অংশ তখন গরিব চাষী, অনুপস্থিত জমিদারদের প্রজা অথবা খেতমজুরে রূপান্তরিত হচ্ছিল। কৃষকদের দারিদ্র্য বেড়েই যাচ্ছিল বলে এই পৃথকীকরণের প্রক্রিয়া দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এর ফলে মালিকানা স্বত্ববান কৃষকের হাত থেকে জমি দ্রুত মহাজন, বণিক ও অন্যান্যদের হাতে চলে আসতে লাগল। এদেরকে নিয়েই গঠিত হয়েছিল অনুপস্থিত জমিদারদের নতুন শ্রেণী। মধ্যবর্তী পর্যায়ের কৃষকেরা দ্রুত লোপ পেয়ে যাচ্ছিল। উত্তরোত্তর দারিদ্র্য যখন এদের একাংশকে নিম্নতম কৃষক এমনকি ভিক্ষাজীবী ও খেতমজুরে রূপান্তরিত করেছিল তখন এই মধ্যবর্তী কৃষকের সংখ্যাও দ্রুত কমে আসছিল। কৃষির পরিচ্ছেদে আগেই দেখা গিয়েছে যে ভারতবর্ষে পরবর্তী বছরগুলোতে অনুপস্থিত জমিদার এবং খেতমজুরের সংখ্যা উচ্চ এবং জ্যামিতিক হারে বেড়ে যাচ্ছিল।

প্রজাদের থেকে আগে স্বত্ববান কৃষকদের মধ্যে জাতীয় চেতনা গড়ে উঠেছিল। এর কারণ হল মালিকানা স্বত্ববান কৃষকেরা রাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষভাবে কাজকর্ম চলত। মালিকানা স্বত্ববান কৃষকেরা রাষ্ট্রকে খাজনা দিত। অন্যদিকে প্রজারা খাজনার ব্যাপারে জমিদারের সঙ্গেই বিরোধে লিপ্ত হত, রাষ্ট্রের সঙ্গে নয়।

মালিকানা স্বত্ববান কৃষকদের মধ্যে প্রজাদের থেকে আগে জাতীয় চেতনা গড়ে ওঠার আরো একটা কারণ ছিল। গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস শ্রেণী-ঐক্যের গান্ধীবাদী আদর্শে প্রভাবিত ছিল এবং সেই তত্ত্বের প্রেরণাতেই মোটের ওপর কর্মসূচী তৈরি করত।[২১] সেই মত অনুসারে জমিদার ও প্রজারা হল ভারতীয় এবং কোনো কর্মসূচী যা প্রজাদের দাবির জন্য সংগ্রাম করে তা জমিদারদের দলীয় স্বার্থহানিকর হবে এবং তাদের বিরোধী করে তুলবে যার ফলে স্বরাজের সংগ্রামে সমস্ত শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ ফ্রণ্টের সংগ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত করবে। সে যাই হোক কিসান আন্দোলন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ওপর কিছুটা চাপ দিতে পেরেছিল এবং সেই চাপের ফলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রজাদের দাবি নিয়ে একটা কর্মসূচী তৈরি করেছিল। স্বামী সহজানন্দ, অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ, ইন্দুলাল যাজ্ঞিক এবং কিসান আন্দোলনের অন্যান্য নেতারা সেই পরিকল্পনায় উৎসাহভার কাজ না করার জন্য কংগ্রেস নেতৃত্বের সমালোচনাও করেছিলেন। এমনকি তারা একথাও বলেছিলেন যে বিহার ও কিছুসংখ্যক প্রদেশে দক্ষিণপন্থী নেতারা গান্ধীর মত অবলম্বন করে প্রজাদের বিরুদ্ধে জমিদারদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। কিভাবে কংগ্রেস সরকার প্রজাদের ন্যায্য সংগ্রামের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের দমনমূলক ক্ষমতাও ব্যবহার করত তাও তারা দেখিয়েছেন।[২২]

ভারতীয় কৃষক : মুখ্য আন্দোলনসমূহ

আমরা এর পর ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় কৃষকদের মালিকানা স্বত্ববান কৃষক, প্রজা ও খেতমজুর—প্রধান প্রধান সংগঠন ও আন্দোলনগুলোর কথা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

১৯১৮ সালের পরে কৃষকদের রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে উঠতে থাকে, তারা সংগঠিত জাতীয় সংগ্রামে অংশ নিতে শুরু করে এবং পরবর্তীকালে এমনকি তাদের নিজ পতাকা ও কর্মসূচী নিয়ে নিজেদের সংগঠন গড়ে তোলে এবং তাদের নিজ নেতৃত্বে সেই কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য সংগ্রামও সংগঠিত করে।

১৯১৮ সালের আগেও অবশ্য কিছু কিছু কৃষক আন্দোলন হয়েছিল। সেই আন্দোলনগুলি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, আকস্মিক এবং খুবই সীমিত ও স্থানীয় আর্থনীতিক লক্ষ্য নিয়ে।

১৮৭০ থেকে ১৮৯৭ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে মাঝে মাঝে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এর মধ্যে ১৮৭০, ১৮৯৬ এবং ১৮৯৭ সালের দুর্ভিক্ষই ছিল সবথেকে ভয়ঙ্কর। এর ফলে প্রভাবিত এলাকাতে কৃষকদের মধ্যে নিদারুণ দুর্দশা দেখা দিয়েছিল। প্রায়শই ঘটিত অর্থনৈতিক মন্দাও তাদের দারুণ দুর্দশার মধ্যে ফেলেছিল। এর ফলে জমিদার, মহাজন ও সরকারের বিরুদ্ধে কখনও কখনও কৃষক আন্দোলন হয়েছিল।

১৮৭০ সালে অর্থনৈতিক মন্দার দরুন বাংলার প্রজারা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে তাদের সাধারণ দারিদ্র্যও ভীষণ বেড়ে যায়। তাদের মধ্যে হাজারে হাজারে 'জ্ঞাতসারে খাজনা দিতে অস্বীকার করে, বিচারসভার বিচার অগ্রাহ্য করে, তাদের উচ্ছেদে বাধা দিতে এবং শেষ পর্যন্ত যে অস্ত্র পাওয়া যায় তা নিয়েই লড়তেও এসেছিল···বাংলাদেশের একটা বড় অংশে এবং সাঁওতাল গ্রামাঞ্চলে অরাজকতার অবস্থা প্রতিনিয়ত দেখা যাচ্ছিল···'। সরকার এই বিশৃঙ্খলা দমন করেছিল ও সেই উদ্দেশ্যে একটা অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত করেছিল এবং ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন করেছিল।

গৃহযুদ্ধের পর আমেরিকাতে তুলার দামে মন্দা ভারতীয় কৃষকদেরও কঠিনভাবে আঘাত করে। এর ফলে তাদের ঋণভার খুব বেশি হয়ে পড়ে এবং ১৮৭৫ সালে দাক্ষিণাত্যে মারাঠা কৃষকেরা মহাজনদের বিরুদ্ধে রুখে ওঠে। মহাজনেরা আদালতের সাহায্যে কৃষকদের উচ্ছেদের ভয় দেখিয়েছিল। কৃষকেরা মহাজনদের বাড়ি আক্রমণ করে, ঋণের দলিলপত্র নষ্ট করে এমনকি তাদের কাউকে কাউকে হত্যা পর্যন্ত করে। দাঙ্গা দমন করা হয়েছিল তবে সরকার কৃষকদেরকে সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নেয় এবং ১৮৭৯ সালে Deccan Agriculturists Relief Act প্রণয়ন করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে পাঞ্জাবে একটা কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল। এই বিদ্রোহ ঘটেছিল মহাজনেরা কৃষকদের জমি থেকে উৎখাত করে দেওয়ার ভয় দেখাবার ফলে। অবস্থাটাকে আয়ত্তে আনার জন্য সরকার ১৯০২ সালে Punjab Alienation Act প্রবর্তন করল।

লর্ড কার্জনের সময়ে ভূমিরাজস্ব নীতির ব্যাপারে ভারত সরকার একটা প্রস্তাব গ্রহণ করে, এর লক্ষ্য ছিল জমিদারদের চাহিদার অত্যধিক চাপ থেকে কৃষকদের রক্ষা করা।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস '১৯০৫-১৯ সালের মধ্যে কৃষকদের সাহায্যের প্রয়োজনের ওপর ততটা গুরুত্ব আরোপ করে নি যতটা গুরুত্ব আরোপ করেছিল ভারতীয় শিল্পপতিদের প্রয়োজনে', যেমন সংরক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে।২৩ বিশেষ করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা জমিদারী এলাকাতে বসবাসকারী প্রজাদের উল্লেখ মোটের ওপর এড়িয়ে চলতেন। 'কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্তর প্রতি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে লর্ড কার্জন বলেছিলেন, সরকারই জমিদারদের অত্যাচার থেকে কৃষকদের রক্ষা করার জন্য বেশি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই চ্যালেঞ্জের কোন উত্তর আসেনি।'২৪

১৯১৭-১৮ সালে গান্ধীর নেতৃত্বে বিহারে চম্পারনে নীলকরদের বিরুদ্ধে কৃষকদের এক আন্দোলন শুরু হয়। এই নীলকরদের অধিকাংশই ছিল ইউরোপীয়। এখানে গান্ধী তার সত্যাগ্রহ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন। সরকার একটা অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত করে যার মধ্যে গান্ধী ছিলেন একজন সভ্য। এর প্রকাশিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সরকার একটা আইন প্রণয়ন করে কৃষকদের ভার আংশিক লাঘব করে। এন. জি. রঙ্গ যিনি এই সংগ্রামে গান্ধী নেতৃত্বের সমালোচনা করেছেন, তিনি বলেছেন, 'অস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে রমেশচন্দ্র দত্তর নেতৃত্বে কংগ্রেসের পূর্বেকার বিক্ষোভ যেমন জমিদারদের হাতে আমাদের কৃষকদের শোষণ ধর্তব্যেই নেয়নি তেমনি চম্পারনে মহাত্মার নেতৃত্বে এই বিক্ষোভ চম্পারন কৃষকদের ভয়াবহ দারিদ্র্য ও দুর্দশার মূল কারণগুলো যেমন অত্যধিক খাজনা ও ঋণভার-এর বিরুদ্ধে কোনো সংগ্রামের পথে নিয়ে যেতে পারে নি।... এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ লাগে যে তিনি (গান্ধী) এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদ উভয়ই জমিদারী ব্যবস্থার লুণ্ঠনের ব্যাপারে সতর্কভাবে নীরব থেকেছেন...'২৫

এরপর গান্ধী ভূমিরাজস্ব আদায়ের বিরুদ্ধে কয়রা জেলাতে কিসানদের সত্যাগ্রহ আন্দোলন সংগঠিত করেন। শস্যহানি হওয়ার দরুন কৃষকেরা সেখানে ভূমিরাজস্ব ঠিকমত দিতে পারত না।

১৯১৯ সালের অসহযোগ আন্দোলনের আগে যেসব কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এগুলো হল তার মধ্যে প্রধান। এই সংগ্রামগুলোয় রাজনৈতিক সারবত্তার অভাব ছিল এবং প্রায়শই ছিল নৈরাজ্যবাদী।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় ভারতীয় কৃষকদের কোনো কোনো অংশ রাজনৈতিক সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভূমি রাজস্ব না দেওয়ার আহ্বান দেয় যার দারুণ প্রভাব পড়ে। স্বরাজের জন্য রাজনৈতিক সংগ্রামকে কৃষকেরা ব্যাখ্যা করেছিল অত্যধিক ভূমি রাজস্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হিসাবে এবং তাদের কোনো কোনো অংশ এই আন্দোলনে সহানুভূতি দেখিয়েছিল, সমর্থন করেছিল এবং অংশগ্রহণ করেছিল। একটা সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলনে ভারতীয় কৃষকদের অংশবিশেষের যোগদানও এই প্রথম।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় এমন সব কৃষক আন্দোলনও হয়েছিল যেগুলো কংগ্রেসের সংগঠিত নয় যেমন কর্ণাটকের গুণ্টুর জেলার কৃষক আন্দোলনগুলো।

১৯২১ সালে অযোধ্যা খাজনা আইন যা সরকার পাশ করে তা আংশিকভাবে কৃষকদের দাবি মিটিয়েছিল।

১৯২২ সালের মোপলা বিদ্রোহের সাম্প্রদায়িক ও অর্থনৈতিক এই উভয় ভিত্তিই ছিল। মোপলারা ছিল প্রধানতঃ মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়। নাম্বুদ্রিরা এদের প্রবলভাবে শোষণ করত। এই নাম্বুদ্রিরা ছিল মালাবার প্রদেশের ব্রাহ্মণ জমিদার। মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা মোপলাদের অর্থনৈতিক অসন্তোষকে সাম্প্রদায়িক পথে চালনা করেছেন। ফলতঃ একটা বিদ্রোহের স্ফুরণ ঘটল যে বিদ্রোহ প্রকৃতিতে ছিল মূলতঃ আর্থিক কিন্তু রূপে ছিল ধর্মীয়। এর ফলে জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছিল দুঃখজনকভাবে।

ভারতবর্ষে এরকমটা প্রায়ই হত। যেসব অঞ্চলে হিন্দুরা জমিদার ছিল এবং মুসলমানেরা ছিল কৃষক সেখানে সাম্প্রদায়িকতার কুমন্ত্রণাতে অর্থনৈতিক শ্রেণীবিরোধ প্রায়ই সাম্প্রদায়িকতার রূপ নিত।

আরো দুটো কৃষক সংগ্রামের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। এর মধ্যে একটা হল সীতারাম রাজুর নেতৃত্বে নরসিপাটান তালুকে কয়াদের আন্দোলন আর আরেকটা হল সীতাপুর, রায়বেরিলী এবং উত্তরপ্রদেশের অন্যান্য জেলাতে কৃষক আন্দোলন। এই আন্দোলনগুলো অবশ্য প্রকৃতিতে ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর আন্দোলনগুলোর সঙ্গে লক্ষণীয় সাদৃশ্য ছিল।

অসহযোগ আন্দোলন শেষ হয়ে যাওয়ার পরই কেবল ভারতীয় কিসানদের স্বাধীন শ্রেণীসংগঠন তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯২৩ সালে অন্ধ্রে রায়তদের সমিতি এবং চাষী ও মজুর ইউনিয়ন গঠিত হয়। ১৯২৬-৭ সালে পাঞ্জাব, বাংলা ও উত্তরপ্রদেশের কিছু কিছু অংশে কিসানসভা শুরু হয়। ১৯২৮ সালে বিহার ও উত্তরপ্রদেশের কিসানসভার প্রতিনিধিরা মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে এক দাবিপত্র পেশ করে যার মধ্যে ছিল সার্বজনীন ভোটাধিকার, মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার এবং জাতীয় স্বাধীনতার দাবি।

১৯২৮ সালে অন্ধ্রপ্রদেশে রায়ত সমিতি গঠিত হয়।

গুজরাটের বরদোলি জেলাতে দুটো কৃষক সংগ্রাম শুরু হয়—এদের একটা হয়েছিল ১৯২৮-৯ সালে আরেকটা ১৯৩০-১ সালে। প্রথমটার নেতা ছিলেন বল্লভভাই প্যাটেল। এই আন্দোলনের অধিকাংশ দাবি সরকারকে দিয়ে মানিয়ে নিতে পারার সাফল্য কৃষক আন্দোলনে দারুণ প্রেরণা যুগিয়েছিল।

১৯৩০ সালে কংগ্রেসের একচ্ছত্র নেতা গান্ধী ব্রিটিশ সরকারের কাছে আপস হিসাবে তার 'একাদশ দফা' পেশ করেন। বামপন্থী জাতীয়তাবাদীরা এবং সমাজতন্ত্রীরা গান্ধীকে এই বলে সমালোচনা করেছিলেন যে তিনি তার এগার দফাতে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকশ্রেণীর মূল চাহিদাগুলো অন্তর্ভুক্ত করেন নি যদিও ভারতীয় পুঁজিবাদীদের সবচেয়ে সোচ্চার অভিযোগগুলো তিনি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।[২৬] এন. জি. রঙ্গ বলেছেন, 'মহাত্মাজীর অবশ্যই দাবি করা উচিত ছিল জমিদারদের খাজনার উল্লেখযোগ্য হ্রাস করা, আমাদের কৃষির ঋণগ্রস্ততা মকুব করা···আমাদের মজুরদের জন্য ন্যূনতম মজুরি, আমাদের প্রধান শিল্পগুলোর জাতীয়করণ করা। ···কিন্তু তিনি তা করবেন না এবং

তাই হবে তাঁর শ্রেণীমৈত্রীর বিশ্বাসের সংগে ও অর্থনৈতিক স্বার্থের বিভিন্নতার ভিত্তিতে আমাদের জনগণকে দুভাগে বিভক্ত করা নিয়ে তাঁর উদ্বেগের সংগে সংগতিপূর্ণ।'২৭

১৯২৯ সালে যে বিশ্বকৃষি ও সাধারণ অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয় তা ভারতীয় কৃষককে দারুণভাবে আঘাত করেছিল। তারা একটা আলোড়নের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। তাদের কোনো কোনো গোষ্ঠী কংগ্রেস আয়োজিত মিছিল ও মিটিংএ অংশগ্রহণ করছিল। উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্র, গুজরাট, কর্ণাটক এবং দেশের অন্যান্য অংশে কংগ্রেসের অনুমোদনে এবং অননুমোদনেও কৃষক আন্দোলন হয়েছিল।২৮

আইন অমান্য আন্দোলন শেষ হয়ে যাওয়ার পর শ্রেণী হিসাবে কৃষকদের স্বাধীন সংগঠন গড়ে তোলার প্রক্রিয়া গতি পায়। আমূল সংস্কারপন্থী জাতীয়তাবাদী এবং কৃষক আন্দোলনের অগ্রসর লোকেদের মধ্যে একটা ধারণা জন্মাচ্ছিল যে কংগ্রেস নেতৃত্ব পুঁজিপতি এবং জমিদারদের স্বার্থরক্ষা করতে উৎসুক।

তারা বুঝতে পেরেছিল যে কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য তাদের স্বাধীন শ্রেণী-সংগঠন ও নেতৃত্ব অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে। তারা আরও বুঝতে পেরেছিল যে নিজস্ব শ্রেণীগত দাবি নিয়ে কৃষকদের যদি আন্দোলনের পথে নিয়ে আসা যায় একমাত্র তবেই স্বরাজের জন্য সংগ্রাম সফল হতে পারবে। কংগ্রেস সমাজ-তন্ত্রী দল, কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলি এবং জওহরলাল নেহেরুর মতো বামপন্থী জাতীয়তাবাদীরা সবাই দেশে কিসান সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছিলেন।

বর্তমান শতকের ত্রিশের দশকে কৃষক আন্দোলন জোরদার হতে শুরু করে। ১৯৩৮ সালে নিদুব্রোলিতে প্রচার ও সংগঠনমূলক কাজ চালাবার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য সক্রিয় কিসান কর্মীদের প্রথম ভারতীয় কিসান স্কুল স্থাপিত হয়। ১৯৩৫ সালে Madras Presidency Ryots' Association স্থাপিত হয়। ১৯৩৭ সালে Madras Presidency Agriculturists' Association সংগঠিত হয়।

সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে কৃষকদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টাও হয়েছিল। স্যার আবদুল রহিম এবং ফজলুল হক বাংলাদেশে মুসলমান কৃষকদের একত্রিত করার জন্য প্রজা পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। এই দল পরে নাম পালটে হয় কৃষক-প্রজা-পার্টি। এই দল কৃষি সংস্কার এমনকি জমিদারী প্রথা বিলোপেরও কর্মসূচী নিয়েছিল। বাংলাদেশে মুসলমান কৃষকদের মধ্যে এই দল ভালরকমের শক্তি সংগ্রহ করেছিল।

১৯২৭ সালে বিহার কিসানসভা আরম্ভ হয়। ১৯৩৪ সালের পর এটি একটা বিরাট সংগঠনে পরিণত হয়। স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীর প্রচেষ্টার ফলেই এরকমটা হয়েছিল। পরবর্তীকালে গঠিত সারা ভারত কিসানসভার মধ্যে বিহার কিসানসভাই ছিল সম্ভবতঃ সবথেকে শক্তিশালী অংশ।

উত্তরপ্রদেশে ১৯৩৫ সালে প্রাদেশিক কিসানসভা স্থাপিত হয়েছিল। জমিদারী প্রথা বিলোপসাধনের দাবি এর কর্মসূচীর অন্যতম বিষয় ছিল।

দেশের অন্যান্য অংশেও কিসানসভা গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছিল।

কৃষকদের কিছুটা সুবিধা দেওয়ার জন্য সরকার কতকগুলো ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। ১৯৩৪ সালে উত্তরপ্রদেশে পাঁচটা Debt Relief Act পাশ হয়েছিল ; পাঞ্জাবে Regulation of Accounts Act পাশ হয় ; বাংলাদেশে ১৯৩৩ সালে Moneylenders' Act ও ১৯৩৫ সালে Relief of Indebtedness Act পাশ হয়। যেহেতু এমনকি এই আইনও কৃষকদের অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটাতে পারে নি, সেহেতু তাদের অসন্তোষ বেড়েই যেতে লাগল এবং কিসান আন্দোলনের বিস্তারের মাধ্যমে তারা রূপ নিতে লাগল।

১৯৩৫ সালে লক্ষ্ণৌতে প্রথম সারা ভারত কিসানসভা মিলিত হয়। এতে স্থির করা হয় যে কংগ্রেসকে দেশের সর্বাধিক কিসানসভা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। জওহরলাল নেহেরু এই সভার প্রতি জোরালো সহানুভূতি ও সমর্থন দেখিয়েছিলেন।

যদিও নিখিল ভারত কৃষক সমিতি ভারতবর্ষের সমগ্র কৃষি জনসাধারণকে নিয়ে গঠিত ছিল না, তবু এর প্রতিষ্ঠার একটা দারুণ ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছিল। এই প্রথম ভারতীয় জনসাধারণের ইতিহাসে একটা নিখিল ভারত কৃষক সংগঠন গড়ে উঠল। এর পরিকল্পনা ছিল সাধারণ দাবি এবং এই বৃহৎ ভূখণ্ডের সমগ্র কৃষি জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করবে। এর ফলে একটা উন্নততর সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছিল এবং একটা ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠেছিল যা প্রাক-ব্রিটিশ ভারতবর্ষে গ্রামীণ জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যমান স্থানীয় দৃষ্টিভংগী অতিক্রম করেছিল।

সারা ভারত কিসানসভা ভারতীয় কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষামূলক ও প্রচারমূলক কাজ করত। দেশের মধ্যে সংগঠনকেও প্রসারিত করেছিল। সারা ভারত কিসানসভা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কাছে সমষ্টিগতভাবে অনুমোদন চেয়েছিল। কংগ্রেস অবশ্য এই প্রস্তাব মেনে নেয়নি।

১৯৩৭ সালে নতুন সংবিধান অনুযায়ী প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনের আগে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একটা ইস্তাহার প্রকাশ করে যার মধ্যে নাগরিক স্বাধীনতা এবং কিসানদের অবস্থার আমূল উন্নতিসাধনের সামাজিক অর্থনৈতিক কর্মসূচীর জন্য গণতান্ত্রিক দাবিগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়। কৃষি জনসাধারণেরা এই ইস্তাহারে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। কংগ্রেস প্রার্থীদের পক্ষে তাদের ভোট নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

পরবর্তী সময়ে কয়েকটা প্রদেশে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারা অবশ্য কৃষকদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারে নি। এই কংগ্রেস সরকার কয়েকটা প্রদেশে কিছু কৃষি আইন পাশ করেছিল (বিশদ বিবরণের জন্য দশম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এগুলো কিন্তু নিম্নতন পর্যায়ের কৃষকদের প্রায় কোনোভাবে প্রভাবিত করতে পারে নি। কংগ্রেস সরকারের প্রতি কৃষকদের অসন্তোষের মনোভাব অনেক প্রতিবাদ সভা, সম্মেলন এবং শোভাযাত্রার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছিল। কিছুসংখ্যক কৃষক নেতাকে গ্রেপ্তার করার জন্য, কৃষকদের মিটিং-এর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার জন্য, এমনকি কৃষকদের বিরুদ্ধে বিশেষ করে বিহারে, পুলিসবাহিনী ব্যবহার করার জন্য কৃষকেরা কংগ্রেস সরকারের সমালোচনা করে।

কংগ্রেস সরকারের আমলে কিসানসভা তাদের দাবি পূরণের জন্য সরকারের ওপর চাপ দেওয়া উদ্দেশ্যে অনেক সভা, সম্মেলন ও পদযাত্রা সংগঠিত করে। কংগ্রেস সরকার কার্যরত অবস্থায় থাকাকালীন কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতারা এবং কংগ্রেস মন্ত্রীরা এই ধরনের পার্লামেণ্ট-বহির্ভূত সংগ্রাম সমর্থন করত না।

১৯৩৪ সালের পর থেকে কৃষক আন্দোলন বিস্তারের সময় কয়েকটা জায়গায় কৃষকদের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনও গড়ে উঠেছিল।

কৃষকদের নির্দিষ্ট মানসিক ও অন্যান্য লক্ষণ

মালিকানা স্বত্ববান কৃষক প্রজা ও খেতমজুরের বড় অংশের অগ্রগতি, পরিস্থিতি, আন্দোলন ও সংগঠনের ইতিহাস বিবৃত করে আমরা এরপর এই সামাজিক শ্রেণীগুলির বিশেষ মানসিক ও অন্যান্য লক্ষণগুলো বর্ণনা করব।২৯

মালিকানা স্বত্ববান কৃষকশ্রেণী যাদের নিজেদের জমি আছে এবং সেই জমিতে চাষ করে ও তার উৎপাদিত দ্রব্য নিয়ে ব্যবসা করে তাদের কতকগুলো মানসিক বৈশিষ্ট্য আছে। যত কমই হোক না কেন যেহেতু তারা জমির মালিক তাই স্বত্ববান কৃষকেরা সাধারণত রক্ষণশীল হয়। একজন শিল্পশ্রমিক, যে সাধারণত সম্পত্তিবিহীন তার কাজকর্মে যতটা সাহস দেখায় একজন স্বত্ববান কৃষক সাধারণত তা দেখায় না। বিভিন্ন দেশে এটাই সাধারণ অভিজ্ঞতা। আবার জমিতে ব্যক্তিগত উৎপাদন পদ্ধতিতে তার নিযুক্ত থাকাটাই কৃষককে ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে তোলে এবং সার্বজনীন কোনো প্রচেষ্টাতে তার সহযোগিতা করা কঠিন করে তোলে। এইখানেই শিল্পশ্রমিকের সঙ্গে কৃষকের বিরাট পার্থক্য। শিল্পশ্রমিক ব্যাপক শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে গঠিত আধুনিক কারখানার উৎপাদন পদ্ধতিতে নিযুক্ত। ভারতবর্ষে শ্রমিকদের ইউনিয়ন ও অন্যান্য সংগঠন কৃষকদের ইউনিয়নের থেকে আগে গড়ে ওঠার এটা অন্যতম কারণ। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ধরনের অসংখ্য সম্মিলিত ও সংগঠিত কার্য-কলাপ কেন কৃষকদের থেকে প্রায়ই বেশি ঘটত এটা তারও অন্যতম কারণ যদিও কৃষকদের থেকে শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থা অনেক সময়েই বেশি খারাপ থাকত।

কৃষকেরা বিশাল এলাকা জুড়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে, শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এরকমটা নয়। এর ফলে কৃষকদের পক্ষে সংগঠিত হয়ে কাজকর্ম করা আরও কঠিন হয়ে পড়ে।৩০ তাছাড়া কৃষকেরা গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে যা সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনগ্রসর এবং যেখানে জীবন মন্থর, প্রায় একঘেয়ে গতিতে চলে; এর একদম বিপরীত হল শহরের জীবন। শহরগুলো হল দেশের সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু, সমসাময়িক জীবনের গতিশীল প্রক্রিয়ার ঘাঁটি যেখানে উন্নত সামাজিক, রাজনৈতিক শিক্ষাগত ও অন্যান্য আন্দোলন প্রধানত জন্ম নেয় এবং প্রসার লাভ করে। শহর সংস্কৃতি ও আধুনিক জীবনের চলমানতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কৃষকেরা সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনগ্রসর গ্রামগুলোতে মানসিকভাবে বেড়ে ওঠে। তাই তারা তুলনায় নিষ্ক্রিয়, মানসিকভাবে জড় ও অজ্ঞ থেকে যায়। শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতের কর্মীরা এবং জাতীয়তাবাদী প্রচারকেরা কৃষকদের

সুসংহত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যা বুঝতে উদ্বুদ্ধ করতে শহরের নিম্নতর লোকেদের তুলনায় বেশি অসুবিধায় পড়েছেন।

কৃষকেরা জাতির অন্যান্য অনুন্নত গোষ্ঠী থেকে কেন আরো বেশি কুসংস্কারযুক্ত ও নিষ্ক্রিয় হয় তার আরো একটা কারণ আছে। কৃষির সফলতা মূলত নির্ভর করে ভাল বর্ষা ইত্যাদি স্বাভাবিক শক্তির ওপর যেগুলি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। শিল্পে এরকমটা হয় না। উৎকৃষ্ট জমি, উপযুক্ত বীজ এবং শক্তপোক্ত হালবলদ, স্বাস্থ্যবান গবাদি পশু এবং তার নিজের শ্রমই কেবল তার ফসল তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত তাই নয়। শেষ পর্যন্ত তাকে নির্ভর করতে হয় বৃষ্টির মতো এক অনিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক শক্তির ওপর। এই ব্যাপারটা কৃষককে আরো বেশি বেশি কুসংস্কারযুক্ত করে তোলে এমনকি কিছুটা ভীরু ও পরাজিত মনোভাবাপন্ন করে তালে। এই কারণে গ্রামীণ জনসাধারণের মধ্যে ভয়ানক রকমের কুসংস্কার বেড়ে যায়। সুসংগঠিত যৌথ নির্ভীক কার্যাবলীর মাধ্যমে জীবনের জন্য সংগ্রাম করার পরিবর্তে কৃষকেরা প্রায়ই দুর্দশার কাছে অসহায়ভাবে নতিস্বীকার করে। অথবা যখন তারা স্বতঃপ্রণোদিত অসংগঠিত এবং ব্যর্থ বিদ্রোহের পথ আশ্রয় করে তখন তারা হতাশ লোকের অন্ধ সাহসই দেখায়।*

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিস্তার এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য কর্মীদের শিক্ষা ও প্রচারমূলক কাজের মতো যেসব তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক অগ্রগতি ও ঘটনা ভারতে ঘটেছিল এবং সেই সঙ্গে তাদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য প্রবাদপ্রতিম স্থানুবৎ ভারতীয় কৃষির সামাজিক ও মানসিক জড়তা দুর্বল করতে শুরু করলো। আগেই বলা হয়েছে কৃষকেরা অত্যন্ত ধীরে ধীরে হলেও নিজ সংগঠন গড়ে তোলার জন্য, তাদের নিজস্ব দাবিদাওয়া স্থির করবার জন্য এবং জাতীয় ও তাদের নিজস্ব শ্রেণী আন্দোলনে উত্তরোত্তর যোগ দেওয়ার জন্য অগ্রসর হতে শুরু করেছিল। এর কারণ হল এই যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা বুঝতে পেরেছিল যে কৃষকেরা জনসংখ্যার একটা বড় গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত, এই কৃষকদের সমর্থন ছাড়া তারা স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে না। তাই তারা তাদের প্রতি বেশি মনোযোগ দিতে শুরু করে। কংগ্রেসের লোকেরা, সমাজতন্ত্রীরা, কমিউনিস্টরা এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর লোকেরা কৃষকদের কাছে আবেদন করে এবং তাদের মধ্যে কাজ সংগঠিত করেছিল।

* এই ছড়ানো বিরাট ভূখণ্ড, অসমধর্মী সামাজিক গঠন, গোঁড়ামি ইত্যাদি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক কাঠামোগত দুর্বলতার জন্য সামাজিক সংগ্রামের ইতিহাসে কৃষকেরা কোনো স্বাধীন রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে না। আধুনিক যুগে এরা বুর্জোয়া অথবা শ্রমিকশ্রেণীকে অনুসরণ করেছে। ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবে ভূমিদাসেরা যারা জমিতে শ্রম দিত তারা সামন্ততন্ত্র অভিজাতদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উঠতি বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। এই বুর্জোয়ারা তাদের স্বাধীনতা ও জমি দেবার দায়িত্ব নিয়েছিল। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের সময় কৃষকেরা রুশ শ্রমিকশ্রেণীর দল বলশেভিক পার্টিকে সমর্থন করেছিল। একমাত্র এই দলই তাদের জমি দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সমাজবিপ্লবী যারা অসমধর্মী কৃষক জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করত তারা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের বামপন্থী অংশ বলশেভিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল।

কৃষি জনসাধারণের মধ্যে পৃথকীকরণের প্রক্রিয়া উত্তরোত্তর বেড়ে যাওয়াতে খেতমজুরের শ্রেণী দ্রুতহারে বেড়ে যাচ্ছিল। যদিও এই শ্রেণী কোনোরকম সম্পত্তির অধিকারী ছিল না এবং দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করত, সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতার জন্য এই শ্রেণীর মধ্যে এখনো বিশেষ সচেতনতা গড়ে ওঠেনি। সে যাহোক কিসান আন্দোলন ও অন্যান্য সাধারণ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এদেরকে আন্দোলনের পথে দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করছিল।

আধুনিক ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের উদ্ভব

আমরা এর পর ভারতীয় জনসাধারণের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করব।

ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠার বহু দশক আগে ও শিল্পে বুর্জোয়া-শ্রেণীর উদ্ভবের আগেই আধুনিক বুদ্ধিজীবীশ্রেণী গড়ে ওঠে।৩১ রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁর সহযোগীরা ছিলেন প্রথম বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী যারা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির চর্চা করেছিলেন এবং তার যুক্তিবাদী ও গণতান্ত্রিক মতবাদ, ধারণা ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে শিক্ষিত ভারতীয়ের সংখ্যা কম ছিল। ব্রিটিশ সরকার আরো বেশি বেশি করে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করার পর এবং মিশনারীদের বেসরকারী উদ্যোগে এবং বুদ্ধিবিভাসিত ভারতীয়ের জোরদার প্রয়াসেই ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে একটা বিশাল ভারতীয় শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। এর থেকেই তৈরি হয়েছিল একটা বড় বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী।

আধুনিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে বুদ্ধিজীবীদের নিশ্চিত ভূমিকা আছে। তারা অনেকাংশে ভারতীয় জনসাধারণকে আধুনিক জাতিতে সংহত করেছিল এবং দেশে বিভিন্ন প্রগতিশীল সমাজ সংস্কার ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলন সংগঠিত করেছিল। সব রাজনৈতিক জাতীয় আন্দোলনের তারা ছিলেন পথপ্রদর্শক, সংগঠক ও নেতা। শিক্ষামূলক ও প্রচারমূলক কার্যাদির মাধ্যমে এই শিক্ষিত ভারতীয়রা জনসাধারণের ব্যাপকতর অংশের মধ্যে স্বাদেশিকতা ও স্বাধীনতার ধারণা এনে দিয়েছিলেন। এই কাজের মধ্যে দারুণ আত্মত্যাগ ও নির্যাতন নিহিত ছিল। তারা সমৃদ্ধিশালী প্রাদেশিক সংস্কৃতি ও সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন, তার মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের ধারণার বীজ বুনতে চেয়েছিলেন। এই বুদ্ধিজীবীরাই বড় বড় বৈজ্ঞানিক, কবি, ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদের জন্ম দিয়েছিল। প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা আধুনিক পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি আত্তীকরণ করেছিলেন এবং জায়মান ভারতীয় জাতির জটিল সমস্যাগুলো বুঝতে পেরেছিলেন। বস্তুতপক্ষে তারাই হলেন আধুনিক ভারতবর্ষের স্রষ্টা।

১৮৫১ থেকে ১৮৫৪ সালের মধ্যে পেশাদার শ্রেণীগুলো দেশে তিনটে সংগঠন গড়ে তুলেছিল। সেগুলো হল, Madras Native Association, The Bombay Association এবং The Indian Association, (দশম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এই সংগঠনগুলো সরকারকে সৈন্যবাহিনী ও সরকারি

কৃত্যকের ভারতীয়করণ করার জন্য চাপ দিত। তাদের যুক্তি ছিল একটা দেশের রাষ্ট্রযন্ত্র তার নিজ দেশের লোক দিয়েই চালানো উচিত, বিদেশীর দ্বারা নয়। তাদের এই দাবি তাদের গোষ্ঠীগত স্বার্থের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল।

১৮৫৭ সালে দেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে শিক্ষিত ভারতীয়ের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে গিয়েছিল। শিক্ষিত ভারতীয়রাই প্রথম জাতীয় সচেতনতা অর্জন করেছিল। ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের বিখ্যাত সভ্যরা বাণিজ্যিক ও জায়মান শিল্প বুর্জোয়াদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জনসাধারণের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কংগ্রেস যে ভাষা গ্রহণ করেছিল তা হল ইংরেজী। তাই বুদ্ধিজীবীরাই হয়ে উঠলেন এর প্রথম নেতা (দশম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ভারতবর্ষে এর পর প্রধানত কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাস, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে একটা ব্যাপক মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভিত্তি এবং ১৯১৮ সালের পর আরো ব্যাপকতর গণভিত্তির কথা রাজনীতির পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে। যে বিষয়টা অবশ্য লক্ষ্য করার মতো তা হল এই যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তার অগ্রগতির পর্যায়ে বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল তা সে বুদ্ধিজীবীদের যে গোষ্ঠীই পরিচালনা করুক না কেন এবং এক গোষ্ঠীর মতবাদ, পদ্ধতি এবং কর্মসূচী অন্য গোষ্ঠীগুলোর থেকে যতই পৃথক হোক না কেন। উদারপন্থী আমলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গোপালকৃষ্ণ গোখলে, দাদাভাই নওরোজী, সুরেন ব্যানার্জী, এম. জি. রানাডে, ফিরোজশাহ মেহতা এবং অন্যান্য এমন বিখ্যাত উদারপন্থীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষার এরা ছিলেন ফল। এর পরবর্তী সংগ্রামী পর্যায়ে এই আন্দোলন বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ এবং লালা লাজপত রায়ের মতো মহান আত্মত্যাগী নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। এরা সবাই আধুনিক ইংরেজী জানা বুদ্ধিজীবী ছিলেন। এমনকি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন যা দেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ ধারা হিসাবে উদ্ভূত হয়েছিল তাও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকশ্রেণী দ্বারাই শুরু হয়েছিল ও পরিচালিত হয়েছিল। এরা আয়ার্ল্যাণ্ডের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ও রাশিয়ার নিহিলিস্ট আন্দোলন বিষয়ে পড়াশোনা করেছিল। ১৯১৮ সালের পর যখন কতকগুলো ঐতিহাসিক কারণে (দশম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মোটামুটি গণভিত্তি পায় তখন গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহেরু, বিঠলভাই প্যাটেল, সি. রাজাগোপালাচারী, রাজেন্দ্র প্রসাদ, জওহরলাল নেহেরু, সুভাষ বসুর মতো বুদ্ধিজীবীরা এবং সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীরাই এর নেতৃত্ব দিয়েছিল।

হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন সমাজসংস্কার ও ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনগুলো সেই সেই সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা সংগঠিত হত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বুদ্ধিজীবীদের একজন সভ্য বি. আর. আম্বেদকর নিচু জাতির মধ্যে সমাজসংস্কার ও রাজনৈতিক শিক্ষার আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে ব্রিটিশ শাসনের সময় প্রায় সব প্রগতিশীল, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনই ছিল বুদ্ধিজীবীদের কাজ। এই বুদ্ধিজীবীরা নতুন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি আত্মস্থ করেছিল।

বুদ্ধিজীবীরাই আধুনিক বিশ্বের সব দেশের সব প্রগতিশীল আন্দোলনের সংগঠক ও নেতা। চীন, ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশে যেখানে জনসাধারণের অধিকাংশ অশিক্ষিত ও অজ্ঞ সেই সব দেশে যেহেতু অশিক্ষিত ও অজ্ঞ জনসাধারণ আত্মসংগঠন ও আত্মোন্নতির ন্যূনতম উদ্যোগ নিতে পারে না, তাই বুদ্ধিজীবীরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। অন্যান্য দেশের ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস চর্চা করে শিক্ষিত ভারতীয়রাই ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং তাদের নিজেদের শ্রেণী সংগঠন ও আন্দোলন গড়তে সাহায্য করেছিল। যদি ভারতীয় জনসাধারণ শিক্ষিত হত তবে তারাই পড়াশোনা করে অন্যান্য দেশের ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য আন্দোলন বিষয়ে জানতে পারত এবং নিজেদের উদ্যোগেই এইরকম সংগঠন গড়তে পারত। অনুরূপভাবে শিক্ষিত ভারতীয়রা যারা গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার আধুনিক ভাবধারা সম্পর্কে জেনেছে এবং অন্যান্য দেশের জনসাধারণের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক কীর্তি জেনেছে—তারা অশিক্ষিত ভারতীয়ের মধ্যে এই জ্ঞান ছড়িয়ে দিয়েছিল।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার যে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল আধুনিক ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী সেই শিক্ষাব্যবস্থা থেকেই উদ্ভূত। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে ছিল আইনজীবী, চিকিৎসক, কারিগর, অধ্যাপক, সাংবাদিক, সরকারী কর্মচারী, কেরানী, ছাত্র এবং অন্যান্যরা। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ও তার পর দেশে উত্তরোত্তর আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী সংখ্যায় দ্রুতভাবে বেড়ে গিয়েছিল।

১৮৬১ সালের Council Act ছিল 'শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণীকে প্রদত্ত সুবিধা…'। '১৮৯২ সালের Council Act পেশাদার শ্রেণীর বৃদ্ধির এবং এই শ্রেণীগুলোকে দেওয়া সুবিধের আর একটা সূচক।'৩২

ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি সমানুপাতিক হারে অর্থনৈতিক উন্নতি হচ্ছিল না। যে শিল্পোন্নয়ন সমাজের সার্বজনীন অর্থনৈতিক উন্নতি সুনিশ্চিত করে এবং তার ফলস্বরূপ সাধারণ সমৃদ্ধি ও সম্পদ বাড়ায় এবং আয়ের অন্যান্য পথ ও অতিরিক্ত কাজ সৃষ্টি করে তা কতকগুলো কারণে ভারতবর্ষে অত্যন্ত মন্থর ছিল। এই কারণগুলোর মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের অর্থনৈতিক নীতি অন্যতম উল্লেখযোগ্য। এই বৈষম্যের দরুন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে বেকারত্ব ইতিমধ্যেই ভয়ানক আকার নিয়েছিল। শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে বেকারত্বের দরুন আর্থিক দুর্দশা থেকে রাজনৈতিক অসন্তোষ জন্ম নিয়েছিল। সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক ধারার বিকাশের এটি অন্যতম কারণ। বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল এবং অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ এই আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন। এর ফলে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনেরও সৃষ্টি হয়েছিল।

পরবর্তী দশকগুলোতে দেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর সংখ্যা যত বেড়ে যেতে লাগল এবং তাদের গোষ্ঠীগত স্বার্থ সম্বন্ধে যত তারা সজাগ হতে আরম্ভ করল ততই এদের বিভিন্ন গোষ্ঠী তাদের নিজ নিজ সংগঠন গড়ে তুলতে শুরু করল এবং তাদের দাবিপত্র পেশ করতে লাগল। তাই ইয়ুথ লীগ, ভলান্টিয়ার

অরগানাইজেশন ইত্যাদি প্রচলিত সংগঠন বাদেও এই গোষ্ঠীগুলোর আরো অনেক সংগঠন গড়ে উঠতে লাগল। ১৯৩০ সালের পর এই প্রক্রিয়া আরো বিশেষভাবে দ্রুত হতে শুরু করল। শিক্ষক, আইনজীবী, ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যান্য এই ধরনের গোষ্ঠীগুলি তাদের অভিযোগের প্রতিকারকল্পে সংগ্রাম সংগঠিত করার জন্য কতকগুলি ইউনিয়ন ও কিসান সভা যা শ্রমিক ও কৃষকদের শ্রেণীগত ও তাৎক্ষণিক স্বার্থ রক্ষা করত, এই সংগঠনগুলো তারই অনুরূপ ছিল। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বিশেষ করে ১৯৩৪ সালের পর ছাত্র সংগঠন ও ইউনিয়নের দ্রুত বিস্তার সর্ব ভারত ছাত্র সংগঠন গঠনের মধ্যে চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছিল। এই ঘটনাও বিশেষ করে লক্ষণীয়।

আধুনিক ভারতীয় বুর্জোয়া : স্বার্থ, সংগঠন ও আন্দোলন

এরপর আমরা ভারতীয় সমাজে আর একটা যে নতুন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল তার কথা আলোচনা করব। অন্তর্দেশীয় ও বহির্বাণিজ্যের ব্যাপক বিস্তারের দরুন এবং ব্রিটিশ শাসনের সময়ে ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্প ও ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা ও কালক্রমে তার পরবর্তী বিস্তারের ফলে একটা নতুন শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। এটি হল আধুনিক বাণিজ্যিক, শিল্প ও আর্থিক বুর্জোয়া শ্রেণী। অন্যান্য দেশের মতো ভারতবর্ষেও এই শ্রেণীই সম্ভবত আর্থনীতিক ও সামাজিকভাবে সব থেকে বেশি শক্তিশালী ছিল।

ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর উৎপত্তি ও অগ্রগতি ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও ব্যাঙ্কিং-এর বিস্তারের সঙ্গে জড়িত ছিল। শেষেরটির বিস্তারের ইতিহাস আধুনিক শিল্পের উৎপত্তির পরিচ্ছেদে বিবৃত করা হয়েছে। আমরা এই শ্রেণীর প্রধান স্বার্থ, বৈশিষ্ট্য, সমস্যা, সংগঠন ও সংগ্রামের বিষয় উল্লেখ করব।

এটা মনে রাখতে হবে যে ইউরোপীয়রাও ভারতবর্ষে বাণিজ্য, শিল্প ও ব্যাঙ্কিং-এ নিযুক্ত ছিল। তাদের আর্থনীতিক উদ্যোগের প্রকৃতি অনুসারে তাদের স্বার্থ বজায় রেখে পৃথকভাবে অথবা ভারতীয়দের সঙ্গে মিলিত হয়ে তারা নিজেদের সংগঠন গড়ে তুলেছিল।

প্রথম ইউরোপীয় চেম্বার অফ কমার্স ১৮৩৪ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৩৬ সালে।

প্রথম ভারতীয় চেম্বার অফ কমার্স, বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স ১৮৮৭ সালে শুরু হয়েছিল। ১৯০৭ সালে বোম্বাইতে ইণ্ডিয়ান মার্চেন্টস্ চেম্বার অফ কমার্স প্রতিষ্ঠিত হয়। মাড়ওয়ারী চেম্বার অফ কমার্স কলকাতাতে শুরু হয় ১৯০০ সালে এবং South Indian Chamber of Commerce মাদ্রাজে ১৯০৯ সালে শুরু হয়। ভারতীয় চেম্বার অফ কমার্স ১৯২৫ সালে সৃষ্টি হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল "ভারতীয়রা জড়িত অথবা নিযুক্ত এমন ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পসমূহের উন্নতি ও সুরক্ষা করা।"৩৩

ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রাদেশিক সংগঠনগুলোও পরবর্তীকালে গড়ে উঠেছিল। ১৯২৭ সালে মহারাষ্ট্র চেম্বার অফ কমার্স প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ভারতীয় ও ইউরোপীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত এইসব গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র সংগঠন গড়ে তোলার প্রধান কারণ। সে যাই হোক এটা লক্ষ্য রাখতে হবে 'ব্যবসায়ী হিসাবে তাদের স্বার্থ আলাদা বটে, কিন্তু যখন উভয়েই নিয়োগকর্তা তখন তাদের স্বার্থ অভিন্ন। বম্বে মিল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনে এরকমটা দেখা গিয়েছিল।'৩৪

ভারতীয় বণিকদের প্রধান অভিযোগ ছিল যাকে তারা বলত ব্রিটিশ সরকারের পক্ষপাতমূলক আচরণ তার বিরুদ্ধে। ব্যবসার ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের প্রতি সরকার পক্ষপাতিত্ব দেখাত কিন্তু অ-ব্রিটিশ দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসায়ে ভারতীয় ব্যবসার ওপর অন্যান্য বাধানিষেধ আরোপ করত।

ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ব্যবসায়ী স্বার্থের সুবিধা-জনক পরিস্থিতির নিন্দা করেছে এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রামও করেছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, তারা দেশের উপকূলবর্তী জাহাজ চলাচল ব্যবসায়ে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের সুবিধাজনক অবস্থানের নিন্দা করেছে। এর জন্য মিঃ হাজীকে আইনসভাতে ভারতবর্ষের উপকূলবর্তী পরিবহন সংরক্ষণের প্রস্তাব উত্থাপন করতে হয়। তার যুক্তি ছিল এই যে উপকূলবর্তী বাণিজ্য বিদেশী একচেটিয়ার নিয়ন্ত্রণে ছিল যা ভারতীয় জাহাজ চলাচল ব্যবসায়ের অগ্রগতিতে বাধা দিচ্ছিল।

জাতীয়তাবাদী বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষে ব্রিটিশেরা যা ভোগ করছে এবং নতুন সংবিধানে তারা যা চায় তা সমানাধিকার নয় বরং জাতি হিসাবে বিশেষাধিকার, সরকারের কাছ থেকে পাওয়া আপেক্ষিক সুযোগ-সুবিধা, যে সরকারের সঙ্গে তাদের রয়েছে জ্ঞাতি সম্পর্ক, এবং বিদ্যমান অসাম্যের প্রবহমানতা ; এই বিশেষাধিকারসমূহ, সুযোগ-সুবিধাগুলি এবং অন্যান্য পরিস্থিতি পরিত্যাগ না করা হলে, ভারতীয়দের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার কোনো সুযোগই হবে না।'৩৫

কালক্রমে আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠার সঙ্গে শিল্পপতি শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় অবশ্য এই শিল্পপতিদের মতো ব্রিটিশ সরকারের প্রতি সংগ্রামী বিরোধিতা করেনি। এর কারণ ছিল এই যে ব্রিটিশ শিল্প ও উদীয়মান ভারতীয় শিল্পের মধ্যে বাজার নিয়ে অপরিহার্য বিরোধিতার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শিল্পের স্বার্থরক্ষার জন্য ব্রিটিশ সরকার সর্বদাই সচেষ্ট ছিল।

'বাজারই হল প্রথম স্কুল যেখানে বুর্জোয়ারা তাদের জাতীয়তাবাদের শিক্ষা লাভ করে।'৩৬ শুরু থেকেই ভারতীয় বুর্জোয়ারা জায়মান ভারতীয় শিল্প-গুলোর সংরক্ষণের দাবিতে সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ গড়ে তুলেছিল।

১৮৮০ সাল থেকে ভারতবর্ষে দৃঢ়ভাবে আধুনিক শিল্প বিকাশ হয়েছিল এবং শিল্প বুর্জোয়ারাও শক্তিতে বেড়ে উঠেছিল। জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীরা ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু করে দিয়েছিলেন এবং ১৮৮৫ সালে প্রধান জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

১৯০৫ সাল নাগাদ উঠতি শিল্পপতি শ্রেণী যথেষ্টই সবল ও সচেতন হয়ে উঠেছিল। তখন থেকে এরা পেশাদার শ্রেণীগুলিকে সমর্থন করতে আরম্ভ করে। এই পেশাদার শ্রেণীগুলি চাকরিতে ও পেশাতে ব্রিটিশদের একচেটিয়া রোধ করার জন্য ইতিমধ্যেই সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছিল।

পেশাদার শ্রেণীগুলির লক্ষ্য ছিল একদল ব্রিটিশকে সরিয়ে দেওয়া যারা তখনো ভারতবর্ষে চিকিৎসা, আইন ও সাংবাদিকতার কাজে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে আসছিল। অনুরূপভাবে শিল্পপতি শ্রেণীগুলির লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষে শিল্পে ব্রিটিশদের একচেটিয়া দখল দূর করা। ভারতবর্ষের বৃহত্তম শিল্প তুলা শিল্পের বিকাশ ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ছিল। ভারতবর্ষে পুঁজিবাদী অগ্রগতির প্রকৃতিটা ছিল ঔপনিবেশিক। দেশের সামাজিক অর্থনীতি ও সেই সঙ্গে ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর অনড় অবাধ বাণিজ্য নীতি উঠতি শিল্পপতিদের স্বার্থ বিঘ্নিত করত। তাদেরকে বাণিজ্যিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হত, অবাধ বাণিজ্যের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করতে হত।

তাদের মূলকথা ছিল স্বাদেশিকতা, সংরক্ষণ। স্বাভাবিক কারণেই উঠতি শিল্পপতিরা পেশাদারী শ্রেণীগুলির সঙ্গে মৈত্রী করত।৩৭

ব্রিটিশ সরকারের অর্থনৈতিক নীতির যারা সমালোচক তারা বলেছেন যে ব্রিটিশ শিল্পের স্বার্থের চাপে নত হয়ে এই নীতি ভারতীয় শিল্পের অবাধ অগ্রগতিতে বাধা দিয়েছে।৩৮

এর ফলে ভারতবর্ষ প্রধানত একটা কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত হয়েছিল যা ব্রিটিশ শিল্পের জন্য কাঁচামাল উৎপাদন করত। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্রিটিশ শিল্পের প্রয়োজন মেটাবার জন্য খাপ খাইয়ে নেওয়া হত। এর ফলে ভারতীয় অর্থনীতি ব্রিটিশ অর্থনীতির ঔপনিবেশিক লেজুড়ে পরিণত হয়েছিল। Joan Beauchamp এইরকম বলেছেন: 'তার (ভারতবর্ষের) শিল্পোন্নতি নিম্নলিখিত শর্তগুলির অধীন:

(ক) এই অর্থনীতি অবশ্যই ব্রিটিশ পুঁজির নিয়ন্ত্রণাধীন হবে, ভারতীয় পুঁজিকে সন্তুষ্ট রাখা হবে ছোট অংশীদারী কাজ দিয়ে (খ) ভারতীয় শিল্পকে ব্রিটিশ শিল্পের সঙ্গে সমান শর্তে প্রতিযোগিতা করতে অথবা ব্রিটিশ শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি করতে কখনই দেওয়া চলবে না। (গ) ব্রিটিশ উৎপাদকদের জন্য ভারতীয় বাজারে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করা চলবে না এবং (ঘ) উৎপাদনের উপকরণ প্রস্তুত করে যেসব শিল্প সেগুলোকে গড়তে দেওয়া চলবে না।'৩৯

শিল্প বুর্জোয়ারা শিল্পের সংরক্ষণ, অনুকূল বিনিময় হার, উঠতি শিল্পের জন্য অনুদান ইত্যাদি নিজস্ব দাবি নিয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কক্ষপথে প্রবেশ করেছিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে শিল্প বুর্জোয়ারা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কক্ষপথে প্রবেশ করতে শুরু করে। এই সময়কালে এই শ্রেণী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করেছিল এবং উৎসাহভরে কংগ্রেসের স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ ও বিলাতি দ্রব্য বর্জনের কর্মসূচীকে সমর্থন করেছিল কেননা এতে তাদের স্বার্থও রক্ষা পেত।

কিছু সময়ের জন্য এই স্বদেশী আন্দোলন সফল হয়েছিল এবং ভারতীয় শিল্প বিশেষ করে তুলা শিল্পের অগ্রগতিতে প্রেরণা যুগিয়েছিল।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এতদিন পর্যন্ত বুদ্ধিজীবী, বাণিজ্যিক বুর্জোয়াদের একাংশ ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর একাংশের মধ্যেই কেবল সীমিত ছিল। মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিরাট গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন

শিল্পপতিদের যোগদানের ফলে ১৯০৫ সালের পর এই আন্দোলন ব্যাপকতর সামাজিক ভিত্তি পেল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৮) দেশে শিল্পোন্নয়ন দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এর কারণ হল এই যে ব্রিটিশ ও অন্যান্য বিদেশী শিল্পগুলো প্রধানত যুদ্ধের প্রয়োজনে নিয়োজিত হচ্ছিল এবং ভারতীয় বাজারের জন্য জিনিস সরবরাহ করতে পারছিল না। এই ঘটনা ভারতীয় শিল্পে উৎসাহ সঞ্চার করেছিল এবং তার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছিল। তাছাড়া ব্রিটিশ সরকারও কতকগুলো কৌশলগত কারণে ইস্পাত ও ঐরকম অন্যান্য শিল্পগুলির প্রতিষ্ঠা সমর্থন করেছিল।

এ ব্যাপারটাও শিল্পপতিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তি বাড়িয়েছিল।

যুদ্ধের পরেই অবশ্য এই শিল্পপতি শ্রেণীর বিশেষ গুরুত্ব ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভেতরে ও তার মুখ্য সংগঠন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ওপর প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বিশেষ করে ১৯১৯-২০ সালের পর এই শ্রেণী কংগ্রেস সংগঠনে তাদের আধিপত্য ক্রমেই বিস্তার করছিল, কংগ্রেসের কর্মসূচী তৈরি করছিল এবং কংগ্রেসের শুরু করা সংগ্রামের রূপ ও পদ্ধতি নির্ধারণ করছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে এই শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল।

১৯১৯-২০ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গান্ধীর ভাবধারা ও তার রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রভাবে আসে। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও তৎভিত্তিক শিল্প সম্বন্ধে গান্ধী তাঁর আপসহীন বিরোধিতার কথা ব্যক্ত করে দিয়েছিলেন। যাহোক ভারতীয় শিল্পপতিদের ভয় দূরীভূত হল যখন ১৯২০ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে গান্ধী স্বদেশী প্রস্তাব সমর্থন করলেন। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, 'জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন তুলা দ্রব্যের বিষয়ে স্বদেশী অবলম্বন করতে পরামর্শ দিচ্ছে···।' (রাজনীতি সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

শিল্পপতিরা অর্থনীতির নিয়ম সম্পর্কে ঐতিহাসিক বোধ ও জ্ঞান নিয়ে গান্ধীর খদ্দর নিয়ে সমান্তরাল প্রচারকে তাদের শিল্প কর্মসূচীর পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করত না। বস্তুতপক্ষে ভারতবর্ষে যখন আধুনিক যন্ত্রচালিত শিল্প তারা বাড়িয়ে যাচ্ছিল এবং তার থেকে লাভও পাচ্ছিল, তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ হাতে কাটা খদ্দর পরিধান করত এমনকি খদ্দর আন্দোলনকে অনুদান দিয়ে সাহায্য করত, এমনটি অসঙ্গতিপূর্ণ হলেও। কংগ্রেস ও তার শুরু করা আন্দোলনের মধ্যে তারা ব্রিটিশ সরকারকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা দিতে বাধ্য করার হাতিয়ার খুঁজে পেয়েছিল আর এই সুবিধা তাদের শ্রেণীর ভালই করত।

শ্রেণী সমন্বয় এবং সম্পত্তির ওপর পুঁজিপতির ন্যায্য অধিকার এবং 'পুঁজিবাদীরা হল পিতা, শ্রমিকেরা সন্তান' এই ধরনের তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে গান্ধীর সামাজিক দর্শন শিল্পপতিদের নাড়া দিয়েছিল।

এই দর্শনের মধ্যে তারা দেখেছিল শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের প্রতিরোধ।

শ্রেণী সংগ্রামের বিরুদ্ধে গান্ধীর অটল বিরোধিতা তাকে শিল্পপতিদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। যদিও শিল্পপতিরা নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে ভাল চোখে দেখত না, যা ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মতই শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তিতে গঠিত ছিল তবু মজুর মহাজনকে অনুমোদন করত এমনকি সমর্থনও করত। এই মজুর মহাজন হল গান্ধীর উদ্যোগে আমেদাবাদ সূতাকল কর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন যা শ্রেণী-সহযোগিতার নীতিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

বিড়লা, বাজাজ, আম্বালাল সারাভাই, কস্তুরভাই লালভাই ও অন্যান্য ধনী শিল্পপতিরা গান্ধীর নিরঙ্কুশ নেতৃত্বে কংগ্রেসকে সমর্থন করত এবং এর কর্ম-সূচীগুলোতে অর্থসাহায্যও করত। এমনকি প্রাক্-পুঁজিবাদী হস্তশিল্পের পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনাকেও তারা ভর্তুকি দিত। প্রকৃতপক্ষে All-India Spinners' Asscciation এবং এর মত সংগঠনগুলিকে এই শিল্পপতিদের অর্থসাহায্যই ভারতবর্ষে দৃঢ়ভাবে ক্ষয়িষ্ণু পুরানো উৎপাদন পদ্ধতির ধ্বংসা-বশেষকে কৃত্রিমভাবে পুষ্ট করেছিল ও জীবন্ত রেখেছিল।

যে গান্ধীবাদী দর্শন দারিদ্র্যকে মহান আদর্শ মনে করেছে এবং বিরোধীকে ভালবাসার জন্য প্রচার করেছে তাকেও এই শিল্পপতিরা অর্থসাহায্য করেছে সম্ভবত এই ভেবে যে কম মজুরি ও কাজের খারাপ শর্তের জন্য শ্রমিকদের অসন্তোষের এটাই সম্ভবত শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক। দারিদ্র্যকে আদর্শ করলে জীবন-যাত্রার মান উঁচু করার দাবি স্ব-নিন্দিত হয়ে পড়ে।

এটা আপাতবিরোধী হলেও বিত্তবান শিল্পপতিরা কিন্তু নিজের জীবনে গান্ধীর জীবনাচরণের তত্ত্ব অভ্যাস করত না। গান্ধীবাদের প্রতি তাদের সমর্থন সত্ত্বেও তারা বিষয়াসক্তি ও লাভের আকাঙ্ক্ষা বর্জন করতে পারে নি।

গান্ধীর নেতৃত্বে এবং গান্ধীবাদী নীতির ভিত্তিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গণ আন্দোলনের কিন্তু একটা চাপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা ছিল শিল্প-পতিরা যার মর্ম অনুভব করতে পেরেছিল। ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে শিল্পসংরক্ষণ, অনুকূল অনুপাত (গান্ধীর একাদশ দফায় অন্তর্ভুক্ত দাবি) এবং অন্যান্য দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে এই আন্দোলনগুলো স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসাবে কাজ করত। (দশম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

ভারতবর্ষে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের অন্যতম অন্তরায় হল কৃষি সম্পর্কের প্রকৃতি। কৃষির পুনর্গঠন ও কৃষি জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য সুদূরপ্রসারী কৃষি সংস্কার ছিল পূর্বশর্ত যার মধ্য দিয়ে কৃষি জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেতে পারত। সমৃদ্ধ কৃষি জনসাধারণ শিল্পপণ্যের ক্রেতা হলেই একমাত্র ভারতীয় শিল্পের দ্রুত বিস্তার সম্ভব ছিল।

ভারতীয় শিল্পপতিরা কিন্তু কখনো আমূল কৃষিসংস্কারের পক্ষে দাঁড়ায় নি। এর কারণ হল এই যে ভারতবর্ষে জমিদার ও শিল্পপতি এই দুই শ্রেণী প্রায়ই পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। জমিদারেরা শিল্পে ও ব্যাঙ্কে বিনিয়োগ করত এবং ব্যাঙ্কার এবং শিল্পপতিদেরও জমিতে স্বার্থ ছিল।

১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস সরকার পুঁজিবাদীদের পক্ষে ঝুঁকে পড়ার জন্য বামপন্থী জাতীয়তাবাদী ও অন্যান্যদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছে। (দশম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সমালোচকরা মন্তব্য করেছেন যে শিল্পপতিদের

কোনো কোনো অংশ কংগ্রেসকে সমর্থন করত কেননা কংগ্রেস তাদের স্বার্থের দিকে নজর রাখত। বোম্বাইতে সুতাকল কর্মীদের ধর্মঘটের সময় কংগ্রেস কর্তৃক পুলিশবাহিনী ব্যবহার, Trade Disputes Act প্রণয়ন, আমেদাবাদ ও শোলাপুরে শ্রমিকদের মিটিং করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি এবং কংগ্রেস সরকার কর্তৃক বিভিন্ন প্রদেশে শ্রমিক নেতাদের বন্দী করা ও স্থানান্তরিত করা ইত্যাদি সব ঘটনা সমালোচকরা তুলে ধরেছিল প্রমাণ করার জন্য যে কংগ্রেস সরকার পুঁজিবাদী স্বার্থকে দাক্ষিণ্য করত।৪০

অন্যান্য শ্রেণীর মত শিল্প বুর্জোয়ারাও তাদের স্বার্থরক্ষা ও দাবি পেশ করার জন্য কতকগুলো সংগঠন গড়ে তুলেছিল।

১৮৭৫ সালে Bombay Millowners' Association প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮১ সালে Indian Tea Association, ১৮৮৪ সালে Indian Jute Mills' Association, ১৮৯১ সালে The Ahmedabad Millowners' Association, ১৯২৭ সালে The Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, ১৯২০ সালে The Employers' Federation of Southern India, ১৯৩৩ সালে All India Organisation of Industrial Employers এবং The Employers' Federation of India প্রতিষ্ঠিত হয়। যেসব সংগঠন তখন গড়ে উঠেছিল সেগুলোর মধ্যে এগুলোই ছিল প্রধান।

ভারতীয় অর্থনীতি ইতিমধ্যে অগ্রগতির একচেটিয়া পর্যায়ে এসে পেঁছেছে। শিল্পের বিশেষ শাখাতে এমনকি একটা গোটা শিল্প অথবা কতকগুলো শিল্পের ওপর তাদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য পুঁজিবাদীদের সংখ্যা দৃঢ়ভাবে কমে যাওয়ার বাড়তি প্রবণতাটা শিল্পের ওপর পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে। এর ফলে শুধুমাত্র যে ভারতীয় জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনের ওপর শিল্পপতি ও আর্থিক পুঁজিপতিদের একটা ছোট গোষ্ঠীর উত্তরোত্তর আধিপত্য দেখা যাচ্ছিল তাই নয়, তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধির জগতেও এই শিল্পপতিদের নিয়ন্ত্রণ দেখা যাচ্ছিল। সংবাদপত্রের দৃষ্টান্ত থেকে এটা দেখা যেতে পারে। বিড়লা একটা কাগজের গোষ্ঠী সম্পূর্ণ কিনে ফেলেছিল যা তাকে তার ইচ্ছা মত পাঠকদের মতবাদ রূপায়িত করা ও দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করার ক্ষমতা দিয়ে ছিল। এর আগে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, আগরকর, তিলকের মত ব্যক্তিরা সংবাদপত্র চালাতে পারতেন এবং তাদের স্বাধীন মত ব্যক্ত করতে পারতেন। বৃহৎ ব্যবসায়ী আরও বেশি বেশি সংবাদপত্রে তার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এল। এইভাবে গোটা সমাজের চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল। অন্যান্য শিল্পেও এই এক প্রবণতা দেখা যেতে লাগল। অর্থনীতিতে একচেটিয়া অধিকার জনসাধারণের চিন্তাজগৎ এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনেও একচেটিয়া অধিকার কায়েম করার দিকে ঝুঁকছিল।

আধুনিক ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব

আমরা এখন ভারতবর্ষে যে আরেকটা নতুন সামাজিক শ্রেণী উদ্ভব হয়েছিল তার কথা আলোচনা করব। এটা হল আধুনিক শ্রমিকশ্রেণী।

ভারতবর্ষে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণী ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত আধুনিক শিল্প, যানবাহন ও বাগিচা শিল্প থেকে উদ্ভূত। ভারতবর্ষে বাগিচা, আধুনিক কারখানা, খনি শিল্প এবং যানবাহন যে অনুপাতে বৃদ্ধি পাচ্ছিল সেই অনুপাতে এই শ্রেণীও বেড়ে যাচ্ছিল।

মূলতঃ দরিদ্র কৃষক ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হস্তশিল্পী যারা মজুর হয়েছিল তাদের মধ্যে থেকেই ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী প্রধানত গঠিত হয়েছিল।৪১

সরকারী ও বেসরকারী উভয় ধরনের লেখকরাই ভারতীয় শ্রমিকদের জীবনযাপন ও কাজের শর্তের নীচু মানের কথা স্বীকার করেছেন।

'সমস্ত অনুসন্ধানেই দেখা যায় যে ভারতবর্ষের অধিকাংশ শ্রমিকরা দিন প্রতি এক শিলিং-এর বেশি পায় না।'৪২

'যেসব জায়গায় আমরা ছিলাম সেখানেই আমরা শ্রমিকদের বাসস্থান পরিদর্শন করতে গিয়েছিলাম। ঐরকম খারাপ জায়গাও যে থাকতে পারে আমরা না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না…'

'প্রায় সব জায়গাতেই অতি ভীড়ের চাপ ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থা সংশ্লিষ্ট কর্তাদের সুস্পষ্ট কর্তব্যের প্রতি নির্মম ও চরম উদাসীনতা প্রকাশ করে।'৪৩

১৯৩৮ সালে জেনেভাতে অনুষ্ঠিত International Labour Conference-এ ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতিনিধি S. V. Parulekar তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন 'ভারতবর্ষে বিপুল গরিষ্ঠ শ্রমিকই এমন একটা মজুরি পায় যা তার জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর পক্ষেও যথেষ্ট নয়।… ভারতবর্ষের শ্রমিকেরা অসুস্থতা, বেকারীত্ব, বার্ধক্য ও মৃত্যুর বিপদের মধ্যে নিরাপত্তাহীন।'৪৪

কম মজুরির ভিত্তিতে তাদের নিজেদেরকে এবং তাদের পরিবারবর্গকে চালাতে না পারার জন্য শ্রমিকদের একটা বড় অংশ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ত। Whitley Commission জানিয়েছিলেন যে, 'অধিকাংশ শিল্পকেন্দ্রে ঋণগ্রস্ত পরিবার ও ব্যক্তির পরিমাণ দুই-তৃতীয়াংশের কম নয়।'৪৫

মজুরি এবং বাসস্থানের অবস্থা বিচার করলে খনি শ্রমিকদের অবস্থা বিশেষ করে খারাপ ছিল।৪৬

বাগিচা শিল্পগুলো অধিকাংশই ছিল ইউরোপীয় অধিকৃত। তাতে নিযুক্ত শ্রমিকেরা সম্ভবতঃ সব থেকে কম মজুরি পেত। এ সম্পর্কে শিব রাও লিখেছেন, 'আসাম উপত্যকা চা বাগানে…বাগানে বসবাসকারী পুরুষ শ্রমিকদের গড় মাসিক আয় হল প্রায় ৭ টাকা ১৩ আনা, নারী শ্রমিক ও শিশু শ্রমিকদের মাসিক আয় যথাক্রমে ৫ টাকা ১৪ আনা এবং ৪ টাকা ৪ আনা।'৪৭

সরকার শ্রমিকদের রক্ষা করার জন্য কতকগুলো আইন পাশ করেছিল যেমন ১৯৩১ সালে Indian Ports Act, ১৯৩৪ সালের Workmens' Compensation Act, ১৯৩৪ সালের Factories Act, ১৯৩৫ সালের Mines Act এবং ১৯৩৬ সালের Payment of Wages Act ইত্যাদি।

কিছুসংখ্যক লেখক সরকারের শ্রম ও সামাজিক আইনগুলোকে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করতেন না।

'কারখানা, খনি, বাগিচা, ডক, রেলওয়ে বন্দর ইত্যাদি সবাইকে জড়িয়ে যেসব শ্রমিক আইন তা ধরলেও তাতে সত্তর আশি লাখের বেশি এর আওতায়

পড়বে কিনা সন্দেহ। এর বাইরে রয়েছে শিল্পশ্রমিকের অধিকাংশটা, এরা ছোট এবং যাকে বলা হয় অনিয়ন্ত্রিত শিল্প তাতে নিযুক্ত।'৪৮

জীবন ও শ্রমের এই কঠিন পরিস্থিতির জন্য ভারতবর্ষে ১৯১৮ সালের পর থেকে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন খুব দ্রুত বেড়ে যাচ্ছিল।

ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী এবং বুর্জোয়াদের থেকে বেশ কিছুটা পরে জাতীয় ও শ্রেণীসচেতনতা লাভ করে। কারণ এই শ্রেণী সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনগ্রসর এবং প্রায় নিরক্ষর ছিল। শ্রমিকদের প্রথম কয়েকটি প্রজন্ম নিঃস্ব হয়ে যাওয়া কৃষকদের এবং প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হস্তশিল্পীদের মধ্য থেকে এসেছিল। এরা গ্রামীণ অনগ্রসরতার ফলভোগী এবং এমনকি শহরে চলে এসে এবং শ্রমিকে পরিণত হয়েও তা ভোগ করেছে। এমনকি পরেও ভারতীয় শ্রমিকদের বেশ অনেকেরই গ্রামের সঙ্গে প্রবল বন্ধন ছিল।

আধুনিক সর্বহারা শ্রেণীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য

জীবন ও শ্রমের অদ্ভুত পরিস্থিতির কারণে শ্রমিকশ্রেণীর কতকগুলো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা গড়ে ওঠে যা এদেরকে কৃষকশ্রেণী, এমনকি শহুরে মধ্যবিত্তশ্রেণীর থেকেও বিশেষভাবে আলাদা করে দেয়। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতাগুলিই এদের শ্রেণী স্বার্থরক্ষার জন্য নিজেদেরকে সংগঠিত করা, একত্রিত করা এবং যৌথ সংগ্রাম চালানো সহজতর করে দেয়। প্রথমতঃ একজন শ্রমিক সম্পত্তিবিহীন হওয়ার দরুন কৃষকের থেকে অনেক বেশি জঙ্গী। কৃষকের একখণ্ড জমি থাকাতে সে লড়াইয়ে নামতে দ্বিধাগ্রস্ত। দ্বিতীয়তঃ শ্রমিকেরা শিল্পাঞ্চলে কলে কারখানায় কেন্দ্রীভূত। এতে তাদের পক্ষে সংগঠিত হওয়ার কাজ সহজতর হয়। এর বিপরীতে কৃষকেরা বিস্তৃত এলাকা জুড়ে বিক্ষিপ্ত থাকায় এক সমিতিতে সংঘবদ্ধ হওয়া তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। তাছাড়া শ্রমিকেরা আধুনিক শক্তিচালিত যন্ত্রের সাহায্যে কাজ করে। তাই তাদের বিনিয়োজিত শ্রমের সফলতার জন্য বৃষ্টি ইত্যাদি প্রকৃতির খেয়ালের ওপর নির্ভরশীল নয়। এর ফলে শ্রমিকদের মধ্যে আত্মসচেতন, যুক্তিপূর্ণ ও স্পষ্ট ভাবনার প্রবণতা দেখা যায়। অপরদিকে কৃষকদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসহীনতা ও পরাজিত মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে। উপরন্তু আরো জটিল ও ব্যাপক শ্রমবিভাগ-ভিত্তিক শ্রমপদ্ধতিতে শ্রমিক নিযুক্ত থাকে। উৎপাদন পদ্ধতিতে অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে সহযোগিতা করার দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তা ধীরে ধীরে শ্রমিক-দের মধ্যে সম্মিলিত হবার প্রেরণা ও সহযোগিতার ক্ষমতা সৃষ্টি করে। কৃষক ইউনিয়ন ও কৃষক আন্দোলনের থেকে ট্রেড ইউনিয়ন দ্রুততরভাবে গড়ে ওঠার এবং ধর্মঘট ও যৌথ প্রয়াস বেশি হওয়ার এ হল অন্যতম কারণ।

আবার এটাও অবশ্য লক্ষ্য রাখতে হবে যে সমসাময়িক সমাজে শ্রমিকশ্রেণী এক অপরিহার্য স্থান অধিকার করে। শ্রমিকশ্রেণী কারখানা চালায়, রেল ও বাস চালায়, গ্যাস ও বিদ্যুতের মত শক্তি উৎপাদন করে, কয়লা উত্তোলন করে ও ডাক ও তার বিভাগের কাজ করে। আধুনিক সমাজকে রক্ষা করার জন্য এই কাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। এই কারণে আধুনিক

শ্রমিকশ্রেণীর নির্দিষ্ট সামাজিক গুরুত্ব তার সংখ্যাগত শক্তির চেয়ে অনেক বেশি।

অন্যান্য দেশের শ্রমিকশ্রেণীর মত ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীও মজুরির বিনিময়ে কাজ করত এবং তারা আধুনিক উৎপাদনের উপকরণসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উত্তরোত্তর সমাজতান্ত্রিক সমাজের ধারণা ও কর্মসূচীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সংবিধানে এটাই প্রতিফলিত হয়েছে। এই সংবিধানে ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠাকে লক্ষ্য হিসাবে ধরা হয়েছে। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের ইতিহাসে যেমন দেখা গিয়েছে, আধুনিক সমাজে শ্রমিকশ্রেণীর এই বিশেষ অবস্থার দরুনই শ্রমিকশ্রেণী এই অন্তিম লক্ষ্যের প্রতি ধাবিত হয় ও তার জন্যে সংগ্রাম করে। সমসাময়িক ভারতীয় সমাজের অন্যান্য শ্রেণী যখন স্বাধীন ভারতবর্ষ কামনা করত, ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী তখন স্বাধীন সমাজতন্ত্রী ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখত।

শ্রমিকদের জীবন ও শ্রমের পরিস্থিতি তাদের নিজ সংগঠন গড়ে তোলার পক্ষে অনুকূল হলেও ভারতীয় সমাজের আরো অনেক কারণ ছিল যা তাদের সংগঠন গড়ে তোলাতে বাধা দিত। এগুলো হল প্রধানতঃ তাদের সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা, জাত ও সাম্প্রদায়িক ভেদ যা তাদের আলাদা করে দিত, ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রভাব ও জীবনের প্রতি অদৃষ্টবাদী মনোভাব যা সাহসিকতার সংগে কাজ করার ইচ্ছা দুর্বল করে দিত। মোটের ওপর অবশ্য ট্রেড ইউনিয়ন, ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন দৃঢ়ভাবেই বেড়ে যাচ্ছিল।

শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বিস্তার

সংগঠিত আন্দোলন হিসাবে ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলন ১৯১৪-১৮ সালের বিশ্বযুদ্ধের পরই মাত্র আরম্ভ হলেও তার আগেই ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর বলার মত কাজকর্ম কিছু ছিল। এই কাজকর্ম অবশ্য খাপছাড়া ও স্বতঃস্ফূর্ত ছিল এবং সুনির্দিষ্ট শ্রেণীচেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিল না।

১৮৯৭ সালে রেলওয়ে কর্মচারীদের Amalgamated Society প্রতিষ্ঠিত হয়। একমাত্র উচ্চ বেতনভোগীর রেলওয়ে কর্মচারীরা এবং প্রধানত অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরাই এর সভ্য ছিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে কলকাতায় Printers' Union এবং বোম্বাইয়ের Postal Union-এর মত কতকগুলো ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল। এই ইউনিয়নগুলোর সভ্যসংখ্যা কম ছিল এবং এগুলোর উপযুক্ত তত্ত্বগত ও কর্মসূচীগত ভিত্তির অভাব ছিল।

১৯১৮ সালের আগের সময়টাতে কতকগুলো শিল্প ধর্মঘটও দেখা গিয়েছিল। এই ধর্মঘটগুলো ছিল অধিকাংশ স্বতঃস্ফূর্ত, অসংগঠিত এবং এরা সুস্পষ্ট কোনো ট্রেড ইউনিয়ন সচেতনতায় অনুপ্রাণিত ছিল না।[৪৯]

রাজনৈতিক দিক থেকেও ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী ১৯১৮ সালের আগে পর্যন্ত অসচেতন ও নিষ্ক্রিয় রয়ে গিয়েছিল। এর একমাত্র ব্যতিক্রম হল ১৯০৮ সালে জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী নেতা বালগঙ্গাধর তিলককে কারারুদ্ধ করার কারণে

বোম্বাই সুতাকল কর্মীদের রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘট। ভারতীয় শ্রমিকদের এটাই হল 'একমাত্র রাজনৈতিক কার্যক্রম'। ভারতীয় শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সচেতনতার লক্ষণ হিসাবে লেনিনও এই আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। (দশম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

১৯১৮ সালের পরই হল সেই সময় যখন ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী শ্রেণীভিত্তিক সংগঠনের পথ ধরেছিল এবং উত্তরোত্তর ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে তুলেছিল। এই রূপান্তরকে Whitley Commission-এর প্রতিবেদনে এইভাবে বলা হয়েছে।

'১৯১৮-১৯ সালের শীতের আগে পর্যন্ত ভারতীয় শিল্পে ধর্মঘট একটা বিরল ঘটনা ছিল। নেতৃত্ব ও সংগঠনের অভাব থাকার দরুন এবং জীবন সম্পর্কে একটা নিস্পৃহ দৃষ্টিভঙ্গীতে গভীরভাবে নিমজ্জিত থেকে শিল্প-শ্রমিকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শিল্পে কঠিন পরিস্থিতি সহ্য করার বিকল্প হিসাবে গ্রামে প্রত্যাবর্তনই একমাত্র পথ বলে মনে করত। যুদ্ধের পর এক তাৎক্ষণিক পরিবর্তন দেখা গেল। ১৯১৮-১৯ সালের শীতের সময় কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘট হয়েছিল। পরের শীতে শ্রমিক ধর্মঘটের সংখ্যা আরো বেড়ে গেল এবং ১৯২০-২১-এর শীতের সময় সংগঠিত শিল্পে শিল্প ধর্মঘট প্রায় সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ধর্মঘটের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে উপলব্ধিই ছিল এর প্রধান কারণ। পরিস্থিতি আরও সহায়তা পেয়েছিল ট্রেড ইউনিয়ন উদ্যোক্তাদের আবির্ভাবে, যুদ্ধের থেকে জনগণের শিক্ষাগ্রহণে এবং শিল্প বিস্তারের ফলে শ্রমিকের ঘাটতি হওয়ায়, যা কিনা আবার বেড়ে গিয়েছিল ইনফ্লুয়েঞ্জার মহামারীতে।'[৫০]

যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সংকট, শ্রমিকদের নিরবচ্ছিন্ন দুর্দশা, জার্মানী, অস্ট্রিয়া, তুরস্ক এবং অন্যান্য দেশের গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ইত্যাদি নানা ঘটনার ফলে শ্রমিশ্রেণীসহ ভারতীয় জনসাধারণের ওপর প্রতিক্রিয়া এবং দেশে সাধারণ আলোড়ন—এই সবই ছিল ১৯১৮ সালের পর ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত আন্দোলন শুরু হওয়ার কতকগুলো কারণ।

১৯১৮ থেকে ১৯২০ সালে দেশজুড়ে কতকগুলো ধর্মঘট হয়। বোম্বাই, কানপুর, কলকাতা, শোলাপুর, জামসেদপুর, মাদ্রাজ এবং আমেদাবাদের অসংখ্য শিল্পকেন্দ্রগুলোতে এই প্রথম এইরকম অসংখ্য ও ব্যাপক ধর্মঘট হয়েছিল।[৫১] এই অর্থনৈতিক ধর্মঘট ছাড়াও বোম্বাই ও অন্যান্য কিছুসংখ্যক শিল্পনগরীর শ্রমিকেরা রাওলাট আইনের প্রতিবাদে রাজনৈতিক ধর্মঘট করেছিল। এইভাবে তাদের উত্তরোত্তর রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিও প্রকাশিত হয়েছিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণীর আগমনও এর মধ্য দিয়েই চিহ্নিত হয়েছিল।

এই সময়ই বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং অন্যান্য কয়েকটা কেন্দ্রে বিভিন্ন শিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার প্রথম প্রয়াস দেখা গিয়েছিল। খুব শীঘ্রই দেশে কিছুসংখ্যক ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠল।

১৯২০ সালে এন. এম. যোশী, লালা লাজপত রায় এবং জোসেপ ব্যাপ্তিস্তার প্রয়াসের ফলে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর ঘোষিত লক্ষ্য ছিল 'ভারতবর্ষের সব প্রদেশের সব সংগঠনের

কার্যাবলীকে সংহত করা এবং সাধারণভাবে আর্থনীতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে ভারতীয় শ্রমিকদের স্বার্থ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।'৫২

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠন ভারতীয় শ্রমিকদের ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই প্রথম ক্রমবর্ধমান ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন একটা সর্বভারতীয় রূপ পেল।

প্রায় এক দশক জুড়ে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃত্ব প্রধানতঃ এন. এম. যোশীর মত উদারপন্থী রাজনীতিবিদদের হাতে ছিল। ক্রমে গিরি এবং সি. আর. দাসের মত জাতীয়তাবাদীরাও এঁর সংগে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন। নেতাদের জাতীয়তাবাদী ও সংস্কারবাদী ভাবধারা শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার নিয়ন্ত্রণ করত। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সংখ্যাগত ভিত্তি অবশ্য খুব নগণ্য ছিল।

১৯২৭ সালের পর ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্যে একটা বামপন্থী নেতৃত্ব গড়ে উঠেছিল। এরা ছিল প্রধানতঃ বামপন্থী জাতীয়তাবাদী, সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের নিয়ে গঠিত। এরা পূর্বতন নেতৃত্বকে দৃঢ়ভাবে সরিয়ে দিতে লাগল। ১৯২২ সাল থেকে ভারতবাসীদের মধ্যে সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী ধারণা বিস্তার লাভ করছিল। এর ফলে দেশে সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী গোষ্ঠী দানা বাঁধতে শুরু করে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাফল্যের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর গুরুত্ব অনুভব করতে পেরে এই গোষ্ঠীগুলি শ্রমিক এবং কৃষকদের নিয়ে দল গঠন করছিল। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে এই দলগুলির সভ্যরা উত্তরোত্তর প্রভাব বাড়াতে লাগল। শ্রেণীসংগ্রামের নীতিতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে গড়ে তোলা এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করার কর্মসূচী নিয়ে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে শ্রমিকদের আকৃষ্ট করাও তাদের উদ্দেশ্য বলে তারা ঘোষণা করেছিল।

বামপন্থী দল নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃত্ব লাভে সফল হন। এই কংগ্রেসের মধ্যে যোশী দলের পুরানো নেতৃত্ব সংখ্যালঘুশ্রেণীতে পরিণত হল। Royal Commission on Labour বয়কটের প্রশ্নে এবং জেনেভায় International Congress-এর প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে দুই দলের মধ্যে গভীর মতভেদ দেখা দিল। এর ফলে কংগ্রেসের মধ্যে ভাংগন দেখা দিল এবং কিছু সংখ্যক ট্রেড ইউনিয়ন বেরিয়ে গিয়ে যোশীগোষ্ঠীর নেতৃত্বে Indian Trades Union Federation গড়ে তুলল।

১৯৩১ সালে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে আরও একটা ভাঙন দেখা গেল। যাহোক ১৯৩৫ সালে এই দুই অংশ একত্রিত হয়েছিল।

১৯৩৮ সালে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং Indian Trades Union Federation একত্রিত হল এবং এর ফলস্বরূপ দেশে এক শক্তিশালী নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পুনরাবির্ভাব ঘটল।

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্যে প্রাগ্রসর কর্মসূচী ছিল যার মধ্যে ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ছিল। উৎপাদন পদ্ধতি, বণ্টন এবং বিনিময়ের সম্ভবপর সামাজিকীকরণ এবং জাতীয়করণ ; শ্রমিকশ্রেণীর সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি সাধন ; শ্রমিকদের জন্য বাক্-

স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্র, সভাসমিতি এবং সমাবেশ ধর্মঘটের মত নাগরিক স্বাধীনতা ; শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামে অংশগ্রহণ এবং জাতি, সম্প্রদায়, বর্ণ, ধর্মভিত্তিক সুযোগ সুবিধাগুলি লোপ করার লক্ষ্যও ছিল।৫৩ এটা ছিল একটা উন্নত গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী।

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে মোট সভ্যসংখ্যা ১৯৪২ সালে ছিল ৩,৩৭,৬৯৫। এর মধ্যে বিভিন্ন শিল্পের ট্রেড ইউনিয়নও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটা মোট শ্রমিকসংখ্যার একটা সামান্য শতাংশ। ভারতবর্ষে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলোতে সভ্যসংখ্যা কম হত প্রধানতঃ শ্রমিকদের দারিদ্র্য ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা, নিয়োগকর্তার হাতের বলি হওয়ার ভীতি ইত্যাদি কারণে। ধর্মঘটের সময় অবশ্য শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাব সব থেকে বেশি থাকত এবং সভ্যসংখ্যাও বৃদ্ধি পেত।

১৯২৭ সালের পরই ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক উভয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমে অংশগ্রহণের পর্যায়ে পৌঁছেছিল। ১৯২৮-৩০ সালের মধ্যে অর্থনৈতিক দাবির ভিত্তিতে কয়েকটা বৃহত্তম ধর্মঘট হয়েছিল যার মধ্যে ছিল বোম্বাই সুতাকল কর্মীদের ধর্মঘট। ১৯২৭ সালের পর ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী একটা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে গঠিত হতে শুরু করে এবং নিজস্ব পতাকা ও স্বাধীন কর্মসূচী গড়ে তোলে। সম্মিলিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণীর একটা উল্লেখযোগ্য অংশই তাদের নিজেদের নেতৃত্বকেই অনুসরণ করত। শ্রমিকেরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আয়োজিত সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেছিল প্রধানতঃ তাদের নিজ পতাকা, নিজ শ্লোগান এবং নিজেদের নেতৃত্বের অধীনে। সরকার এই ঘটনাকে বিপজ্জনক এবং কমিউনিস্ট বিক্ষোভের পরিণতি বলে মনে করেছিল। সরকার তাই Trade Disputes Act প্রণয়ন করে এবং ১৯২৯ সালে Public Safety Bill একটা অর্ডিন্যান্স হিসাবে জারি করে। আগেরটা ধর্মঘট করবার স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত করেছিল এবং পরেরটার মাধ্যমে সরকার অবাঞ্ছনীয় বিদেশীদের বহিষ্কার করবার ক্ষমতা পেয়েছিল। সরকার বেশ কিছু বামপন্থী শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করে ও তাদের বিচার শুরু করে, এ হল সেই বিখ্যাত মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা। শ্রমিকশ্রেণীর কিছু অংশ ১৯৩০-৩১ সালের আইন অমান্য আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করেছিল।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীদের দারুণ সাফল্যের পেছনে শ্রমিকদের উৎসাহোদ্দীপক সমর্থন কাজ করেছে। কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার এদের নাড়া দিয়েছিল। কংগ্রেস সরকার সম্পর্কে তাদের অবশ্য মোহমুক্তি ঘটল। তারা কংগ্রেস সরকারকে শুধুমাত্র শ্রমিকদের জীবনযাত্রা ও কাজের পরিস্থিতি উন্নতি করার অঙ্গীকার রক্ষা করে নি বলে তাই নয় অগণতান্ত্রিক, পুঁজিবাদমুখী আইন যেমন, Bombay Trade Disputes' Act প্রণয়ন করার জন্য দোষারোপ করত। বোম্বাইতে ধর্মঘটীদের ওপর পুলিশের গুলি-বর্ষণ, শ্রমিক মিটিং নিষিদ্ধকরণ এবং শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তারের জন্যও দোষারোপ করেছিল।

১৯৩৮ সালের পর দেশে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগল। এ আই টি ইউ সি-তে অনুমোদিত ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা বৃদ্ধির মধ্য দিয়েই এটা প্রতিফলিত হয়।৫৪

এই নতুন সামাজিক শ্রেণী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে উত্তরোত্তর গুরুত্ব অর্জন করছিল।

নতুন সামাজিক শ্রেণীগুলির জাতীয় চরিত্র

এই প্রধান নতুন সামাজিক শ্রেণীগুলির স্বার্থ, লক্ষণ, সমস্যা, সংগঠন এবং আন্দোলনের কথা বিবৃত করে আমরা এখন তাদের কতকগুলো সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করব। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতবর্ষের পুরানো শ্রেণী থেকে এরা আলাদা।

নতুন সামাজিক শ্রেণীর একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল তার জাতীয় প্রকৃতি। তারা ভারতবর্ষের একই জাতীয় অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তাছাড়া একই রাষ্ট্রব্যবস্থায় বসবাস করত বলে এটা হতে পেরেছিল। এতে করে প্রতিটি নতুন সামাজিক শ্রেণীর আর্থিক, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য স্বার্থ-সম্পন্ন একটা সম্প্রদায় সর্বভারতীয় জাতীয় ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছিল। এই সামাজিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগুলি যখন তাদের অভিন্ন স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হল (যদিও এই মূলগত স্বার্থের একতার কাঠামোর মধ্যেও তারা একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করত) তখনই সর্বভারতীয় পর্যায়ে নিজেদেরকে সংগঠিত করার প্রেরণা পেল তারা এবং জাতীয় ভিত্তিতে তাদের সাধারণ স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আন্দোলন শুরু করল।

প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতবর্ষে অবস্থাটা এরকম ছিল না। তখন কোনো একক জাতীয় অর্থনীতি অথবা রাষ্ট্রব্যবস্থাও ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতবর্ষে কারিগরদের কথা বলা যায়। এক গ্রামের কারিগরের সঙ্গে অন্য গ্রামের কারিগরের কোনো সাধারণ অর্থনৈতিক স্বার্থবন্ধন ছিল না, কেননা সে ছিল গ্রামীণ সার্বভৌমত্বের অংশ। অনুরূপভাবে এক শহরের হস্তশিল্পীদের অন্য শহরের হস্তশিল্পীদের সঙ্গে কোনো সাধারণ অর্থনৈতিক বন্ধন ছিল না। বস্তুতপক্ষে ভারতবর্ষে তখন ছিল প্রায় অসংলগ্ন স্থানীয় অর্থনীতির মিশ্রণ এবং রাষ্ট্রসমূহের জোট। তাই কারিগর, হস্তশিল্পী এবং কৃষিজীবীদের মধ্যে না ছিল কোনো সাধারণ রাজনৈতিক স্বার্থ না কোনো অর্থনৈতিক স্বার্থ। এর ফলে জাতীয় ভিত্তিতে অথবা জাতীয় পর্যায়ে সংগ্রাম ও সংগঠন করবার প্রেরণার অভাব ছিল।

সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কে এদের সচেতনতা

নতুন উদ্ভূত সামাজিক শ্রেণী এক জাতীয় অর্থনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীন হয়ে পুরানো শ্রেণীর থেকে একেবারে বিপরীত ছিল। শিল্পপতি, কারখানা ও পরিবহন কর্মী, আধুনিক বণিকশ্রেণী, মালিকানা স্বত্ববান কৃষক, প্রজা, খেতমজুর এমনকি বৃত্তিজীবী শ্রেণী সবারই নিজ নিজ সাধারণ স্বার্থ ও সমস্যা ছিল। আর্থিক ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো হল সংরক্ষণ, অনুপাত, মজুরী ও কাজের

শর্তাবলী, দামের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, রাজস্ব নির্ধারণের স্তর, মাশুল, পরিশোধ ইত্যাদি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো হল ভোটাধিকার, আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব, নিজ গোষ্ঠীর স্বার্থ এগিয়ে নেওয়ার জন্য নাগরিক স্বাধীনতা ও অন্যান্য।

এই কারণে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং অগ্রগতির সঙ্গে সমসাময়িক পুঁজিবাদী সমাজ (পুরানো সমাজ কিছুটা টিঁকে থাকা সত্ত্বেও) এবং কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রবর্তন হওয়াতে দেখা যায় যে প্রতিটি নতুন শ্রেণী যতই সচেতন হয় ততই তাদের সাধারণ স্বার্থের তাগাদায় বাধ্য হয়ে একটা জাতীয় অর্থাৎ সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনে উদ্যোগী হয়। বুর্জোয়ারা উত্তরোত্তর নিজেদেরকে জাতীয় বুর্জোয়া বলে গণ্য করতে থাকে এবং Indian Chambers of Commerce এবং Federations of Industries-এর মত সংগঠন স্থাপন করে। প্রলেটেরিয়েটরাও নিজেদেরকে জাতীয় প্রলেটেরিয়েট মনে করে এবং কালক্রমে তাদের সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান All India Trade Union Congress গঠন করে। খেতমজুর, স্বত্ববান কৃষক ও প্রজাদের নিয়ে গঠিত ছিল কৃষকশ্রেণী। অবিন্যস্ত দারিদ্র্যপীড়িত এবং সাংস্কৃতিক জীবনে অনগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও এরা সারা ভারত কিসানসভার মত সর্বভারতীয় সংগঠন স্থাপনে প্রথম প্রয়াসী হয়।

অনুরূপ সমস্ত সামাজিক গোষ্ঠী যেমন ছাত্র, মহিলা, অনুন্নত শ্রেণীসমূহ, চিকিৎসক, সম্পাদক এবং অন্যান্যরা যেমনি সাধারণ স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হল তখনই জাতীয় পর্যায়ে All India Womens' Conference, All India Medical Practitioners' Association, All India Journalists and Editors Conference ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গঠন করতে উদ্যোগী হয়েছিল।

এমনকি ভারতীয় নৃপতিরা যারা ছিল পুরানো সমতুল্য শ্রেণীর নবরূপায়ণ তারাও সর্বভারতীয় পর্যায়ে Indian Chambers of Princes গঠন করে নিজেদের সংগঠিত করেছিল।

নতুন ভারতীয় সমাজের আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে যখন নতুন সামাজিক শ্রেণী জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করতে উদ্যোগী হচ্ছিল তখন এরা তাদের স্বার্থের গুরুত্ব অনুসারে নিজেদের মধ্যে হয় বন্ধুত্ব করে অথবা সংগ্রাম করে ভারতীয় জনগণের সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কে উত্তরোত্তর সচেতন হয়ে উঠছিল। এই সাধারণ স্বার্থগুলি হল উৎপাদিকা শক্তির অগ্রগতি এবং ভারতীয় সমাজের আর্থনীতিক সাধারণ অগ্রগতি, ভারতীয়দের দ্বারা রাষ্ট্রক্ষমতার বর্ধিত নিয়ন্ত্রণ এবং আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার। নতুন শ্রেণীর শিক্ষিত লোকেরা উত্তরোত্তর বুঝাতে পারছিল যে ঐসব শ্রেণীর অংশগত অগ্রগতি ভারতীয় সমাজের সামগ্রিক সাধারণ অগ্রগতির সংগে জড়িত। তারা এও বুঝতে পারছিল যে শিল্পের দ্রুত অগ্রগতির জন্য কৃষির পুনরুজ্জীবন এবং পুনর্গঠন অপরিহার্য এবং কৃষির সমৃদ্ধির জন্য শিল্পের বিস্তার অবশ্য প্রয়োজন। সমৃদ্ধ কৃষির অর্থ হল শিল্প-বিস্তার যা জমির অত্যধিক চাপ কমিয়ে দেবে। বৃত্তিজীবী শ্রেণীর সমৃদ্ধি প্রধানতঃ সাধারণ সমৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে। শিক্ষা এবং সংস্কৃতির বিস্তার হল সামাজিক এবং আর্থিক উন্নয়নের আবশ্যিক পূর্বশর্ত। সামাজিক রূপান্তরে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা তারা বুঝতে পেরেছিলেন। এর ফলে দেশের

মধ্যে সর্বপ্রকার প্রগতিশীল সামাজিক শ্রেণী এবং গোষ্ঠীর সংহত জাতীয়তা-বাদী আন্দোলন বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই আন্দোলনের একটা সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল। এর কর্মসূচীতে যে যে দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল তা হল আমূল শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, আইনসভা কর্তৃক শাসনব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, ব্যাপক নাগরিক স্বাধীনতা, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা, উচ্চতর, উদার ও কারিগরি শিক্ষা-বিস্তার, হোমরুল, ডোমিনিয়নের মর্যাদা এবং স্বরাজ।

এদের সচেতনতার অসম বিকাশ

আবার এই নতুন শ্রেণীগুলির মধ্যে জাতীয় এবং শ্রেণীসচেতনতা একই সময়ে গড়ে ওঠেনি। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং যুক্তিবাদ আত্মস্থকারী বুদ্ধি-জীবীরাই সবার আগে গণতান্ত্রিক এবং জাতীয় স্পন্দন অনুভব করেছিল এবং তারাই হয়ে উঠেছিলেন সর্বপ্রকার প্রগতিশীল সামাজিক, ধর্মীয়, আর্থনীতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পথিকৃৎ এবং নেতা। পরবর্তী সময়ে বেশি বেশি সংখ্যায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী, বুর্জোয়া, প্রলেটেরিয়েট এবং কৃষক-দের মধ্যে জাতীয় দৃষ্টিভংগী গড়ে উঠতে লাগল। ১৯১৮ সালের পরে ব্যাপক-তর ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হল ও ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা হল। (রাজনীতি সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

ভারতীয় জনসাধারণের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক, আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতির জন্য ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলনের প্রবণতা অবশ্য সাম্প্রদায়িকতা প্রসারের সংগে সংগে এবং ফাটল সৃষ্টিকারী অন্যান্য কারণে ব্যাহত হয়েছিল। (কোনো কোনো প্রাদেশিক এবং সংখ্যালঘুগোষ্ঠীর জাতি-চেতনা গড়ে ওঠার সংগে এই সাম্প্রদায়িকতা অবশ্য পৃথক)। কায়েমী স্বার্থের এক অংশের সংগে যুক্ত হয়ে শিক্ষিত শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস জিইয়ে রাখত এমনকি বাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল। সাধারণত এর লক্ষ্য ছিল চাকরিক্ষেত্রে তাদের পদ, বিধানসভায় তাদের আসন অথবা ব্যবসায়ে তাদের প্রতিযোগিতা প্রভৃতি গোষ্ঠীগত স্বার্থ রক্ষা করা (ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ জাতি ও সংখ্যালঘুদের সমস্যা)। জনগণের সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতাই সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের জাতীয়তাবিরোধী কাজে সহায়তা করেছিল।

প্রগতিশীল নতুন সামাজিক শ্রেণীগুলির কর্মসূচী যেমন আধুনিক শিক্ষা সংস্কৃতির অধিকতর বিস্তার, ব্যাপক শিল্পায়ন, ভূমিব্যবস্থার গণতান্ত্রিক পুন-র্বিন্যাস এবং কৃষির আধুনিকীকরণ, রাষ্ট্রব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ, স্বাধীনতা এবং অন্যান্য দাবিসমূহের একক অথবা সম্মিলিতভাবে একটা প্রগতিশীল এবং জাতীয় চরিত্র ছিল কেননা এগুলি পরিকল্পিত হয়েছিল জাতীয় স্তরে এবং এর লক্ষ্য ছিল একটা সমৃদ্ধিশালী জাতীয় অস্তিত্ব গড়ে তোলা। এই কর্মসূচী-গুলোর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভারতীয় জনগণের জন্য উন্নততর জাগতিক ও ও সাংস্কৃতিক জীবনাচরণ। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর গণতন্ত্র সমৃদ্ধ অর্থনীতি এবং কমবেশি একটা সমৃদ্ধ অগ্রসর সাংস্কৃতিক জীবনের আকাঙ্ক্ষাই এই কর্মসূচীগুলোকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

সম্পত্তিবান শ্রেণীসমূহের মধ্যে ক্রমবর্ধমান প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতা

এতদসত্ত্বেও এটা মনে রাখতে হবে যে কতকগুলো মূলগত জাতীয় সমস্যা মোকাবিলা করবার সময় সমস্ত নতুন শ্রেণীই নিরন্তর গণতান্ত্রিক ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে জমিদারী প্রথা বিলোপের কথা বাদ দিলেও ভূমি-ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের ফলে জমিদারদের গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হারাতে হলেও তা ছিল কৃষির পুনর্গঠন এবং কৃষি জনসাধারণের আর্থনীতিক অবস্থার উন্নতির জন্য অপরিহার্য, তা সত্ত্বেও ভারতীয় বুর্জোয়ারা কোনোরকম আমূল কৃষি সংস্কারের ব্যাপারে উৎসাহই দেখায় নি। তারা তাদের শ্রেণীগত স্বার্থের নিকট জাতীয় আর্থনীতিক অগ্রগতির সাধারণ স্বার্থকে বলি দিয়েছিল। তাদের শ্রেণীগত স্বার্থ জমিদারী প্রথা বিলোপের বিরুদ্ধে ছিল (রাজনীতি ও কৃষির পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। আরও একটা দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে যখন কংগ্রেস সরকার স্থাপিত হল তখন তারা Bombay Disputes Act-এর মত আইন যা নাগরিক স্বাধীনতা লঙ্ঘন করত তা প্রণয়ন করে পুঁজিবাদমুখী প্রবণতা দেখিয়েছিল।

সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদের ক্ষয়ে, তীব্রতর আন্তঃ-পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, উত্তরোত্তর ব্রিটিশ ও আমেরিকান পুঁজির ওপর নির্ভরতা, দেশীয় ভূমি স্বার্থের সঙ্গে যোগসাজস, কোনোরকম প্রকৃত রাষ্ট্রক্ষমতাহীন ঔপনিবেশিক প্রভৃতির যুগে বসবাস করার দরুন এবং তাছাড়াও শ্রমিক, কৃষক ও প্রজা যাদের আর্থিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছিল তাদের দ্রুত প্রসারমান আন্দোলনের মুখো-মুখি হয়ে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী তাদের শ্রেণী অবস্থান ও স্বার্থের দরুনই উত্তরোত্তর অপ্রগতিশীল এমনকি প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল। মতাদর্শের ক্ষেত্রে এ নিয়ে এসেছিল ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়বাদ, আর রাজনীতিতে স্বৈরতান্ত্রিক ধারণা যেমন 'এক নেতা এক দল এক কর্মসূচী এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার সংকোচন' (ধর্মঘট করার ক্ষেত্রে শ্রমিকের স্বাধীনতা প্রভৃতি)। এই ছিল শ্রেণীটির বর্ধমান প্রবণতা।

ভারতে দ্বিমুখী আন্দোলন

সুতরাং দেশে দুটো আন্দোলন একই সঙ্গে ছিল, উভয়েই জাতীয় ভিত্তিতে এবং সর্বভারতীয় স্তরে। প্রথমটি বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী যেমন শিল্পপতি, বণিক, শ্রমিক, কিসান, বৃত্তিজীবী শ্রেণী, ছাত্র, মহিলা ও অন্যান্যদের নিজ নিজ স্বার্থ ও লক্ষ্য সহ পৃথক সব আন্দোলন নিয়ে গঠিত। প্রতিটি সামাজিক শ্রেণী অথবা গোষ্ঠী তাদের নিজ স্বার্থ পূরণের জন্য নিজেদেরকে সংগঠিত করেছিল এবং সংগ্রাম করেছিল। এইভাবে নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অসংখ্য এবং স্বতন্ত্র আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এই বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতির দ্বারা নির্ধারিত হত এবং সেই পরিস্থিতিই নির্ধারণ করত তাদের তৎকালীন বিরোধ অথবা মৈত্রী।

আরেকটা আন্দোলন হল বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে কয়েকটা শ্রেণী অথবা সমস্ত শ্রেণীর সাময়িক অথবা স্থায়ী সম্মিলিত আন্দোলন। এই আন্দোলন হোমরুল, ডোমিনিয়ন মর্যাদা অথবা পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য ভারতীয় জাতীয়তাবাদী

সংগ্রামের রূপ নিয়েছিল। এই আন্দোলন সাধারণ স্বার্থের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল, সেই সাধারণ স্বার্থটা হল আরেকটা জাতি কর্তৃক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ অপসারণ করা। ক্ষমতা অর্জনের পর রাষ্ট্র ও সামাজিক আর্থনীতিক কাঠামো কি হবে সে সম্পর্কে প্রতিটি সামাজিক শ্রেণীর অবশ্য নিজস্ব ধারণা ছিল।

জাতীয় স্তরে আলাদা আলাদা শ্রেণী আন্দোলন এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা, আর্থনীতিক অগ্রগতি এবং সাংস্কৃতিক প্রগতির জন্য সম্মিলিত জাতীয় আন্দোলনের ব্যাপারটা প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতবর্ষে ছিল না।

যাহোক পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে দেখা যাবে এই নতুন সচেতনতার বিস্তার যদিও উত্তরোত্তর অধিকতর সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল তবু তা ছিল সীমিত ও গতিতে মন্থর।

সূত্র নির্দেশ

১ Gadgil. M. N. Roy এবং Krishna দ্রষ্টব্য।
২ Adhikari এবং W. C. Smith দ্রষ্টব্য।
৩ O'Malley, Thompson এবং Garratt দ্রষ্টব্য।
৪ Ralph Fox কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ১৮।
৫ Shelvankar দ্রষ্টব্য।
৬ Wadia and Merchant দ্রষ্টব্য।
৭ Palekar দ্রষ্টব্য।
৮ Gadgil and Buchanan দ্রষ্টব্য।
৯ Krishna দ্রষ্টব্য।
১০ Altekar, Mathai and Gadgil দ্রষ্টব্য।
১১ E. Thompson, Chudgar and Butler Commission Report দ্রষ্টব্য।
১২ Baden Powell এবং R. C. Dutt দ্রষ্টব্য।
১৩ N. N. Ghose, পৃ. ১১৭ দ্রষ্টব্য।
১৪ Edwards and Meryvale, পৃ. ২৮৯ দ্রষ্টব্য।
১৫ Montague, পৃ. ৭৯-৮০।
১৬ Krishna, পৃ. ৬৭-৮।
১৭ Pal, পৃ. ২৮৮।
১৮ Ranga, Jawaharlal Nehru, Brailsford এবং Floud Commission Report দ্রষ্টব্য।
১৯ Tawney, পৃ. ১১৬।
২০ Swami Sahajananda এবং Indulal Yagnik-এর পরে কৃষক আন্দোলন সম্পর্কিত বাদবাকী আলোচনার জন্য Swami Sahajananda এবং Indulal Yagnik দ্রষ্টব্য।

২১ Ranga দ্রষ্টব্য।
২২ Ranga এবং Swami Sahajananda দ্রষ্টব্য।
২৩ Ranga, পৃ. ১১।
২৪ উপরিউক্ত, পৃ. ১২।
২৫ উপরিউক্ত, পৃ. ১৩।
২৬ R. P. Dutt দ্রষ্টব্য।
২৭ Ranga দ্রষ্টব্য।
২৮ Pattabhi Sitaramayya দ্রষ্টব্য।
২৯ Tawney, Engels, Maynard, Lenin দ্রষ্টব্য।
৩০ Ranga দ্রষ্টব্য।
৩১ Gadgil, Krishna, Buch দ্রষ্টব্য।
৩২ Krishna, পৃ. ১৩৭-৮।
৩৩ উপরিউক্ত, পৃ. ১৭৬।
৩৪ উপরিউক্ত, পৃ. ১৭৮।
৩৫ The Statesman, Calcutta, 2 February, 1931 থেকে উদ্ধৃত।
৩৬ Stalin, পৃ. ১৫।
৩৭ Krishna, পৃ. ১৪০।
৩৮ Gadgil, Wadia এবং Joshi, Shah দ্রষ্টব্য।
৩৯ Joan Beauchamp, পৃ. ৫৩।
৪০ Ranga and Swami Sahajananda দ্রষ্টব্য।
৪১ Gadgil এবং Buchanan দ্রষ্টব্য।
৪২ Purcell এবং Hallsworth, পৃ. ১০।
৪৩ উপরিউক্ত, পৃ. ৮-৯।
৪৪ R. P. Dutt কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ৩৫১-২।
৪৫ উপরিউক্ত, পৃ. ৩৫৫।
৪৬ Buchanan, Wadia and Merchant, Shiva Rao দ্রষ্টব্য।
৪৭ Shiva Rao, পৃ. ১২৮।
৪৮ উপরিউক্ত, পৃ. ২১০।
৪৯ Buchanan, পৃ. ৪২৬ দ্রষ্টব্য।
৫০ Joan Beauchamp কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ১৩৫।
৫১ R. K. Das, পৃ. ৩৬-৭ দ্রষ্টব্য।
৫২ Shelvankar কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ.২০৯।
৫৩ Report of the Nineteenth Session of the All-India Trade Unicn Congress, Cawnpore, 1942, পৃ. ৭১।
৫৪ Annual Reports of the All-India Trade Union Congress দ্রষ্টব্য।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আধুনিক জাতীয়তাবাদের অগ্রগতিতে সংবাদপত্রের ভূমিকা

সংবাদপত্রের গঠনমূলক সামাজিক ভূমিকা

আধুনিক যুগে সংবাদপত্র শক্তিশালী সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সংবাদপত্র আধুনিক যুগের সব জটিল প্রক্রিয়াকে রূপ দেয় ও সেই সঙ্গে প্রতিবিম্বিত করে। সব থেকে কম সময়ে ব্যাপক পর্যায়ে ভাবনার বিনিময়ে সহায়তা করে। সংবাদপত্রের সাহায্যে সম্মেলন সংগঠিত হয়, বিতর্ক চলে ও তার নিষ্পত্তি হয়, আন্দোলন হয় ও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সমাজের শীর্ষস্থান যারা অধিকার করে আছে ও সাধারণ মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা যারা তাদের সবরকম ক্রিয়াকলাপের একটা শক্তিশালী সমালোচনার যন্ত্র হল সংবাদপত্র। এইভাবে এটি তাদের ওপরে জনগণের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।

সপ্তদশ, অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় জনসাধারণের কাছে ছাপাখানা একটা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জনসাধারণকে জাতি হিসাবে সংহত করতে, সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতদের সৃষ্টি সামন্ততান্ত্রিক বিশৃংখলার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোর ব্যাপারে আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় সংবাদপত্র খুব কার্যকরী ছিল। ফ্রান্সের নতুন সামাজিক ব্যবস্থা ও তার উন্নত সামাজিক ধ্যানধারণার অগ্রদূত ও প্রচারক বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী কিন্তু শাসক সামন্তশ্রেণীর নৈতিক অবক্ষয়, সাংস্কৃতিক দৈন্য এবং তাদের প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক তাৎপর্য উন্মোচন করার ব্যাপারে সংবাদপত্রকে একটা কার্যকরী আয়ুধ হিসাবে ব্যবহার করেছিল। সংবাদপত্রের মাধ্যমেই ভলতেয়ার, Diderot, Holbach, Helvetius এবং অন্যান্যরা জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সামাজিক ধারণা প্রচার করেছিলেন এবং তৎকালীন ধর্মীয় কুসংস্কার ও সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণকে উদ্দীপ্ত করেছিলেন। এঁরা ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে মুখর হয়ে ওঠেন এবং সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত-বর্গ ও সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার জন্য ভূমিদাসদের আহ্বান জানান। জন্মসূত্রে সুবিধালাভের যে অগণতান্ত্রিক নীতির ওপর সামন্ততান্ত্রিক সমাজ গঠিত ছিল ও ক্যাথলিক কুসংস্কারের মাধ্যমে যে রীতিকে করা হয়েছিল অলংঘনীয়, অসংখ্য বই ও ছোট পুস্তিকাতে তাঁরা তার প্রকাশ্যে নিন্দা করেছেন। সামন্ততান্ত্রিক অধিকারের বিপরীতে ব্যক্তির সমানাধিকারের কথা এঁরা উদ্দীপ্ত ভাষায় প্রচার করতেন। ভূমিদাস প্রথা অবলুপ্তির জন্য এবং ফরাসী জনসাধারণের কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য এঁরা প্রচার চালিয়েছিলেন। জনগণের চেতনা জাগাতে, নতুন ধ্যানধারণায় তাদেরকে

উদ্বুদ্ধ করতে, সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা উচ্ছেদ করে তার পরিবর্তে আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য জনগণকে ঐতিহাসিক সংগ্রামে প্ররোচিত করতে Mirabeau, Danton, Robespierre, Marat প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে নতুন সামাজিক শক্তির হাতে সংবাদপত্র অপরিহার্য হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। ঐতিহাসিকভাবে উন্নততর নতুন সমাজব্যবস্থা, বিপ্লবোত্তর ফরাসী সমাজের প্রতিনিধিত্বমূলক বুর্জোয়া জাতীয় গণতান্ত্রিক সমাজ, গড়ে তুলতে ফরাসী জনসাধারণের অগ্রগামী অংশের হাতে সংবাদপত্র একটা হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াল। সংবাদপত্রের সাহায্য ছাড়া সামন্ত-বিরোধী সংগ্রামের জন্য জনসাধারণকে চালনা করা, সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার ধ্বংসের পর জাতীয় রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন ও আধুনিক ফরাসী দেশে যে সুসমৃদ্ধ জটিল, বৈজ্ঞানিক ও রুচিশীল সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তা সম্ভব হত কিনা গভীর সন্দেহের বিষয়।১

ইংলন্ড, জার্মানী, ইটালি এবং অন্যান্য আধুনিক ইউরোপীয় দেশগুলোতেও সংবাদপত্র অনুরূপ ভূমিকা নিয়েছিলঃ গণতান্ত্রিক ধারণায় উদ্বুদ্ধ জনসাধারণের প্রাগ্রসর অংশ মুদ্রণযন্ত্রের সাহায্যেই সাধারণ্যে সেই ধারণা ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল। স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্রব্যবস্থা ও তমসাচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় সংস্কৃতি সহ সামন্ততান্ত্রিক সমাজ বিলোপের পর এইসব দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষের মধ্যে আধুনিক সংস্কৃতির বাণী প্রচারেও মুদ্রণযন্ত্রই ছিল হাতিয়ার।

'ভাবনাগুলো জনসাধারণের কাছে পেঁছিলে বাস্তব শক্তিরূপে স্ফুরিত হয়ে ওঠে।' ইতিহাসে দেখা যায় যে জাতীয় জাগরণে, প্রগতিশীল আদর্শ আত্মস্থ করার ব্যাপারে এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তাদের সক্রিয় শক্তি হিসাবে টেনে নিতে ছাপাখানা বড় ভূমিকা পালন করেছে।

প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে সংবাদপত্রের অভাব

প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে ভারতে ছাপাখানা ছিল না। ১৫৫৭ সালে খ্রীষ্টধর্ম-সংক্রান্ত গ্রন্থ ছাপানোর জন্য পর্তুগীজ জেসুইটরা প্রথম ছাপাখানা প্রবর্তন করলেও কেবলমাত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছরে তা জনসাধারণের জীবনকে প্রভাবিত করার মত একটা প্রকৃত সামাজিক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল।

মোঘল আমলে হাতে লেখা সংবাদপত্র প্রচলিত ছিল। সাধারণতঃ সম্রাট প্রতি প্রাদেশিক কেন্দ্রে দুইজন করে সংবাদলেখক নিযুক্ত করতেন। একজন ওয়াকিয়ানবিশ সেই অঞ্চলের সমস্ত উল্লেখযোগ্য সরকারী কাজকর্মের খবর লিপিবদ্ধ করে হাতে লেখা সংবাদ গেজেট বের করতেন এবং আরেকজন সাবানিনবিশ সেখানে যেসব উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটত তার খবর সহ প্রস্তুত করতেন একটা তথ্যপত্র।২

প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে ধনী ব্যবসায়ীরাও ব্যক্তিগত সংবাদলেখক নিযুক্ত করতেন। এরা বাণিজ্যিক ও অন্যান্য খবরাখবর সহ তথ্যপত্র প্রস্তুত করে মনিবের কাছে পাঠাত।৩

মুদ্রণযন্ত্রের সুবিধা না থাকার জন্য এইসব সরকারী ও ব্যক্তিগত সংবাদপত্র ও তথ্যপত্র হাতেই লেখা হত। এগুলির প্রচার জনসাধারণের ছোট ছোট গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। সংবাদের বৈচিত্র্যও ছিল সীমিত।

১৯০০ সাল পর্যন্ত ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রসার

ভারতবর্ষে ছাপাখানার প্রবর্তন ভারতীয় জনসাধারণের জীবনে একটা বৈপ্লবিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। জনগণের মধ্যে জাতীয় চেতনার জাগরণ ও প্রসারের ফলে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের উদ্ভব ঘটেছিল।

রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ভারতবর্ষে স্বদেশী সংবাদপত্রের প্রবর্তক। যদিও এর আগে কয়েকটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল বটে, কিন্তু ১৮২১ সালে রামমোহন কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদকৌমুদী ও ১৮২২ সালে প্রকাশিত পার্শী সংবাদপত্র Mriat-ul-Akbar হল ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন সংবাদপত্র। এই কাগজগুলো ছিল প্রধানতঃ সমাজসংস্কার ও ধর্মীয় ও দার্শনিক সমস্যার বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার মাধ্যম।

এন. পি. ফারদুনজী মুর্জবন বোম্বাইতে গুজরাতি সংবাদপত্রের পথিকৃৎ ছিলেন। সেই অতদিন আগে ১৮২২ সালে তিনি বোম্বে সমাচার শুরু করেন। এটি দৈনিকপত্র হিসাবে এখনো চালু আছে।

লর্ড বেণ্টিংকের প্রগতিশীল শাসনব্যবস্থা ভারতীয় সাংবাদিকতার অগ্রগতিতে প্রেরণা জুগিয়েছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি প্রগতিশীল ভারতীয়ের প্রয়াসে ১৮৩০ সালে 'বঙ্গদূত' (বাংলা ভাষায়) পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হয়।

পি. এম. মোতিওয়ালা নামে একজন উদ্যোগী পার্শী ১৮৩১ সালে জাম-এ-জামসেদ নামে একটা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এটি দৈনিক হিসাবে এখনও প্রকাশিত হয়। ১৮৫১ সালে বোম্বাইতে রুস্ত গফতার এবং আখবর-এ-সওদাগর নামে আরো দুটো কাগজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একজন বিখ্যাত নেতা ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নেতা দাদাভাই নওরোজী 'রুস্ত গফতার' পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন।

বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী সমাজসংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫৮ সালে বাংলা ভাষায় সোমপ্রকাশ কাগজ শুরু করেন। এই কাগজ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে চালিত হত ও রাজনৈতিক সাংবাদিকতার একটা উঁচু মান বজায় রেখে চলত। ১৮৬০ সালে বাংলাদেশে নীল চাষ এলাকাতে যখন বিক্ষোভ দেখা দেয় তখন এই কাগজ দৃঢ়তার সঙ্গে কৃষকদের স্বার্থে কথা বলত।

১৮৬১ সালে Indian Council's Act প্রণীত হয়। এই আইনের ফলেই ভারতীয়গণ প্রথম আইন পরিষদ সংক্রান্ত কাজে সরকারের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছিল। এতে ভারতীয় সমাজের উচ্চতর পর্যায়ের লোকেদের মাঝে রাজনৈতিক সচেতনতার বিকাশলাভ করেছিল। এর ফলে পরবর্তী সময়ে ভারতীয় ও অভারতীয় উভয় জাতীয় সংবাদপত্রের প্রচার বৃদ্ধি পেয়েছিল।

১৮৬১ সালে বোম্বাইতে Times of India, ১৮৬৫ সালে এলাহাবাদে The Pioneer, ১৮৬৮ সালে মাদ্রাজে The Madras Mail, ১৮৭৫ সালে কলকাতায় The Statesman, ১৮৭৬ সালে লাহোরে The Civil and Military Gazette প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এইসব কাগজগুলোই ইংরেজী

দৈনিক পত্রিকা এবং ব্রিটিশ যুগে এগুলো চলেওছিল। Times of India সাধারণতঃ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের নীতি সমর্থন করত। Pioneer জমিদার ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর স্বার্থ সমর্থন করত, Madras Mail ছিল ইউরোপীয় বণিকশ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধি, The Statesman সরকার ও সেই সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীগুলির উভয়েরই সমালোচনা করত আর The Civil and Military Gazette স্পষ্টতই ছিল ব্রিটিশ রক্ষণশীল মতবাদের মুখপত্র।

স্বদেশী সংবাদপত্রও সেই সময় গড়ে উঠেছিল। তিন ভাই হেমেন্দ্র কুমার, শিশির কুমার ও মতিলাল ঘোষের যৌথ প্রয়াসে ১৮৬৮ সালে দ্বিভাষিক, ইংরেজী ও বাংলা সাপ্তাহিকী হিসাবে অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৭৮ সালে Vernacular Press Act-এর আওতা এড়িয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে এই কাগজটিকে পুরোপুরি ইংরেজী সাপ্তাহিকীতে পরিণত করা হল। ১৮৯১ সালে এই কাগজকে একটা ইংরেজী দৈনিক কাগজে রূপান্তরিত করা হয়। অমৃতবাজার পত্রিকা জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণা প্রচার করত ও সবচেয়ে জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলোর অন্যতম ছিল। সরকারী ব্যবস্থার কড়া সমালোচনার জন্য এই পত্রিকাটিকে নিপীড়নের মুখে পড়তে হয়েছে। অতীতে এর একাধিক সম্পাদককে কারারুদ্ধ হতে হয়েছিল।

উঠতি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সব থেকে উল্লেখযোগ্য নেতাদের অন্যতম ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। তিনি ১৮৭৯ সালে ইংরেজীতে The Bengali পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন। তিনি এর মালিক ছিলেন। The Bengali-তে প্রকাশিত একটা প্রবন্ধের জন্য তিনি আদালত অবমাননার দায়ে সোপর্দ হন ও তাঁর দুই মাসের কারাদণ্ড হয়। ভারতীয় রাজনৈতিক জগতে উদার ভাবধারা এবং মধ্যপন্থী মতবাদ প্রকাশ করত—The Bengali.

স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির পরামর্শে স্যার দয়াল সিং মাজিঠিয়া ১৮৭৭ সালে লাহোরে The Tribune নামে এক ইংরেজী পত্রিকা শুরু করেন। পঞ্জাবে এই পত্রিকার প্রভাব ছিল। এর একটা উদার জাতীয়তাবাদী চরিত্র ছিল।

লর্ড লিটনের শাসনকালে কতকগুলো কারণে জনসাধারণের মনে আঘাত লেগেছিল এবং রাজনৈতিক অসন্তোষ জমতে লাগল। এতে সংবাদপত্রের প্রসারে আরও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। বীররাঘবাচারী ও অন্যান্য দেশপ্রেমী ভারতীয়রা ১৮৭৮ সালে মাদ্রাজে The Hindu নামে একটা ইংরেজী সাপ্তাহিক কাগজের প্রবর্তন করেন। ১৮৮৯ সালে এটি দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। The Hindu কাগজটার একটা উদার মতবাদ ছিল। তবে সমালোচনা সত্ত্বেও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতি সমর্থন করত।

এই সময়ই বঙ্গবাসী (সাপ্তাহিকী) এবং বসুমতী (দৈনিক/সাপ্তাহিক) নামে দুটো বাংলা সংবাদপত্র শুরু হয়। বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু প্রথম কাগজটির প্রবর্তন করেছিলেন। এই দুটো কাগজেরই কম দাম ধরা হয়েছিল ও প্রধানতঃ জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান খবরের চাহিদা মেটাত। এই দুই কাগজই প্রকাশিত হয়ে আসছিল ও বাংলাদেশে সনাতন হিন্দুধর্মের মুখপত্র রূপে কাজ করছিল।

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সংগে ভারতীয় জাতীয়তা-বাদ সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটা সাংগঠনিক রূপ পায়। এর পর থেকে ভারতীয় জনসাধারণের উচ্চতর পর্যায়ের লোকেদের মাঝে জাতীয় সচেতনতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। শতাব্দীর শেষের দিকে রাজনৈতিক চেতনার একটা নতুন ধারা দানা বেঁধে উঠেছিল।

উদার জাতীয়তাবাদী ভাবাপন্ন নেতাদের পাশাপাশি প্রায় বিপরীত ভাবাপন্ন চরমপন্থী ও জংগী জাতীয়তাবাদী নেতারাও দেখা দিয়েছিল। বালগংগাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ও বারীন্দ্র ঘোষ, লালা লাজপত রায় এই প্রবণতার দৃষ্টান্ত।

১৮৮৯ সালের পর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ব্যাপকতা ও গভীরতা নানা ধরনের স্বদেশী সংবাদপত্র প্রসারের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। তিলক দি কেশরী নামে একটা মারাঠী পত্রিকা শুরু করেন। জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের যে নতুন ধারণা ও পদ্ধতি এঁরা গড়ে তুলেছিলেন সেটা তিলক এই পত্রিকায় প্রচার করতেন। তিলক সুদক্ষ সাংবাদিক ছিলেন। তাঁর হাতে কেশরী এবং দি মারাঠা (একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক) দুটি পত্রিকাই জনসাধারণের মধ্যে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী মনোবৃত্তি ও ধারণা উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে কার্যকরী হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল। কেশরী পত্রিকা মারাঠী ভাষায় দ্বি-সাপ্তাহিক কাগজ হিসাবে চলে আসছিল। কেশরীতে প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য তিলককে দুইবার কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল।

যুগান্তর ও বন্দেমারতম্ ছিল ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক পরিচালিত। এই পত্রিকা দুটো বাঙালী সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর প্রভাবশালী মুখপত্রে পরিণত হয়। এই দুই কাগজ জাতীয় স্বাধীনতা ও পুনর্গঠনের বিষয়ে এদের মতবাদ প্রচার করত। এই কাগজ দুটো বংগভংগের বিরুদ্ধে আলোড়ন এবং স্বদেশী ও বয়কটের পক্ষে প্রচারের মুখপত্র ছিল।

সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রেও জাতীয় সচেতনতা বিস্তার লাভ করেছিল। ১৮৯০ সালে বোম্বাইতে Indian Social Reformer নামে এক ইংরেজী সাপ্তাহিকী শুরু হয়। এই কাগজ প্রধানতঃ সমাজসংস্কার প্রচারের কাজেই নিযুক্ত ছিল।

সচ্চিদানন্দ সিংহ ১৮৯৯ সালে The Hindusthan Review নামে একটা ইংরেজী মাসিক পত্রিকা শুরু করেন। এই সাময়িক পত্রিকাটির একটা উদার রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত মেজাজ ছিল।

পরবর্তী সময়ে সংবাদপত্রের অগ্রগতি

মাদ্রাজে জি. এ নটেশন ১৯০০ সালে The Indian Review নামে একটা ইংরেজী মাসিক কাগজ প্রবর্তন করেন।

কলকাতাতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৯০৭ সালে The Modern Review নামে একটা ইংরেজী মাসিকের প্রবর্তন করেন। এটি ভারতবর্ষের সবথেকে বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা ছিল। পত্রিকাটি সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও

বৈজ্ঞানিক বিষয়ে চর্চায় নিরত ছিল। এটি আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলোর আকর্ষণীয় ও প্রয়োজনীয় খবরগুলোও দিত। সাধারণতঃ এই পত্রিকাটি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের সমর্থন করত।

১৯০৭ সালে সুরাটে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস উদারপন্থী ও চরমপন্থী এই দুই দলে ভাগ হয়ে গেলে প্রথমোক্ত দলের নেতা স্যার ফিরোজ শা মেহতা, স্যার দিনশা ওয়াচা এবং গোখলে প্রমুখ বোম্বাইতে তাঁদের মতবাদ প্রচারের মুখপত্রের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন।

স্যার ফিরোজ শা মেহতা ১৯১৩ সালে Bombay Chronicle প্রকাশ করেন। বি. জি. হর্নিমান ছিলেন এর প্রথম সম্পাদক। হর্নিমানের সুযোগ্য ও মর্যাদাব্যঞ্জক সম্পাদনায় Bombay Chronicle অচিরেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৮) জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের (উদারপন্থী ও গান্ধী) এক অংশ ভারতীয় জনসাধারণের দাবি মেটানোর ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করেছিল ও যুদ্ধে ব্রিটেনের প্রতি পরিপূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেছিল। তিলকের নেতৃত্বে আরেকটা অংশ অবিলম্বে স্বায়ত্তশাসনের জন্য দেশব্যাপী বিক্ষোভ সংগঠিত করার পক্ষপাতী ছিল। ডঃ অ্যানি বেশান্ট এই দাবীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত Madras Standard পত্রিকাটির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং তার নতুন নাম রাখেন New India। তাঁর পরিচালনাধীনে এই পত্রিকা হোম রুল আন্দোলন প্রচারের মুখপত্র হয়ে ওঠে।

১৯১৮ সালে Servants of India Society তাদের নিজস্ব মুখপত্র হিসাবে Servants of India নামে এক ইংরেজী সাপ্তাহিক কাগজের প্রবর্তন করেন। এর সম্পাদক ছিলেন শ্রীনিবাস শাস্ত্রী। এই কাগজটা উদারপন্থী জাতীয়তাবাদী মতের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সমস্যা ব্যাখ্যা করত ও তা সমর্থন করত। ১৯১৯ সালে এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী গণ আন্দোলনের প্রথম ঢেউ দেখা যায়। গভীর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে জনসাধারণের মধ্যে যে অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল এই আন্দোলন তারই পরিণতি। গান্ধী, সি. আর. দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, আলি ভ্রাতৃদ্বয়, হজরৎ মোহানি ও কংগ্রেস এবং খিলাফৎ সংগঠনের অন্যান্য নেতারা এই আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। এই আন্দোলনে ভারতীয় জনসাধারণের জাতীয় সচেতনতা প্রতিফলিত হয়েছিল এবং ফলে এই চেতনা আরও বৃদ্ধি পায়। এই আন্দোলনের ফলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের ভূমিকা আরো প্রসারিত হয়।

১৯১৯ সালে গান্ধীজী Young India প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি হয়ে ওঠে তাঁর রাজনৈতিক দর্শন, কর্মসূচী ও নীতির মুখপত্র। পরবর্তী সময়ে ১৯৩৩ সালের পর তিনি 'হরিজন' নামে একটা কাগজ শুরু করেন। (এটি ইংরেজী হিন্দী এবং অন্যান্য কয়েকটা ভাষায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক)

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ১৯১৯ সালে এলাহাবাদে Independent (ইংরেজী দৈনিক) প্রকাশ করেন। এটা ছিল কংগ্রেসের সরকারি রাজনৈতিক

মতামত প্রচারের মুখপত্র। শিবপ্রসাদ গুপ্ত The Aj নামে একটা (দৈনিক/সাপ্তাহিক) হিন্দি কাগজ প্রবর্তন করেন। ইংরেজী না জানা জনসাধারণকে রাজনীতি এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত করাই ছিল এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য। এর পরে হিন্দি ভাষায় আরো কিছুসংখ্যক রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক পত্রিকা ও সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে থাকে।

অসহযোগ আন্দোলনের কিছুদিন পরে মতিলাল নেহেরু এবং সি. আর. দাশের নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একটা গোষ্ঠী স্বরাজ পার্টি গঠন করে। ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের প্রশ্নে অপর গোষ্ঠীর সঙ্গে এদের মতভেদ হয়। স্বরাজ গোষ্ঠী পরিষদে প্রবেশের পক্ষপাতী ছিল। অপর গোষ্ঠী ছিল এর বিরোধী। তাদের মত ছিল কংগ্রেস শুধুমাত্র গান্ধীর গঠনমূলক কার্যসূচী রূপায়িত করুক। ১৯২২ সালে স্বরাজ পার্টির নেতা দিল্লীতে কে. এম. পানিক্করের সম্পাদনায় নিজেদের কর্মসূচী প্রচার করার জন্য Hindustan Times (একটা ইংরেজী দৈনিক) পত্রিকা প্রকাশ করেন।

লাহোরে লালা লাজপত রায়ের প্রচেষ্টায় এই সময়ে The People নামে এক ইংরেজী জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়।

১৯২৩ সালের পর ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট মতবাদ বিস্তার লাভ করতে থাকে।

ভারতবর্ষের ওয়ার্কার্স এণ্ড পিজেণ্টস্ পার্টির মুখপত্র হিসাবে 'ক্রান্তি' নামে একটা মারাঠী সাপ্তাহিক এবং Spark ও New Spark নামে দুটো ইংরেজী সাপ্তাহিক যথাক্রমে M. G. Desai এবং Lester Hutchinson কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে বের হয়েছিল। এই দুই সম্পাদকই মীরাট ষড়যন্ত্রের মামলার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এঁরা যে লক্ষ্য ঘোষণা করেছিলেন তা হল ভারতবর্ষে মার্কসবাদের ধারণা ছড়িয়ে দেওয়া, শ্রমিক ও কৃষকদের স্বাধীন রাজনৈতিক ও আর্থিক আন্দোলন সমর্থন করা এবং জাতীয় স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন সমর্থন করা।

১৯৩০ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের শক্তি ও পরিধি আরো বৃদ্ধিলাভ করে। কংগ্রেসের যুব সমাজের মধ্যে সমাজতন্ত্রী এবং কমিউনিস্ট মতবাদ ছড়িয়ে পড়ল। এইভাবে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির সূচনা হল। এবং এই দল তার প্রধান মুখপত্র হিসাবে Congress Socialist নামে একটা ইংরেজী সাপ্তাহিকের প্রবর্তন করে। কমিউনিস্টরা প্রচারের উদ্দেশ্যে ইংরেজী সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। প্রথমে National Front এবং পরে Peoples' War ছিল এই দলের মুখপত্র।

কমিউনিস্টদের দলীয় সংগঠনের সঙ্গে মতপার্থক্য হওয়ার দরুন এম. এন. রায় তাঁর নিজের গোষ্ঠী গঠন করলেন। ইংরেজী সাপ্তাহিক Independent India হল এই গোষ্ঠীর মুখপত্র।

১৯৩০ সালে এস. সদানন্দের সম্পাদনায় Free Press Journal নামে এক ইংরেজী দৈনিক প্রবর্তিত হল। এর দাম ছিল খুব কম। এই কাগজ কংগ্রেসের স্বাধীনতার দাবি ও সংগ্রামের দৃঢ় সমর্থক ছিল।

ভারতীয় জনসাধারণের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রেরও বিস্তার হতে থাকল। সমস্ত প্রদেশে, সব উল্লেখ-

যোগ্য শহরে দেশী ভাষায় ইংরেজী, হিন্দি এবং উর্দুতে সাময়িকপত্র, দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ হত। রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সমস্যা, এবং কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক সমস্যা সবকিছুই সংবাদপত্রে আলোচিত হত। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিই কেবল ওপরে উল্লিখিত হয়েছে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সাংস্কৃতিক এবং বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীসমূহ, জমিদার, শিল্পপতি, কৃষক শ্রমিকের মত সামাজিক-অর্থনৈতিক গোষ্ঠীসমূহ এবং ছাত্র, মহিলা, অন্ত্যজ শ্রেণীর মত সামাজিক গোষ্ঠীসমূহের নিজ নিজ মতবাদ ও কর্মসূচী প্রচারের জন্য বিশেষ পত্রপত্রিকা ছিল। মুসলীম লীগ এবং হিন্দু মহাসভার মত সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলোও নিজস্ব মুখপত্র প্রকাশ করত।

১৯৪১ সালে দেশে সতেরটি ভাষায় ৪,০০০টি মুদ্রিত সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রকাশিত হত।[৪]

ভারতীয় সংবাদপত্রের রাজনৈতিক প্রবণতা

এইসব খবরের কাগজ ও সাময়িকীগুলোকে নিম্নলিখিতভাগে ভাগ করা যায়।

The Statesman, The Times of India, The Civil and Military Gazette, The Pioneer এবং The Madras Mail ইত্যাদি সংবাদপত্রগুলো ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের মত ও কার্যাবলী এবং শাসন-ব্যবস্থা সাধারণতঃ সমর্থন করত।

Amrita Bazar Patrika, The Bombay Chronicle, The Bombay Sentinel, The Hindustan Times, The Hindustan Standard, The Free Press Journal, Harijan, National Herald এবং National Call ছিল ইংরেজী ভাষায় উল্লেখযোগ্য জাতীয়তাবাদী দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজ। The Hindu, The Leader, The Indian Social Reformer, The Modern Review ইত্যাদি কাগজ জাতীয়তাবাদের উদারপন্থী ধারণা প্রচার করত। মোটামুটিভাবে জাতীয়তাবাদী কাগজগুলো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও তার কর্মসূচী ও নীতি সমর্থন করত। অন্যদিকে উদারপন্থী কাগজগুলো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কর্মসূচীর প্রতি সমালোচনা-মূলক সমর্থন জ্ঞাপন করত। Dawn কাগজে মুসলিম লীগের মতবাদ প্রচারিত হত।

দেশের ছাত্র সংগঠনগুলোও প্রচারের জন্য পত্রপত্রিকা প্রকাশ করত। এদের পত্রিকার নাম ছিল Student এবং 'সাথী'।

দেশী ভাষার পত্রপত্রিকাও ভারতবর্ষে দ্রুত বিস্তারলাভ করছিল। বাংলা-ভাষায় 'জনশক্তি', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'বঙ্গবাসী'; মারাঠী ভাষায় 'কেশরী', 'লোকমান্য', 'নভকল' এবং 'কির্লোস্কার'; গুজরাতিতে 'বোম্বে সমাচার', 'জন্মভূমি', 'হিন্দুস্থান', 'প্রজামিত্র', 'সন্দেশ' এবং 'বন্দেমাতরম্'; মালয়া-লাম ভাষায় 'মাতৃভূমি'; তামিল ভাষায় 'স্বদেশমিত্রম্'—এইসব ভাষায় এই-গুলো এবং আরও অনেক উল্লেখযোগ্য দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল।

উর্দুতে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর মধ্যে ছিল 'ইত্তিহাদ', 'আজমল্', 'হামদম্', 'খিলাফৎ', 'তেজ' এবং 'রিয়াসৎ' উল্লেখযোগ্য।

হিন্দি প্রকাশনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'বীর অর্জুন', 'আজ', 'সৈনিক' এবং 'বিশ্বামিত্র'।

১৮৬০ সালে ভারতবর্ষে Reuter-এর শাখা স্থাপিত হয়। ১৯০৫ সালে Associated Press of India, ১৯২৭ সালে Free Press News Service এবং ১৯৩৪ সালে United Press of India প্রতিষ্ঠিত হয়। এইগুলো হল দেশের উল্লেখযোগ্য সংবাদ পরিবেশন সংস্থা।

সংবাদপত্রের মন্থর ও সামান্য অগ্রগতির কারণ

ভারতবর্ষে সংবাদপত্র দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করছিল বটে, কিন্তু এর বিস্তারের হার ছিল ধীর।

গণনিরক্ষরতা, নিদারুণ দারিদ্র্য ও পীড়নমূলক সংবাদপত্র আইন—এসব কিছুকেই সমালোচকরা এই দেশে সংবাদপত্র দ্রুত বিস্তারের প্রতিবন্ধক বলে মনে করতেন। স্বাধীন কাজে বাধা ও জামিন ব্যবস্থা আরোপ করে একাধিক প্রেস অ্যাক্ট প্রণয়ন ভারতীয় সংবাদপত্রের দ্রুত বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সংবাদপত্র ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় আন্দোলন প্রসারের অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার ছিল বলে ব্রিটিশ সরকার সংবাদপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবার চেষ্টা করত। কেননা ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের দাবী ও তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের কোনো আগ্রহ ব্রিটিশ সরকারের ছিল না। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন প্রকার কঠোর বাধা-নিষেধ জারী করে অনেকগুলো Press Act প্রণয়ন করেছিল। এই ঘটনাই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিকাশে সংবাদপত্রের নিশ্চিত ভূমিকার জ্বলন্ত প্রমাণ।

সূচনাকাল থেকেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ জনসাধারণকে জাতি-সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে সংবাদপত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিল এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার ব্যাপারে সবরকম প্রয়াসের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিরোধ চালিয়েছিল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের ইতিহাস তাই জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অন্যতম মৌলিক গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিবর্তনের সর্বপর্যায়েই এই ধারণা প্রবল ছিল এবং এই অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রামও করা হয়েছে।

বিদেশী জাতির দ্বারা শাসিত ভারতবর্ষের এই পরিস্থিতির দরুন ব্রিটিশের মধ্যেও স্বাধীন ভারতীয় সংবাদপত্রের বিষয়টি একটা বিতর্কিত প্রশ্ন হয়ে উঠেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন ওয়েলেসলী, মিন্টো, অ্যাডাম, ক্যানিং এবং লিটন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কঠোর নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী ছিলেন তখন হেস্টিংস, মেটকাফ, মেকলে এবং রিপন ভারতবর্ষে কমবেশি স্বাধীন সংবাদপত্রের পক্ষপাতী ছিলেন।৫

বিদেশী জাতি একটা অনগ্রসর জনসাধারণকে শাসন করত ও স্বাধীন সংবাদপত্র সৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খলা ভীষণভাবে ব্যাহত করবে এই যুক্তিতে স্যার টমাস মুনরো এবং লর্ড এলফিনস্টোনের মত উদারপন্থী ব্রিটিশ নেতারাও ভারতীয় সংবাদপত্রের ওপর কঠিন নিয়ন্ত্রণ চেয়েছিলেন।৬

ছাপাখানার বিরুদ্ধে পীড়নমূলক নীতির ইতিহাস

ঐতিহাসিকভাবে অবশ্য ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাস অকিঞ্চিৎকর উত্থান-পতন সত্ত্বেও উত্তরোত্তর স্বাধীনতা হ্রাসেরই ইতিহাস। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে দেখা যায় যে জাতীয়তাবাদ যে পরিমাণ বেড়েছিল ভারতবর্ষে সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা সেই অনুপাতেই খর্ব করা হয়েছিল।

ভারতীয় জাতীয়াবাদী সংবাদপত্রের পথপ্রদর্শক রাজা রামমোহন রায় ভারতীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্যও প্রথম সংগ্রামী ছিলেন। অ্যাডামের আমলে যখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর আক্রমণ করা হয় তখন তিনি চন্দ্রকুমার ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, দ্বারকানাথ ঠাকুর, গৌরীচরণ ব্যানার্জী এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মত বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের সংগে কলকাতার সুপ্রীম কোর্টে পেশ করার জন্য একটা আবেদনপত্রের খসড়া করেন।

আবেদনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর এই পরিকল্পিত আক্রমণকে অগণতান্ত্রিক, বিবেচনাহীন ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে নিন্দা করা হয়েছিল। এই আবেদনে স্বাক্ষরকারীরা ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পথপ্রদর্শক। মিস্ সোফিয়া স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পথপ্রদর্শক। মিস্ সোফিয়া কোলেট এই আবেদনপত্রকে 'ভারতীয় ইতিহাসের Areopagitica' বলে উচ্চপ্রশংসা করেছেন। রমেশচন্দ্র দত্ত এই আবেদনপত্রটিকে 'আজ তাদের দেশের লোকেরা এতটা মূল্য দিতে শিখেছে যে রাজনৈতিক অধিকারের তারই জন্য সাংবিধানিক বিক্ষোভের পদ্ধতির' সূচনা হিসাবে বর্ণনা করেছেন।৭

মার্কুইস অফ ওয়েলেসলী ১৭৯৯ সালে একজন সরকারী অনুমোদনাধিকারী নিযুক্ত করেন। সমস্ত বিষয় প্রকাশনার পূর্বে পরীক্ষা করার দায়িত্ব তার ছিল এবং যারা নির্দেশ ভংগ করতেন তাদেরকে শাস্তি দেবার জন্য কঠোর নিয়ম প্রণয়নেরও অধিকার ছিল। ১৮১৮ সালে হেস্টিংস প্রেস সেন্সর প্রথা বিলোপ করেন এবং প্রায় সব রকমের নিয়ন্ত্রণ তুলে দেন। এর ফলে প্রকাশনার ক্ষেত্রে আপেক্ষিক স্বাধীনতার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এই পরিবেশে ভারতীয়দের মধ্যে সংবাদপত্র প্রকাশে উৎসাহ সঞ্চার হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৮২২ সালে প্রকাশিত 'বোম্বাই সমাচারে'র কথা উল্লেখ করা যায়।

১৮২৩ সালে ভারতবর্ষের অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল অ্যাডাম সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে নিপীড়নমূলক নীতি নিয়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁর জাতীয়তাবাদী সহযোগীরা এর প্রতিবাদ করেছিলেন। সুপ্রীম কোর্ট অবশ্য তাঁদের আবেদন নাকচ করে দেয়। ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত সংবাদপত্র এই নতুন নিয়ন্ত্রণের অধীনে থেকে যায়।

উদারপন্থী মেকলের সাহায্যে মেটকাফ ১৮৩৫ সালে বাংলা ও বোম্বাইতে নিয়ন্ত্রণ বাতিল করে দিয়ে একটা আইন প্রণয়ন করেন। এই আইন অনুযায়ী বই ও কাগজ ছাপানোর জন্য আর অনুমতির প্রয়োজন রইল না।

১৮৫৭ সাল পর্যন্ত মুদ্রণের বেশ ভাল রকমই স্বাধীনতা ছিল। সিপাহী বিদ্রোহ লর্ড ক্যানিংকে ১৮৫৭ সালের প্রেস আইন পাশ করতে প্ররোচিত করেছিল। কঠোর বিধিনিষেধ ছিল বলে এই আইন 'কণ্ঠরোধী আইন' নামে পরিচিত ছিল। এই আইন অনুযায়ী সরকার মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠা নিয়ন্ত্রণ করতে পারত এবং ইচ্ছে করলে ছাপানো পুস্তক ও পত্রিকার প্রচারও বন্ধ করতে পারত। এই আইনটি অবশ্য কেবলমাত্র এক বছরের জন্যই কার্যকর হওয়ার কথা ছিল।

১৮৬৭ সালে প্রণীত The Press and Registration of Books Act বই এবং খবরের কাগজ মুদ্রণ ও প্রকাশনার স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছিল। ১৮৭৮ সালে Vernacular Press Act প্রণীত হয়। দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র দ্রুত বিস্তার লাভ করছিল এবং ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনা ও জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর মুখপত্র হয়ে উঠেছিল। এই আইন দ্বারা দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়।

উদার মতাবলম্বী লর্ড রিপন ১৮৮২ সালে এই Vernacular Press Act বাতিল করে দিয়েছিলেন।

১৯০৮ সাল পর্যন্ত ভারতীয় সংবাদপত্র বেশ খানিকটা স্বাধীনতা ভোগ করেছিল। যাই হোক আগের দশ বছরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দ্রুত প্রসারের দরুন সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করতে চাইল। ১৯০৮ সালে Newspaper (Incitement to Offences) Act এবং ১৯১০ সালে Indian Press Act প্রণীত হয়।

স্যার জেন্‌কিন্স ও ১৯১০ সালের প্রেস অ্যাক্ট

এতাবৎ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতীয় সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থাগুলির মধ্যে ১৯১০ সালের প্রেস অ্যাক্টই সব থেকে কঠোর। এই আইন সংবাদপত্র ও তার স্বাধীন ক্রিয়াকর্মের ওপর শাসকবর্গের ক্ষমতা বিশেষভাবে বাড়িয়ে দেয়। এই আইনে প্রশাসকদের অত্যধিক পরিমাণ জামিন আদায়ের ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং সেই জামিন ইচ্ছেমত বাজেয়াপ্ত করা যেত; আইন ভঙ্গকারী কোনো সংবাদপত্রের মুদ্রণযন্ত্র বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতাও তাদের দেওয়া হয়। বিচারালয়ে আবেদন করার অধিকার স্বীকৃত ছিল বটে, কিন্তু এই অধিকারের বিশেষ কোনো মূল্য ছিল না। ভারতীয় কোর্টের একজন ইংরেজ বিচারক স্যার লরেন্স জেন্‌কিন্স মন্তব্য করেছেন: '৪ ধারার শর্তসমূহ খুবই ব্যাপক, আর ভাষা ততটাই ছড়ানো যতটা মানুষের উদ্ভাবনায় সম্ভব। এটা ভাবা খুবই কঠিন যে একটি উদ্ভাবনী মন আইনের এই ধারার পরিধি কতদূরই না প্রসারিত করতে পারেন। তা নিশ্চয়ই সেই সব লেখা পর্যন্ত ধাওয়া করবে যার অনেকগুলিরই এমনকি অনুমোদনও অবধারিত···দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের সেই হতমান অংশের ওপর এই এক আক্রমণ আর এই এক ব্যাপক বিস্তারিত জালের মধ্যে এসে পড়বে অন্যদের লজ্জা; এক শ্রেণীর প্রশংসা করাটাও আর ঝুঁকিহীন থাকবে না। প্রামাণ্য সাহিত্য বলেই যা স্বীকৃত তারই এক বড় অংশই নিঃসন্দেহেই ধরা পড়বে এই জালে।'৮

পরোক্ষে উল্লিখিত ৪ নম্বর ধারা ১৯১০ সালের প্রেস অ্যাক্টের অংশ। পরে এই ধারা ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালের দুই অ্যাক্টেই অন্তর্ভুক্ত হয়।

ভারতীয় হাইকোর্টের একজন ইংরেজ বিচারপতির এই মন্তব্য ১৯১০ সালের প্রেস অ্যাক্টের নিপীড়নমূলক চরিত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ।

এই আইন ও পূর্বেকার সব আইনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী জাতীয়তাবাদী বিক্ষোভের ফলে ১৯২২ সালে Press Law Repeal and Amendment Act প্রণীত হয়। এতে ১৯১০ সালের Press Act ও ১৯০৮ সালের Newspaper Act নাকচ করে দেওয়া হয় এবং Press and Registration of Books Act এবং Post Office Act শিথিল করে দেওয়া হয়।

১৯৩১ এবং ১৯৩২ সালের প্রেস অ্যাক্ট : তাৎপর্য

১৯৩০ সাল পর্যন্ত ভারতীয় সংবাদপত্র কিছুটা স্বাধীনতা ভোগ করেছিল। ১৯২২ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গণপ্রকৃতি হ্রাস পেয়েছিল ও স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ১৯২৯ সালে আন্দোলনের নতুন তরঙ্গ জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সরকার সংবাদপত্রের অধিকার সংকুচিত করার সিদ্ধান্ত করে। ১৯৩১ সালে The Indian Press Emergency Powers Act প্রণীত হয়। ১৯৩২ সালে Emergency Powers Ordinances-এর অন্তর্ভুক্তির ফলে আইনটি আরও জোরদার ও ব্যাপক হয়। ১৯৩২ সালের Criminal Law Amendment Act-এর ১৪, ১৫ এবং ১৬নং ধারা অনুযায়ী এই আইনকে সংশোধিতও করা হয়। '১৯৩২ সালের সংশোধনী আইন (Ordinance Act) প্রেস আইনকে আরও কঠোর করে তোলে, এর পরিধি প্রসারিত করে এবং ১৯৩১ সালের আইনের চেয়েও অনেক বেশি ক্ষমতা শাসকবর্গের হাতে তুলে দেয়।'[৯]

১৯৩১ সালের Press Law এবং এর পরবর্তী সংশোধিত রূপ ভারতীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রচণ্ডভাবে সংকুচিত করেছিল। এই আইনে জামিন চাওয়া এবং তা বাজেয়াপ্ত করার ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়। এর পরিধি এতই ব্যাপক ছিল যে মধ্যপন্থী অথবা উদারপন্থী খবরের কাগজগুলোও এর আয়ত্তের মধ্যে এসে যায়। আইনে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছিল যে সংবাদপত্রের অধিকতর নিয়ন্ত্রণই এর লক্ষ্য। যেসব নতুন অপরাধ দমনের উদ্দেশ্যে এই আইনটি প্রণীত হয়েছিল তার মধ্যে ছিল সেইসব প্রকাশনা যেগুলো প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে 'মহামান্য সম্রাট অথবা ব্রিটিশ ভারতবর্ষে আইন মোতাবেক সরকার কিংবা বিচার বিভাগ অথবা মহামান্য সম্রাটের প্রজাদের কোনো শ্রেণী বা অংশ সম্বন্ধে ঘৃণা বা অবমাননা সৃষ্টি করে অথবা মহামান্য সরকারের প্রতি আনুগত্য নষ্ট করে'। ভীতিপ্রদর্শন, প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ, ভূমিরাজস্ব আদায়, কৃষিজমির খাজনা অথবা অন্যান্য বিষয়ে বকেয়া আদায়ে বাধা প্রদান, সরকারী চাকুরেদের পদত্যাগ করতে উস্কানি দেওয়া, সম্রাটের প্রজাদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিদ্বেষের মনোভাব জাগিয়ে তোলা, প্রভৃতি অপরাধের জন্যও এই আইনে দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।[১০]

ফলতঃ এই আইনটির পরিধি খুব ব্যাপক ছিল। 'আইনটির ধারাগুলির বিশ্লেষণ করলে···দেখা যায় যে ছাপাখানা কি করবে বা করবে না সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ অফিসার ও স্থানীয় প্রশাসনের ওপর ন্যস্ত হয়েছে।'১১

আইনটি যে অতিশয় কঠোর একথা সরকার নিজেই স্বীকার করে নেয়। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত হোম মেম্বার স্যার হেনরী হেগ কেন্দ্রীয় আইনসভায় মন্তব্য করেছিলেন যে, 'মহাশয় এই আইনে যে যে বিধান দেওয়া আছে···তা যে কোনো দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সম্পাদকের কাছে বিরক্তিকর—একথা আমি তো স্বীকার করিই—সরকারও পুরোপুরি স্বীকার করে। এই ধরনের বিধান অনেক-গুলিই আছে। মহাশয় সুপরিচালিত কাগজগুলো যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় আমি তা ভালভাবেই জানি।'১২

১৯৩২ সালে প্রেস আইন অনুসারে সরকার প্রায়ই কোনো কোনো প্রদেশের পত্রিকায় কতকগুলো খবর প্রকাশ নিষিদ্ধ করত। অথচ অন্য প্রদেশের খবরের কাগজে সেই সংবাদই প্রকাশিত হত। এই আইন আরও কিছু কিছু ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছিল যেমন 'দুই কলমব্যাপী শিরোনাম, সংবাদ বিন্যাস এমনকি একটা সংবাদ কিভাবে এবং কাগজের কোন জায়গায় ছাপানো হবে, কোন কোন রাজনৈতিক নেতার ছবি ছাপানো হবে ইত্যাদি। ভারতীয় সাংবাদিক ও প্রচারকগণ এইগুলো পীড়াদায়ক নিয়ন্ত্রণ বলে মনে করতেন।

১৯৩২ সালের Foreign Relations Act অনুযায়ী 'কয়েকটি বৈদেশিক রাষ্ট্রের সংগে মহামান্য সম্রাটের সরকারের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষতিসাধন' করতে পারে—এইরকম রচনা প্রকাশ দণ্ডনীয় হলো। ১৯৩৪ সালে Indian States (Protection) Act প্রণীত হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য হল 'মহামান্য সম্রাটের অধীনস্থ ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রশাসনকে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ, আনুগত্য নাশে প্ররোচনামূলক কার্যকলাপ এবং বাধাবিপত্তি থেকে রক্ষা করা।' এই আইন অনুসারে 'ভারতের যে কোনো দেশীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রশাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণা বা অবমাননাত্মক বা আনুগত্য নাশে প্ররোচনামূলক' রচনা প্রকাশও দণ্ডনীয় বলে গণ্য হল। এই আইন দুটিতে ভারতীয় সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা আরও সংকুচিত হল।

তিনটি সংবাদ পরিবেশন সংস্থা

১৯৪১ সাল নাগাদ দেশে তিনটে প্রধান সংবাদ পরিবেশন সংস্থা ছিল, রয়টার, Associated Press এবং Free Press News Service. সরকার প্রথম দুটি সংস্থার কাছ থেকে সংবাদ নিত ও সরকারী খবর প্রচারের জন্য তাদের ব্যবহার করত। তৃতীয়টা ছিল একটা ভারতীয় সংস্থা যা জাতীয়তা-বাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে সংবাদ নির্বাচন ও সরবরাহ করত।

রয়টার (যার প্রতি সরকারের সমর্থন ছিল) ভারতবর্ষে সবরকমের বিদেশী খবর সরবরাহ করত ও বহির্বিশ্বে ভারতীয় খবর সরবরাহ করত। এ ব্যাপারে রয়টারের বস্তুত একচেটিয়া অধিকারের দরুন ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা বহি-

রয়টারের বস্তুত একচেটিয়া অধিকারের দরুন ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা

বহির্বিশ্বে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতীয় ঘটনাসমূহের প্রচারে বাধা পেতেন।

ব্রিটিশ সরকারের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য করে রয়টার বহির্জগতে কোনো কোনো সংবাদ পাঠাতে বিলম্ব করত। 'অমৃতসরের নির্বিচার গণহত্যার ঘটনা প্রায় সাত মাস ধরে আটকে রাখা ছিল এবং ব্রিটেনের জনসাধারণ এ সম্পর্কে খুব সামান্যই বুঝতে পেরেছিল…।'১৩

যেসব ভারতীয় সংবাদ সংস্থায় কাজ করতেন তাঁরা জানতেন যে বিভিন্নভাবে সরকারী সাহায্য ভিন্ন সংবাদ সংস্থা দাঁড় করানো যায় না। 'আমরা বেশ বুঝতে পারছি যে যতদিন পর্যন্ত সরকার কোনো সংবাদ সংস্থার প্রতি আর্থিক বা অন্য কোনো উপায়ে পক্ষপাতিত্ব দেখাবে ততদিন অন্য সংস্থার পক্ষে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব।'১৪

কয়েক ধরনের বিদেশী গ্রন্থাদি, প্রধানত বামপন্থী গ্রন্থাদি আমদানীর ওপর বাধানিষেধ ছিল। Sea Customs Department-এ একটা অংশ ছিল যারা এই নিষেধ কার্যকরী করত। এই নিষেধাজ্ঞা ভারতীয় জনসাধারণকে অন্যান্য দেশের কিছু কিছু আন্দোলন ও মতাদর্শ সম্পর্কে পর্যাপ্ত সংবাদ সংগ্রহে বাধা দিত।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সবসময়ই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হ্রাস করার বিভিন্ন সরকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাত। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করবার জন্য সরকার যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং সংগঠন তার সমালোচনা করেছেন। এর মধ্যে ছিলেন রাজা রামমোহন রায় ও তাঁর মত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পথপ্রদর্শক-বৃন্দ, উদারপন্থীরা, চরমপন্থীরা, বেশান্তপন্থী হোমরুলবাদীরা, গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, সমাজতন্ত্রীরা, কমিউনিস্টরা, ছাত্র সংগঠনগুলো, ট্রেড ইউনিয়নগুলো, কিসানসভাগুলো, নিখিল ভারত নাগরিক স্বাধীনতা সংঘ ইত্যাদি।

এতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রসার ও অগ্রগতিতে সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই প্রতীয়মান হয়।

ভারতীয় জনসাধারণের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য চেষ্টা করত নিখিল ভারত নাগরিক স্বাধীনতা সংঘ। এরাও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিল।

এছাড়া ছিল আরও কতকগুলো সংগঠন যথা, নিখিল ভারত সাংবাদিক সমিতি, নিখিল ভারত সম্পাদক সম্মেলন এবং প্রগতিশীল লেখক সম্মেলন। এরা সবাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিল।

ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রগতিশীল ভূমিকা

সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক পর্যায়ে ভারতীয় জাতীয়তা-বাদ এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তুলতে ও তার প্রসার ঘটাতে সংবাদ-পত্রের একটা শক্তিশালী ভূমিকা ছিল।

সংবাদপত্রের মাধ্যমে রাজনৈতিক শিক্ষা ও প্রচারের যে সুবিধা ছিল রাজনৈতিক দিক দিয়ে জাতীয় আন্দোলন তার জন্যই সম্ভবপর হয়েছিল। এর সাহায্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীরা প্রতিনিধিমূলক সরকার, মুক্তি, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, হোমরুল, ডোমিনিয়ন মর্যাদা এবং স্বাধীনতা ইত্যাদির ধারণা জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় করে তুলতে পেরেছিল। সংবাদপত্রের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদীরা ব্রিটিশ সরকারের কার্যকলাপ এবং শাসনব্যবস্থার সমালোচনা করতে পারত এবং জনসাধারণকে রাজনৈতিক সমস্যা বুঝতে শেখাতে পারত।

তাদের নিজ নিজ কর্মসূচী, নীতিসমূহ, সংগ্রামপদ্ধতি মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তুলতে এবং ব্যাপকভিত্তিক সংগঠন গড়ে তুলতে জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর হাতে সংবাদপত্র ছিল একটা হাতিয়ার।

সংবাদপত্র ছাড়া জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলোর সর্বভারতীয় সম্মেলনের প্রস্তুতি এবং অনুষ্ঠান সম্ভব হত না, বড় বড় রাজনৈতিক আন্দোলনও সংগঠিত এবং পরিচালিত করা যেত না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় কংগ্রেসের কর্মী এবং কংগ্রেসের সমর্থকরা ১৯৩০-৩২-এর গণ-আন্দোলনের সময় তাদের কার্যাবলী ও নীতিসংক্রান্ত নির্দেশের জন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতা গান্ধীর Young India-র প্রতিই লক্ষ্য রাখত।

সংবাদপত্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটা শক্তিশালী অস্ত্র ছিল বলে বিভিন্ন মতাবলম্বী স্বদেশীদের সকলেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সব পর্বেই দৃঢ়ভাবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিল।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় আন্দোলন গঠনে সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এই ঘটনাতেই প্রমাণিত হয় যে 'ভারতবর্ষে রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে কেশবচন্দ্র সেন, গোখলে, তিলক, ফিরোজশা মেহতা, দাদাভাই নওরোজী, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, সি. ওয়াই. চিন্তামণি, এম. কে. গান্ধী এবং জওহরলাল নেহেরু পর্যন্ত বিখ্যাত নেতৃবর্গের সকলেই নিজেদের "নৈতিক মূল্যবোধ" সংক্রান্ত আদর্শ প্রচারের মাধ্যম হিসাবে সংবাদপত্র ব্যবহার করেছেন এবং এখনও করছেন।'১৫

দেশের বিভিন্ন অংশে বসবাসকারী বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক, দ্রুত এবং অবিরাম মতামত বিনিময় একমাত্র সংবাদপত্রের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছিল। ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের সূচনা ও বিস্তার বিভিন্ন প্রদেশের জনসাধারণের মধ্যে একটা নিকটতর সামাজিক ও মননগত যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। এর ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ে অন্তর্প্রদেশীয় এবং জাতীয় সহযোগিতার কর্মসূচী নিয়ে দৈনন্দিন ও ব্যাপক আলোচনা সম্ভব হত এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে জাতীয় সম্মেলন করা সম্ভব হত। এইসব সম্মেলনে গৃহীত কর্মসূচী দেশব্যাপী রূপায়ণের জন্য জাতীয় কমিটিও নিয়োগ করা হয়েছিল। ফলে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ ও জটিল, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জাতীয়তা গড়ে উঠতে লাগল।

সংবাদপত্র প্রাদেশিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রসারেও সহায়তা করেছিল। এইসব সাহিত্য আপাততঃ প্রাদেশিক হলেও এদের বিষয়বস্তুতে ছিল জাতীয়। বাংলা, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, গুজরাত, মালাবার এবং সংযুক্ত প্রদেশ এবং অন্যান্য

প্রদেশে সমৃদ্ধ প্রাদেশিক সাহিত্য কাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি শাখায় বিকাশ লাভ করেছিল।

জাতগত বাধা, বাল্যবিবাহ, বিধবার পুনর্বিবাহে নিষেধ প্রভৃতি যেসব সামাজিক, আইনগত ও অন্যান্য বৈষম্য নারীজাতিকে ও অন্যান্যদের ভোগ করতে হত সেইসব সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করার ব্যাপারে সংবাদপত্র সমাজ সংস্কারকদের কাছে একটা শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি অমানবিক ব্যাপারের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার সংগঠনেও সংবাদপত্র সাহায্য করেছিল। ভারতীয় সমাজের গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের নীতি, কর্মসূচী ও পদ্ধতি জনসাধারণের কাছে প্রচার করাতে সংবাদপত্র সংস্কারকদের সহায়ক হয়েছিল। সংবাদপত্রের সাহায্যেই সমাজ সংস্কারকগণের পক্ষে দেশ-ব্যাপী সামাজিক দুর্নীতি অবসানের উদ্দেশ্যে সবচেয়ে কার্যকর কর্মসূচী প্রচার করা এবং এই সম্পর্কে সর্বদা আলোচনা চালানোর ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছিল এবং সর্বোতগ্রাহ্য নীতি প্রণয়নের জন্য নিখিল ভারত সামাজিক সম্মেলনগুলো অনুষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছিল।

তাছাড়া সংবাদপত্র ভারতীয় জনসাধারণকে আন্তর্জাতিক দুনিয়ার ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেছিল। বিভিন্ন জাতিকে বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করতে এবং মোটামুটিভাবে বিশ্বের উন্নতির সংগে সামঞ্জস্য রেখে তাদের নিজ দেশের জাতীয় কর্মসূচী ও নীতি প্রণয়ন করার ব্যাপারে সংবাদপত্র অন্যতম হাতিয়ার ছিল। বিভিন্ন দেশের প্রগতিশীল গোষ্ঠীর মধ্যে সংহতির বন্ধন গড়ে তোলার ব্যাপারেও সংবাদপত্রের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে উত্তরোত্তর প্রবল জাতীয় আবেগ ও সচেতনতা সৃষ্টি করতে, ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তুলতে ও সংহত করতে, জাতীয় ও প্রাদেশিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি গড়ে তুলতে এবং বহির্বিশ্বের অন্যান্য প্রগতিশীল জনগণ ও শ্রেণীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন সৃষ্টি করতে সংবাদপত্রের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

পরিপূর্ণ বিকাশের পূর্বশর্ত

ভারতবর্ষে স্বাধীন, ব্যাপক সম্প্রসারিত ও প্রগতিশীল সংবাদপত্র গড়ে তোলার ব্যাপারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ছিল প্রধান বাধা।

(১) সরকার কর্তৃক সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বাধা আরোপ

(২) জনসাধারণের ব্যাপক দারিদ্র্য যার ফলে শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেও পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশনা বিক্রি কম হত।

(৩) গণ নিরক্ষরতা।

(৪) কয়েকটি ধনী ব্রিটিশ ও ভারতীয় গোষ্ঠীর দ্বারা সংবাদপত্রের এক-চেটিয়া নিয়ন্ত্রণের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা (সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর একচেটিয়া বৃদ্ধি অর্থনীতিতে একচেটিয়া বৃদ্ধির প্রতিফলন মাত্র)।

সুতরাং যুক্তিসংগতভাবে এটাই প্রমাণিত হয় যে ভারতীয় জনসাধারণের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মান হিসাবে ব্যাপক ও স্বাধীন সংবাদপত্রের ব্যবহার শুধুমাত্র ব্রিটিশ শাসনমুক্ত এবং বিদেশী ও ভারতীয় স্বার্থমুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষেই সম্ভব হতে পারে।

সূত্র নির্দেশ

১ Laski, Tawney, Kropotkin দ্রষ্টব্য।
২ O'Malley, পৃ. ১৮৯ দ্রষ্টব্য।
৩ উপরিউক্ত, পৃ. ১৮৯।
৪ উপরিউক্ত, পৃ. ১৮৮।
৫ O'Malley, Margarita Barns দ্রষ্টব্য।
৬ Margarita Barns, পৃ. ২৫১ দ্রষ্টব্য।
৭ R. C. Dutt, O'Malley-তে উদ্ধৃত।
৮ Indian Law Reports, No. 41 (Calcutta).
৯ Report of the Indian Delegaticn, পৃ.২৮৬।
১০ উপরিউক্ত, পৃ.২৯০-১।
১১ উপরিউক্ত, পৃ. ২৯২।
১২ উপরিউক্ত, পৃ. ২৯২।
১৩ R. P. Dutt, পৃ. ৩৫।
১৪ Margarita Barns (2), পৃ. ১৮৮।
১৫ Margarita Barns, পৃ.XV ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সামাজিক এবং ধর্মসংস্কার আন্দোলনসমূহ ঃ জাতীয় গণতান্ত্রিক চেতনার অভিব্যক্তি

সংস্কার আন্দোলন ঃ জাগ্রত জাতীয়তাবাদের অভিব্যক্তি

ব্রিটিশ শাসনের আমলে ভারতবর্ষে বিভিন্ন সমাজসংস্কার ও ধর্মসংস্কার আন্দোলনগুলো ছিল ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে জাগ্রত জাতিসচেতনতা ও পাশ্চাত্যের উদার ধারণা বিস্তারেরই প্রকাশ। এই আন্দোলনগুলো ক্রমেই সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে জাতীয় আকার ও পুনর্গঠনের কর্মসূচী নেওয়ার দিকে ঝুঁকছিল।

সামাজিক ক্ষেত্রে ছিল জাতপ্রথার সংস্কার অথবা বিলোপ, নারীজাতির সমানাধিকার, বাল্যবিবাহ এবং বিধবাদের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে, সামাজিক ও আইনগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ও আন্দোলন।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল ধর্মীয় কুসংস্কার ঠেকাতে ও মূর্তি-পূজা, বহু ঈশ্বরবাদ আর বংশানুক্রমিক পুরোহিত প্রথায় আঘাত করতে।

এই আন্দোলনগুলো বিভিন্ন মাত্রায় ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সামাজিক সাম্যের নীতির ওপর গুরুত্ব দিয়েছিল ও তার জন্যে সংগ্রাম করেছিল এবং জাতীয়তা-বাদের সপক্ষে ছিল।

ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকেই ভারতবর্ষে যে নতুন সমাজ গড়ে উঠেছিল তার প্রয়োজনগুলি ছিল স্পষ্টতই পুরানো সমাজের প্রয়োজনের থেকে আলাদা।

উদার পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ নব্য বুদ্ধিজীবীরা এই প্রয়োজনগুলো বুঝতে পেরেছিল। তারা অতীত থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সামাজিক প্রথা, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও নৈতিক ধ্যানধারণাগুলোকে সংস্কার করার জন্য অথবা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার জন্য আন্দোলন সংগঠিত করেছিল কেননা তারা এগুলোকে মনে করত জাতির অগ্রগতির পথে বাধা। তারা নিশ্চিত ছিলেন যে ব্যক্তিস্বাধীনতা, মানবিক ব্যক্তিত্ব প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা এবং সামাজিক সাম্যের মত উদার নীতিগুলির ভিত্তিতেই একমাত্র নতুন সমাজ রাজ-নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত হতে পারে।

নতুন সমাজের প্রয়োজনের উপযোগী করে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গণতন্ত্রী-করণের এবং পুরানো ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর নবরূপায়ণের জন্য ভারতীয় জন-সাধারণের সচেতন এবং প্রগতিশীল গোষ্ঠীরা যে সংগ্রাম করেছিল সংস্কার আন্দোলনগুলো তারই প্রতিভূ।

ভারতীয় সমাজ-সংস্কারকদের অভিযোগ ছিল যে ভারতবর্ষে সমাজ-সংস্কারের মন্থর অগ্রগতির জন্য ব্রিটিশ সরকারের যথেষ্ট সমর্থনের অভাবই দায়ী। তারা বলেছেন যে দেশে সামাজিক অন্যায় ও প্রতিক্রিয়ার দুর্গ ভাঙতে ব্রিটিশ সরকার তাদেরকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করে নি, সমাজ-সংস্কারমূলক আইন প্রণয়নের হার ছিল অত্যন্ত মন্থর এবং সাধারণতঃ দেশের অগ্রসর গোষ্ঠীর মতবাদের চাপে তা করা হত। একথা সত্যি যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রিটিশ শাসকেরা নিজেরাই দাসপ্রথা, সতীদাহ এবং শিশুবলি বন্ধ করার মতো প্রগতিশীল আইনের সূচনা করেছিল। কিন্তু পরে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়। বস্তুতঃ ১৮৯১ সালে গৃহীত Age of Consent Act একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ সমাজসংস্কার আইন যা সরকার এর আগের বহু দশকের মধ্যে গ্রহণ করেছিল।

এটি ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের দৃঢ়তা আরো জোরদার করেছিল যাতে তারা ভারতবর্ষে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য সেই ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে।

সংস্কার আন্দোলনের গণতান্ত্রিক চেতনা

জন্মলগ্ন থেকেই ভারতীয় জাতীয়বাদ গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা অনুভব করেছে। সমাজসংস্কার ও ধর্মসংস্কার আন্দোলন এই আকাঙ্ক্ষাগুলোকে মূর্ত করেছিল। এই আন্দোলনগুলো বিভিন্ন মাত্রায় সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিশেষাধিকার অবসান, দেশের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের গণতন্ত্রীকরণ, জাতীয় ঐক্যের বিঘ্নস্বরূপ জাতিভেদের মতো বিচ্ছিন্নতাজনক প্রথার সংস্কার বা বিলোপ করতে চেয়েছিল। তারা চেয়েছিল জাতবর্ণ ও নারীপুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত ব্যক্তির সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে।

সমাজ-সংস্কারকরা প্রতিপন্ন করেছেন যে ভারতীয় জনসাধারণের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি অর্জন করার জন্য দৃঢ় জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে সামাজিক সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠানসমূহের গণতান্ত্রিকীকরণ একান্ত প্রয়োজন।

এই জাতীয় গণতান্ত্রিক জাগরণ জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রেই প্রকাশ পেয়েছিল। রাজনীতিতে এই চেতনা প্রশাসনিক সংস্কার, স্বায়ত্তশাসন, হোমরুল, ডোমিনিয়ন মর্যাদা ও সর্বোপরি স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল। সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ব্যক্তি স্বাধীনতা, সাম্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতিসমূহ প্রচার করেছিল। জাতীয়তাবাদ আঘাত হেনেছিল জন্মগত পার্থক্যের অগণতান্ত্রিক নীতি এবং জন্মসূত্রে বিশেষ সুবিধা ভোগের নীতিকে যার ওপর ভিত্তি করে বর্ণাশ্রম লালিত হয়েছিল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ তাই মূলে ছিল গণতান্ত্রিক এবং তাই মধ্যযুগীয়তা ও বিদেশী শাসন উভয়েরই বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল। সমাজসংস্কার ও ধর্মসংস্কার আন্দোলনগুলো ছিল ভারতবর্ষের জাতীয় চেতনার অভিব্যক্তি এবং এর লক্ষ্য ছিল মোটামুটি গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মানবিক সাম্যের ভিত্তিতে মধ্যযুগীয় সামাজিক কাঠামো ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটানো।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

জাতপ্রথার বিরুদ্ধে জেহাদ

জাতপ্রথা, 'হিন্দুধর্মের ইস্পাতকাঠামো'

হিন্দুদের জাতপ্রথা হিন্দুসমাজকে অসংখ্য পরস্পরবিচ্ছিন্ন উঁচুনীচু পর্যায়বদ্ধ এবং জন্মসূত্রে নির্ধারিত গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছিল। এই জাত-ভেদ প্রথাই হিন্দুসমাজের সমাজসংস্কারক আন্দোলনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল।

জাতপ্রথা 'হিন্দুসমাজের ইস্পাতকাঠামো' বলে অভিহিত। এই প্রথা বেদের থেকেও পুরানো কেননা বেদেও এর কথা উল্লিখিত আছে। মনে হয় আদিতে হিন্দুসমাজ তিনটে কি চারটে বর্ণে বিভক্ত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ, ভৌগোলিক বিস্তার ও কারিগরি বিদ্যার উন্নয়নজনিত নূতন নূতন বৃত্তির উদ্ভব, প্রভৃতি কারণে বর্ণসমূহ অসংখ্য ছোট ছোট জাত ও উপজাতে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

অতীতে হিন্দুধর্ম সমস্ত হিন্দুর মধ্যে সাংস্কৃতিক একতা প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু জাতপ্রথা সামাজিকভাবে হিন্দুদের ক্রমবর্ধমান হারে গোষ্ঠী অথবা উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত করে ফেলেছিল। বিবাহ, বৃত্তি, ভোজন ইত্যাদি সবরকম মূলগত সামাজিক বিষয়ে প্রতিটি গোষ্ঠী অথবা উপগোষ্ঠী ছিল পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

জাতপ্রথা ছিল অগণতান্ত্রিক ও কর্তৃত্বপরায়ণ। জাতসমূহ ক্রমপর্যায়ে বিন্যস্ত। প্রত্যেকটি জাতই ওপরের পর্যায়ে অবস্থিত জাতসমূহ থেকে নিকৃষ্ট এবং নিম্নতর পর্যায়ে অবস্থিত জাতসমূহ থেকে উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হত। ক্রমপর্যায়ে বিন্যস্ত জাতসমূহের মধ্যে কার কোন্ পর্যায়ভুক্ত জাতে জন্ম হয়েছে তাই দিয়ে তার মর্যাদা নির্ধারিত হত। কোনো একটা বিশেষ জাতে জন্ম হলে মর্যাদা তদনুসারে পূর্বনির্ধারিত বলে গণ্য হত। এই অবস্থার পরিবর্তন ছিল অসম্ভব। জন্মসূত্রে যে মর্যাদা মানুষ পেত মেধা বা ধনসম্পদ কিছু দিয়েই তার পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না।

অনুরূপভাবে যে জাতে যার জন্ম হয়েছে সেই অনুসারে তার বৃত্তিও পূর্ব-নির্ধারিত থাকে। এক্ষেত্রে করবার কিছু নেই। জন্মসূত্রেই মানুষের বৃত্তি নির্ধারিত হত।

প্রতিটি জাত অথবা উপজাত সাকুল্য বিবাহের নিয়মদ্বারা পরিচালিত হত। এক জাতের মানুষ অন্য জাতের কাউকে বিয়ে করতে পারত না। এইভাবে জন্ম দ্বারা কার কোথায় বিবাহ হবে এবং বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্রপাত্রী নির্বাচন নির্ধারিত হত।

'জাতপ্রথায় জন্মগত আভিজাত্য স্বীকৃত, গুণগত স্বীকৃতি এতে নেই। জাতপ্রথার ফলে ব্যক্তির মেধা ও যোগ্যতা স্বচ্ছন্দে ও স্বাভাবিকভাবে বিকাশ-লাভ করতে পারে না। প্রেরণা, আত্মবিশ্বাস ও উদ্যমের মনোভাব জাতপ্রথার প্রভাবে পঙ্গু হয়ে উঠেছে। জাতীয়তাবোধের বিস্তার ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠন প্রচেষ্টাও জাতপ্রথা দ্বারা ব্যাহত হয়। এই প্রথাই অস্পৃশ্যতা সমস্যার সৃষ্টি করেছে'।১

ক্রমপর্যায়ে বিন্যস্ত বলে জাতব্যবস্থা সামাজিক ও আইনগত অসাম্যের মধ্যে নিবদ্ধ। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্‌। সামাজিক পিরামিডের সবার ওপরে ব্রাহ্মণ জাতের অবস্থান। সবরকম ধর্মীয় ও বৈষয়িক শিক্ষা ও জ্ঞানের অধিকার-সহ পৌরোহিত্য করার একচেটিয়া অধিকার ব্রাহ্মণেরই ছিল। আর একেবারে নিম্নস্তরে ছিল শূদ্র জনসাধারণ আর তার সঙ্গে ছিল অস্পৃশ্যগণ ও এমনকি যাদের ছায়া মাড়ানো যায় না তারা। হিন্দুধর্ম দ্বারা অনুমোদিত এবং হিন্দু রাষ্ট্রের নিপীড়নমূলক ক্ষমতার সাহায্যে পরিপুষ্ট হিন্দুসমাজ বিন্যাস অনুসারে অপরাপর জাতের সেবা করাই শূদ্রাদি জাতের বৃত্তি হিসাবে নির্দিষ্ট হয়েছিল এবং কঠোর শাস্তিবিধানের কারণে বাধ্য হয়ে জঞ্জাল, ময়লা সাফ, চামড়া পরিষ্কার প্রভৃতি কাজ করত। জাতপ্রথার একান্ত বৈশিষ্ট্য এই যে তার ভিত্তিবৃত্তির বিভিন্নতার ওপর ছিল না।

বৃত্তির বিভিন্নতার ওপর জাতের ভিত্তি। এইটাই জাতের একান্ত বৈশিষ্ট্য নয়। জাতের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এই যে জন্মদ্বারা সামাজিক গোষ্ঠী পরিচয় নির্ণীত হয়। "এতদ্বারা শুধুমাত্র যে সাম্য অস্বীকৃত হচ্ছে তাই নয়, একান্ত-ভাবে উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে নির্ধারিত অসাম্য সংগঠিত করা হয়েছে। যে কোনো সমাজেই পার্থক্য থাকবে, যে কোনো অবস্থাতেই বৃত্তির পার্থক্য হবে। পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী এইটা মেনে নিয়ে জাতগড়া হয়েছিল বলে জাত বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ তা নয়। যে উপায়ে পার্থক্য বিন্যস্ত হয়েছে এবং নিয়ন্ত্রিত হয় সেইটাই এর বিশিষ্টতার কারণ।"২

জাত বনাম শ্রেণী

জন্মসূত্রে মানুষের জাত নির্ধারিত হত বলে কারও পক্ষে জাত পাল্টানো যেত না। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত আধুনিক শ্রেণীর সঙ্গে জাতের পার্থক্য এইখানেই।

'জাত হল অনুন্নত জীবনচর্চাসম্পন্ন গোষ্ঠী। কে কোন্‌ জাতের অন্তর্গত হবে সেটা কোনো স্বেচ্ছাসংঘ বা শ্রেণীতে ঢোকার মত ইচ্ছে অনিচ্ছের ওপর নির্ভর করত না, জন্মের ওপর নির্ভর করত। আধুনিক ইউরোপের শ্রেণী-সমাজে যেমন মানুষের সম্পদের ওপর মানুষের মর্যাদা নির্ভর করে, জাতের ক্ষেত্রে তা হত না ; ভাগ্যবলে যে ব্যক্তি যে জাতে জন্মেছে সেই জাতের ঐতিহ্য-গত গুরুত্ব অনুসারে তার মর্যাদা নির্ধারিত হত। সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠী হিসাবে জাত ও শ্রেণীর পার্থক্য সম্পর্কে MacIver বলেছেন, "প্রাচ্য সভ্যতায় শ্রেণী ও পদমর্যাদা নির্ধারিত হয় প্রধানত জন্ম দ্বারা, আজকের পাশ্চাত্য সভ্যতাতে সম্পদই হল শ্রেণী নির্ণয়ের সমতুল্য অথবা সম্ভবত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ

উপায়। শ্রেণী নির্ণয়নের প্রশ্নে জন্মগত পরিচয় অপেক্ষা সম্পদগত পরিচয় অনেকটা নমনীয়; সম্পদগত পরিচয় অনেকটা নির্দিষ্ট বলে এর ওপরে কোন শ্রেণী পরিচয়ের কথা বললে সেটাকে সহজেই চ্যালেঞ্জ করা চলে। সম্পদগত পরিচয় পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত হয় বলে এর ফলে গুণগত পার্থক্য সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা কম। সম্পদ অর্জন করতে হয়, সম্পদ নাশ হতে পারে, হস্তান্তরিত করা চলে বলে জন্মগত পরিচয়ের মত সম্পদগত পরিচয় মানুষে মানুষে স্থায়ী বিভেদরেখা টেনে দেয় না।"৩

'সর্বসাধারণের প্রতি প্রযোজ্য আইন ব্যতিরেকে শ্রেণীবিশেষের অন্তর্গত লোকের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য বা নৈতিক প্রশ্নে পরিচালিত করবার উদ্দেশ্যে শ্রেণীগত কোন স্থায়ী বা নৈমিত্তিক সমিতি নেই।'৪

বস্তুতপক্ষে অন্যায়কারী সদস্যকে সমাজ থেকে বহিষ্কার করা, জরিমানা করা এমনকি শারীরিক সাজার মত শাস্তি দেওয়ার আধা-আইনগত ক্ষমতা পঞ্চায়েতের ছিল। লোকে আগে জাত মানত, তার পরে সমাজ মানত। এর ফলে স্বভাবতই মানুষের মনে সামাজিক সংহতির বোধ দুর্বল হয়ে গিয়েছিল।

প্রত্যেক জাতেরই আচার আচরণের বিধি সম্বন্ধে নিজস্ব ধারণা ছিল বলে যে কোনো জাতের সঙ্গে পৃথক নীতিবোধসম্পন্ন অপর জাতের সাংস্কৃতিক পার্থক্য ঘটত। এইভাবে প্রত্যেকটা জাত এক একটা স্বতন্ত্র সামাজিক-সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীতে পরিণত হত।

উপরন্তু জাতব্যবস্থা ধর্মদ্বারাপূত শাস্ত্রীয় মর্যাদা লাভ করেছিল। বলা হয় ভগবান ব্রহ্ম এর আদি উৎপত্তিস্বরূপ।৫ যদি কোনো ব্যক্তি তার জাতের বিধান অমান্য করত তবে তার আচরণ শুধুমাত্র জাতের প্রতি অপরাধ হত তাই নয়, ধর্মের বিরুদ্ধে পাপাচার বলে গণ্য হত। এইভাবে জাত বন্ধন ধর্ম দ্বারা সুরক্ষিত হয়েছিল।

বস্তুতপক্ষে হিন্দুধর্মের বিধান এই যে প্রত্যেকে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সামাজিক অবস্থা অর্থাৎ নিজ নিজ জাত পরিচয় সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেবে। কেননা জাতপ্রথা ঈশ্বরের বিধানমতে সৃষ্ট এবং জাত অনুসারে প্রত্যেকে নিজ কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করবে। একমাত্র এই উপায়েই মোক্ষ লাভ হতে পারে এবং মৃত্যুর পরে সমুন্নত দিব্যজীবন লাভ করতে পারে।

জাতপ্রথা বিবাহ, বৃত্তি, অন্যান্যদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি সামাজিক-সম্পর্ক ইত্যাদি মৌলিক বিষয়সমূহ মানুষের সমগ্র জীবন নিয়ন্ত্রণ করত, জাতের বিধিনিষেধ ধর্মানুমোদিত ছিল হিন্দুরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষমতা ও সেই সঙ্গে দণ্ডবিধানে জাতের নিজস্ব ক্ষমতা—এইসব কারণের দরুন মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে কিছুই থাকত না। ব্যক্তি তার বৃত্তি নির্বাচন করতে পারত না, যাকে সে ইচ্ছে করত, তাকে বিয়ে করতে পারত না, যে কোনো লোকের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতে পারত না। উপরন্তু সূক্ষ্মভাবে স্তরবিভক্ত জাত ক্রমপর্যায়ে যার যে পর্যায়ে জন্ম হয়েছে সেই পর্যায় অনুসারেই তার সামাজিক মর্যাদা এবং রাষ্ট্রের আইনের চোখে তার স্থান নির্ধারিত হত।

আইন সকলের প্রতি সমভাবে প্রযুক্ত হত না, জাত অনুসারে আইন প্রয়োগে পার্থক্য করা হত।

জাতব্যবস্থা পর্যায়ক্রমিক হবার ফলে বিভিন্ন জাতের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছিল। এমনকি বাসস্থানের ব্যাপারেও নিম্নতর জাতগুলোকে উচ্চতর জাতসমূহ থেকে আলাদা করা হত। গ্রামে এবং শহরে নিম্নতর জাতভুক্ত লোকেদের জন্য পৃথক পল্লী নির্দিষ্ট করে দেওয়া হত। উপরন্তু অস্পৃশ্য ও অন্যান্য অশুচি জাত অর্থাৎ জাত জর্জরিত হিন্দুসমাজে যারা একেবারে নিম্নতম পর্যায়ভুক্ত তাদেরকে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য পাতকুয়া অথবা পুকুর থেকে জল নেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হত। মন্দিরে প্রবেশের অধিকারও এদের ছিল না। জাতব্যবস্থার প্রশ্রয়ে সামাজিক অত্যাচার এতটাই অমানবিক হয়ে উঠেছিল যে নিম্নতম পর্যায়ভুক্ত কোনো কোনো জাতকে যে শুধুমাত্র অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত করা হত তাই নয় তাদের কাছেও যাওয়া চলত না। এমন লোককে দেখলেই কলুষিত হতে হত, শুধু তাই নয় তারা কেউ জ্ঞানতঃ অথবা অজ্ঞানতঃ শুচিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের দৃষ্টিপথে এসে পড়লে প্রায়শই তাকে অত্যন্ত নৃশংস শাস্তি ভোগ করতে হত।[৬]

জাতব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

উচ্চনীচ পর্যায়ভেদ, সামাজিক বৈষম্য, সাকুল্যবিবাহ, আহারাদি সংক্রান্ত বাধানিষেধ এবং বাধ্যতামূলক পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি জাতব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

"সংক্ষেপে বলতে গেলে প্রত্যেক ভাষা অঞ্চলে জাত বলে পরিচিত সুনির্দিষ্ট নামবিশিষ্ট প্রায় দুইশত গোষ্ঠী ছিল। এর যে কোনো একটায় জন্ম হলে তদনুসারে ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হত। এই জাতগুলো উপজাত নামে অভিহিত প্রায় দুই হাজার ক্ষুদ্রতর ভাগে বিভক্ত ছিল। এই ভাগগুলোর মধ্যেই বিবাহসম্পর্ক স্থাপিত হত, বাস্তবিক সামাজিক জীবন নির্ধারিত হত এবং নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে উঠত। অল্প কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া এই প্রধান গোষ্ঠীসমূহ যে একত্রিত ছিল তার কারণ সকলেই এক পুরোহিতকে মান্য করত।...এই গোষ্ঠীগুলো সর্বাধিক প্রসারিত সীমারেখায় এই ব্যবস্থা পুরোপুরি মেনে নেবার ফলে এবং গ্রামে এদের সামাজিক ও আর্থিক পরস্পর নির্ভরতার ফলে এদের একান্ত সংগঠনসমূহ ব্যবস্থাটা ভেঙে কতকগুলো স্বতন্ত্র একক তৈরী করতে পারে নি। বরং নাগরিক জীবনে সমন্বয় সৃষ্টি করেছিল। এই সমন্বিত রূপে প্রতিটি অংশের মূল্য অবশ্যই সমান নয়, অংগগুলো একে অপরের অধীনস্থ।"[৭]

ভারতীয় জনগণের নীচু মানের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার জন্য জাতব্যবস্থা জোরদার হয়েছিল এবং শতাব্দীকাল ধরে রয়ে গিয়েছিল। যে প্রাক্-পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যার ওপর জাতব্যবস্থা নির্ভর করত তা প্রধানতঃ অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা, যথোপযুক্ত বিনিময় সম্পর্ক প্রসারের অনুপস্থিতি এবং অত্যন্ত দুর্বল ও যৎসামান্য যানবাহন ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে চলত।

অতীতে জাতব্যবস্থার যেটুকুও বা উপযোগিতা ছিল, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ

অধিকারের ফলে সৃষ্ট সামাজিক, আর্থিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এবং তার সুদূরপ্রসারী ফলাফলে সেটুকুও বিনষ্ট হয়ে গেল।

জাতব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান বিভাজনের কারণ

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অধিকারের ফলে যে নতুন আর্থিক রূপ ও পদ্ধতির সূচনা হয়েছিল তার ফলে জাতের আর্থিক ভিত্তি ধ্বংস হয়ে গেল। গ্রামীণ আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার বিনাশ, জমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সূচনা এবং দেশের দ্রুতভাবে শিল্পায়ণের ফলে নতুন বৃত্তি সৃষ্টি হয়েছিল এবং আধুনিক শহর গড়ে উঠেছিল। এইসব ঘটনার প্রভাবে জাতসম্পর্কিত অনেকগুলি বাধানিষেধ লোপ পেতে থাকে। রেলওয়ে এবং বাস পরিবহণের প্রসারের দরুন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই প্রথম ব্যাপকভাবে যাতায়াতের সুযোগ তৈরী হয়েছিল। এর ফলে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক যোগাযোগের পথ প্রশস্ত হয়। স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় যেভাবেই হোক না কেন জনসাধারণের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বাড়তে লাগল। এইসব কারণে জাতের বৃত্তিগত ভিত্তি ক্ষয় হতে থাকে এবং জাতবদ্ধভাবে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন থাকবার অভ্যাস নষ্ট হয়ে যেতে থাকে।

সম্পত্তি সম্পর্কিত নতুন ব্যবস্থার প্রভাব

একদিকে ভূমিতে সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত অধিকার পত্তন এবং সেই অধিকার ইচ্ছেমত ব্যবহার করবার ব্যবস্থা হওয়াতে আর অপরদিকে শিল্পগত, বাণিজ্যিক, প্রশাসনিক এবং ডাক্তারি ও ওকালতির মত আধুনিক পেশার সুযোগ সৃষ্টি হওয়াতে গ্রামে যৌথ পরিবারের মধ্যে বহির্মুখী প্রবণতা দেখা দিল। পরিবারের লোকেরা অনেকেই শহরে গিয়ে অন্যান্য বৃত্তি অবলম্বন করতে লাগল। এদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করবার ঝোঁক বেড়ে যেতে লাগল।

নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা এবং তার সঙ্গে ভারতীয় কৃষির কৃৎকৌশলগত অনগ্রসরতা, কৃষকদের ক্রমবর্ধমান ঋণভার কুটিরশিল্পের ধ্বংস ও আনুপাতিক হারে শিল্পোন্নয়ন না হবার দরুন কৃষির ওপর অতিরিক্ত চাপ ইত্যাদি কারণে একশ্রেণীর কৃষক শহরে চলে আসতে বাধ্য হয়। শহরে তারা কারখানা শ্রমিক বা গৃহভৃত্য হয়ে দিনযাপন করত। এতেও জাতব্যবস্থার পেশাগত ভিত্তি অসংবদ্ধ হয়ে পড়ে।

জাতের নিয়মভঙ্গ করলে শাস্তি দেওয়ার যে ক্ষমতা জাত পঞ্চায়েতের ছিল ব্রিটিশ সরকার সে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল। এর ফলে এবং অর্থোপার্জনের প্রয়োজনীয়তা ও নতুন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে উদ্ভূত নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার কারণে লোকে জাতব্যবস্থা অনুযায়ী উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ পূর্বপুরুষের বৃত্তি পরিত্যাগ করে অন্য পেশা অবলম্বন করতে লাগল। জাতের বিধান মেনে পুরোহিত অথবা শিক্ষক হওয়ার পরিবর্তে ব্রাহ্মণ সন্তান ডাক্তারী বা ব্যবসা করতে লাগল অথবা কারখানার মালিক বা কেরানী বা বিমানচালক হল। "অর্থনৈতিক প্রয়োজনে অথবা উচ্চাশার দরুন শিক্ষিত ব্রাহ্মণরা চামড়ার কারবারের মত কাজও করছে। পঞ্চাশ বছর আগে এরকম কথা শুনলে লোকে শিউরে উঠত।"[৮]

আধুনিক নগরজীবনের প্রভাব

আধুনিক শিল্পের প্রয়োজনে সর্বজনের ব্যবহার্য হোটেল, রেস্তোরা, থিয়েটার এবং ট্রামবাস ও রেল পরিবহণ ব্যবস্থা সমন্বিত আধুনিক শহরের উদ্ভব হয়। অপর জাতের লোকের সান্নিধ্যে পান, ভোজন বা খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে ছোঁয়াছুঁয়ির যেসব বিধিনিষেধ বিভিন্ন জাতের লোকে মেনে চলত সেসব ক্রমে ক্রমে ভেঙে পড়তে লাগল। কর্মসূত্রে অথবা সামাজিক অনুষ্ঠানে অন্য জাতের লোক এমনকি অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মেলামেশা করার প্রয়োজনীয়তা সেই ভাঙন ত্বরান্বিত করেছিল। "ইউরোপীয়দের সঙ্গে মেলামেশার ফলে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্মেলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে সব জাতের এবং যাদের মধ্যে জাত নেই তাদের নারী-পুরুষ একত্রিত হচ্ছে।"[৯]

একজন ব্রাহ্মণ শিল্পপতি তাঁর সহযোগী একজন শূদ্র শিল্পপতির সঙ্গে তাজ হোটেলে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেন। শ্রমিক ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর উপযোগী অল্প খরচের হোটেল ও রেস্তোরাতে সব জাত এমনকি সব ধর্মাবলম্বী লোকে ভীড় করে।

ট্রেন ও বাসে প্রায়ই নীচু শ্রেণীর লোক এমনকি অস্পৃশ্যদের সঙ্গেও গা ঘেঁষাঘেষি করে চলতে হয়। আধুনিক সমাজজীবনের জন্য যেসব জিনিস প্রয়োজন সেগুলো জাত বা সম্প্রদায় অনুসারে কেউ পাবে বা পাবে না এমনটা হয় না। মূল্য দিতে পারলে সকলেই এইসব জিনিস পেতে পারে।

তবে একথা মনে করা ঠিক হবে না যে জাতপ্রথা লোপ পেয়ে গিয়েছিল। এমনকি শহরেও গোঁড়া লোকেরা খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে জাতের বিধিনিষেধ নিষ্ঠাভরে মেনে চলবার আপ্রাণ চেষ্টা করত। এইসব প্রথার উত্তরোত্তর ভাঙনের ঐতিহাসিক প্রবণতা সম্বন্ধেই এতক্ষণ আলোচনা করা হল।

নতুন আইন ব্যবস্থার প্রভাব

প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে হিন্দুসমাজের মধ্যে উদগ্র সামাজিক ও আইনগত বৈষম্য প্রচলিত ছিল। সারা দেশে এক ধরনের আইন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ব্রিটিশ সরকার এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার ওপর প্রবল আঘাত করেছিল। আগে অপরাধীর জাতগত মর্যাদা অনুসারে তার শাস্তির পরিমাণ নির্ধারিত হত। হিন্দু রাষ্ট্র জাত এবং গ্রাম পঞ্চায়েত একই অপরাধের জন্য বিভিন্ন জাতের অপরাধীর বিভিন্ন ধরনের শাস্তির বিধান করত। ব্রিটিশ আমলে আইনের দৃষ্টিতে জাত-নির্বিশেষে সকলের সমান মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হল।

ব্রিটিশ সরকার জাত পঞ্চায়েতের জাত থেকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল। ফলে অবাধ্য লোককে জোর করে বশ্যতা স্বীকার করাবার ক্ষমতা আর জাত পঞ্চায়েতের হাতে রইল না। জাত স্বেচ্ছাসংগঠনে পরিণত হল। জাতের বিধিনিষেধ ভঙ্গ করবার অপরাধে জরিমানা অথবা তদ্রূপ কোনো শাস্তি দেবার আইনগত অধিকার জাতের হাতে থাকল না। এতে জাতের ক্ষমতা অনেকটাই কমে গিয়েছিল।

১৮৫০ সালের Caste Disabilities Removal Act, ১৮৭২ সালের Special Marriage Act এবং ১৯২৩ সালের Special Marriage Amendment Act প্রভৃতি আইন জাতব্যবস্থারূপ সৌধটিকে দুর্বল করে দিয়েছিল।

নতুন সামাজিক গঠনের প্রভাব

নতুন আর্থিক ব্যবস্থা আর্থিক ক্ষেত্রে জনসাধারণকে নতুন শ্রেণীবিভাগে বিভক্ত করল। পূর্বের কর্তব্যমূলক বিভাগের ওপর ভিত্তি করে জাতের যে শ্রেণীবিভাগ গড়ে উঠেছিল তার সঙ্গে এই নতুন কর্তব্যমূলক বিভাগের সাদৃশ্য নেই। ভারতীয় জনসাধারণ এখন নতুন শ্রেণীবিভাগে বিভক্ত হল যথা পুঁজি-বাদী, শ্রমিক, স্বত্ববান কৃষক, বণিক, প্রজা, ক্ষেতমজুর, ডাক্তার, উকিল, কারিগর ইত্যাদি। বিভিন্ন জাত এবং সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের নিয়ে প্রত্যেকটি শ্রেণী গঠিত ছিল কিন্তু এদের সবারই জাগতিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থ ছিল এক। নতুন শ্রেণীব্যবস্থার এই আনুভূমিক বিভাগের প্রভাবে জাতব্যবস্থার পুরানো প্রলম্ব বিভাজন পদ্ধতি উত্তরোত্তর শিথিল হয়ে উঠল। এইভাবে গড়ে উঠল অনেক নতুন নতুন সংগঠন যথা Millowners' Association, All India Trade Union Congress, All India Kisan Sabha, Landlords Union ইত্যাদি। এই গোষ্ঠীগুলো তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য সংগ্রাম করত। এই সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় তারা গড়ে তুলল একটা নতুন চেতনা এবং দৃষ্টিভঙ্গী ও নতুন সংহতি, এসব কিছুই গোষ্ঠীর সভ্যদের জাত সচেতনতা ধীরে ধীরে দুর্বল করে দিল। এই শ্রেণীসংগঠনগুলো এবং এইসব গোষ্ঠীর একত্রিত কার্য-কলাপ দ্রুত ভারতীয় জনসাধারণকে নতুন দৃষ্টিভংগী এবং অভ্যাসে শিক্ষিত করে তুলল।

শ্রেণীসংগ্রামের প্রভাব

ধর্মঘট সংগ্রামে শুধুমাত্র উঁচুজাতের শ্রমিকরাই নয় অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও মজুরি বাড়ানো এবং কাজের শর্তাবলী উন্নত করার সাধারণ উদ্দেশ্যে সম্মিলিতভাবে সংগ্রাম করেছিল। অনুরূপভাবে জাতিনির্বিশেষে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বা চামার, পুঁজিপতিরাও শ্রমিকদের বিরুদ্ধে নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য একত্রিত হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে শ্রেণীগত একতাবন্ধনে মুসলমান অথবা খ্রীস্টান পুঁজিপতিরাও আবদ্ধ হয়েছিল। ঐতিহাসিক প্রবণতাটা ছিল শ্রেণীবন্ধনকে আরো জোরদার করার দিকে ও জাতের বন্ধনকে দুর্বল করার দিকে। কেননা শ্রেণী সমসাময়িক অর্থনৈতিক বাস্তবতা, সমাজের নতুন আর্থিক বিভাগ এবং শ্রেণীভুক্ত সমস্ত লোকের একই রকমের বৈষয়িক স্বার্থের ওপর নির্ভরশীল।

উপরন্তু শ্রেণী জাতীয় অর্থনীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে যখন জাতের ভিত্তি ছিল পেশা তখন জাত শুধুমাত্র স্থানীয় শহর অথবা গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর নির্ভর করত। সমগ্র কৃষককুল অথবা সকল কারিগরের সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কোনো বৈষয়িক স্বার্থ ছিল না, কেননা কৃষকেরা ও কারিগরেরা অসংখ্য স্বয়ংশাসিত গ্রামে অথবা শহরে ছোট ছোট

স্থানীয় গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। স্থানীয় গোষ্ঠীর কৃষক ও কারিগরদের স্বার্থ শুধুমাত্র স্থানীয় পর্যায়ে আবদ্ধ ছিল।১০ সুতরাং তারা স্থানীয় পর্যায়ে ঐক্যবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালের সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী অথবা মিল মালিক ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর সংঘবদ্ধ ঐক্যের মতো তা ছিল না।

পেশার বিভিন্নতার ফলে আয়ের পার্থক্য দেখা দিল এবং তার ফলে জীবন-যাত্রার মানও পৃথক হয়ে গেল। এতে মানসিক অভ্যাস, দৃষ্টিভংগী এবং আশা-আকাঙ্ক্ষারও পার্থক্য সৃষ্টি হল। জাতপ্রথাবিরোধী প্রবণতা বেড়ে যেতে লাগল। কেবলমাত্র পুরোনো মানসিক অভ্যাস, নিষ্ক্রিয়তা, নৈতিক সাহসের অভাবের দরুন জাতপ্রথাবিরোধী মনোভাব থেকে জাতপ্রথার বিরুদ্ধে কোনো বড় রকমের বিদ্রোহ দেখা দেয় নি।

আধুনিক শিক্ষার প্রভাব

জাতের প্রতি আস্থা শিথিল হবার ব্যাপারে আধুনিক শিক্ষার ভূমিকাকে কম করে দেখলে চলবে না। প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতবর্ষে শিক্ষার যেটুকু ব্যবস্থা ছিল তার সবটাই ব্রাহ্মণদের নির্দেশে পরিচালিত হত . এবং ধর্মের সংগে অংগাংগীভাবে জড়িত ছিল। জাতপ্রথা হিন্দুধর্মের দ্বারা স্বীকৃত বলে তার একটা ধর্মীয় মাহাত্ম্য ছিল। ধর্মের সংগে অংগাংগীভাবে জড়িত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভাব মানুষকে জাতব্যবস্থা মেনে নিতে শেখাত, মানুষকে জাত সচেতন করে তুলত। মানুষ জাতব্যবস্থাকে দৈবাদিষ্ট বলে মনে করত এবং জাতের বিধি লঙ্ঘন করা পাতক বলে গণ্য করত। প্রাক্-ব্রিটিশ শিক্ষার অন্যতম কাজ ছিল মানুষের মনে হিন্দু সমাজের জাতব্যবস্থা সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ সঞ্চার করা ও মানুষকে জাতব্যবস্থা সম্পর্কে উৎসাহী করে তোলা।

ব্রিটিশ সরকার শিক্ষাকে ধর্মের শাসন থেকে মুক্ত করে দিয়েছিল। ব্যয়ভার বহন করতে পারলে জাত বা সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেই শিক্ষালাভ করতে পারত। কিছু কিছু বিকৃতি ও সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বিষয়বস্তুর প্রশ্নে এই শিক্ষা উদার ছিল। এই শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে কতকগুলো নীতি প্রসার লাভ করে যথা ঃ আইনের চক্ষে সব মানুষ সমান, সকল নাগরিকের সমানাধিকার, নিজের ইচ্ছেমত পেশা অবলম্বনে সকলের সমান স্বাধীনতা। এই শিক্ষা ইউরোপীয় উদারনৈতিক ভাবধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রতিনিধিমূলক সংগঠন, সভাসমিতি করার স্বাধীনতা ইত্যাদি এই শিক্ষাব্যবস্থার ফলে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এটা ঠিক যে ব্রিটিশ শাসন ভারতীয় জাতির ওপরে একটা বিদেশী আধিপত্য সুতরাং অগণতান্ত্রিক তবু এও অস্বীকার করা যায় না যে ব্রিটিশ শাসকরা যে শিক্ষা চালু করেছিল সেটা ধর্মনিরপেক্ষ এবং মূলতঃ উদারপন্থী ছিল। প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষা ছিল জাতব্যবস্থার অনুবর্তী এবং সুবিধা-ভোগীদের পরিপোষক। এর সংগে তুলনায় ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষার এই বৈশিষ্ট্য স্বীকার করতে হবে।

হিন্দু সমাজের শিক্ষিতশ্রেণীর একটা অংশ যারা পাশ্চাত্যদেশের উদারপন্থী দর্শন ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতি সম্পর্কে চর্চা করেছিলেন তাঁরা জাতপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অগ্রণী হলেন। রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর,

কেশবচন্দ্র সেনের মত শিক্ষিত ভারতীয়দের গোষ্ঠীসমূহ জাতব্যবস্থার সংস্কার-সাধনে প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। বস্তুতঃ এটা তাদের কার্যক্রমের মৌলিক বিষয়ের অন্তর্গত ছিল।

হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরে শিক্ষা যতই প্রসারিত হতে লাগল ততই হিন্দু-সমাজের বহুকালব্যাপী বিড়ম্বিত মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার প্রবণতা সঞ্চারিত হতে আরম্ভ করল। এর ফলে দাক্ষিণাত্যের আত্মমর্যাদার আন্দোলন এবং ডঃ আম্বেদকরের নেতৃত্বাধীন নিপীড়িত শ্রেণীর আন্দোলনের মত আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ডঃ আম্বেদকর নিজেই ছিলেন একজন অধস্তন সমাজের লোক।

রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রসারে জাত সম্পর্কে সচেতনতা অনেকটা শিথিল হয়ে গিয়েছিল। বিদেশী শাসন ভারতীয় জনসাধারণকে জাতীয় পর্যায়ে একত্রিত হতে সর্বদাই উৎসাহিত করেছে। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রাম পরিধি ও ব্যাপকতায় যত বেড়েছে সংকীর্ণ স্থানীয়, প্রাদেশিক, জাত ও সাম্প্রদায়িক সচেতনতাও ততই দুর্বল হয়ে পড়েছে। লিবারেল ফেডারেশন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং ঐ ধরনের অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে কর্মসূচী, কৌশলগত নীতি ও সংগ্রাম পদ্ধতির প্রশ্নে অনেক পার্থক্য ছিল। কিন্তু এদের কোনোটাই জাত বা সম্প্রদায়ের ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয় নি। এই সংগঠনগুলো জাত ও ধর্মনির্বিশেষে সমস্ত ভারতীয়কেই তাদের সভ্য করবার চেষ্টা করত। এরা ভারতবর্ষের জন্য যে রাজনৈতিক কাঠামোর পরিকল্পনা করত তাতেও কোনো জাতসম্পর্কিত সুযোগসুবিধার স্থান ছিল না।

ভারতীয়দের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা জোরদার করার ব্যাপারে ১৯২০-২-এর অসহযোগ আন্দোলন বা ১৯৩০-৩-এর আইন অমান্য আন্দোলনের অবদান প্রভূত। কার্যক্রম বা সংগ্রাম পদ্ধতির বিচারে না গিয়েও বলা যায় যে এইসব আন্দোলনের মধ্যে জাতীয় চেতনা আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং এই আন্দোলনগুলোর মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় সচেতনতা গভীরতর ও ব্যাপকতর হয়েছিল।

এইভাবে জাতীয় আন্দোলনের প্রসার হিন্দুদের মধ্যে জাতের চেতনা কিয়দংশে কমিয়ে দিয়েছিল।

বস্তুতপক্ষে শ্রেণী ও জাতীয় আন্দোলন উভয়েই ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে জাতসম্পর্কিত চেতনা শিথিল করে দিয়েছিল।

জাতব্যবস্থার প্রতিক্রিয়াশীল তাৎপর্য

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আমলে প্রবর্তিত সমসাময়িক আর্থিক উন্নতির পক্ষে জাতব্যবস্থা বিঘ্নস্বরূপ হয়ে দেখা দিয়েছিল। জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করার ব্যাপারে অপরিহার্য যে জাতীয় একতা তার প্রসারের পক্ষেও জাতব্যবস্থার ভূমিকা অনুরূপ। শিল্পবিকাশের জন্য প্রচুরসংখ্যক শ্রমিক সংগ্রহ করা দরকার ছিল। জাতের কড়া নিয়ম অনুসারে প্রত্যেককে বাধ্যতামূলকভাবে বংশানুক্রমিক

পেশায় নিয়োজিত হতে হত বলে শিল্পক্ষেত্রে পর্যাপ্তসংখ্যক শ্রমিক যোগাড় করার অসুবিধা হত। জাতের প্রতি আনুগত্য সর্বোপরি হওয়াতে লোকের পক্ষে সবরকম বাধ্যবাধকতা অতিক্রম করে জাতীয়তাবাদের অনুবর্তী হওয়া সহজসাধ্য ছিল না। কুটীর শিল্প ধ্বংস হওয়াতে এবং কৃষির ক্রমবর্ধমান অবনতির দরুন কারিগর এবং কৃষিজীবীগণ উপায়ান্তরহীন হয়ে অন্য পেশা অবলম্বন করেছিল। ব্যক্তিস্বাধীনতার মত গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রসার শিক্ষিত ভারতীয়দের জাতভেদ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই বিক্ষোভ থেকেই জাতপ্রথাবিরোধী আন্দোলনসমূহ জন্মলাভ করেছিল এবং ধীরে ধীরে প্রবল হয়ে উঠেছিল। তবে জাতব্যবস্থার প্রধান স্তম্ভ স্বজাতে বিবাহ প্রথা লুপ্ত হয় নি।

সামাজিক জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও সমাজসংস্কারে জাতব্যবস্থাই অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল। 'দেশের এইদিকটাতে অর্থাৎ গুজরাটের কথা বলছি, সবরকম সমাজ সংস্কারের সবথেকে বড় বাধা হল জাত।'[১১]

ভারতীয় জনসাধারণের শিক্ষিত গোষ্ঠী জাতব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছিল। নতুন ভারতবর্ষে জাতব্যবস্থার অসংগতি তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন। জাতীয় স্বাধীনতার জন্য এবং উন্নত রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের জন্য জাতকাঠামোর সংস্কার করতে হবে অথবা একেবারে লোপ করে দিতে হবে। ব্যক্তির উদ্যমকে জাতের কঠিন বন্ধন থেকে মুক্ত করতে হবে। একমাত্র এই উপায়েই ভারতীয় জাতিভুক্ত সকল মানুষের সৃজনশীল শক্তির পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। জাতীয় অগ্রগতির জন্য দরকার জাতের শৃংখল থেকে ব্যক্তির মুক্তি। জাতের দ্বারা সৃষ্ট সবরকম সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ও অক্ষমতা বিলোপ করে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

মৃত্যুর পর মোক্ষ লাভ হবে এই আশায় লোকে জাতের বিধিনিষেধ মেনে চলত। সমাজসংস্কারকরা প্রচার করলেন যে দেশের অগ্রগতিই মানুষের উদ্দেশ্য।

জাতপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন

সমাজসংস্কারকরা মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থার মৌলিক ধারণাগুলো আক্রমণ করেছিলেন। এই ধারণাগুলোকে সংক্ষেপে এইভাবে বিবৃত করা যেতে পারে—বিচ্ছিন্নতা, অন্তরস্থ বিবেকের নির্দেশ অপেক্ষা বহিঃস্থিত শক্তির কাছে নতিস্বীকার ও জন্মসূত্রে মানুষে মানুষে কৃত্রিম প্রভেদের চেতনা···জাগতিক সমৃদ্ধির প্রতি সাধারণ ঔদাসীন্য যা হলো প্রায় নিয়তিবাদ মেনে নেবার মনোভাব। এগুলোই আমাদের প্রাচীন সমাজব্যবস্থার মৌলিক ধারণা। এই ধারণাসমূহের পরিণতি হলো এমন পারিবারিক বিন্যাসগুলো যাতে স্ত্রীলোকেরা পুরোপুরি পুরুষের অধীনস্থ হয়ে থাকত এবং নীচু জাত উঁচু জাতের অধীনস্থ হয়ে থাকত। ফলে মানুষের মনে মানবতার প্রতি স্বাভাবিক সম্ভ্রমবোধ থাকত না।[১২]

সমাজসংস্কারকরা বৈষম্য ও বিচ্ছিন্নতার বিরোধিতা করেছিলেন এবং সাম্য ও সহযোগিতার (উদারপন্থী বুর্জোয়া অর্থে) পক্ষপাতী ছিলেন। উত্তরাধিকার

সূত্রে মর্যাদাভেদের বিরুদ্ধে এবং অগণতান্ত্রিক ও কর্তৃত্বপরায়ণ জাতব্যবস্থার ধর্মীয় ও দার্শনিক তত্ত্ব কর্মবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করেন। মৃত্যুর পর মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা করার থেকে বরং যে ঐহিক পৃথিবীতে তারা বাস করে তারই উন্নতির জন্য কাজ করতে তাঁরা জনসাধারণকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁরা জাতব্যবস্থাকে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিস্তারের পক্ষে শক্তিশালী বিঘ্ন-রূপে অভিহিত করেছিল।১৩

বিভিন্ন সমাজসংস্কারক গোষ্ঠীরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জাতকে বিরোধিতা করতেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় হিন্দুদের প্রাচীন সামাজিক ধর্মীয় গ্রন্থ মহানির্বাণ-তন্ত্রের প্রমাণ উল্লেখ করে বললেন যে জাতব্যবস্থা লোপ পাওয়া উচিত। ব্রাহ্মসমাজ জাতব্যবস্থাসম্মত সামাজিক বাধানিষেধের বিরোধিতা করে বললেন, "যে ক্ষতিকারক ভেদবুদ্ধি আমাদের জাতের প্রাণশক্তি নিঃশেষে শোষণ করছে তার অবসান করে বিধাতা ভারতের জন্য যে মহান ভূমিকা নির্দিষ্ট করেছেন সেই দায়িত্ব বহনের জন্য দেশবাসী কবে উপযুক্ত শক্তি ও একতা অর্জন করবে? আমাদের সমস্ত সামাজিক গ্লানির মূল কারণ জাতব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস না হলে যে ভারত তার ভূমিকা পালন করতে পারবে না একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।"১৪

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বে রাজা রাম-মোহনের উত্তরসূরী ছিলেন। এঁরা রামমোহনের থেকেও আরো বেশী করে হিন্দুধর্মশাস্ত্রের সমালোচনা করতেন। কেশবচন্দ্র সেন কোনোরকম শাস্ত্র প্রমাণের অপেক্ষা না করে দ্ব্যর্থহীনভাবে জাতব্যবস্থার সমালোচনা করেছিলেন। সামাজিক বিদ্রোহের যে প্রেরণা রাজা রামমোহন রায় সঞ্চার করেছিলেন সেটা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠেছিল।

ব্রাহ্মসমাজ জাতবিরোধী আন্দোলন প্রথম সূচনা করেছিল। পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য সংগঠন সেই আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বোম্বাই প্রার্থনা সমাজ বস্তুতপক্ষে ব্রাহ্মসমাজের মত একই ধারার জাতবিরোধী প্রচার চালিয়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজ এবং প্রার্থনাসমাজ উভয়েই পুরোপুরি পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক প্রভাবে জাতব্যবস্থার নিন্দে করেছিল। বিপরীতপক্ষে স্বামী দয়ানন্দ প্রবর্তিত আর্যসমাজ জাতব্যবস্থা অগ্রাহ্য না করে শুধুমাত্র চার বর্ণের ভিত্তিতে বৈদিক যুগের হিন্দুসমাজ ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন চেয়েছিল। আর্যসমাজ অসংখ্য উপজাতিতে বিভক্ত হিন্দুসমাজের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বিভাগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে চতুর্বর্ণের ভিত্তিতে সমাজের পুনর্গঠন করবার চেষ্টা করত। উপরন্তু আর্যসমাজ নিম্নতন বর্ণ শূদ্রদেরও ধর্মশাস্ত্র-পাঠের অধিকার দেবার পক্ষপাতী ছিল।

অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজ এবং প্রার্থনাসমাজ যখন জাত নির্মূল করবার আন্দোলন করছিল। আর্যসমাজ তখন সবরকম উপজাত বিলোপ করে জাতকাঠামোকে নতুন করে গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিল।

ব্রাহ্মসমাজ, প্রার্থনাসমাজ এবং আর্যসমাজ বাদেও জাতের বিরুদ্ধে অপরাপর আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। তেলাঙ্গ, রানাডে, ফুলে, যাঁরা ১৮৭৩ সালে সত্যসাধক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মালাবারের কবি নর্মাদ এবং অন্যান্যরা

জাতপ্রথার বিরুদ্ধে জোর জেহাদ ঘোষণা চালিয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারতে আত্ম-মর্যাদা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। অব্রাহ্মণরা যেসব অপমানজনক বাধানিষেধে বিপর্যস্ত হত এই আন্দোলন তার বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছিল।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বামপন্থী নেতারা মনে করতেন যে প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক সংগঠনগুলো অপরিণত আর্থিক বিবর্তনের ওপর ভিত্তি করে চলে এবং ভারতীয় জনসাধারণের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা না থাকার জন্যই আর্থিক বিবর্তন অপরিণত রয়ে গেছে। সুতরাং ভারতীয় সমাজের সামাজিক পুনর্গঠনের জন্য জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করাই প্রথম কর্তব্য। ফলতঃ তাঁরা জাতব্যবস্থা বিলোপের প্রশ্নটি জাতীয় স্বাধীনতার সমস্যার সঙ্গে জড়িত বলে ভাবতেন। "সামাজিক সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা, অপরিণত আর্থিক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক পরাধীনতা থেকে প্রসূত এবং তারই পরিণাম। প্রক্রিয়াটি বিপরীতধর্মী বলে ভাবলে চলবে না।…মূল সমস্যাটা হল আর্থিক-রাজনৈতিক।"১৫

ভারতীয় জনসাধারণ যদি স্বায়ত্তশাসন লাভ করে একমাত্র তাহলেই ভারতীয় সমাজের আমূল পুনর্গঠন সম্ভব—এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তাঁরা অধিকতর শক্তি ও উদ্দীপনার সঙ্গে স্বরাজলাভের সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে রাজনৈতিক ক্ষমতা ভিন্ন গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজের পুনর্গঠন সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁরা সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন শিথিল করেন নি। অবশ্য তাঁদের কার্যক্রমে সমাজ পুনর্গঠন গৌণ স্থান লাভ করেছিল।

জাতব্যবস্থা অব্যাহত রাখার আন্দোলন

জাতব্যবস্থা দুর্বল করার ব্যাপারে কোনো সক্রিয় ভূমিকা না নেওয়ার অভিযোগে ব্রিটিশ সরকারের ব্যাপক সমালোচনা করা হত। কিছু কিছু ব্রিটিশ ঐতিহাসিক, সাংবাদিক এবং অধ্যাপক ব্রিটিশ রাজত্ব নিরাপদ রাখার উপায় হিসাবে জাতিভেদ টিঁকিয়ে রাখার পক্ষপাতী পর্যন্ত ছিলেন। "আমাদের শাসন-ব্যবস্থার স্থায়িত্বের জন্য জাতিভেদ মোটের ওপর প্রতিকূল নাও হতে পারে। যদি আমরা বিচক্ষণতা অবলম্বন করি এবং ধৈর্য ধারণ করে চলি তবে জাত-ব্যবস্থা আমাদের অনুকূল হতে পারে। এর শক্তি জাতীয় একতার বিরোধী"১৬ জেমস্ কার এই কথা বলেছেন।

আরো কতকগুলো ছোট ছোট কারণে জাত সম্বন্ধে সচেতনতা টিঁকে ছিল। ১৯২১ সালে সেন্সাসের দুইজন সুপারিন্টেন্ডেন্টের অন্যতম একজন Mr. Middleton পাঞ্জাবে জাতব্যবস্থার ওপরে ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"একথা জানান উচিত যে পেশাগতভাবে জাতগুলোকে শ্রেণীবদ্ধ করার বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ আছে ; লোকে মনে করে যে এই জাতগুলো বানানো হয়েছে এবং ব্রিটিশ সরকার এগুলোকে স্বতন্ত্র জাত হিসাবে টিঁকিয়ে রেখেছে। আমাদের ভূমিসংক্রান্ত দলিলপত্র এবং সরকারী কাগজপত্র জাতের প্রাচীন বিধি-নিষেধ সুদৃঢ় করে তুলেছে। আমরা প্রতিটি মানুষকে জাত অনুসারে পৃথক

পৃথক ভাগে বিভক্ত করেছি। কারও জাত নির্ধারণ করা সম্ভব না হলে পুরুষানুক্রমিক পেশা ধরে তার পরিচয় স্থির করা হয়েছে। আমরা জাতব্যবস্থা ও সামাজিক এবং আর্থিক সমস্যায় তার প্রভাবের নিন্দা করে থাকি কিন্তু যে ব্যবস্থার নিন্দা করি তার অস্তিত্বের জন্যে আমরাই অনেকাংশে দায়ী। নিজেদের মত থাকলে সোনার এবং লোহারের মত জাত দ্রুত লোপ পেয়ে যাবে···জাতগুলোর গায়ে উচ্চনীচ মর্যাদাসূচক দাগ দেওয়া এবং বিভিন্ন জাতকে ছোট ছোট ভাগে বিন্যস্ত করায় সরকার যে আগ্রহ দেখাচ্ছে তাতেই জাতব্যবস্থা দৃঢ়তর হচ্ছে।”১৭

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রসার ও তীব্রতা এবং অপরদিকে মালিক ও শ্রমিক এবং জমিদার ও কৃষকের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামের ফলে ধনীদের একাংশ জাতব্যবস্থা সমর্থনে প্রণোদিত হয়েছিল। এরা জাতব্যবস্থার সাহায্যে প্রসার্যমান জাতীয় ঐক্য এবং বিভিন্ন জাত ও সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রমিক ও কৃষকের শ্রেণী-ঐক্য বিপন্ন করবার চেষ্টা করতে লাগল। ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন জাতের অন্তর্গত শ্রমিক ও কৃষকেরা যখন তাদের সাধারণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ উপলব্ধি করতে পারল তখন তারা ক্রমান্বয়ে জাতের পরিবর্তে শ্রেণীসচেতন হয়ে উঠতে লাগল। তারা ট্রেড ইউনিয়ন, কিসান সভা, প্রজাদের সংগঠন, ক্ষেতমজুরদের ইউনিয়ন ইত্যাদি শ্রেণী সংগঠনে একত্রিত হতে লাগল এবং তাদের নিজেদের দল যথা সমাজতন্ত্রী দল অথবা কমিউনিস্ট পার্টি ইত্যাদি দল গঠন করতে লাগল। মালিক অথবা জমিদারের কাছ থেকে কাজের এবং জীবনযাত্রার উন্নততর ব্যবস্থা আদায়ের জন্য তারা সম্মিলিতভাবে সংগ্রাম করেছিল। স্বভাবতঃই মালিক ও জমিদার এ ব্যাপারগুলো ভালভাবে নেয় নি। তাদের মধ্যে যারা সব থেকে বেশী প্রতিক্রিয়াশীল তাঁরা জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান একতা ব্যাহত করার জন্য এমনকি জাতের মত প্রতিক্রিয়াশীল প্রথা কাজে লাগিয়েছিল।

পরপর প্রতিটি লোক গণনাতে হিন্দু জনসাধারণকে জাত অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করায় আপত্তি করা হত। এই সমালোচনার পেছনে যুক্তিটা ছিল এই যে, যে ভেদব্যবস্থা লোপ পাওয়া উচিত এর ফলে সেইটাই স্থায়িত্ব লাভ করছে। অন্যদিকে জাতপ্রথার গুণদর্শী লোক ছিলেন। এঁরা জাতব্যবস্থার গুণাবলী নির্দেশ করে বলতেন যে জাতব্যবস্থার জোরেই হিন্দুসমাজ সংহত আছে এবং বহিরাক্রমণ প্রতিহত করতে পারে। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বলেছিলেন, “অসন্তোষ থেকে এবং উচ্চশ্রেণী ও জনসাধারণ, মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ক্রমবর্ধমান তিক্ততার ফলে সভ্যতা বিপন্ন হয়ে উঠছে তার থেকে রক্ষা পাবার অব্যর্থ উপায় জাতব্যবস্থা।”১৮

স্বজাতের উপচীকির্ষা ও জাতের ভিত্তিতে গঠিত পারস্পরিক সহায়তামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতপ্রথা বিলোপের পথ ব্যাহত করেছিল। জাতসংহতির আবেগ ও জাতের মধ্যে কেন্দ্রাতিগ প্রবণতার ক্রমবর্ধমান প্রভাবে বিভিন্ন জাতের জাতসচেতন অগ্রণী ব্যক্তিগণ বিভিন্ন প্রকারে নিজ জাতের লোকেদের সাহায্য করার জন্য সভাসমিতি গড়ে তুলেছিলেন। নিজ জাতের দরিদ্র লোকেদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হত। কম ভাড়ায় কেবলমাত্র নিজজাতভুক্ত লোকেদের

ভাড়া দেবার জন্য ঘরবাড়ী তৈরি করা হয়েছিল। কেবলমাত্র নিজজাতভুক্ত ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা চালানোর জন্য বৃত্তি দেওয়া হত। শুধুমাত্র নিজ জাতভুক্ত লোকেদের উপকারের জন্য সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছিল।

এসব কিছুই জাত-সচেতনতা ও জাতের প্রতি আনুগত্য জোরদার করেছিল এবং জাতীয়তাবোধ ও প্রগতিশীলতা ব্যাহত করেছিল। আগে একটা জাত-গোষ্ঠী ছিল শহরের বৃত্তি সমবায় ও গ্রামসমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর্থিক লেনদেন বিশেষ না থাকায় অথবা পরিবহণের অসুবিধার দরুন বিভিন্ন শহর এবং গ্রামে বসবাসকারী একই জাতের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ খুব কমই ছিল। তারপর রেলপথ ও সড়কপথে যাতায়াতের সুবিধার দরুন প্রত্যেকটি জাত জাতীয় ভিত্তিতে সংগঠিত হবার সুযোগ পেল। বিভিন্ন জাতসমিতি গড়ে তুলল ও দেশব্যাপী ছড়ানো নিজজাতভুক্ত লোকেদের দেখাশোনা করবার জন্য কার্যনির্বাহক সংগঠন পরিচালনা করত। জাতসংগঠনগুলো জাতসংহতি প্রচারের জন্য পত্রপত্রিকা প্রকাশ করল। এসব কার্যকলাপের ফলে শুধুমাত্র জাত-সচেতনতা বৃদ্ধি পেল, জাতসচেতনতা জাতীয় স্তরে সংহত হয়ে উঠল এবং জাত টিঁকে গেল।

জাতব্যবস্থার আর্থিক ভিত্তি ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়াতে বিভিন্ন জাতের নিজস্ব আর্থিক স্বার্থবোধ ক্রমে হ্রাস পেতে লাগল। এক পেশা এবং এক বৈষয়িক স্বার্থ এবং দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন লোক নিয়ে যে জাত গঠিত হয়েছিল, তা উত্তরোত্তর একটা রূপকথায় পরিণত হয়ে গেল।

নিম্নবর্গীয় জাতসমূহের আন্দোলনের দ্বৈত ভূমিকা

হিন্দুসমাজের নিম্নবর্গভুক্ত যে জাতগুলো অগণতান্ত্রিক জাতপ্রথার দরুন সামাজিক, ধর্মীয় ও আইনগত বাধা-নিষেধে আবদ্ধ ছিল তাদের আন্দোলনে দুটো দিক লক্ষ্য করা যায়ঃ একটা প্রগতিশীল দিক, অন্যটা প্রতিক্রিয়াশীল এবং জাতীয়তাবিরোধী। একটা নিম্নতর জাত যখন জাতিভিত্তিতে সংগঠিত হয়েছিল ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করত তখন সেই সংগ্রাম বৃহত্তর সংগ্রাম যেমন ভারতীয় জনসাধারণের গণতান্ত্রিক একতার সংগ্রামে সহায়ক হয়ে উঠতে পেরেছিল। একদিকে সুযোগ-সুবিধা অন্যদিকে বঞ্চনা থাকায় সাম্প্রদায়িকতার প্রসার ঘটেছিল। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা লাভ করা গেলে এবং ক্রমোচ্চ শ্রেণী-বিভাগের ভিত্তিতে গঠিত সামাজিক কাঠামোর সামাজিক ও আইনগত বৈষম্য লোপ করা গেলে সাম্প্রদায়িকতাও লোপ পাবে। তখন এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের আর কোনো প্রভেদ থাকবে না, তখন সব লোক গণতান্ত্রিকভাবে একত্রবদ্ধ হত। পরবর্তী সময়ে তৎকালীন সামাজিক-আর্থিক কাঠামোতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের যথার্থ ভূমিকা অনুসারে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীতে শ্রেণীবদ্ধ হবে। এইরূপ শ্রেণীবিভাগ হবে ইতিহাসসম্মত। বর্ণিত সামাজিক গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে যখন গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা বিস্তার লাভ করবে একমাত্র তখনই সাম্প্রদায়িকতার অবসান হবে।

কিন্তু যখন কোনো নিম্নতর জাত দেশের সংবিধানে বিশেষ গুরুত্ব পাবার জন্য বা পৃথক নির্বাচকের অধিকার দাবী করে তখন যেটা প্রতিক্রিয়াশীল ও

জাতীয়তাবিরোধী রূপ নেয়। পৃথক নির্বাচকের অধিকার কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িকতাই বাড়িয়ে তুলবে। এর ফলে সমাজের সাম্প্রদায়িক বিভাগ চিরস্থায়ী হবে। সমাজের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ কাঠামোর ফলে নিম্নতর জাতের প্রতিভা বিকাশের পথে যেসব বিশেষ বাধা-বিপত্তি আছে নিম্নতর জাতগুলি যদি সেসবের অবসান করতে চায় তবে সেটা হবে ন্যায়সঙ্গত। এটা প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দাবী এবং এর দ্বারা মানুষের সৃজনশীল জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু কোনো জাত যদি বিশেষ সুবিধা দাবী করে সেটা অগণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবিরোধী কাজ হয়। শুধুমাত্র একটা নেতিবাচক প্রশ্নেই সমস্ত নিপীড়িত জাতের মধ্যে সর্বজনীন স্বার্থবোধ ছিল ঃ যেসব বাধা-নিষেধ এদের ওপর চাপান হয়েছিল এরা চাইত সেগুলো অপসারণ করা হোক। কিন্তু যখন নতুন আর্থিক ব্যবস্থা চালু হবার ফলে সব জাতের বৃত্তিগত ভিত্তি ভেঙ্গে পড়ল, যখন প্রত্যেক জাতের লোকেরা পৃথকভাবে স্বতন্ত্র পেশা অবলম্বন করল এবং তাদের মধ্যে বস্তুগত স্বার্থের দ্বন্দ্বও দেখা দিল তখন এদের কোনো ইতিবাচক সর্বজনীন স্বার্থবোধ আর বজায় থাকতে পারল না।

অনুরূপভাবে অব্রাহ্মণ জাতগুলোরও কোনো সার্বিক ইতিবাচক স্বার্থ ছিল না। এদের মধ্যে কারিগর, ক্ষেতমজুর, জমিদার, শ্রমিক, প্রজা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের লোক ছিল, এদের মধ্যে স্বার্থগত পার্থক্য প্রচুর। একই জাতের মধ্যে আবার প্রায়ই পেশার পার্থক্য ছিল। আইনগত ও সামাজিক বাধানিষেধ লোপ করবার প্রচেষ্টাতেই অব্রাহ্মণ আন্দোলনগুলোকে নীতিসংগত ও প্রগতিশীল বলা যেতে পারে। সাধারণ সার্বিক ইতিবাচক স্বার্থরক্ষা করার জন্য বিশেষ প্রতিনিধিত্বের কোনো অর্থ হয় না। কেননা অব্রাহ্মণ জাতসমূহের সর্বগ্রাহ্য কোনো স্বার্থ ছিল না। এমনকি বিশেষ একটা জাতের মধ্যেও ছিল না। বস্তুতপক্ষে অব্রাহ্মণ মিল মালিকদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থ কেবলমাত্র বিভিন্ন জাত ও সম্প্রদায়ভুক্ত মালিকদের নিয়ে গঠিত মিল মালিকদের সমিতিতে যোগ দিলেই রক্ষা পেতে পারে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন জাত ও সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রমিকদের সংগঠনে যোগ দিলেই অব্রাহ্মণ শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা পাওয়া সম্ভব।

যখন সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় একতার জন্য অব্রাহ্মণদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন সাম্প্রদায়িক প্রভেদ বিলোপ করার পথ করে দিচ্ছিল সেই সময় বিশেষ প্রতিনিধিত্বের কথা সাম্প্রদায়িক বিভেদ সঞ্জীবিত করে রেখে যাচ্ছিল। "ফলতঃ সংরক্ষিত প্রতিনিধিত্বের দরকার নেই। এটা ক্ষতিকারকও বটে কেননা এর ফলে জন্মভিত্তিতে প্রভেদ অক্ষুণ্ন থেকে যায়। যেসব দেশে জাতিসমাজ একতার ভিত্তিতে দৃঢ়ভাবে গঠিত সেখানে বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কিত ঐ ধরনের কোনো নীতির স্থান একেবারে নেই। সমাজ পরস্পরবিরোধী স্বার্থসম্মিলিত গোষ্ঠীতে বিভক্ত থাকলেও এই প্রশ্ন সেখানে ওঠে না। জাতিভিত্তিক প্রভেদের ওপর জোর দেওয়া এবং বিশেষ প্রতিনিধিত্ব প্রচলন করবার অর্থই হল ঐক্য চেতনার ভিত্তিতে আঘাত করা।"১৯

জাতপ্রথাকে দুর্বল করার ব্যাপারে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভূমিকা ছোট করে দেখা যায় না। এটা সত্যি যে জাতের যে মূল ভিত্তি অর্থাৎ সাকুল্য-

বিবাহ প্রথা প্রায় অক্ষুণ্ণই থেকে গিয়েছিল কিন্তু অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, গোষ্ঠীনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ফলে বিভিন্ন জাতের মধ্যে সহযোগিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গণভিত্তিক হবার ফলে সংকীর্ণ জাতবন্ধনের ওপর তার প্রভাব পড়েছিল। উপরন্তু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নীতিগতভাবে মূলতঃ গণতান্ত্রিক ছিল এবং এর কার্যক্রম ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সমানাধিকারের ওপর ভিত্তি করে গঠিত ছিল। তাই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বস্তুগতভাবে এবং পরোক্ষভাবে জন্মসূত্রে অসাম্যের পরিপোষক জাত-ব্যবস্থার একান্ত বিরোধী। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সব মানুষকে একত্র করে অন্যদিকে জাতমানুষের সংগে মানুষের পার্থক্য সৃষ্টি করে। জাতীয়তা-বাদী আন্দোলন জাতীয় স্বাধীনতা ও জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের মত ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতিও প্রচার করে। সুতরাং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রসার জাতপ্রথাকে দুর্বল করে দিয়েছিল।

'ভারতীয় জনসমাজের প্রাগ্রসর শক্তিসমূহ জাত, অশিক্ষা, অস্পৃশ্যদের অমর্যাদার বিরুদ্ধে এবং আর যা কিছু মানুষকে পশ্চাদ্‌বর্তী করে রাখে সেই সবকিছুর বিরুদ্ধে সংগ্রামেই অগ্রণী হয়েছিল। প্রাচীন হিন্দুসভ্যতা ও তার চিরায়ত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যখন পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দেওয়া হচ্ছিল তখন জন-সাধারণের বৃহত্তম অংশ সার্বিক সমর্থনপুষ্ট ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, জাত, বর্ণ অথবা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সর্বজনীন সমানাধিকারের পুরোপুরি গণতান্ত্রিক কার্যক্রম প্রচার করেছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল সর্বপ্রকার বিশেষ সুবিধা বিলোপ করা, সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, সর্বজনীন অবাধ বাধ্যতামূলক শিক্ষা, ধর্মবিষয়ে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা, বাক্-স্বাধীনতা, সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতা, সমিতি ও সংগঠন করার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা। ব্রিটেনের আধা-গণতন্ত্র থেকে এই কার্যক্রম অনেকটা বেশি এগিয়ে ছিল।'২০

ভারতের অভ্যন্তরীণ এবং বিশ্বের বড় বড় ঘটনাসমূহের প্রভাব ভারতীয়-দের মনে পড়েছিল। এর ফলে ভারতবাসীর মনে প্রাচীন প্রতিষ্ঠান এবং রীতি-নীতিসমূহ ভেঙে এগিয়ে যাবার আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। ১৯১৪-১৮ সাল-ব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে এই প্রক্রিয়া বেগবান হয়ে উঠল।

"যুদ্ধনিবৃত্তির আঠারো বছর পর আমরা বুঝতে পারলাম যে ভারতবর্ষ বিশ্বশক্তির প্রভাবমুক্ত থেকে পুরানো ভারসাম্যের অবস্থায় আর কখনো ফিরতে পারবে না·· রক্ষণশীলতার দরুন ব্রিটিশ শাসকবর্গ পূর্বাগত দোষত্রুটিগুলো টিঁকিয়ে রাখতে চাইছিলেন। ভোট সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রাজনৈতিক দলসমূহের মাধ্যমে গণতন্ত্রের যে উদ্ভাবনী শক্তি প্রসারলাভ করছে তার প্রভাবে ন্যায়নীতি ও শক্তিসামর্থ্য বিরহিত সুপ্রাচীন প্রথাসিদ্ধ সুযোগ-সুবিধা ক্রমশ ক্ষীয়মাণ হয়ে যাবে। জাতপ্রথার প্রবক্তাগণ এমনভাবে পশ্চাদপসরণ করেছেন যে আর দাঁড়াবার জায়গা পাবেন না।···অস্পৃশ্যতা লোপ পেলে জাতভেদ কি আর টিঁকতে পারবে?···সন্দেহ নাই যে হিন্দুধর্মের শক্তি আইনকানুন বা মন্দিরে নিহিত নয়, পারিবারিক বন্ধনই তার উৎস। কিন্তু আজ নারীশিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে আধুনিকতার প্রভাব পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে। যে

হিন্দু যৌথ পরিবার জাতব্যবস্থার স্তম্ভস্বরূপ, সেইটাই নারীশিক্ষা প্রসার, দেশভ্রমণের সুযোগ-সুবিধা এবং বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে হীনবল হয়ে পড়ছে।"২১

ভবিষ্যৎ প্রবণতা

এবার সংক্ষেপে বলি। ইতিপূর্বে যেসব নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষ বিষয়ে কথা বলা হয়েছে তাদের সমবেত কার্যকলাপ জাতপ্রথাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। জাতের পেশাগত ভিত্তি বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। সমান্তরালভাবে নতুন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল। এইসব সংগঠনে যারা একত্রিত হয়েছিল তারা বিভিন্ন জাতের লোক হলেও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রশ্নে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। এই সংগঠনগুলো এবং নতুন চেতনা ধীরে ধীরে জাত ও সংগঠনের গুরুত্ব হ্রাস করে দিয়েছিল এবং জাত সচেতনতাকেই দুর্বল করে দিয়েছিল।

বস্তুতপক্ষে আইনের ক্ষেত্রে জাতবিষয়ক সুযোগ-সুবিধা একেবারে লোপ পেয়ে গিয়েছিল। সামাজিক পর্যায়ে এটা লোকাচার এবং জড়তার জন্যই টিঁকে ছিল। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে জাতের বিধিনিষেধ লোকে প্রায়ই অমান্য করত এবং নাগরিক জীবনে এইসব বিধিনিষেধ বিশেষভাবে শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

জাতব্যবস্থার অপর স্তম্ভ সাকুল্যবিবাহ। এর জোরেই জাতব্যবস্থা অনেকটা টিঁকেছিল। এটা অবশ্য প্রায় অপরিবর্তিত থেকে গেল। ভিন্নজাতের লোকের মধ্যে বিবাহ বিশেষ হত না।

তবে জাতব্যবস্থা বিলোপের প্রবণতা স্পষ্ট। অধিকতর আর্থিক উন্নয়ন ও শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অগ্রগতির জন্য জাতীয়তাবাদী ও শ্রেণী আন্দোলন বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জাত বিলোপের ব্যাপারটা এমনকি জ্যামিতিক হারে বেড়ে যাবে। প্রকৃতির রাজ্যে যেমন, সমাজেও তেমনি অগ্রগতি অথবা হ্রাস সমান তালে চলে না। জনসাধারণের মধ্যে পুঞ্জীভূত জাতবিরোধী চেতনা ব্যাপক জাতবিরোধী কার্যক্রমে রূপলাভ করবে। এর ফলে বিবাহসংক্রান্ত বিধিনিষেধও শিথিল হয়ে যাবে। জাত-ব্যবস্থার শেষ স্তম্ভ সাকুল্যবিবাহ লোপ পেলে জাতের ইমারত ধ্বংস হয়ে যাবে।

সূত্র নির্দেশ

১ Buch, পৃ. ২৩।
২ Shelvankar, পৃ. ২০।
৩ Ghurye, পৃ. ২।
৪ উপরিউক্ত, পৃ. ৩।
৫ Risley, পৃ. ২৯৮ দ্রষ্টব্য।

৬ O'Malley, পৃ. ৩৭৪-৫।
৭ Ghurye, পৃ. ২৭।
৮ O'Malley, পৃ. ৩১০।
৯ উপরিউক্ত, পৃ. ৩১০।
১০ Mathai, পৃ. ৬৫।
১১ Lady Vidya Gauri Nilkantha, Ghurye কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ১৬১।
১২ Indian Social Reform, Part II, পৃ. ৯১।
১৩ Buch দ্রষ্টব্য।
১৪ Philosophy of Brahmaism, পৃ. ৩৩০।
১৫ R. P. Dutt, পৃ. ৬০।
১৬ Ghurye কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ১৬৪।
১৭ Ghurye কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ১৬০।
১৮ O'Malley, পৃ. ৩৭৩।
১৯ Ghurye, পৃ. ১৬৯।
২০ R. P. Dutt, পৃ. ৫০০।
২১ *Manchester Guardian Weekly,* December 1936.

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অভিযান

অস্পৃশ্যতা, হিন্দুসমাজের অমানবিক প্রথা

প্রাক্-ব্রিটিশ যুগ থেকে কতকগুলো পীড়নমূলক ও অগণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকার সূত্রে হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল। হিন্দুদের একটা গোষ্ঠীকে অস্পৃশ্য বলে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হত। অস্পৃশ্যরা কতকগুলো প্রাথমিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল—যেমন সর্বজনীন মন্দিরে প্রবেশাধিকার, সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কূপ অথবা জলাশয় ব্যবহার করার অধিকারও অস্পৃশ্য-দের ছিল না। উপরন্তু তাদের স্পর্শেই উঁচুজাতের লোকেরা অশুচি হয়ে যেত। এইসব চূড়ান্তরূপ অমানবিক সামাজিক পীড়ন তাদের ওপর করা হত।

অস্পৃশ্যরা হিন্দুসমাজ থেকে পরিত্যক্ত হয়েছিল। হিন্দুসমাজের অন্তর্গত হয়েও তারা ছিল হিন্দুসমাজের বাইরে।

ঐতিহাসিক দিক দিয়ে দেখলে বলা যায় অস্পৃশ্যতা হল ভারতবর্ষে আর্য অধিকারের সামাজিক পরিণাম। সামাজিক লেনদেন প্রক্রিয়ায় এদের বিজিত জনসাধারণের একটা অংশ আর্যগোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। বলা চলে যে এদের মধ্যে যারা সবথেকে অনুন্নত ও অবজ্ঞাত ছিল তারাই বংশানু-ক্রমিক অস্পৃশ্য জাতে পরিণত হয়েছিল।

বহু শতাব্দী ধরে হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্যতা প্রচলিত ছিল। এমনকি বুদ্ধ, রামানুজ, রামানন্দ, চৈতন্য, কবীর, নানক, তুকারামের মত মহাপুরুষ কর্তৃক প্রবর্তিত ব্যাপক এবং প্রবল ধর্মসংস্কার আন্দোলনগুলোও অমানবিক ও সুপ্রাচীন অস্পৃশ্যতা প্রথার বিরুদ্ধে বিশেষ কিছুই করে উঠতে পারে নি। ধর্মানুশাসনে প্রশ্রয়পুষ্ট ঐতিহ্যমণ্ডিত বর্বর অস্পৃশ্যতা প্রথা বহু শতাব্দীকাল ধরে প্রচলিত থেকেছে।

ইতিহাসে দেখা যায় যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে নানাধরনের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ প্রচলিত ছিল। এইসব সমাজব্যবস্থাই সামাজিক বিশেষাধিকার ও বৈষম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে, সামাজিক মর্যাদার উচ্চাবচ বিন্যাস এবং অধিকার বৈষম্য হিন্দুসমাজে যতটা প্রকট অন্য কোনো ক্ষেত্রেই এতটা নয়। অস্পৃশ্যদের যেভাবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল হিন্দুসমাজ অন্য কোনো সমাজের দুর্বল অংশ সেভাবে নিপীড়িত হয় নি।[১] অস্পৃশ্যদের দৈহিক স্পর্শই পাপজনক, ঘৃণ্যই বলে বিবেচিত হয়।

হিন্দুসমাজে বংশানুক্রমিক অস্পৃশ্যরা খুব হীনবৃত্তিতে নিযুক্ত ছিল। ময়লা পরিষ্কার করা, মৃত পশু অপসারণ করা প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব তাদের ওপর

ন্যস্ত ছিল।২ সামাজিক ও বিধিগতভাবে তাদের অন্য কোনো বৃত্তি অবলম্বনের অধিকার ছিল না। কোনো অস্পৃশ্য এই অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে হিন্দুরাষ্ট্রে তাকে কঠোরতম দণ্ডে দণ্ডিত করা হত। পড়াশোনা করার বা মন্দিরে ঢোকারও অধিকার তাদের ছিল না। গ্রামে বা শহরে সম্পূর্ণ পৃথক এলাকাতে বসবাস করতে হত এবং সর্বসাধারণের ব্যবহার্য যেসব কূপ, পুষ্করিণী থেকে উঁচুজাতের হিন্দুরা জল নিত সেগুলো ব্যবহার করারও তাদের কোনো অধিকার ছিল না।৩ একই অপরাধ করার জন্য উঁচুজাতের হিন্দুরা যে ধরনের শাস্তি পেত অস্পৃশ্যরা হিন্দুরাষ্ট্রের আইন অনুসারে অথবা উঁচুজাতের হিন্দুদের নিয়ে গঠিত গ্রাম পঞ্চায়েতে তার থেকে অনেক বেশি কঠোর শাস্তি পেত।

অস্পৃশ্যদের এই সামাজিক পীড়ন ধর্মানুশাসন দ্বারা অনুমোদিত ছিল। ফলতঃ অস্পৃশ্যদের ওপর নিপীড়ন সমাজব্যবস্থার মধ্যে দৃঢ়মূল হয়ে উঠেছিল।

অস্পৃশ্যতার মত আর কোনো প্রথা মানুষকে এত গভীরভাবে অপমানিত ও বিপর্যস্ত করে নি। অস্পৃশ্যতা প্রথায় মানুষের ব্যক্তিত্ব ও মানবিক মর্যাদার চরমতম অবমাননা হয়েছিল।

স্বাভাবিকভাবেই অস্পৃশ্যতার মত নিদারুণ নিষ্ঠুর সামাজিক প্রথা বিলোপ-সাধন ভারতবর্ষে সব সমাজসংস্কার আন্দোলনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল।

বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমাজসংস্কারকগণ স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ও ভাবনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। কিন্তু এই প্রথা উচ্ছেদ করার প্রশ্নে কারও দ্বিমত ছিল না। এটা সত্যি যে হিন্দুসমাজের একটা বড় অংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ গোঁড়া সনাতনপন্থীরা অস্পৃশ্যতার উচ্ছেদসাধন এবং নিপীড়নমূলক বৈষম্যসমূহ বিলোপের বিরুদ্ধে প্রাণপণে বাধা দিয়েছিল। তবে তাদের প্রতিরোধ উত্তরোত্তর দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল।

নিপীড়িত শ্রেণীর শক্তি

১৯৩১ সালের জনগণনা অনুসারে সমগ্র ভারতবর্ষে নিপীড়িত শ্রেণীভুক্ত মানুষের মোট সংখ্যা ছিল ৫০,১৯২,০০০। উত্তরপ্রদেশে এরা ছিল মোট জনসংখ্যার ২৩ শতাংশ।৪

অর্থাৎ সামাজিক দিক দিয়ে অধঃস্থিত এই শ্রেণীর লোকসংখ্যা ছিল হিন্দু জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ। তাই তাদের মুক্তির সমস্যা ভারতবর্ষের জাতীয় স্বাধীনতা ও সামাজিক পুনর্গঠনের সকল পরিকল্পনাতেই প্রাধান্য পেয়েছিল।

নিপীড়িত শ্রেণীর মধ্যেও আবার সামাজিক পর্যায়ভেদ ছিল। সামাজিক অত্যাচারপীড়িত এই শ্রেণীর মধ্যেও সামাজিক দিক থেকে অপেক্ষাকৃত উচ্চতর এবং নিম্নতর গোষ্ঠী ছিল। এর ফলে সমস্যাটা আরও বেশি জটিল ও কঠিন হয়ে পড়েছিল।

উপরন্তু অস্পৃশ্যতা ও অন্যান্য সামাজিক অক্ষমতা স্থানভেদে পৃথক হত।

এসব সত্ত্বেও নিপীড়িতদের সকলেই যেসব অত্যাচার ও অবিচারের কবলে ছিল সেইগুলো দিয়েই সমগ্র নিপীড়িতশ্রেণীকে স্বতন্ত্র বলে ধরা হয়েছিল।৫

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং নিপীড়িত শ্রেণীর ওপর যেসব অত্যাচার অবিচার চলত তার বিলোপ ব্রিটিশ আমলে উদ্ভূত সকল ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল।

নিপীড়িতদের উন্নতিবিধানের প্রচেষ্টা

ভারতীয় জনসাধারণের শিক্ষিত এবং সচেতন অংশের মনে গণতান্ত্রিক চেতনা থেকে যে রোষ জাগ্রত হয়েছিল অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে রোষ তারই অংগ।

ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ, সোশ্যাল রিফর্ম কন্‌ফারেন্স এমনকি গান্ধী নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং গান্ধী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নিখিল ভারত হরিজন সংঘের মত আন্তর্জাতিক সংগঠন এরা সবাই অস্পৃশ্যদের সমান সামাজিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচার, শিক্ষাবিস্তার এবং বাস্তব ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে চেষ্টা করেছিলেন।

নিপীড়িত শ্রেণীর অভ্যন্তরেও আলোড়ন এসেছিল। তাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ফলে একদল বুদ্ধিজীবী সৃষ্টি হয়েছিল যেমন ডঃ আম্বেদকর। ডঃ আম্বেদকর তাদের দুঃখদুর্দশা ও অক্ষমতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন এবং তাদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আবেগে উদ্বুদ্ধ হয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অল ইণ্ডিয়া ডিপ্রেসড্ ক্লাসেস্ এ্যাসোসিয়েশন এবং অল ইণ্ডিয়া ডিপ্রেসড্ ক্লাসেস্ ফেডারেশন ছিল নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের মুখ্য প্রতিষ্ঠান। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ডঃ আম্বেদকর এবং তিনিই এর নেতা ছিলেন। এছাড়াও নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতের অসংখ্য স্থানীয় ও গোষ্ঠীগত সংগঠন ছিল।

এইসব সংগঠনগুলোই বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের অক্ষমতা দূর করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। এদের ওপর যেসব অবিচার করা হত তার মধ্যে সবচেয়ে প্রকট ছিল মন্দিরে প্রবেশ ও সর্বসাধারণের স্কুলে ভর্তি হবার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা, সর্বসাধারণের ব্যবহার্য জলাশয়ে যাবার বাধা এবং স্বতন্ত্র এলাকায় বসবাস করার বাধ্যবাধকতা। এছাড়াও ডঃ আম্বেদকর বঞ্চিত শ্রেণীকে একটা রাজনৈতিক বাহিনীতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন এবং তাদের রাজনৈতিক দাবীসমূহ আদায় করার চেষ্টা করেছিলেন। এই দাবীসমূহই বিশেষ প্রতিনিধিত্ব রূপে ১৯৩৫ সালের সংবিধানে স্বীকৃত হয়। যদিও বিশেষ প্রতিনিধিত্বের জন্য নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের দাবী জাতীয়তাবিরোধী এবং জাতীয় ঐক্যের প্রতিবন্ধক ছিল, তবু এই দাবীসমূহেই নিপীড়িত শ্রেণীর রাজনৈতিক সচেতনতা ধরা পড়ে।

আর্যসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি হিন্দুদের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল সংস্কার ও যুক্তিবাদের ভিত্তিতে হিন্দুসমাজের সংহতিসাধন করা। এইসব আন্দোলনের নেতারা হিন্দুসমাজের গণতন্ত্রীকরণের দিকেও সচেষ্ট হয়েছিলেন। হিন্দুসমাজের নিপীড়িত শ্রেণীসমূহ যেসব কঠোর সামাজিক অত্যাচারে পীড়িত হত তার বিরুদ্ধে এরা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা হিন্দুশাস্ত্রের প্রমাণ দেখিয়ে এইসব অবিচারের বিরুদ্ধে প্রচার করতেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা শাস্ত্র গ্রন্থসমূহ ছাপিয়ে প্রকাশ করেছিলেন।

যেসব আন্দোলন ধর্মসংস্কারের উদ্দেশ্যে গঠিত হয় নি তাদের নেতৃবর্গ স্বাধীনতা ও সমান মানবিক অধিকারের নামে অস্পৃশ্যতা ও অন্যান্য সামাজিক অন্যায়ের নিন্দা করতেন। তাঁরা এর জন্য বেদ থেকে কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ দেখানোর প্রয়োজন মনে করতেন না।

গোখেল, গান্ধী প্রভৃতির মত ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উদারপন্থী ও বামপন্থী নেতারাও যুক্তি দেখাতেন যে ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বশাসন ও স্বাধীনতার দাবী প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক দাবী। সেই কারণে ভারতীয়দের সামাজিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন হওয়া উচিত এবং গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে সব মানুষের সমান স্বাধীনতা ও অধিকারের ভিত্তিতে ব্যক্তি, জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের পুনর্গঠন করা প্রয়োজন।

উপরন্তু জাতীয় স্বাধীনতা জাতীয় একতা ও ঐক্যবদ্ধ জাতীয় শক্তি ভিন্ন অর্জন করা সম্ভব নয়। জাতীয় একতা এবং ঐক্যবদ্ধ শক্তির জন্য প্রয়োজন সমানাধিকার এবং আত্মোন্নতির সমান স্বাধীনতা। অস্পৃশ্যতাবিলোপ, নিপীড়িত শ্রেণীভুক্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের অক্ষমতা দূরীকরণ জাতীয় একতা ও জীবনীশক্তি বিকাশে সহায়তা করবে।

এমনকি সাভারকারের মত হিন্দুরা যারা হিন্দুরাজের পক্ষপাতী ছিলেন তাঁরাও বঞ্চিত শ্রেণীর উন্নয়নের প্রবক্তা ছিলেন। এর কারণ হল এই যে অধিকতর সামাজিক সাম্যের আকর্ষণে হিন্দুদের অনেকে অবিরত মুসলমান ও খ্রীষ্টধর্ম অনুকরণ করার ফলে হিন্দুদের সংখ্যা বিপজ্জনকভাবে কমে যেতে দেখে এঁরা ভীত হয়ে পড়েছিলেন।

এইভাবে বঞ্চিত শ্রেণীর অবস্থার উন্নতিসাধন অর্থাৎ তাদের অসহনীয় আর্থিক দুর্দশা মোচন করা, তাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করা, অস্পৃশ্যদের সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কূপ, স্কুল ও রাস্তা ব্যবহারের অধিকার দেওয়া ও মন্দিরে প্রবেশের অধিকার দেওয়া এবং তাদের জন্য বিশেষ রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব আদায় করার জন্য আন্দোলন অবিরত বৃদ্ধি পেতে থাকল এবং শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগল। জল পাবার অধিকারের জন্য ডঃ আম্বেদকরের নেতৃত্বে পরিচালিত মাহার সত্যাগ্রহ এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অবশ্য এই আন্দোলনের গতিটা ছিল খুব মন্থর। নিপীড়িত শ্রেণীসমূহ ভারতীয় সমাজের সব থেকে বেশী দারিদ্র্যপ্রপীড়িত অংশ। এদের মধ্যে সাক্ষরতা বিশেষ ছিল না।

গান্ধী, ১৯৩২ সালে তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নিখিল ভারত হরিজন সেবক সংঘ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের জন্য সমাজসংস্কার ও তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপক চেষ্টা করেছিলেন। সংঘ হরিজনদের জন্য অসংখ্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। এর মধ্যে আবাসিক পেশাগত বিদ্যালয়ও ছিল। এছাড়া মেথরদের ইউনিয়ন, সমবায় ঋণ সমিতি এবং আবাসন সমিতিও প্রতিষ্ঠা করা হয়।৬

১৯৩৭ সাল থেকে বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস যে কয়েক বছর সরকার পরিচালনা করেছিল তার মধ্যেই সরকারী উদ্যোগে নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের উন্নতির জন্য অনেক দরকারী কাজ করেছিল। বোম্বাইয়ের কংগ্রেস সরকার Bombay Harijan Temple Worship (Removal of Disabilities) Act

পাশ করে। এই আইন অনুসারে মন্দিরের অছিবর্গকে প্রচলিত প্রথা ও ন্যাস-পত্রের বিধান অগ্রাহ্য করে হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার দেবার অনুমতি দেওয়া হয়। মধ্যপ্রদেশ এবং বিহার কংগ্রেস সরকার প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত হরিজনদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে। অন্যান্য কংগ্রেসশাসিত প্রদেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল। অনেকগুলো জায়গায় মন্দিরে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে হরিজনদের সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল।

হরিজনদের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান সহানুভূতিপুষ্ট এইসব আন্দোলনের ফলে অস্পৃশ্যরা বেশ কয়েকটা জায়গায় মন্দিরে প্রবেশাধিকার লাভ করে।

ত্রিবাঙ্কুর, ইন্দোর, অযোধ্যা, দেবসের মত দেশীয় রাজ্যের শাসকরা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বলে সরকার নিয়ন্ত্রিত সব মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশাধিকার দেন।

ব্রিটেনের 'নিরপেক্ষ' নীতি, এই নীতির সমালোচনা

ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা বলতেন যে ব্রিটিশ সরকার উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে বঞ্চিত শ্রেণীর অধিকার সংরক্ষণের জন্য কাজ করে নি। যে অগণতান্ত্রিক উপায়ে অস্পৃশ্যদের মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হত তার বিরুদ্ধে ব্রিটিশরা সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগ করে নি। এমনকি ডঃ আম্বেদকর ব্রিটিশ সরকারের নির্বিশেষ প্রতিপক্ষ ছিলেন না। তিনিও অস্পৃশ্যদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে :

"ব্রিটিশ শাসনের আগে অস্পৃশ্যতার দরুন আপনাদের অবস্থা শোচনীয় ছিল। কিন্তু অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য ব্রিটিশ সরকার কি করেছে ? ব্রিটিশরা আসবার আগে আপনারা গ্রামের কুয়া থেকে জল নিতে পারতেন না। ব্রিটিশ সরকার কি আপনাদের সেই অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে ? ব্রিটিশরা আসার আগে আপনারা মন্দিরে ঢুকতে পারতেন না। এখনও কি তা পারেন ? ব্রিটিশ আসবার আগে আপনাদের পুলিশের কাজে নেওয়া হত না। এখনও কি ব্রিটিশরা আপনাদের পুলিশবাহিনীতে নিয়োগ করছে ?"[২]

ডঃ আম্বেদকর মনে করতেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত না ভারতীয় জনসাধারণ রাজনৈতিক ক্ষমতা পায় এবং যতক্ষণ না সেই ক্ষমতা সামাজিক দিক দিয়ে অবদমিত গোষ্ঠীর হাতে আসে ততক্ষণ পর্যন্ত অস্পৃশ্যদের, সামাজিক, আইনগত এবং সাংস্কৃতিক অক্ষমতাসমূহ পুরোপুরি দূর করা সম্ভব হবে না। তিনি বলেছেন :

"আপনারা নিজেরা যেভাবে পারবেন সেভাবে কেউই আপনাদের অভাব অভিযোগ দূর করতে পারবেন না এবং এটা করতে হলে আপনাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করতে হবে।...যে সরকারের ক্ষমতাধিকারীগণ ন্যায় বিচারের স্বার্থে এবং প্রয়োজনের তাগিদে সামাজিক ও আর্থিক নীতিগুলো সংশোধন করতে ভয় পাবে না সেইরকম সরকার আমাদের চাই। ব্রিটিশ সরকার কখনো এই কাজ করতে পারবে না। যে সরকার জনসাধারণের নিজস্ব স্বার্থে পরি-

চালিত এবং জনসাধারণের দ্বারা গঠিত সেই সরকার অর্থাৎ স্বরাজ-সরকারের দ্বারাই এটা সম্ভব হতে পারে।"৮

সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষপাতশূন্য যে নীতি উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ও নিপীড়নমূলক সামাজিক রীতি ও প্রথাসমূহ টিঁকিয়ে রাখবার চেষ্টা করত ডঃ আম্বেদকরের বক্তব্য সেই নীতির কঠোর সমালোচনা করেছিল। এটা সত্যি যে গোঁড়া হিন্দুরা সবরকম প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলনের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন এবং এইসব আন্দোলন প্রতিহত করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ ও নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের নেতারা মনে করতেন যে সামাজিক বৈষম্য ও অন্যায় দূরীকরণের রাষ্ট্রের যে কর্তব্য আছে সেটা অবহেলা করে ব্রিটিশ সরকার অন্যায় কাজ করেছিলেন। এটা সত্যি যে ব্রিটিশ সরকার সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছিলেন এবং সতীদাহ বিলোপ, আইনের চক্ষে স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য সব নাগরিকের সমানাধিকার স্থাপন প্রভৃতি সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তবে একথা বলতে হয় যে সরকারী সংস্থার প্রচেষ্টা অত্যন্ত ধীর গতিতে অগ্রসর হত এবং প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক গোষ্ঠীর মনোভাব সম্পর্কে সরকার বড় বেশী সজাগ থাকত।

H. N. Brailsford-এর মত প্রগতিশীল ইংরেজরা ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রতিক্রিয়াশীল ও ক্ষীয়মান সামাজিক রীতিনীতি বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাবের অনুরূপ সমালোচনা করেছেন। **Subject India** নামক গ্রন্থে Brailsford বলেছেন:

"যতই হোক না কেন একথা বলা যায় যে আগের মত এখনও ভারতীয় রীতিনীতি বিষয়ে যতদূর সম্ভব হস্তক্ষেপ না করাই আমাদের সরকারী নীতি। বাল্যবিবাহের মত স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক সামাজিক প্রথাও সরকার বরদাস্ত করে চলেছে। ভারতবর্ষের পরিবেশে অস্পৃশ্যতা অপরিবর্তনীয় প্রথা বলে সরকার মেনে নিয়েছে এবং এই পরিবেশ বদলানোর কোনো চেষ্টাও করে নি। সুপ্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি মানুষের যে আনুগত্য থাকে প্রায় সেভাবে আমাদের আদালতসমূহে হিন্দু আইন প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ফলতঃ যে দেশে মানুষ সহজে প্রাচীন রীতিনীতি পরিত্যাগ করতে চায় না সেখানে প্রাচীন ভাবধারা বাঁধা গতে পরিণত হয়েছে।"৯

নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ, মৌলিক মানবিক অধিকার সম্বন্ধে তাদের ক্রমবর্ধমান সচেতনতা, ব্রিটিশ শাসনের আমলে ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে যে সাধারণ গণতান্ত্রিক সচেতনতা দেখা গিয়েছিল তারই অঙ্গ হিসাবে গণ্য। সেই সময় গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে একটা নতুন আর্থিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সমাজের সব মানুষই সমান এবং আইনের চোখে সকলের অধিকার ও স্বাধীনতা সমান এই নীতি ছিল নতুন ব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ। ব্রিটিশ আমলে প্রবর্তিত নতুন ব্যবস্থাসমূহ প্রাক্-পুঁজিবাদী মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজের বংশানুক্রমিক অধিকার ও মর্যাদা সম্বন্ধীয় ধারণার ওপর কঠিন আঘাত করেছিল। নতুন পরিস্থিতিতে প্রত্যেক ব্যক্তির ইচ্ছামত পেশা অবলম্বনের সমান অধিকার এবং স্বাধীনতা ছিল। মোটের ওপর সেখানে আইনের চক্ষে প্রত্যেকের অধিকার সমান। এর ফলে

সামাজিকভাবে অবনত শ্রেণীসমূহের মনে শতাব্দীকালের পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করে মুক্তিলাভের জন্য উদ্দীপনা জেগেছিল। উচ্চজাতদ্ভূত লোকেদের মানবতাবাদী ক্রিয়াকলাপ অবনত শ্রেণীসমূহের মুক্তিসংগ্রাম তীব্রতর করে ভারতবর্ষের সমাজসংস্কার আন্দোলনসমূহ গড়ে তুলেছিল।

নতুন আর্থিক ব্যবস্থার প্রভাব

বেশ কয়েকটা বাহ্য ঘটনা প্রায়ই অদৃশ্যভাবে সামাজিক বৈষম্য ও পার্থক্য কমিয়ে দিয়েছিল। রেলওয়ে ও মোটরবাস প্রচলনের ফলে স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য লোকেরা দৈহিকভাবে পরস্পরের নিকটবর্তী হচ্ছিল। ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত আধুনিক শিল্পসমূহে স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য উভয়শ্রেণী থেকেই নিরপেক্ষভাবে শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছিল। স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য শ্রমিকেরা পরস্পরের দৈহিক সান্নিধ্যে থেকে কারখানায় কাজ করছিল। শ্রমিক ধর্মঘট স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য উভয়শ্রেণীর শ্রমিকেরা একত্রে সংগ্রাম করত। এইভাবে এদের মধ্যে ধীরে অথচ দৃঢ়ভাবে নতুন শ্রেণীচেতনার উদ্ভব হচ্ছিল। শ্রেণীচেতনার প্রভাবে এদের মনে জাত সম্বন্ধীয় চেতনা লোপ পেতে থাকল। জাত সম্বন্ধীয় সংস্কার নাশে শহরের রেস্তোরাগুলোর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। জাতবৈষম্য ও জাতপার্থক্য লোপের ব্যাপারে তাদের বাস্তব অবদান যে কতখানি সে কথা বোধ করি রেস্তোরার মালিকরা জানতই না।

আধুনিক শিক্ষার প্রভাব

নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের ফলে এরা উত্তরোত্তর এমন সব পেশা অবলম্বন করতে থাকল যেগুলো আগে উঁচুজাতের একচেটিয়া ছিল। যাদের পেশা এক তাদের মধ্যে সর্বজনীন বস্তুগত স্বার্থবোধ গড়ে উঠল এবং কালক্রমে যখন কুসংস্কারের বাধা কেটে গেল তখন উঁচুজাত এবং নীচুজাত উভয়শ্রেণীর লোকেই জাতসম্পর্কিত ভাবনাচিন্তা পরিহার করে সর্বজনীন স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে পরস্পরে একত্রিত হল এবং সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ হল।

আধুনিক শিক্ষার সূচনার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়রা পাশ্চাত্যের উদারপন্থী ও গণতান্ত্রিক ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হল। এর ফলে হিন্দুসমাজের সামাজিক অবিচার ও নির্বাধ জাতবৈষম্য সম্বন্ধে উচ্চতর জাতের বিবেকবান ব্যক্তিদের মধ্যে সংকোচ এসে গিয়েছিল। আর এরই প্রভাবে নিপীড়িতশ্রেণীর শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে বিদ্রোহাত্মক মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। সামাজিক অত্যাচারের যে শৃঙ্খলে তারা আবদ্ধ ছিল সেটা ভাঙবার জন্য এরা নিপীড়িত শ্রেণীসমূহকে সংগঠিত করেছিলেন।

অস্পৃশ্যরা যে হীনবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হত তার অন্যতম কারণ শিক্ষার অভাব। শিক্ষার অভাবে তারা আর্থিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে অতিশয় অবনত হয়ে থাকত। অস্পৃশ্যদের মধ্যে উদার ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার যতই হতে থাকল ততই একদিকে যেমন তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হল অন্যদিকে এদের মধ্যে যারা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করেছিল তারা অন্যান্য জাতের সমবৃত্তি-

সম্পন্ন লোকেদের সঙ্গে শ্রেণীগত সম্পর্কে আবদ্ধ হতে লাগল। এইভাবে জাতের বাইরে পেশা ও শ্রেণীগত নতুন বন্ধন সৃষ্টি হল। এর ফলে অস্পৃশ্যরা ধীরে ধীরে কারখানা শ্রমিক, শিক্ষক, কেরানী, ব্যবসায়ী, মেকানিক, শিল্পদ্রব্যের উৎপাদক ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে গেল। একই প্রকার আর্থিক কার্যকলাপে রত স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্যদের মধ্যে নতুন আর্থিক বন্ধন সৃষ্টি হল। এর ফলে অস্পৃশ্যতার কুসংস্কার দুর্বল হতে লাগল। শিল্পকেন্দ্রগুলোতে এই প্রবণতাটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এইসব ক্ষেত্রে একইরকম পেশা এবং মজুরির বৃদ্ধি, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ইত্যাদি দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য মালিকের বিরুদ্ধে সম্মিলিত সংগ্রামের ফলে স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য শ্রমিকদের মধ্যে ধীরে ধীরে সংহতি গড়ে উঠল। মন্থর অথচ দৃঢ়ভাবে নতুন শ্রেণীচেতনা জাতসম্বন্ধীয় পুরানো কুসংস্কারকে উচ্ছেদ করতে লাগল।

আবার অস্পৃশ্যদের কেউ শিক্ষিত হলে তার আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটলে তাদের প্রতি উচ্চতর শ্রেণীর মনোভাবও পরিবর্তিত হতে থাকে।

অস্পৃশ্যতার ভিত্তি মূলতঃ আর্থিক। বৃত্তিগত সমতা লোপ পেলে এবং তাদের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নতি ঘটলে অস্পৃশ্যরা আধুনিক আর্থিক কাঠামোভিত্তিক বিভিন্ন গোষ্ঠীর অন্তর্গত হয়ে যাবে। এর ফলে অস্পৃশ্যতা বিশেষভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাব

আরো একটা কারণে অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলন পুষ্টিলাভ করেছিল। এই কারণটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাবসঞ্জাত। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জাতসম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত ভারতীয়দের সংহত করাই ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের লক্ষ্য। স্বরাজের সংগ্রামে সাফল্যলাভ করবার জন্য ভারতবর্ষের সব জাত ও সম্প্রদায়ের মধ্যে গণতান্ত্রিক ঐক্য স্থাপন প্রয়োজন। দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভিন্ন কারও রক্ষা পাবার সম্ভাবনা নাই। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে সকল গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মিলিত সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে প্রাথমিক গণতান্ত্রিক ঐক্য সৃষ্টি হল। এইভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাবে প্রাচীন বৈষম্যসমূহ ধীরে ধীরে দূর হতে থাকল। অপরপক্ষে সমাজসংস্কার আন্দোলনগুলোর লক্ষ্য ছিল অস্পৃশ্যতার মত সামাজিক অবিচারের বিলোপসাধন। এই আন্দোলনগুলোও তাদের দিক থেকে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে ভারতীয় জনসাধারণের জাতীয় একতা গড়ে তুলতে সহায়তা করেছিল।

সমাজ সংস্কারের আন্দোলনকারীরা যখন শুধুমাত্র সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল তখন তারা মানবিক ও জাতীয়তাবাদী উভয়ভাবেই অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

অস্পৃশ্যরা ভারতীয় সমাজের সবথেকে দারিদ্র্যপীড়িত গোষ্ঠী। তাদের অধিকাংশই ছিল ক্ষেতমজুর বা আধা ক্রীতদাস অথবা সবথেকে নিকৃষ্ট বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিল। অস্পৃশ্যরা আর্থিক ও সামাজিক দ্বিবিধ অত্যাচারে পীড়িত হত এবং এ দুটোই পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। হীন সামাজিক

অবস্থার দরুন অস্পৃশ্যদের ওপর আর্থিক শোষণ তীব্রতর হত এবং আর্থিক দুর্দশার ফলে তাদের সামাজিক অবস্থা স্থায়ী হয়ে উঠেছিল।

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের পূর্বশর্ত

দেখা যাচ্ছে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের সমস্যা ভারতীয় সমাজের মৌলিক সামাজিক-আর্থিক পুনর্গঠনের সঙ্গে সম্বন্ধ জাতীয় অর্থনীতি সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত। এর জন্য প্রয়োজন অস্পৃশ্যগণসহ সমগ্র জনসাধারণের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি সাধনের নিমিত্ত আর্থিক ও সামাজিক সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস, শিক্ষাবিস্তার এবং এমনসব ইতিবাচক আইনকানুন যার দ্বারা গোঁড়া রক্ষণশীল লোকদের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের সকল অক্ষমতা দূর করে দেবে। শুধুমাত্র সমাজসংস্কার আন্দোলন করে বেশীদূর এগোনো যায় না। সাধারণতঃ এর দ্বারা সামাজিক অবিচারের আর্থিক ভিত্তি নাড়া দেওয়া যায় না। ফলে সমাজসংস্কার আন্দোলন থেকে কেবলমাত্র আংশিক ও অস্থির ফলই পাওয়া যায়।

অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন কালক্রমে বেগবান হয়ে উঠল তার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় জনগণের বৃহত্তর জাতীয় ও মানবিক চেতনা প্রকাশ পেয়েছে। অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলন ভারতীয় জনগণের জাতীয় ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

সূত্র নির্দেশ

১ Ghurye, পৃ. ১৪২।
২ Rameshwari Nehru, পৃ. ৪।
৩ উপরিউক্ত, পৃ. ৩।
৪ উপরিউক্ত, পৃ. ২।
৫ Ambedkar (2) এবং (3) দ্রষ্টব্য।
৬ **Report of the Survey of the Conditions of Harijans in Allahabad; Report of the Harijan Survey Committee 1933-4, Cawnpore, Report on the Conditions of Harijans, Delhi,** দ্রষ্টব্য।
৭ **Report of the Delegation sent to India by the India League in 1932,** পৃ. ১৩৬-এ উদ্ধৃত।
৮ উপরিউক্ত, পৃ. ১৩৭।
৯ Brailsford, পৃ. ১৭-১৮।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

নারী মুক্তির আন্দোলন

প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে নারীজাতির হীনাবস্থা

নতুন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব, নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং জনসাধারণের মধ্যে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারার বিস্তারের ফলে ভারতবর্ষে যে সাধারণ জাতীয় এবং গণতান্ত্রিক জাগরণ ঘটেছিল তার প্রকাশ দেখা গিয়েছিল অসংখ্য শতাব্দীব্যাপী সহ্য করা সামাজিক পরাধীনতা ও অত্যাচারের মধ্যযুগীয় বন্ধন থেকে ভারতীয় নারী মুক্তির আন্দোলনের মধ্যে।

প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতীয় সমাজে সম্ভবতঃ বৈদিক যুগের প্রথম দিককার কথা বাদ দিলে নারীজাতিকে পুরুষের অধীনস্থ বলে গণ্য করা হত। আইন এবং ধর্ম নারী ও পুরুষের সমানাবস্থা বা সমানাধিকার স্বীকার করত না। সমাজ পুরুষকে যেসব অধিকার এবং স্বাধীনতা দিত নারীজাতিকে তা দিত না। নারী ও পুরুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচার আচরণ বিচার করার জন্য বিভিন্ন মান অবলম্বন করা হত।

ব্রিটিশ অধিকার ভারতবর্ষে এক নতুন অর্থনৈতিক ও আইন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে এবং নারীজাতিকে পাশ্চাত্য দেশগুলির আধুনিক গণতান্ত্রিক সংস্পর্শে নিয়ে আসে। এর আগে প্রাগৈতিহাসিক গোষ্ঠী সমাজের কথা বাদ দিলে সমস্ত মধ্যযুগীয় ও প্রাচীন সমাজে ভারতবর্ষে নারীজাতিকে পুরুষের অধীনস্থ বলে গণ্য করা হত।

এটা সত্যি যে অতীতে বৌদ্ধধর্মের মতো ধর্মসংস্কার আন্দোলনগুলো ভারতীয় নারীর অবস্থার উন্নতি বিধানে আংশিকভাবে হলেও সচেষ্ট হয়েছিল কিন্তু বহু শতাব্দী ধরে নারীজাতি যে সামাজিক ও নৈতিক অবিচারে নির্যাতিত ছিল তার অবসান করার জন্য বড় বড় আন্দোলনগুলো কেবলমাত্র ব্রিটিশযুগেই সংগঠিত হয়েছিল।

এটা সত্যি যে ভারতীয় ইতিহাসে গার্গী, চাঁদবিবি, নুরজাহান, রাজিয়া বেগম, ঝাঁসীর রানী, মীরাবাঈ, অহল্যাবাঈ প্রভৃতির মতন অনন্যসাধারণ মহিলাদের দৃষ্টান্ত আছে যারা সাহিত্য, শিল্পকলা, দর্শন, শাসনব্যবস্থা এবং এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও মহান কীর্তি সম্পাদন করেছেন। কিন্তু এই মহিলারা সমাজের বিশেষাধিকারভোগী শাসকগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন। তাই সাধারণভাবে ভারতীয় নারীজাতি যেসব সামাজিক অধীনতা ভোগ করত তার থেকে এরা মুক্ত ছিলেন। সামগ্রিকভাবে ভারতীয় নারীজাতির না ছিল স্বাধীনতা, না ছিল আত্মপ্রকাশের সুযোগ।

নতুন অর্থনৈতিক শক্তি, নারীর মর্যাদার ওপর এর প্রভাব

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অধিকার দেশের সামাজিক বিন্যাসের রূপান্তর ঘটিয়েছিল। ব্রিটিশ অধিকার এমন সব বাস্তব এবং বিষয়ী শক্তি উন্মুক্ত করে যা জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক প্রেরণা উদ্দীপ্ত করেছিল।

সামাজিক জীবনযাত্রার নতুন পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত সমাজসংস্কার আন্দোলনগুলো ভারতীয় নারী নির্যাতনের সামাজিক ও আইনগত বৈষম্য ও অন্যায় দূর করার কাজে রত হয়।

প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে ভারতীয় নারীদের অধীনতার মূল ছিল তৎকালীন সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই। সেই সমাজে ব্যক্তির মর্যাদা নির্ধারিত হত জন্মের দ্বারা। সে যে নারী হয়ে জন্মেছে এই ছিল তার অযোগ্যতা। সমাজে নারীর এই অধস্তন অবস্থা ধর্মীয় আদেশের দ্বারা আরও পূত হয়ে গিয়েছিল।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অধিকার যে পুঁজিবাদী অর্থনীতির সূচনা করেছিল এবং দেশে যে আইন ও রাজনৈতিক শাসন কায়েম করেছিল তা ব্যক্তিগত সাম্য ও চুক্তিবদ্ধ স্বাধীনতার নীতির ভিত্তিতে গঠিত ছিল। এই ব্যবস্থা জন্ম, নারী ও পুরুষ, জাত এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক সমস্ত বৈষম্য নীতিগতভাবেই স্বীকার করত না।

এটা সত্যি যে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর এই নীতিকে বাস্তবায়িত করার জন্য সংগ্রাম সংগঠিত করতে হয়েছিল। নাগরিক অধিকারের বিষয়ে নারীজাতিকে উত্তরোত্তর পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার দেবার মতো আইন প্রণীত হওয়ার আগে ব্রিটিশ সরকারের দ্বিধা এবং সেই সঙ্গে সমাজের গোঁড়া গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিরোধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল।

নারীর মর্যাদা উন্নয়নের আন্দোলন

যদিও পুরুষদের মধ্যে শিক্ষিত ব্যক্তিরাই নারী নির্যাতন আইন ও প্রথা দূর করার প্রাথমিক প্রয়াস করেছিলেন, তবে কালক্রমে সেই নিপীড়িত মহিলারাই নিজেদের নেতৃত্বে মুক্তির সংগ্রাম সংগঠিত করতে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। তারা মহিলা সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন এবং তাদের সক্ষমতার প্রতিকারের জন্য বিক্ষোভের কর্মপন্থা তৈরি করেছিলেন। ভারতীয় নারীজাতির সামাজিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষাগত অগ্রগতির জন্য যেসব সংগঠন কাজ করছিল তাদের মধ্যে ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত সারা ভারত মহিলা সম্মেলন পুরোভাগে ছিল।

ভারতীয় নারীদের অযোগ্যতা দূরীকরণ ও বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার থেকে তাদের মুক্তি সময়সাপেক্ষ ঘটনা। সনাতন ভারতবর্ষ ও সাবেক সামাজিক ও মানসিক অভ্যাসগুলি এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। যাহোক, এই আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যলাভ করেছিল এবং দিনে দিনে অনেক বেশি জোরদার হয়েছিল।

অতীতে সতীদাহ এবং শিশুহত্যার মতো বর্বরপ্রথা ছিল অবাধ। ভারতীয় নারীরা এই নির্যাতন সহ্য করেছে। স্বামীর মৃত্যু হলে বিধবা স্ত্রীকে তার জীবন্ত দেহ স্বামীর মৃতদেহের চিতায় নিক্ষেপ করতে হত। পিতামাতা শিশু-

কন্যাকে হত্যা করত কেননা দরিদ্র পিতামাতার পক্ষে মেয়ের বিয়ে অত্যন্ত ব্যয়বহুল ছিল।

এমনকি সতীদাহ প্রথা বিলুপ্ত হয়ে গেলেও বিধবাদের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল।

পর্দা প্রথা ও দেবদাসী প্রথার মতন অন্যায় প্রথা তখনও বর্তমান ছিল।

কেবলমাত্র মুসলমান নয়, এমনকি হিন্দুদের অংশবিশেষও পর্দাপ্রথার মতন ক্ষতিকর রীতি মেনে চলত। 'যেখানে পড়ে আছে নারী, নির্বাসিত যাবজ্জীবনের পিঞ্জরে, নিষ্ক্রিয়তায় তার স্বাভাবিক তীক্ষ্ন ইন্দ্রিয়রাজি হয়ে আছে নিষ্প্রভ, জ্ঞানালোক তার দৃষ্টি বিভাসিত করে না, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত, অন্ধকারে খুঁজে মরছে, জন্মেছে যে সমাজে হয়ে আছে তার প্রথার বলি।'১

রাজা রামমোহন রায়ের মতো সমাজসংস্কারকেরা প্রচারের মাধ্যমে সতীদাহ প্রথার অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন। পরিশেষে লর্ড বেণ্টিঙ্ক এই প্রথার বিলোপ সাধন করেন। শিশুহত্যাও পরে অপরাধ বলে ঘোষিত হয়েছিল।

শিক্ষা ও জনসাধারণের মধ্যে উদার ও যুক্তিবাদী ধারণা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পর্দা প্রথাও বিলুপ্ত হতে শুরু করেছিল।

ভূপালের বেগমদের মতো অভিজাত মহিলারা এর দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। শরীর ও মন ও সেই সঙ্গে সামাজিক প্রগতির ওপর পর্দা প্রথার ক্ষতিকর প্রভাবের কথা নারী আন্দোলনের নেতারা ব্যক্ত করেছেন। 'নারীকে যদি সামাজিক জীবনের অগ্রগতিতে অংশ নিতে হয়, যে দায়িত্ব ও কর্তব্যে তাদের সন্তানকে শিক্ষিত করতে হয় সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য যদি বুঝতে হয় তবে পর্দা প্রথাকে চলে যেতেই হবে।'২

বাল্যবিবাহ হল অন্যতম প্রধান অন্যায় যা পুরুষের থেকে মেয়েদেরই বেশি ভোগ করতে হত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ১৮৬০ সালে একটা আইন পাশ হল। এই আইনে অবিবাহিত মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স বাড়িয়ে দশ করা হয়েছিল। ওঁরই প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সালে বিধবাদের পুনর্বিবাহ আইনগতভাবে অনুমোদিত হয়েছিল।

যাহোক কেবলমাত্র ১৯২৯ সালেই একটা সুনির্দিষ্ট আইনগত পথ নেওয়া হয়েছিল যাতে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকারক প্রথায় আঘাত করা হয়েছিল। সেই একই বছরে Child Marriage Restraint Act পাশ হয়। এতে মেয়েদের ক্ষেত্রে বিয়ের বয়স বাড়িয়ে ১৪ ও ছেলেদের ক্ষেত্রে বাড়িয়ে ১৮ করা হয়।

বাংলাদেশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বোম্বাই-এর Mr. Malabari, কবি নর্মদ, জাস্টিস রানাডে, কে নটরাজন্ প্রভৃতি উৎসাহী সমাজসংস্কারকরা সক্রিয়ভাবে বিধবাদের পুনর্বিবাহের অধিকার সমর্থন করেছিলেন। যদিও সব সমাজসংস্কারক গোষ্ঠীই বিধবাবিবাহকে তাদের কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য অঙ্গ বলে মনে করতেন তবু এই আন্দোলন খুব বেশিদূর এগোতে পারে নি, কেননা বিধবাদের পুনর্বিবাহ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে গভীর বিরাগ ছিল। আইনগত বাধা অপসারিত হলেও পুরানো মানসিক অভ্যাস তখনো বজায় ছিল।

দেবদাসী প্রথা যা নব্য ভারতবর্ষ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল তা ছিল প্রাচীন গ্রীসের অনুরূপ একটা রীতির সদৃশ। দেবদাসীরা হল 'বংশানুক্রমিক

একটা নারীজাত' যারা খুব বাল্যাবস্থা থেকেই মন্দির সেবার কাজে নিজেদেরকে উৎসর্গ করত। 'সম্প্রতি মাদ্রাজে তারা সংখ্যায় দুই লক্ষেরও বেশি এবং যদিও নৃত্যগীতে তাদের পারদর্শিতা...হয়তো ঐসব শিল্পকলাকে বাঁচিয়ে রাখতে কিছুটা সাহায্য করেছে তবু দেবদাসীরা পতিতা বলেই গণ্য হত। এ ব্যাপারটাই তাদের চর্চিত কলাবিদ্যার মান নামিয়ে দিয়েছিল ও অভিজাত মহিলাদের কাছে তাদের করে তুলেছিল ঘৃণ্য।'৩

ডঃ মুথুলক্ষ্মী রেড্ডি ও অন্যান্য সংস্কারকদের তীব্র বিক্ষোভের ফলে ১৯২৫ সালে একটি আইন পাশ হয়, যা তাদের (দেবদাসী) প্রতিও দণ্ডবিধির সেই অংশগুলি প্রয়োগযোগ্য করে যাতে করে নাবালিকাগামিতা দণ্ডনীয় অপরাধ হয়।'

শিক্ষার অধিকার অর্জনের জন্য আন্দোলন

প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতবর্ষে কিছু ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে অধিকাংশ নারী-জাতিকে কোনোরকম শিক্ষা দেওয়া হত না। মধ্যযুগীয় ধারণা নারীদের কেবলমাত্র গার্হস্থ্য কর্তব্যেরই ভার দিয়েছিল। ছেলেদের জন্য গ্রামে বা শহরে স্কুল ছিল কিন্তু মেয়েদের কোনোরকম শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অধিকারের পর প্রাচীন সমাজের অবলুপ্তি ও নতুন সমাজের উদ্ভব ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারের সঙ্গে সমান তালে চলছিল। কর্তৃত্বপরায়ণ ধ্যান-ধারণার জায়গায় উত্তরোত্তর স্থান করে নিল উদারপন্থী ধ্যান-ধারণা। জাত, বর্ণ, ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত ব্যক্তির সমানাধিকার ও স্বাধীনতা থাকা উচিত। ব্রিটিশ শাসনের ১৫০ বছর ছিল ভারতীয় জনসাধারণের প্রগতিশীল গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে রাজনীতি, ধর্ম, শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নীতি আদায় করে নেওয়ার প্রচেষ্টার সময়। এই নীতির নামেই স্বরাজ দাবি করা হয়েছিল। জাতভেদ ও বৈষম্য বিলোপের কথা বলা হয়েছিল, ধর্মক্ষেত্রে বংশানুক্রমিক পৌরোহিত্যের একচেটিয়া অধিকারকে আক্রমণ করা হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষাক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার দাবি করা হয়েছিল।

সামাজিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে মানুষের সমানাধিকারের দাবির গণতান্ত্রিক নীতির উত্তরোত্তর বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলন কেবলমাত্র বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন নয়, এই আন্দোলন প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বহু অগণ-তান্ত্রিক উত্তরাধিকারের বিরুদ্ধে ছিল। এই আক্রমণ ছিল জাতপ্রথা ও বাধা-নিষেধের কাছে ব্যক্তির পরাভবের বিরুদ্ধে এবং পুরুষের লভ্য অধিকার থেকে নারীকে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে আন্দোলন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নারীদের সমানাধিকার প্রায় সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত হয়েছিল। নারীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারলাভ করেছিল আরও দ্রুত এবং বেশি বেশি করে শিক্ষার প্রতি মেয়েদের রক্ষনশীল সঙ্কোচ কেটে যেতে আরম্ভ করল। 'এমন একটা সময় ছিল যখন ভারতবর্ষে মেয়েদের শিক্ষার কোনো সমর্থক তো ছিলই না বরং তার প্রকাশ্য প্রতিপক্ষ ছিল। সম্পূর্ণ অনীহা, ব্যঙ্গবিদ্রূপ, সমালোচনা ও গ্রহণ—স্ত্রী-শিক্ষা ইতিমধ্যেই সব পর্যায়ই অতিক্রম

করেছে। এখন নিঃসন্দেহে একথা বলা যেতে পারে যে ভারতবর্ষের যে কোনো জায়গায় ছেলেদের মতন মেয়েদের শিক্ষাও অপরিহার্য প্রয়োজন, জাতীয় অগ্রগতির অবধারিত চিহ্ন হিসাবেই স্বীকৃত।'৪

ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, ডেনমার্ক, আমেরিকান, জার্মান এবং ব্রিটিশ মিশনারী সোসাইটি প্রভৃতি ধর্মীয় সংস্কার সংস্থাগুলো এবং ক্ষুদ্র অথচ প্রগতিশীল পার্সী সমাজ—এরাই নারীশিক্ষার পথিকৃতের কাজ করেছিল। ১৯১৬ সালে অধ্যাপক কার্ভে কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় নারীশিক্ষা প্রদানের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান।

মুসলমানদের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার ছিল মন্থর, যদিও স্যার সৈয়দ আহমেদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ স্ত্রীশিক্ষা সমর্থন করেছিলেন অনেক আগেই গত শতাব্দীর শেষের দিকে। কিন্তু এর প্রবণতা ছিল অবশ্য দৃঢ় অগ্রগতির।

নারীশিক্ষার দৃঢ় অগ্রগতি এতেই পরিলক্ষিত হয় যে বিদ্যালয়ে পাঠরতা মেয়ের সংখ্যা ১৯১৭ সালে ১২ লক্ষ ৩০ হাজার থেকে বেড়ে ১৯৩৭ সালে হয়েছিল ২৮ লক্ষ ৯০ হাজার।

ভারতীয় জনসাধারণের অধিকাংশের ব্যাপক দারিদ্র্যই ছিল নারীশিক্ষার দ্রুত অগ্রগতির পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। দারিদ্র্যের দরুন ভারতীয় জনগণের শ্রমজীবী অংশ শ্রমিক এবং বিশেষত কৃষকেরা শিক্ষার যেটুকু সুযোগ ছিল তাও নিতে পারত না। শিক্ষার জন্য তাদের খরচ করার সামর্থ্য ছিল না, তাই সমাজের এই স্তরে শিক্ষা প্রবেশ করতে পারে নি। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা মনে করতেন যে ভারতীয় জনসাধারণের জন্য যথার্থ অর্থনৈতিক মান সুনিশ্চিত করার মতো অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে বিদেশী শাসনের রাজনৈতিক বাধাই হলো ভারতীয় জনসাধারণের দারিদ্র্যের কারণ। ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে সর্বজনীন শিক্ষার বিস্তারের সমস্যা তাই ভারতীয় জনসাধারণের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও তার ফলস্বরূপ অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে জড়িত ছিল।

মহিলাদের রাজনীতিক্ষেত্রে আগমন

সমসাময়িক ভারতবর্ষের ইতিহাসে অন্যতম বিস্ময়কর ঘটনা হলো রাজনীতিতে বিশেষতঃ ১৯১৯ সালের পরে ভারতীয় নারীর দ্রুত প্রবেশ। প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতবর্ষে সুলতানা রাজিয়া বেগম, চাঁদবিবি, নুরজাহান, অহল্যাবাঈ হোলকার-এর মতন রাজকীয় এবং অভিজাত পরিবারের কিছু মহিলা ছাড়া নারী সাধারণ কখনো রাজনীতিতে অংশ নেয়নি। ব্রিটিশ যুগে এই অবস্থা পাল্টে গেল। যে সীমিত ভোটাধিকার তাদের দেওয়া হয়েছিল সেটা তো তারা ব্যবহার করেই ছিল এমনকি ভারতীয় কংগ্রেসের ধাঁচে গণআন্দোলনেও তারা অংশগ্রহণ করেছিল। 'ঠিক সেই সময়ে কংগ্রেস এবং মহাত্মা গান্ধী একটা জাতীয় প্রয়াস চালানোর জন্য তাদের আহ্বান জানাচ্ছিলেন, তখন তারা উপলব্ধি করছিল যে বিধাতাপ্রেরিতপুরুষ এবং সর্বোচ্চ শক্তি উভয়েই তাদের হাতের কাছে এনে দিয়েছেন মূল্যবান হাতিয়ার। তারা এক হাতে তুলে নিল প্রতিরোধহীন বিরোধিতা, আর এক হাতে ভোট।'৫

ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসে শত শত নারীরা রাজনৈতিক গণআন্দোলনে

অংশগ্রহণ করছে, মদের দোকানে পিকেট করছে, মিছিলে হাঁটছে, জেল খাটছে, লাঠি, গুলির মুখোমুখি হচ্ছে—এ একটা অভিনব ব্যাপার।

একটা আঘাতেই ভারতীয় নারী তার যুগযুগব্যাপী বাধানিষেধ ভেঙে ফেলল। রাজনৈতিক কর্মসূচীতে মত দিয়ে এবং বড় বড় রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে পরিবারে স্বামী ও অন্যান্য পুরুষের দাসী থেকে তারা নাগরিকের পর্যায়ে উঠে এল। সরোজিনী নাইডু, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের মতন কেউ কেউ এমনকি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নেত্রী পর্যন্ত হয়েছিলেন।

১৯৩৬ সালে যখন কংগ্রেস সরকারের প্রবর্তন হলো তখন কিছু সংখ্যক ভারতীয় মহিলা প্রাদেশিক বিধানসভায়, মন্ত্রী, আণ্ডার সেক্রেটারি, ডেপুটি স্পীকারের পদে কাজ করেছিলেন। ভারতীয় মহিলারা স্থানীয় পর্ষৎ এবং পৌরসভার সভ্যও হয়েছিলেন।

এইভাবে ভারতীয় নারীর মধ্যে এক বিরাট জাগরণ ঘটেছিল। এটা সত্যি যে অপরিসীম দারিদ্র্যের দরুন শিক্ষার সুযোগ এবং নাগরিক জীবনে তাদের প্রবেশ শুধুমাত্র সমাজের উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত স্তরের মধ্যেই সীমিত ছিল। তা সত্ত্বেও এটা একটা নতুন ও বিস্ময়কর অগ্রগতি যা প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতবর্ষে অজানা ছিল।

শ্রেণীসংগ্রামে মহিলাদের যোগদান

তাদের অশিক্ষা ও বাধা সত্ত্বেও এমনকি নিম্নতর শ্রেণীর নারীরাও দ্রুত তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছিল, শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর হাজার হাজার নারী ধর্মঘট, সংগ্রাম, পথ বিক্ষোভ এবং সভাসমিতিতে অংশগ্রহণ করেছিল। তারা রাজনৈতিক সচেতনতাও গড়ে তুলছিল ও জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠন ও সেই সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন এবং কিষানসভার সভ্য হয়েছিল—যাদের উদ্দেশ্য ছিল কেবল একটা স্বাধীন ভারতবর্ষ নয়, একটা স্বাধীন সমাজতন্ত্রী ভারতবর্ষও বটে।

ভারতীয় নারীর এই জাগরণ নারীজাতির মধ্যে জাতীয় আবেগ এবং জাতীয় ও ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য গণতান্ত্রিক ইচ্ছারই প্রকাশ।

সূত্র নির্দেশ

১ Ray, পৃ. ১১৬।
২ H. H. The Maharani of Baroda at the All-India Women's Educational Conference, 1927, O'Malley কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ৪৫০।
৩ O'Malley, পৃ. ৪৫৩।
৪ The Rani of Sangli at the All-India Women's Conference, 1927, O'Malley কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ৪৫০।
৫ O'Malley, পৃ. ৪৭৫।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ধর্মসংস্কার আন্দোলন

ধর্মসংস্কার আন্দোলন, জাতীয় জাগরণের অভিব্যক্তি

ভারতীয় জনসাধারণের জাতীয় গণতান্ত্রিক জাগরণ ধর্মীয় ক্ষেত্রেও প্রকাশ পেয়েছিল। একদিকে পুরানো ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী অভ্যাস ও সংগঠন ও অন্যদিকে নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা—এই দুইয়ের মধ্যে বৈপরীত্য দেশে বিভিন্ন ধর্মসংস্কার আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল। এই আন্দোলনগুলো ছিল জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের নতুন নীতিগুলির ভিত্তিতে পুরানো ধর্ম সংশোধনের প্রতিভূ, আর এই নীতিগুলো ছিল নতুন সমাজ গড়ে তোলার শর্ত।

ব্রিটিশ শাসনে এই প্রথম ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভারতীয় জনসাধারণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঐক্যের দরুন সমস্যাগুলো জাতীয় রূপ নিয়েছিল। এই জাতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য জনসাধারণকে যৌথ প্রয়াসে একত্রিত করার জন্য জাতীয়তাবাদের প্রেরণার প্রয়োজন ছিল। এতদিনে সমগ্র হয়ে উঠেছে এমন ভারতীয় সমাজের আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশ ত্বরান্বিত করা এবং এই বিকাশের পথে ব্রিটিশ শাসনের আরোপিত বাধার মোকাবিলা করাও ছিল বিকাশমান ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রধান কাজ যা তারা নিজেরাই স্থির করেছিল। একথা সত্যি যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রথম পথিকৃৎ ও প্রথম যুগের সমাজ ও ধর্মসংস্কারকদের আশা ছিল যে ব্রিটিশ গণতন্ত্রের পরিচালনায় এই নিয়ন্ত্রণগুলো লোপ পেয়ে যাবে। তবু তাঁরা বুঝতেই পেরেছিলেন যে ব্রিটিশ শাসনের প্রথমদিকের প্রগতিশীল প্রকৃতি সত্ত্বেও তা ভারতীয় জাতীয় অগ্রগতিকে পঙ্গু করে দিয়েছিল।

গণতন্ত্র হলো আরেকটা নীতি যা সংস্কারকরা, রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, তেলাঙ্গ, রানাডে, ফুলে-র মতো জাতীয়তাবাদের গোড়ার যুগের নেতারা এবং আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতারা ধর্মক্ষেত্রে নানামাত্রায় প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ অধিকারের ফলে ভারতবর্ষে যে আধুনিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা ছিল একটা পুঁজিবাদী সমাজ। এই সমাজের ভিত্তি ছিল ব্যক্তিস্বাধীনতা, প্রতিযোগিতা ও চুক্তির স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছায় সম্পত্তি অধিকার এবং তা ব্যবহার করার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নীতি। প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজের কর্তৃত্বপরায়ণ চরিত্রের বিপরীতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ছিল এর মূল কথা। প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজ জন্ম ও স্ত্রী-পুরুষ ভেদে সামাজিক পার্থক্য রক্ষা করে চলত এবং ব্যক্তিকে জাত ও যৌথ পরিবার ব্যবস্থার অধীনস্থ করে রাখত। অগ্রগতির

প্রাথমিক শর্ত হিসাবেই নতুন সমাজ দাবি করত জন্ম ও স্ত্রী-পুরুষ ভেদে বিশেষ সুবিধার বিলোপ।

প্রথম যুগের ধর্মসংস্কারকরা ধর্মক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতার নীতিকে প্রসারিত করতেও খুব চেষ্টা করেছিলেন।

বস্তুতপক্ষে, ব্রাহ্মসমাজ, প্রার্থনাসমাজ, আর্যসমাজ ইত্যাদি ধর্মসংস্কার আন্দোলনগুলো নতুন সমাজের উপযোগী করে পুরানো ধর্মকেই ঢেলে সাজাবার বিভিন্ন মাত্রার প্রচেষ্টা। এটা সত্যি যে তাদের কিছু কিছু নেতার (বিশেষ করে আর্যসমাজের) এই ভুল ধারণা ছিল যে তারা বৈদিক আর্যদের প্রথমযুগীয় সমাজকাঠামো পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন এবং স্বর্ণযুগে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। বস্তুতপক্ষে তারা বিভিন্ন মাত্রায় হিন্দুধর্মকে সমসাময়িক ভারতীয় জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনের উপযোগী করে তুলতে ব্যস্ত ছিলেন। ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আছে যেখানে নতুন সমাজের সংহতিসাধনকারীরা কল্পনা করেছেন যে তারা অতীতে প্রত্যাবর্তন করছেন এবং প্রাচীনযুগে যেসব সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক রূপ ছিল তার পুনরুজ্জীবন ঘটাচ্ছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে প্রথমযুগের ধর্মসংস্কার আন্দোলনগুলো এমন একটা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করতে চেয়েছিল যা হিন্দু, মুসলমান, পার্শী এবং অবশিষ্ট সমাজের সমস্ত সম্প্রদায়ের জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলবে যাতে সেইসব সর্বজনীন জাতীয় সমস্যার সমাধান হয় যেমন আধুনিক পথে ভারতে অর্থনৈতিক বিকাশ, ব্যক্তির স্বাধীনতা বিকাশের ওপর বাধানিষেধ অপসারণ, নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা, জাতপ্রথার বিলোপসাধন, চিরায়ত সংস্কৃতির একচেটিয়া এবং ঈশ্বর ও ব্যক্তির মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থ হিসাবে ব্রাহ্মণের বিলোপসাধন। তা সত্ত্বেও ধর্মসংস্কারের অংগীভূত ইউরোপীয় প্রোটেস্টাণ্ট নেতাদের ও অন্যান্য আন্দোলনের মতন ভারতীয় ধর্মসংস্কারকরাও সমাজের কোনো প্রাচীন যুগের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করছিলেন না শুধু নবসৃষ্ট সমাজের সংহতিসাধন করেছিলেন।

উদার নীতিই হলো নবজাগ্রত পুঁজিবাদের দর্শন।[১] এর দুটি প্রধান নীতি হলো জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র। ধর্মসংস্কার আন্দোলনগুলো ছিল ধর্মক্ষেত্রে উদারনীতিকে প্রসারিত করারই প্রচেষ্টা।

"অতীতের প্রতি আবেদন", এর প্রকৃত তাৎপর্য

কিছু কিছু ধর্মসংস্কারকরা (আর্য সমাজ) মনে করতেন যে তারা পূর্ব-যুগীয় অতীতে প্রত্যাবর্তন করছেন কিন্তু বস্তুতপক্ষে তারা নতুন একটা সমাজ গড়ে তুলছেন যা অতীত ইতিহাসে অপরিচিত ছিল। তাদের এই ভুল ধারণার পেছনে একটা গভীর মানসিক-দার্শনিক কারণ ছিল।

এই ভ্রান্ত ধারণা সাবেক 'সচেতন সিদ্ধান্ত' বা চিন্তা এবং সামাজিক অস্তিত্বের নতুন অবস্থানের মধ্যে বিরোধের ফল।

'সমাজের মতো মানুষের মধ্যেও একদিকে থাকে বর্তমান সক্রিয় সত্তা এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধ্যানধারণা। ...ফলে তার অন্তরের মধ্যেও চলে অস্তিত্ব, চিন্তা, নতুন সত্তা ও প্রাচীন ধ্যানধারণার দ্বন্দ্ব। অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দিকে যে

এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু মনের সহজাত প্রবৃত্তি প্রাচীন স্মৃতিবাহী বলে তার প্রায়শই মনে হয় যে বিগত কালে আটকে যাচ্ছে। এই কারণে দেখা যায় যে নায়ক একদিকে প্রাচীনের দোহাই দেয়, প্রাচীন ধারাকে জিইয়ে তোলার জন্য মানুষকে উদ্দীপিত করে আবার এর মধ্যে দিয়ে ভবিষ্যতের প্রতিই ইঙ্গিত করে। ধ্রুপদী সংস্কৃতির পুনরভ্যুত্থান বুর্জোয়া নবজাগরণের মুখ্য উপাদান হয়ে উঠেছিল। নেপোলিয়ন এবং বিপ্লব রোমান সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকের বিপ্লববাদীদের আদর্শ ছিল নিষ্কলুষ, স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক মানুষের প্রত্যাগমন। এইরকম সময়ে মানুষ মনে মনে নতুনের জন্য উত্তেজনা অনুভব করে।...

মানুষের মনে হতে পারে যে পুরাতনকে রক্ষা করা বা পৃথিবীতে পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করাই তার কর্তব্য। এই কর্তব্য সমাপন হলেই দেখা যায় যে ভবিষ্যৎ সমাগত প্রায়। যে সংস্কারক খ্রীস্টান ধর্মের আদিরূপে "ফিরে যেতে" চায় তারই কার্যকলাপের ফলে বুর্জোয়া প্রোটেস্টান্ট ধর্ম সামনে এসে পড়ে...।[২]

একইভাবে গান্ধী কল্পনা করতেন যে তিনি হিন্দুদের স্বর্ণযুগের রামরাজ্য প্রতিষ্ঠায় ব্যাপৃত আছেন অথচ বাস্তবিকপক্ষে তিনি ভারতবর্ষের জন্য একটা আধুনিক গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন।

ভারতীয়রা পরাধীন জাতি বলেই এই অতীতমুখী ভাব আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিদেশী শাসন থেকে জাতীয় মুক্তির জন্য সুস্থ আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি পুনরুজ্জীবিত হিন্দুদের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীর 'আধ্যাত্মিক বিস্ময়' উৎকট স্বদেশভক্তি সম্পন্ন স্বপ্নও সময় সময় ভারতীয় চিত্তে স্থান পেয়েছিল (যেমন রামকৃষ্ণ মিশন আন্দোলনের বিখ্যাত নেতা বিবেকানন্দ)। ভারতবর্ষের বিশেষ 'আধ্যাত্মিক শক্তির' কথাও সগর্বে ঘোষিত হয়েছিল।

প্রথমযুগের ধর্মসংস্কার আন্দোলনগুলো অবশ্য প্রগতিশীল ছিল। এই আন্দোলনগুলোই হল জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় জাগরণের প্রথম প্রকাশ।

নতুন সমাজের প্রয়োজনের উপযোগী করে পুরানো ধর্মকে পুনর্গঠনের জন্য এই ধরনের ধর্মসংস্কার আন্দোলনগুলো সাধারণতঃ প্রত্যেক দেশের ইতিহাসেই গড়ে উঠেছে মধ্যযুগীয়তা থেকে আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে রূপান্তরের সময়।

মধ্যযুগীয়তা বনাম উদারপন্থী মতবাদ

মধ্যযুগীয়তা অভিজাততন্ত্রের পক্ষপাতী। পুঁজিবাদের দর্শন—উদারনীতি—গণতন্ত্র আর জনগণের সরকারের ধারণা প্রচার করে। মধ্যযুগীয় ধর্ম সমেত মধ্যযুগীয়তা জন্মের ভিত্তিতে সুবিধার পক্ষপাতী ছিল। উদারপন্থা ঐ ধরনের সব সুবিধাকে অন্যায় বলে সমালোচনা করত এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা, সমানাধিকার ও অবাধ প্রতিযোগিতার নীতি প্রচার করত। মধ্যযুগীয়তা জনগণের কাছে দাবি করত রাজকীয় ক্ষমতার দৈব উৎসের প্রতি আস্থা, সামাজিক কাঠামোর অলঙ্ঘনীয় প্রকৃতিতে আস্থা এবং যা কিছু বর্তমান আছে তার ঈশ্বরনির্দিষ্ট স্বরূপে বিশ্বাস। উদারপন্থা বিশ্বাসের পরিবর্তে ব্যবহার করত বিশ্লেষণী যুক্তি। প্রতিটি প্রথা ও নীতিকে যুক্তি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে।

মধ্যযুগীয়তা পতনের তত্ত্ব প্রচার করত (সুখ শান্তিময় স্বর্ণযুগ থেকে বর্তমানের অধঃপতিত কলি যুগ)। উদারপন্থা মানুষের ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে চলত এবং আবেগের সঙ্গে বর্বরতা থেকে ক্রীতদাসত্ব, ক্রীতদাসত্ব থেকে সামন্ততান্ত্রিকতা এবং সামন্ততান্ত্রিকতা থেকে আধুনিক পুঁজিবাদে উত্তরণের অগ্রগতির তত্ত্ব প্রচার করত। মধ্যযুগীয়তা মোটের উপর মানুষকে জীবন সম্পর্কে নৈরাজ্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিতে প্ররোচিত করত এবং আধ্যাত্ম জগতের প্রতি তার মনোযোগ নিবদ্ধ করতে প্ররোচিত করত। উদারপন্থা আধুনিক যন্ত্র ও বিজ্ঞানের সাহায্যে এই দুনিয়ার আনন্দদায়ক বস্তুসমূহের অসীম পরিধি নির্দেশ করে মানুষের বেঁচে থাকার ইচ্ছা বাড়িয়ে দিয়েছিল।[৩]

পুরানো ধর্মের ভিত্তি ছিল পুরানো সমাজের নিম্নমানের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ। নতুন সমাজের প্রয়োজনের উপযোগী করে একে নতুন করে গড়ে তুলতেই হতো। একে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, জীবনের প্রতি আশাবাদী ও সদর্থক মনোভাব এমনকি যুক্তিবাদী দর্শনের ওপর ভিত্তি করে সংশোধন করতে হয়েছিল।

মোটের ওপর এইসব পুনর্গঠিত ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য হলো জাতীয় অগ্রগতি। ধর্ম যেখানে অস্বীকৃত বা সংস্কারমুক্ত হলো না, সেখানে জাতীয়তাবাদ ধর্মের সঙ্গে এক হয়ে গেল (বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখেরা যে জাতীয়তাবাদের ধর্মের কথা বলেছেন)।

কোনো কোনো সময় জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় চেতনা ও আশা উদ্বুদ্ধ করার উপযোগী করে পুরানো দেবদেবীদের ব্যাখ্যা করা হতো। 'পুরানো দেবদেবীদের এই ব্যাখ্যা দেশের আনুষ্ঠানিকতায় একটা নতুন অর্থ যোগ করে দিয়েছিল এবং অধিকাংশই যখন জগদ্ধাত্রী বা কালী বা দেবী দুর্গার পুজা করত তখন তারা তাদের ভক্তির সঙ্গে মিশিয়ে দিত। উদ্দীপক ধ্বনি "বন্দে মাতরম", এসব কিছুই হলো ভারতীয় হিন্দুদের আরাধনার জনপ্রিয় প্রতীক। এইসব প্রতীকের রূপান্তর হলো একাধারে বর্তমান আন্দোলনের গভীরতা ও শক্তির কারণ ও সাক্ষ্য। পুরানো দেবদেবীদের এই বিস্ময়কর রূপান্তর দেশের স্ত্রীজাতি ও জনসাধারণের মধ্যে নতুন জাতীয়তাবাদের বার্তা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।'[৪]

এইভাবে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মতন ধর্মপুনরুজ্জীবন আন্দোলনও জাতীয়তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিল।

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সর্বাত্মক পরিধি

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো এদের কর্মসূচী কেবলমাত্র ধর্মসংস্কারের কাজেই সীমিত ছিল না, সামাজিক সম্পর্ক ও সামাজিক প্রথা পুনর্গঠনের কাজেও তা প্রসারিত ছিল, কেননা ভারতীয় ধর্ম ও সামাজিক কাঠামো ছিল অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জাতের পর্যায়ক্রমিক শ্রেণীবিভাগ নারী-পুরুষের মধ্যে অসাম্য, অস্পৃশ্যতা, সামাজিক নিষেধের নিগড় ধর্মের অনুমোদন থাকার কারণেই বেড়ে গিয়েছিল। ফলতঃ সব ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মোর্চার একটা অংশ ছিল সমাজসংস্কার আন্দোলন। ধর্মকে এইভাবে কমবেশী

পুনর্গঠন করতে গিয়ে এই আন্দোলনগুলো সামাজিক সম্পর্ক ও প্রথাকেও কমবেশী পুনর্গঠিত করতে চাইত। ভারতবর্ষের মতন পৃথিবীর আর কোথাও ধর্ম এইভাবে ব্যক্তিজীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করে না। তার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, তার সামাজিক জীবন, তার বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু, তার কায়িক গতি-বিধি সব কিছুই ধর্মের দ্বারা কঠোর ও অনুপুঙ্খভাবে নিয়ন্ত্রিত হতো। তাই ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পক্ষে ধর্মীয়, সামাজিক এমনকি রাজনৈতিক সংস্কারের সর্বব্যাপক কর্মসূচী থাকা অপরিহার্য ছিল। বহুঈশ্বরবাদ ও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে তারা যেরকম করেছিল, ঠিক সেইরকম সংগ্রামই করেছিল জাতপ্রথা ও বিদেশে যাওয়ার নিষেধের ব্যাপারে। ধর্মক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের একচেটিয়া অধিকারকে তারা যেরকম সমালোচনা করেছিল, সেইরকম সমালোচনাই করেছিল, জাতগত সুবিধাভোগের বিরুদ্ধে। তারা এ সবের সমালোচনা করেছিল কেননা এ সব-কিছুই হলো জাতীয় অগ্রগতির পথে বিঘ্ন এবং এই জাতীয় অগ্রগতির পূর্বশর্ত হিসাবে দরকার হলো ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সাম্য ও স্বাধীনতার নীতির ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য।

এইসব আন্দোলনের উপাদান হলো জাতীয় অগ্রগতি। ভারতীয় জন-সাধারণের প্রথম জাতীয় আগরণ মূলতঃ একটা ধর্মীয় রূপ নিয়েছিল। পরবর্তী যুগে এই জাগরণ আরো গভীর ও ব্যাপক হয়েছিল ও উত্তরোত্তর ধর্মনিরপেক্ষ রূপ নিয়েছিল।

ইউরোপে অনুরূপ ঘটনা

ইউরোপেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র ও সমাজ প্রবর্তনের লক্ষ্য নিয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠার আগেই জায়মান জাতীয়তাবাদ ধর্মীয় রূপ নিয়েছিল যেমন প্রোটেস্টান্টবাদ ও রিফর্মেশন।

এর কারণ হলো যে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল মধ্যযুগীয় ধর্ম তার পক্ষে উপযোগী ছিল না। ইউরোপে মধ্যযুগীয় ধর্ম (The Universal Roman Church) খ্রীষ্টীয় জগতকে সাংস্কৃতিক দিক থেকে একত্রিত করলেও সামন্ততান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সমর্থন করত। উঠতি পুঁজিবাদী অর্থনীতির জাতীয়ভাবে ব্যাপক বিনিময় সম্পর্কের ভিত্তি করে একটা দেশের জনসাধারণের জাতীয় অর্থনৈতিক একতার পক্ষে মধ্যযুগীয় ধর্ম প্রতি-বন্ধকের কাজ করত। আবার রোমান চার্চ সামন্তরাষ্ট্রব্যবস্থা সমর্থন করে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল। নতুন পুঁজিবাদী অর্থনীতির অবাধ ও দ্রুত অগ্রগতির জন্য জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের দরকার ছিল।

ইউরোপীয় জনসাধারণের জাতীয় জাগরণ তাই সামন্তধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মীয় সংগ্রামের মাধ্যমেই প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল। রোমান চার্চ ছিল সামন্ততান্ত্রিক আর্থনীতিক ও রাষ্ট্রব্যবস্থার আধ্যাত্মিক সমর্থক। ফ্রান্সে ভলতেয়ার, রুশো, Helvetius, Holbach এবং অন্যান্যরা এই রোমান চার্চের বিরুদ্ধে প্রাথমিক বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সামন্তরাজত্বের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় রাজনৈতিক বিদ্রোহের আগেই ধর্মবিরোধী বিদ্রোহ ঘটেছিল।[৫]

ভারতবর্ষে প্রথম জাতীয় জাগরণ সারিবদ্ধ ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে রূপ পেয়েছিল। এদের মধ্যে কতকগুলো আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল উদারপন্থীর

নীতিতে প্রথাসিদ্ধ ধর্মসংস্কার করা। অন্যান্যদের লক্ষ্য ছিল প্রাচীনকালে যেরকম ছিল সেই রকমভাবে এই ধর্মকে অবিকৃত রাখা।

'ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দীতে যেরকম ঘটেছিল প্রায় সেরকমই উনবিংশ শতাব্দীতে বহুরূপাবিশিষ্ট হিন্দুধর্মের জগৎ আধ্যাত্মিক বিপ্লবে আলোড়িত ও জাগ্রত হয়ে উঠেছিল।... রিফর্মেশনের মতন তারা প্রাচীনতম ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তন করেছিল এবং পরবর্তী সময়ের ক্রমাবনতি ও কুসংস্কারকে আক্রমণ করেছিল।'৬

ভারতবর্ষে ধর্মসংস্কার আন্দোলনগুলো মধ্যযুগীয় ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ চালিয়েছিল। জাতপ্রথার মতন প্রথা যা ভারতীয় জনসাধারণের জাতীয় একতা ও দেশে নতুন অর্থনীতি গড়ে তোলার পক্ষে প্রতিবন্ধক ছিল। মধ্যযুগীয় ধর্ম সেই প্রথা অনুমোদন দিয়ে ধর্মীয় পবিত্রতা আরোপ করত। বহুঈশ্বরবাদ, অর্থহীন আত্মবিনাশী ধর্মীয় আচার এবং জনগণের বিশ্লেষণা বোধবুদ্ধিকে হেয় করে দেয় যে ধর্মীয় মতান্ধতা এরা সেগুলিকেও আক্রমণ করেছিল। এই ধর্মসংস্কার আন্দোলনগুলো চরিত্রে ছিল জাতীয় কিন্তু রূপে ছিল ধর্মীয়। আমাদের জাতীয় জীবনযাত্রার পরবর্তী সময়েই জাতীয়তাবাদ পুরোপুরি অথবা মূলতঃ ধর্মনিরপেক্ষ রূপ নিয়েছিল।

এই ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মধ্যে মুখ্য যেগুলো সেগুলোর কথা সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। এতে দেখা যেতে পারে কিভাবে এই আন্দোলন জাতীয়তাবাদের উঠতি জোয়ার অংগীভূত করেছিল এবং কিভাবে বিভিন্ন মাত্রায় ধর্মে উদারনীতি প্রয়োগ করার জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল।

ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন

রাজা রামমোহন রায়কে (১৭৭২-১৮৩৩) ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক বলে সঠিকভাবে অভিহিত করা যেতে পারে। তিনি ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন প্রবর্তন করেন ১৮২৮ সালে। এই ধরনের আন্দোলনের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজই ছিল প্রথম। রাজা ছিলেন মূলতঃ গণতন্ত্রবাদী ও মানবতাবাদী। তাঁর ধর্মীয়-দার্শনিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে রাজা ইসলামের একেশ্বরবাদ ও পৌত্তলিকতাবিরোধী, সুফীদের ঈশ্বরবাদ যা যুক্তির খাতিরে ঈশ্বর মানে কিন্তু ধর্ম মানে না এবং খ্রীষ্টধর্মের নৈতিক শিক্ষা ও পাশ্চাত্যের উদার ও যুক্তিবাদী মতবাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। 'ইসলাম, খ্রীষ্টধর্ম এবং আধুনিক যুক্তিবাদ তথা মানবতাবাদের উৎকৃষ্ট উপাদানগুলোকে তিনি ব্যাখ্যা করতেও নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং এ সবকিছুকেই তিনি এক নতুন বিশ্বাসে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন যা তিনি তার নিজের সমাজের প্রাচীন ঔপনিবেশিক দর্শনের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন।'৭

তিনি প্রাচীন হিন্দু একেশ্বরবাদের বহুঈশ্বরবাদে অধঃপতনকে আক্রমণ করেছেন। তিনি হিন্দুদের মূর্তিপূজাকে অবমাননাকর বলে আক্রমণ করেছেন এবং 'সব ধর্ম ও মানবের জন্য এক ঈশ্বর' এই ধারণা প্রচার করেছেন।

বহুঈশ্বরবাদ ও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণ জাতীয় ও সামাজিক-নৈতিক বিবেচনাপ্রসূত ছিল, আর ছিল দার্শনিক বিশ্বাসের দ্বারা উদ্বুদ্ধ।

যে কোনো নিকৃষ্ট পৌত্তলিকতার চেয়েও সমাজের বিন্যাস বেশী ধ্বংস করে দেয় যে হিন্দু মূর্তিপূজার অদ্ভুত অভ্যাসজনিত আচারবিধি···সে সম্পর্কে আমার ক্রমাগত ভাবনাচিন্তা, আর সেইসঙ্গে আমার দেশবাসীর জন্য সহানুভূতি আমাকে সর্বপ্রচেষ্টা প্রয়োগে বাধ্য করেছে যাতে তারা প্রকৃতি দেবতার সর্বত্র বিদ্যমানতা ও একত্ব সম্পর্কে ভাবতে পারে।'৮

রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ধর্মের যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পক্ষে। প্রত্যেক মানুষ পুরোহিতকে মাঝখানে না রেখে নিজেরাই প্রত্যক্ষভাবে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করবে ও ধর্মীয় মতবাদের যুক্তিবাদী চরিত্র মূল্যায়ন করবে। সে ধর্মনীতিসমূহ তার নিজস্ব নৈতিক যুক্তি দিয়ে যাচাই করে নেবে এবং যা কিছু এই যাচাই পদ্ধতিতে টিঁকবে না তাকেই সে পরিত্যাগ করবে।

হিন্দুসমাজ যেহেতু হিন্দুত্বের ধর্মীয় ধারণা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হত তাই কোনো ধর্মসংস্কার আন্দোলনই তার কর্মসূচীর মধ্যে সমাজসংস্কার আন্দোলনকে বাদ দিতে পারত না। রাজা রামমোহন রায় এবং প্রথম যুগের ধর্মসংস্কারকদের মতে ক্ষয়িষ্ণু সমাজকাঠামো থেকে স্বাস্থ্যকর সমাজকাঠামো গড়ে তোলার জন্য ধর্মীয় পুনর্গঠনই হল প্রাথমিক দরকার। এই কারণেই ধর্মসংস্কার আন্দোলনের গোটা কর্মসূচীর মধ্যে সমাজসংস্কার আন্দোলন একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজ জাতপ্রথার বিরুদ্ধে আঘাত হানে, জাতপ্রথাকে অগণতান্ত্রিক অমানবিক ও জাতীয়তাবিরোধী বলে চিহ্নিত করে। সতীপ্রথা ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধেও ব্রাহ্মসমাজ অভিযান চালিয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজ বিধবাদের পুনর্বিবাহের স্বাধীনতা ও নারী-পুরুষের সমানাধিকারের পক্ষপাতী ছিল।

ব্রাহ্মসমাজ আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে মূল্য দিয়েছিল এবং দেশে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন পাশ্চাত্যের উদারপন্থী গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একজন গুণগ্রাহী।

রাজা রামমোহন রায় ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনকে ভাল ব্যাপার বলে মনে করতেন। সতীপ্রথা ও শিশুহত্যার বিলোপ, দেশে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রবর্তন, স্বাধীন সংবাদপত্র ইত্যাদি সমাজসংস্কারের প্রগতিশীল পদ্ধতি শুরু করার জন্য তিনি ব্রিটিশ শাসনের প্রশংসা করতেন। এটা খুবই স্বাভাবিক কেননা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন ঐতিহাসিক দিক দিয়ে বলতে গেলে একটা প্রগতিশীল ব্যাপারই ছিল বটে।

'উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগে ব্রিটিশ শাসকরা সবরকমের দুর্দশা ও শিল্প বিধ্বংসের মধ্যেও সক্রিয়ভাবে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করছিল এবং অনেক ক্ষেত্রেই ভারতীয় সমাজের গোঁড়া ও সামন্ততান্ত্রিক শক্তির সক্রিয় মোকাবিলা করছিল···এই সময়টাই হল সেই সাহসী সংস্কারের পর্ব যখন সতীপ্রথা বিলোপ (ভারতীয় সমাজের প্রগতিশীল গোষ্ঠীর পরিপূর্ণ সহযোগিতায় সম্পাদিত ক্রীতদাসপ্রথার বিলোপ (বাস্তবে আনুষ্ঠানিক মাত্র) শিশুহত্যা ও ঠগীদের বিরুদ্ধে লড়াই, পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা ও স্বাধীন

সংবাদপত্রের প্রবর্তন প্রভৃতি ব্যাপারগুলো ঘটেছিল। অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গী, ভারতীয় ঐতিহ্যের যা কিছু পশ্চাদ্‌পদ তার প্রতিই সহমর্মিতাশূন্যতা; নিশ্চিত বিশ্বাস যে উনবিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়া ও খ্রীষ্টীয় ধারণাই হল মানবতার আদর্শরূপ—এই মনোভাব সত্ত্বেও প্রথম যুগের শাসকরা উদীয়মান বুর্জোয়া ভাবধারার প্রতিনিধিত্বমূলক এক শক্তিশালী নব কর্মোদ্যোগ সৃষ্টি করছিল; এবং এই প্রচেষ্টায় স্যর হেন্‌রি লরেন্সের মতো শ্রেষ্ঠ যারা তারা যাদের নিয়ে কাজ করতেন তাদের শ্রদ্ধাও অর্জন করেছিল।...ব্রিটিশের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল প্রাচীন প্রতিক্রিয়াশীল শাসকেরা যারা তাদের দখলদার মনে করত। সেই সময়ে রাজা রামমোহন রায় ও ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব ভারতীয় সমাজের সবচেয়ে প্রগতিশীল অংশ প্রগতির উৎকর্ষ বলে ব্রিটিশদের প্রকাশ্য প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখত, তাদের সংস্কারের প্রতি দ্বিধাহীন সমর্থন জানাত এবং তাদের মধ্যে নবীন সভ্যতার অগ্রদূতকে দেখতে পেত।'৯

ব্রিটিশের প্রতি তার প্রচুর অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও রাজা রামমোহন রায় ব্রিটিশেরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত করার জন্য যে পদ্ধতি নিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। ভারতীয়দের উচ্চতর পদের বাইরে রাখার ব্যাপারেও তিনি ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনা করেছেন।

ব্রাহ্মসমাজ কেবলমাত্র একটা ধর্মীয় আন্দোলনই ছিল না, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচীও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে রানাডে এবং অন্যান্যরা যে সমাজসংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিলেন এবং প্রথমদিকের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যে রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন এ সব কিছুরই পথিকৃৎ ছিল। ধর্মসংস্কার আন্দোলন এইভাবে দেশে পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলনেরও রাস্তা খুলে দিয়েছিল। রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁর প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজের ঐতিহাসিক তাৎপর্য এইখানেই। 'রাজা রামমোহন রায় ভারতবর্ষে আধুনিক যুগের প্রবর্তন করেছিলেন।'১০

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের পরবর্তী নেতা। তিনি ধর্ম পুস্তকের অভ্রান্ততা বিষয়ে সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠেছিলেন এবং পরিশেষে তা মানতে অস্বীকার করেন। ধর্ম পুস্তকের কর্তৃত্বের পরিবর্তে তিনি স্বতঃলব্ধ জ্ঞান ব্যবহার করতেন। স্বতঃলব্ধ জ্ঞান দ্বারা তিনি উপনিষদের এক একটা অংশ খুঁজে বের করতেন যা ব্রাহ্মসমাজের মতবাদ ও কর্মসূচীর ধর্মীয় মতাদর্শগত ভিত হিসাবে কাজ করত।

কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪) ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের পরবর্তী নেতা। তাঁর নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজের মতবাদ বেশি বেশি করে প্রকৃত খ্রীষ্টধর্মের উপযোগী হয়ে উঠতে লাগল। পরবর্তী পর্বে তিনি আদেশ মতবাদ প্রচার করেন। এই মতানুসারে ঈশ্বর কিছু ব্যক্তিবিশেষকে জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করেন এবং সেই কারণে তাদের কথা অভ্রান্ত ও সত্য বলে গণ্য করতে হয়। ব্রাহ্মদের মধ্যে একটা গোষ্ঠী এই মতবাদ গ্রহণ করেন নি এবং তাঁরা ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠন করেন।

ব্রাহ্মসমাজ ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ। ইতিহাসের গতিতে

এই আন্দোলন ধর্মসংস্কার আন্দোলন হিসাবে শুরু হয় যার লক্ষ্য ছিল কর্তৃত্ব-পরায়ণ ধর্মের গুরুভার থেকে ব্যক্তিবিশেষকে মুক্তি দেওয়া কেননা এই গুরুভার তাদের উদ্যমকে রুদ্ধ করে এবং ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক মনকে নির্বোধ করে।

ব্রাহ্মসমাজ ব্যক্তিস্বাধীনতা, জাতীয় ঐক্য, সংহতি সহযোগিতার নীতি-সমূহ ঘোষণা করে ও সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সম্পর্কের গণতন্ত্রীকরণ করে ব্রাহ্মসমাজ ভারতীয় জনসাধারণের জন্য একটা নতুন যুগের সূচনা করেছিল। তাদের জাতীয় জাগরণের এটাই ছিল সর্বপ্রথম সংগঠিত অভিব্যক্তি।

প্রার্থনা সমাজ

এম. জি. রানাডে ১৮৬৭ সালে বোম্বাইতে প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের ধরনেই এর ধর্ম ও সমাজসংস্কারের কর্মসূচী ছিল। এর প্রতিষ্ঠাতা রানাডে ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও ইণ্ডিয়ান সোস্যাল কন্‌ফারেন্সের অন্যতম নেতা। উক্ত সংগঠনগুলির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে ১৮৮৫ ও ১৮৮৮ সালে।

আর্য সমাজ

১৮৭৫ সালে দয়ানন্দ সরস্বতী বোম্বাইতে আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ এই আন্দোলনের মধ্যে রূপ পেলেও এই আন্দোলন কিছুটা আলাদা ধরনের ছিল। এর প্রকৃতি ছিল অনেকটাই ধর্ম বিষয়ে পুনরুভ্যুদয়ের সমর্থক। বেদকে এই সমাজ অভ্রান্ত এবং তাছাড়া অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার বলে ঘোষণা করেছিল। বেদে আছে সবরকমের খবরাখবর—দার্শনিক, প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক। কি করে বেদ বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে হয় সেটা অবশ্যই প্রত্যেককে জেনে নিতে হবে। যে কেউ যথোপযুক্ত চেষ্টা করলে বেদের মধ্যেই আধুনিক রসায়ন, কত্রবিদ্যা এবং এমনকি সামরিক ও অসামরিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে পারে।[১১]

বেদ যেহেতু অভ্রান্ত বলে গণ্য হয়েছিল তাই ব্যক্তির বিচার নয়, বেদের কথাই সর্বশেষ বলে গণ্য করা হত। বেদের অভ্রান্ততা ঘোষণা করে আর্য সমাজ শাস্ত্রীয় বাণী লঙ্ঘন করতে ব্যক্তিবিশেষকে অনুমতি দেয় নি, দিতে পারতও না। ব্রাহ্মণের অত্যাচার এবং রক্ষণশীলতা থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত করেও আর্য সমাজ এইভাবে দৈবী বেদের প্রতি প্রকারান্তরে ভক্তি দাবি করত। ব্যক্তিগত বিচারের স্বাধীনতার পরিবর্তে বেদের কর্তৃত্বই রক্ষিত হয়েছিল।

ব্রাহ্মণের কর্তৃত্ব অস্বীকার করা, অর্থহীন আচার আচরণ ও বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি পুজো যা জনগণকে অনেক যুধ্যমান সম্প্রদায়ে ভাগ করে দিচ্ছিল তা বর্জন করা, এবং বহু শতাব্দী ধরে হিন্দু মনকে মানসিক বিভ্রান্তি ও আত্মিক অবমাননার মধ্যে রেখেছিল যে গুচ্ছের ধর্মীয় কুসংস্কার তার বিরুদ্ধে জেহাদ—এই ছিল আর্য সমাজের কর্মসূচীর প্রগতিশীল বিষয়বস্তু। এর 'বেদে ফিরে চলো' এই ধ্বনি জাতীয় ঐক্য ফিরিয়ে আনা এবং জাতীয় গৌরব ও

সচেতনতা উদ্বুদ্ধ করার আকাঙ্ক্ষায় প্রণোদিত। অবশ্য যেহেতু এরা সংকীর্ণ হিন্দু ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল তাই এদের প্রচারিত জাতীয় ঐক্যের আওতায় মুসলমান এবং খৃীস্টানদের মতন অহিন্দু সম্প্রদায়গুলোকে আনতে পারে নি। হিন্দুধর্মেরই এটি ছিল একটা আধা পুনর্গঠিত কাঠামো।

আর্য সমাজের সমাজসংস্কারের একটা কর্মসূচী ছিল। যদিও এই সমাজ বংশানুক্রমিক জাতপ্রথার বিরোধিতা করত তবু এ সমাজ জাতের চার বিভাগের পক্ষপাতী ছিল। তাদের মতে এই বিভাগ জন্মসূত্রে নয় মেধাসূত্রে নির্ধারিত হবে, যেহেতু বেদে এইরকম জাতবিভাগ বিপিবদ্ধ আছে এবং বেদ যেহেতু অভ্রান্ত তাই আর্য সমাজ জাতপ্রথার বিলোপ ঘোষণা করতে পারে নি।

আর্য সমাজ সামাজিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের সমর্থক ছিল। এটা স্পষ্টতট একটা গণতান্ত্রিক ধারণা, তবে বৈদিক যুগে যেহেতু সহশিক্ষা ছিল না তাই এরা সহশিক্ষার বিরোধিতা করেছিল।

আর্য সমাজ বালক ও বালিকা উভয়ের জন্যই দেশজুড়ে স্কুল কলেজ সংগঠিত করেছিল। এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হত। ১৮৮৬ সালে দয়ানন্দ ইংগ-বৈদিক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর্য সমাজের রক্ষণশীল গোষ্ঠী মনে করত যে এই কলেজে যে শিক্ষা দেওয়া হত তা প্রকৃতিতে যথেষ্ট বৈদিক নয়। এই রক্ষণশীল গোষ্ঠীর সভ্যরা মুনসীরামের নেতৃত্বে হরিদ্বার গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে শিক্ষা কি বিষয়বস্তু কি পদ্ধতি উভয় দিক থেকেই প্রাচীন বৈদিক ধাঁচের ছিল।

সবরকম ক্রিয়াকর্মের ব্যাপারে আর্য সমাজ সাধারণতঃ জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হত। উপ-জাতভেদ বিলোপ করে আর্য সমাজ হিন্দুদের সংহত করতে চেষ্টা করেছিল। এই সমাজ জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়েছিল এবং জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, বর্ণ ও নারী-পুরুষের পার্থক্য নির্বিশেষে সমতার নীতি ঘোষণা করেছিল। পরাধীন জাতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যে হীনমন্যতা তাকে এরা ধ্বংস করতে চেয়েছিল।

সংকীর্ণ হিন্দু ভিত্তি সত্ত্বেও, বেদেই সব জ্ঞান নিহিত আছে এই ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও শত শত জাতীয়তাবাদী ভারতীয় আর্য সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে একটা সময় ছিল যখন আর্য সমাজ ছিল রাজনৈতিক পীড়নের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। তাই এটা মোটেই আশ্চর্য নয় যে ১৯১৭ সালের পর বিশৃংখলার কারণ নির্ণয় করার জন্য দ্য টাইমস্ পত্রিকার পক্ষ থেকে Valentine Chirol যখন ভারতবর্ষ পরিদর্শনে আসেন তখন তিনি আর্য-সমাজকে ইংলন্ড ও তার সার্বভৌমত্বের পক্ষে ভীতিপ্রদ হিসাবে দেখেছিলেন।[১২]

আর্য সমাজ ভারতীয় জনসাধারণের জাতীয় জাগরণের এক ধরনের প্রতিনিধিত্ব করত। ইসলামের প্রতি নঞর্থক মনোভাব সহ সংকীর্ণ হিন্দু ভিত্তি থাকার দরুন সময়কালে আর্য সমাজ মুসলমানদেরও অনুরূপ সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে চালিত হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। প্রথম যুগে যখন জাতীয় জাগরণ সবেমাত্র ঘটছিল সেইসময় আর্য সমাজ একটা প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। আর্য সমাজের দুটো দিক ছিল—একটা হল প্রগতিশীল, আরেকটা হল প্রতিক্রিয়াশীল। যখন এ হিন্দুদের ধর্মীয় কুসংস্কার ও ব্রাহ্মণদের একচ্ছত্র

পৌরহিত্যের সমালোচনা করত, যখন এ বহুঈশ্বরবাদকে অস্বীকার করত এবং যখন গণশিক্ষার, উপ-বর্ণভেদ বিলোপসাধনের, এবং নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল তখন এই সমাজ প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু যখন এরা বেদকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিশ্বের সবরকম জ্ঞানভাণ্ডার এবং অভ্রান্ত সত্য বলে ঘোষণা করেছিল, যখন সমাজকে মেধার ভিত্তিতে হলেও, চারজাতে বিভাগের পক্ষপাতী ছিল তখন এ প্রগতি-বিরোধী ভূমিকা পালন করেছিল। অসীম ও নিয়ত পরিবর্তনশীল সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিশ্বে কোনো জ্ঞানই চূড়ান্ত হতে পারে না। সুতরাং বেদ সমস্ত জ্ঞানের মূর্ত প্রতীক হতে পারে না। আবার সবরকম জ্ঞানই ঐতিহাসিক শর্তসাপেক্ষ এবং যে যুগে সে জন্মেছে সেই যুগের সামাজিক ও ঐতিহাসিক অগ্রগতির মানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই পরবর্তী বংশধরদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া অতীতের জ্ঞানকে সমালোচনার সঙ্গে বয়ে নিয়ে যেতে হয় ও তাকে যুক্তি ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়ে খতিয়ে দেখতে হয়, এইখানেই ব্যক্তিগত বিচারের ভূমিকার প্রশ্ন আসে। বেদকে যদি একবার অভ্রান্ত বলে গণ্য করতে হয় তাহলে ব্যক্তি ও সেই সময়কার যুগকে তাদের স্বাধীন বিচারের ব্যবহার থেকে বঞ্চিত করা হয় ও প্রাচীন ধর্মাদেশ সম্পর্কে মতামত থেকেও বঞ্চিত করা হয়। এটা হল ধর্মাদেশের কাছে ব্যক্তি ও যুগের বোধির ক্রীতদাসত্ব। উদারপন্থী নীতি থেকে এটা একেবারেই আলাদা।

আবার, আর্য সমাজ জাতীয় অথবা সার্বজনীন ধর্ম হতে পারে নি কেননা তার অনুগামীদের কাছে বেদের অভ্রান্ততা ও সর্বজ্ঞতার স্বীকৃতি দাবী করা হত।

আগেই বলা হয়েছে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রথম যুগে আর্য সমাজ একটা প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তবে, যখন জাতীয় জাগরণ ব্যাপক ও গভীর হচ্ছিল ও জাতীয় আন্দোলন অধিকতর ধর্মনিরপেক্ষ হচ্ছিল, তখন অচেতনভাবে হলেও বিবদমান ধর্ম সাম্প্রদায়িক পরিবেশের সৃষ্টি করে আর্য সমাজ জাতীয়তাবাদের প্রসারে বিঘ্ন ঘটিয়েছিল।

রামকৃষ্ণ মিশন আন্দোলন

ভারতীয় জনসাধারণের জাতীয় জাগরণ রামকৃষ্ণ অনুপ্রাণিত আন্দোলনে নতুন রূপ পেয়েছিল। রামকৃষ্ণ ছিলেন চণ্ডীদাস ও চৈতন্যের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকার এক মহান হিন্দু ঋষি। এই আন্দোলন মূলতঃ ভক্তিবাদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এর মুখ্য প্রচারক ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি রামকৃষ্ণের একজন শিষ্য এবং অতি উচ্চস্তরের চিন্তাশীল বুদ্ধিমান ব্যক্তি। রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তার উপদেশ প্রচারের জন্য তিনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের লক্ষ্য ছিল পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী প্রভাব থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করা, মূর্তিপূজার অভ্যাস এবং বহুঈশ্বরবাদসহ এরা হিন্দুধর্মকে অনুসরণ করেছিল। এদের লক্ষ্য ছিল পুনরুজ্জীবিত হিন্দুধর্মের জন্য বিশ্বের আধ্যাত্মিক বিজয়।[১৩]

ভারতীয়দের মধ্যে আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি বিমুখ হবার একটা প্রবণতা সৃষ্টিই ছিল ভারতবর্ষে বিদেশী শাসনের অন্যতম একটা ক্ষতিকারক পরিণতি। গড়পড়তা ভারতীয়ের সচেতন জীবন গড়ে উঠেছিল প্রাক্-পুঁজিবাদী সংস্কৃতির ওপর নির্ভর করে। তার থেকে এই পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ঐতিহাসিক দিক থেকে অনেক উন্নত পর্যায়ের ছিল।

এছাড়াও আরো কতকগুলো ছোট ছোট ধর্মসংস্কার আন্দোলন ছিল যার মধ্যেও নবজাগরণের প্রকাশ ঘটেছিল। হিন্দুধর্ম পুনরুভ্যুত্থান ও সংস্কারবাদী এই দুই রূপে জাতীয় পর্যায়ে নিজেকে সংগঠিত করতে আরম্ভ করেছিল। হিন্দু সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এই আন্দোলনগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল।

এইভাবে ১৯০২ সালে ভারতধর্ম মহামণ্ডল সমিতি সৃষ্টি হল। এর কর্মসূচী ছিল হিন্দুধর্ম সংস্কার করা ও হিন্দুদের মধ্যে ধর্মীয় ও ধর্ম-বহির্ভূত শিক্ষার বিস্তার করা। ১৮৯০ সালে শ্রীনারায়ণ তিয়াদের আন্দোলন শুরু করেন। তিয়ারা নানা প্রকার অপদেবতার পুজো করত। এরা ছিল হিন্দু-সমাজের অন্যতম নিম্নতন জাত। এই আন্দোলনের কর্মসূচী ছিল সম্প্রদায়ের জন্য মন্দির নির্মাণ করা ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।[১৪]

থিওসফী

Madame Blavatsky এবং Henry Steel Olcott ১৮৭৯ সালে ভারতবর্ষে থিওসফী প্রবর্তন করেন। তবে প্রধানতঃ অ্যানি বেশান্টের নেতৃত্বে থিওসফীর আন্দোলন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক নতুন পরিস্থিতির চাপে গড়ে ওঠা এটি আরেকটি ধর্মসংস্কার আন্দোলন। এই আন্দোলনের অসাধারণত্ব এইখানে যে এটি শুরু হয়েছিল একজন অভারতীয়ের হাতে যিনি হিন্দুধর্মের একজন বড় গুণগ্রাহী ছিলেন। থিওসফী প্রাচীন হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিক দর্শনের মতাবলম্বী ছিল ও আত্মার দেহান্তরিত হওয়ার তত্ত্ব স্বীকার করত। এই মতবাদ জাত-বর্ণ-ধর্ম ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিশ্বভ্রাতৃত্ব শিক্ষা দিয়েছিল। এরা ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় চেতনা বিকাশের পক্ষে ছিল। ১৯০৫ সালে অ্যানি বেশান্ট লিখেছিলেন, 'ভারতবর্ষের প্রয়োজন হল অন্যান্য অনেক কিছুর মধ্যে জাতীয় চেতনার বিকাশ, ভারতীয় আদর্শে প্রতিষ্ঠিত এবং পাশ্চাত্য চিন্তা ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ কিন্তু নিয়ন্ত্রিত নয় এমন একটা শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা।'[১৫]

থিওসফী সব প্রাচ্য ধর্মগুলির তুলনামূলক বিচারের পক্ষপাতী ছিল। অবশ্য এই মতবাদ প্রাচীন হিন্দুধর্মকে বিশ্বের মধ্যে গভীরতম আধ্যাত্মিক ধর্ম বলে গণ্য করত।

থিওসফী কিন্তু দেশের গভীরে প্রবেশ করতে পারে নি।

আরো কতকগুলো ছোটখাট ধর্মসংস্কার আন্দোলন ছিল যাদের লক্ষ্য ছিল হিন্দুধর্মকে সমসাময়িক ভারতীয় জনসাধারণের সামাজিক প্রয়োজনের উপযোগী করে তোলা যেমন দেবসমাজ, রাধাস্বামী সৎসঙ্গ আন্দোলনের কথা বলা যায়। বড় বড় আন্দোলনগুলোর মতো এই আন্দোলনগুলোরও লক্ষ্য ছিল হিন্দুদের হিন্দুধর্মের মূলনীতির সঙ্গে একত্রিত করা। তাদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের

গণতন্ত্রীকরণ, এবং তাদেরকে জাতীয় আবেগে উদ্বুদ্ধ করা। তারাও হিন্দুদের নতুন জাতীয় চেতনাকে ব্যক্ত করেছিলেন ধর্মীয় আকারে।

বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের ধর্মীয় আন্দোলন

এইসব সংগঠিত ধর্মসংস্কার ও ধর্মপুনর্গঠন আন্দোলন ছাড়াও অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ও রাজনৈতিক যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি যেমন বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, তিলক এবং গান্ধী সুস্পষ্ট কোনো আন্দোলন সংগঠিত না করেও ধর্মসংস্কারের কাজে সহায়তা করেছিল। বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদ যদিও উত্তরোত্তর ধর্মনিরপেক্ষ হচ্ছিল তবু কিছু সময়ের জন্য তা ধর্মীয় প্রকৃতিরও ছিল, তা স্বামী বিবেকানন্দের নব্য বৈদান্তিক আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। 'তাই বাঙালী জাতীয়তাবাদীর চেষ্টা ছিল নিজের অন্তরাত্মার মধ্যে সাংখ্যের চরমপুরুষের সন্ধানের ঔপনিষদিক আদর্শের ওপর স্বরাজের জন্য আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠা করা, তাই মাতৃপূজা—কালী দেশের প্রতীক।'১৬

তিলক গীতার নতুন ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং কর্মকেই গীতার মূল শিক্ষা বলে ঘোষণা করেছিলেন। তার মতে গীতার দর্শনের সারবস্তুই ভারতীয় জনসাধারণ বুঝতে পারছিল না। ফলতঃ, তারা জড়তা ও অদৃষ্টবাদী মনোভাবে আচ্ছন্ন হচ্ছিল। এটা উপলব্ধি করতে পারলেই ভারতীয় জনসাধারণকে সক্রিয় কাজে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

তিলক জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হিসাবে একটি গতিশীল দর্শনের জন্য প্রাচীন হিন্দুধর্মের সাহায্য নিয়েছেন।

এইভাবে ব্রিটিশ শাসন থেকে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য, গণতন্ত্র ও আধুনিক অর্থনীতির ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্র প্রবর্তনের জন্য জাতীয় আন্দোলন হয়ে উঠল সর্বব্যাপক ধর্মীয় আন্দোলনের একটা কাজ। জাতীয়তাবাদ তাই ধর্মীয় পরিভাষায় ব্যক্ত হয়েছিল ও ধর্মীয়-অতীন্দ্রিয়রূপে আবৃত হয়েছিল। কালক্রমে যে ধর্মভাব একে আচ্ছন্ন রেখেছিল সেই ধর্মভাব থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ আন্দোলন উত্তরোত্তর ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠেছিল।

বস্তুবাদ, ভারতবর্ষে অবহেলিত

ভারতীয় জাতীয় অগ্রগতির একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য এই যে এর পথপ্রদর্শক এবং পরবর্তী নেতারা কেউই কোনো বস্তুবাদী দর্শন গড়ে তোলেন নি বা গ্রহণ করেন নি। দর্শন, রাজনীতি, অথবা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে গোখলে, তিলক, সুরেন ব্যানার্জি, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, লালা লাজপত রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গান্ধী, আবুল কালাম আজাদ, ইক্‌বাল, জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সব নেতারাই বিভিন্ন মাত্রায় এবং বিভিন্ন পর্যায়ে প্রথাসিদ্ধ ধর্মসমূহের সংস্কারেরই পক্ষপাতী ছিলেন। তারা কেউই ধর্মকে অথবা তার ভিত্তি ঈশ্বরবাদকে চ্যালেঞ্জ করেন নি, বা খণ্ডনও করেন নি। তারা কেউই বস্তুবাদের দর্শনকে মেনে নেন নি।

ইউরোপে উদীয়মান জাতীয়তাবাদের যুগের সঙ্গে এ ছিল বিপরীত। এটা সত্যি যে ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের অধিকাংশ চিন্তানায়ক ছিলেন ভাববাদী

(দার্শনিক অর্থে) ও ঈশ্বরবিশ্বাসী। এমনকি ভলতেয়ারের মতো খ্রীষ্টধর্মের ভীষণ সমালোচকও ছিলেন এক ধরনের ঈশ্বরবিশ্বাসী (Deist)। যাহোক যুগের দার্শনিক আন্দোলনে বস্তুবাদের ক্ষীণস্রোত নিহিত ছিল। Holbach এবং Diderot-এর মতন কয়েকজন ফরাসী কোষবেত্তা পণ্ডিত ছিলেন বস্তুবাদী। আবার ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জাতীয় রাষ্ট্র এবং সমাজ গঠনের পর কিছু সংখ্যক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হয়েছিল যাঁরা বস্তুবাদী তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। Haeckel, Feurbach এবং মার্কস এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত। এইসব পুরোদস্তুর বস্তুবাদী ছাড়াও এই জাতীয়তাবাদের যুগে ইউরোপে Kant এবং Herbert Spencer-এর মতন কিছু অজ্ঞাবাদী দার্শনিক এবং Hume-এর মতন কিছু নাস্তিক চিন্তাবিদেরও আবির্ভাব হয়েছিল।[১৭]

ভারতবর্ষে অবশ্য জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে কোনো একজনও বিখ্যাত বস্তুবাদী বা অজ্ঞাবাদী বা নাস্তিক দার্শনিকের নাম লেখা নেই।

এর কারণ সম্ভবতঃ এই যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ অদ্ভুতভাবে গড়ে উঠেছিল। আধুনিক বস্তুবাদ সমগ্র ইউরোপীয় সংস্কৃতির ক্ষুদ্র হলেও একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। যেহেতু এই সংস্কৃতি ছিল ভারতবিজয়ী শাসক ব্রিটিশের সংস্কৃতি তাই জাতীয়তাবাদী নেতারা সচেতন ও অচেতনভাবে এর থেকে পিছু হটে গিয়েছিল। দর্শনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে অবশ্যই নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে এবং আহরণ করতে হবে অতীতের দার্শনিক উত্তরাধিকার যা ছিল মূলত ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক। নেতারা কেন আধুনিক বস্তুবাদ এমনকি পুরোদস্তুর যুক্তিবাদ ত্যাগ করেছিল সম্ভবতঃ এইটাই তার প্রধান কারণ। তার যুক্তিবাদী দৃষ্টিভংগী সত্ত্বেও রাজা রামমোহন রায় বৈদিক ধর্মশাস্ত্রের প্রতি তাঁর বিশ্বাস অতিক্রম করতে পারেন নি। তাঁর অনুগামী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যুক্তি এবং স্বতঃলব্ধ জ্ঞান এই দুইয়ের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন। কেশবচন্দ্র সেন মানুষের কাছে ঈশ্বরের নীতি প্রচার করবার ধর্মযাজকরূপে নিজেকে ঘোষণা করেছিলেন। বিপিন পাল এবং অরবিন্দ ঘোষ আধ্যাত্মিক অতীন্দ্রিয়বাদে বিশ্বাস করতেন। আর্য সমাজপন্থী লাজপত রায় বেদকে পবিত্র বলে গণ্য করতেন। সর্বোপরি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মহত্তম নেতা গান্ধী যখনই কোনো জটিল সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তখন 'অন্তরের বাণী'র সাহায্য প্রার্থনা করতেন।

বিদেশী শাসনের উপস্থিতিই এমনকি উঁচুদরের জাতীয়তাবাদীকেও সচেতন ও অচেতনভাবে শুধুমাত্র যে বিদেশী শাসন পরিহার করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাই নয় শাসকজাতির সংস্কৃতি থেকেও পিছু হটতে সক্রিয় করেছিল। ভুল করে হলেও এই বিদেশী শাসন ও বিদেশী সংস্কৃতি একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। বিদেশী শাসন মোটের ওপর অবাধ জাতীয় অগ্রগতিকে বাধা দিত। সেই পরিস্থিতিতে উদ্ভূত জাতীয় সচেতনতার প্রসার প্রায়ই জাতীয়তাবাদীকে দেশের অতীত সংস্কৃতির অজ্ঞান ও অতীন্দ্রিয় পর্বে ফিরিয়ে নিত এবং সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল জাতীয় আন্দোলনকে সেই অতীতের ওপর ভিত্তি করে দাঁড় করাবার চেষ্টা চলত। ফলে জাতীয় আন্দোলনে ঢুকে গিয়েছিল বিভ্রান্তি ও অজ্ঞানতা এবং নানা সামাজিক ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় ঐক্য প্রসারে সৃষ্টি হয়েছিল বাধা। রাজনীতি ধর্মের সংক্রমণে হয়ে উঠেছিল অলৌকিক।

প্রথম পর্বের ধর্মসংস্কার আন্দোলনসমূহের প্রগতিশীল তাৎপর্য

প্রথম পর্বে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সদ্য প্রকাশিত হচ্ছিল, ছিল অপরিপক্ব, তখন তা ব্রাহ্মসমাজ ধাঁচের উদারপন্থী ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে দেখা দিচ্ছিল। জাতীয় আন্দোলনের ধর্মীয় রূপ তার অপরিণত অবস্থায় আবদ্ধ ছিল। তাই এদের সীমিত যুক্তিবাদী ও ধর্মীয় রূপ থাকা সত্ত্বেও এই ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনগুলো ঐতিহাসিক দিক দিয়ে প্রগতিশীল ভূমিকা নিয়েছিল। মধ্যযুগীয়তার দুর্গে এরাই ছিল প্রথম ফাটল। ধর্মীয় ও সমাজসংস্কারের ভাষায় এরাই প্রথম ঘোষণা করেছিল যে আধুনিক ভারতীয় জাতি জন্মলাভ করেছে এবং গড়ে উঠছে। পরবর্তী যুগে যখন জাতীয় সচেতনতা ব্যাপক ও জাতীয় আন্দোলন আরো শক্তিশালী এমনকি সংগ্রামী হয়ে উঠেছিল তখন বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ প্রমুখ জাতীয়তাবাদীরা প্রাচীন হিন্দুত্বের ধর্মীয় অতীন্দ্রিয় দর্শনের ওপর ভিত্তি করে যে প্রয়াস করেছিলেন তা এক অর্থে জাতীয়তাবাদের প্রসারে বিঘ্ন ঘটিয়েছিল। এই নেতারা জনসাধারণের এক গোষ্ঠীর জাতীয় চেতনা গভীর করেছিল এমনকি সংগ্রামীও করেছিল ঠিকই, কিন্তু জাতীয়তাবাদকে হিন্দু অতীন্দ্রিয়বাদের সঙ্গে যুক্ত করে এমনকি তার ওপর ভিত্তি করে তারা জাতীয়তাবাদের সামাজিক ভিত্তির বিস্তার বিঘ্নিত করেছিল। জাতীয় আন্দোলন মুসলমান সম্প্রদায়ের বড় গোষ্ঠীকে কেন এর মধ্যে আনতে পারে নি তার অন্যতম কারণ হল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে ধর্মীয় যোগাযোগ সবসময়ই ছিল এমনকি গান্ধীর নেতৃত্বের সময়ও এরকমটা ছিল। এটাই যে একমাত্র সুনিশ্চিত কারণ তা হয়তো নয় কিন্তু এটা এমন একটা কারণ যা উপেক্ষা করা যায় না। একথা সত্যি যে গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পরিচালনায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটা জাতীয় গণতান্ত্রিক উত্তরণের কর্মসূচী ছিল—কোনো হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী নয়। বাস্তবিক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একটা জাতীয় সংগঠন, সমস্ত সচেতন রাজনৈতিক শক্তির মিলন কেন্দ্র। কিন্তু রাজনীতিকে সবসময়ই আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন করে তুলতে হবে, ধর্মীয় নৈতিকতার অনুরূপ হতে হবে—গান্ধীজীর এই সোচ্চার ভাবনা যারা জাতীয় আন্দোলনকে ধর্মনিরপেক্ষ রাখতে চাইত, তাদের এই আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। তাছাড়া রাজনৈতিক প্রেক্ষিতেও তা নিয়ে এসেছিল এক অলৌকিক অস্পষ্টতা যা প্রায়শই আন্দোলনের নীতিভ্রষ্ট করত।

যুক্তিবাদ ও বস্তুবাদের প্রসার

১৯৩০ সালের পর ভারতবর্ষে যুক্তিবাদী ও বস্তুবাদী দর্শনের তত্ত্ব ধীরে ধীরে বিস্তারলাভ করতে লাগল। এর অনেকগুলো কারণ ছিল যেমন ১৯১৪ ১৮ সালের যুদ্ধের পর পশ্চিমের রাজনৈতিক, সমাজতাত্ত্বিক ও দার্শনিক সাহিত্যে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপকতর আগ্রহ। বিশ্ব পুঁজিবাদের বিপর্যয় এবং সমাজতন্ত্রের সগর্ব দাবি যে সমাজতন্ত্রই হল পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক উত্তরণ—এ ব্যাপারটা রাজনীতি-সচেতন ভারতীয় যুবকদেরকে পাশ্চাত্যের সমাজতন্ত্রী সাহিত্য পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছিল, এর মধ্যে ছিল

মার্কসবাদ—যার ভিত্তি ছিল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শন। বস্তুতপক্ষে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের একটা গোষ্ঠী মার্কসীয় মতবাদ গ্রহণ করেছিল এবং তাদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাফল্যও উত্তরোত্তর বেশিসংখ্যক ভারতীয়দের মার্কসীয় বস্তুবাদের সপক্ষে আনতে সাহায্য করেছিল। ভারতবর্ষের কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী, কমিউনিস্ট, রায়পন্থী, ঠাকুরপন্থী এবং ট্রটস্কিবাদী রাজনৈতিক গোষ্ঠী তাদের দর্শন হিসাবে মার্কসবাদকে গ্রহণ করেছিল।

মার্কসের বস্তুবাদের স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা স্রোত ভারতবর্ষে জোরদার হতে শুরু করেছিল—তা হল যুক্তিবাদ। ভারতীয় যুক্তিবাদীদের সংখ্যাও বাড়ছিল।

জাতীয়তাবাদের পথিকৃৎ এবং নেতারা ছিলেন শিক্ষিতশ্রেণী এবং বুর্জোয়া। তারা নতুন পুঁজিবাদী সমাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই নতুন পুঁজিবাদী সমাজ ঐতিহাসিকভাবে উন্নততর ধরনের এবং তা উত্তরোত্তর মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থা উচ্ছেদ করে দিচ্ছিল। তারা সেই নতুন সমাজব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভিত্তি গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই সমাজের অবাধ অগ্রগতি চেয়েছিলেন। উদারপন্থা হল এই উদীয়মান পুঁজিবাদের দর্শন। উদারপন্থা হল একধরনের নীতি যা পুঁজিবাদের প্রসারকে সুনিশ্চিত করে। প্রাক্-পুঁজিবাদ থেকে পুঁজিবাদ যেমন উন্নততর সমাজব্যবস্থা, সেইরকম উদারপন্থা প্রাক্-পুঁজিবাদী দর্শনের থেকে উন্নততর দর্শন। উদারপন্থার ভিত্তি হল জাতীয় একতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানুষের সমানাধিকার, প্রতিনিধিমূলক সংগঠন ও যুক্তিবাদ। অন্যদিকে প্রধানত প্রাক্-পুঁজিবাদী দর্শনের ভিত্তি ছিল ধর্মীয় কুসংস্কার এবং তা জন্মভিত্তিক পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার নীতি সমর্থন করত।

যুক্তিসম্মতভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পথিকৃৎ এই বুদ্ধিজীবীদের উদারপন্থী দর্শন সম্পূর্ণ গ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তু যেহেতু উদারপন্থার জন্ম হয়েছিল পাশ্চাত্যে এবং যেহেতু ভারতীয়রা পাশ্চাত্য শক্তির দ্বারা শাসিত তাই তারা পুরানো হিন্দুধর্মকে আঁকড়ে ধরেছিল, তার প্রাচীন খাঁটি চেহারায় পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিল অথবা নতুন ভারতীয় সমাজের প্রয়োজনের উপযোগী করে উদারপন্থী নীতিতে নতুন করে গড়ে তুলতে চেয়েছিল।

মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় জাগরণ, মন্থরগতির কারণ

হিন্দুদের থেকে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় জাগরণ অপেক্ষাকৃত মন্থর গতিতে ঘটেছিল। এর পেছনে কতকগুলো ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় কারণ ছিল।

আওরঙ্গজেবের পর মুঘল সাম্রাজ্যের অবলুপ্তির যুগে যদিও কিছুসংখ্যক হিন্দুরাজ্যের উদ্ভব ঘটেছিল তবু মুসলমানেরা সবসময়ই জানত যে তারাই হল ভারতবর্ষের শাসক সম্প্রদায়। বিশেষভাবে ব্রিটিশের প্রতি তারা শত্রুভাবাপন্ন ছিল, কারণ ব্রিটিশদেরকে তারা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য দায়ী করত। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশেরা সমগ্র ভারতবর্ষের কার্যত না হলেও আইনত যে সম্রাট সেই শাহ আলমকে সিংহাসনচ্যুত করেছিল। সিপাহী

বিদ্রোহের পর ব্রিটিশদের মুসলমানবিরোধী নীতি মুসলমানদের এই ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবকে আরো বাড়িয়ে তুলেছিল।

এই ব্যাপারটাই মুসলমানদের মধ্যে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-প্রবর্তিত নতুন সংস্কৃতি ও শিক্ষার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে অনাগ্রহ সৃষ্টি করল। তারা সেই শিক্ষার প্রভাবাধীনে আসাটা এড়িয়ে যেতে লাগল এবং সনাতন ইসলাম ধর্মকে দৃঢ়তরভাবে আঁকড়ে রইল।

ভারতবর্ষ ব্রিটিশ অধিকারের সময় মুসলমানদের মধ্যে দারিদ্র্য খুব দ্রুতহারে বেড়ে যাচ্ছিল। 'ভারতবর্ষের সূক্ষ্ম ও দক্ষ কারিগরি শিল্পের অনেকগুলোই মুসলমানদের করায়ত্ত ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সরকারী রাজস্ব নীতিতে তারা একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতবর্ষে কি সৈন্য-বাহিনীতে, কি শাসনব্যবস্থাতে, কি শিক্ষাবৃত্তিতে সমস্ত উচ্চ পদগুলোই মুসলমানদের করায়ত্ত ছিল। অনেক উচ্চ ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর মুসলমানরা একেবারে ভিক্ষুকে পর্যবসিত হয়েছিল।···ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলিম মানসিকতা যে ব্রিটিশের প্রতি গভীরতম বিরাগ পোষণ করত এতে কোনো সন্দেহ নেই কেননা ব্রিটিশেরাই তাদের ক্ষমতা ধ্বংস করে দিয়েছিল। যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ব্রিটিশের সঙ্গে জড়িত বলে তারা মনে মনে জানত তার সম্বন্ধেও তারা অনুরূপ ধারণাই পোষণ করত।'১৮

হিন্দুরা এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ নিয়েছিল। তারা একটা শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে তুলেছিল। এই শিক্ষিতশ্রেণীর একটা গোষ্ঠী আবার উদারপন্থী ধ্যানধারণা গ্রহণ করেছিল, *অন্য ধর্ম অনুধাবন করে, বড় বড় সংস্কার আন্দোলনগুলো সংগঠিত করেছিল। অন্যদিকে মুসলমানেরা এই নতুন শিক্ষা থেকে ভিন্নমুখী হয়ে যাচ্ছিল।

সব দেশেই জাতীয়তাবাদের পথিকৃৎ সবসময়ই আধুনিক বুদ্ধিজীবী ও বুর্জোয়াশ্রেণী। উদীয়মান পুঁজিবাদ বুদ্ধিজীবী এবং পুঁজিপতিশ্রেণী গড়ে তোলে এবং এরাই আবার বুর্জোয়া সমাজ গড়ে তোলে। এই বুর্জোয়া সমাজই হল জাতীয় আন্দোলনের সংগঠক। মূলতঃ হিন্দুসমাজের মধ্যে থেকেই প্রথম গোষ্ঠীর ভারতীয় বুদ্ধিজীবী এবং বুর্জোয়াশ্রেণী উদ্ভূত হয়েছিল। এরাই হয়েছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পথিকৃৎ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেই কেবল মুসলমান সমাজ আধুনিক শিল্প-ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। ক্রমে ক্রমে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের উদ্ভব হল। এই বুদ্ধিজীবীদের একটা গোষ্ঠী আবার খুব দ্রুত জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলল। এর সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বাণিজ্যিক ও শিল্পবুর্জোয়াশ্রেণীও গড়ে উঠতে আরম্ভ করল। মুসলমান-দের মধ্যেও জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটতে লাগল।

ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রসার ব্যাহত হওয়ার আরও একটা কারণ হল ইসলামের মৌলিক প্রকৃতি। অন্য যে কোনো ধর্মের থেকে ইসলাম অনুগতদের একতার প্রতি গুরুত্ব দিত। অনুগতদেরকে এই ধর্ম বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দিয়েছিল। ইসলাম হলো বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের একটা সর্বজনীন সম্মেলন। জাতীয়তাবাদের একটা সীমিত জাতীয় ভৌগোলিক ভিত্তি

আছে, তাই জাতীয়তাবাদের বিকাশে ইসলাম অনেক বেশী প্রতিরোধ সৃষ্টি করে, জন্ম দেয় হয় বিশ্ব-ইসলামবাদ নয়ত মানবতাবাদের।

মূলতঃ মুসলমান অধ্যুষিত (যেমন আরব ও তুর্কী) ও পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটেছে এমন একটা দেশের মুসলমানরা জাতীয়তাবাদী হয় এবং একটা জাতীয় সচেতনতা গড়ে তোলে। অন্য যে কোনো মধ্যযুগীয় ধর্ম থেকে ইসলাম জাতীয়তাবাদের প্রসারকে অনেক বেশী ব্যাহত করলেও সমাজ-তন্ত্রের মতন আন্তর্জাতিক কর্মসূচী কিন্তু পেটিবুর্জোয়া এবউ দরিদ্রশ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

'কথাবার্তার মাধ্যমে লেখক দেখেছেন যে মুসলমান যুবকেরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অন্য যেকোনো নেতার থেকে সমাজতন্ত্রী নেতা জওহরলাল নেহেরুর প্রতি বেশী অনুরক্ত।...যুবক ও ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সমাজতন্ত্র যে বিস্তার লাভ করেছে এটা স্পষ্ট।...Punjab Socialist Party অধিকাংশই মুসলমানদের নিয়ে গঠিত ও Frontier Socialist Party অধিকাংশই মুসলমাদের নিয়ে গঠিত এবং এই Frontier Socialist Partyর সভ্যসংখ্যা ভারতবর্ষের মধ্যে বৃহত্তম।'১৯

'সমাজতন্ত্রের মধ্যে সম্ভবত সামাজিক সম্পর্কের কিছুটা স্বাধীনতা আছে ; তাই হিন্দু জনগণের থেকে মুসলমান জনসাধারণ এর মধ্যে বেশী সম্ভাবনা দেখে এবং একবার সমাজতন্ত্রের পথে পা বাড়ালে তারা দ্রুত এগিয়ে যাবে বলেই মনে হয়।'২০

সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীর বিরুদ্ধে আরবের জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমেই ইসলামধর্মের জন্ম। তাই এর একটা গণতান্ত্রিক মণ্ডল আছে। ইসলাম সামাজিক সাম্যের নীতি প্রচার করে। এটি মুসলমান জন-গণের মধ্যে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের প্রচার আরও সফল করে তোলে।

জাতীয়তাবাদের দিকে তাদের অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও সময়কালে তাদের মধ্যেও একাধিক ধর্মীয় পুনরুত্থান এমনকি ধর্মসংস্কার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এই আন্দোলন-গুলো অবশ্য হিন্দুদের অনুরূপ আন্দোলনের মতো অত শক্তিশালী ছিল না। এ ছাড়াও অধিকাংশের মধ্যে জাতীয় প্রকৃতির অভাব ছিল। এরকম চারটে আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন (১) দিল্লীর সাহ আবদুল আজিজ (২) বেরি-লীর সৈয়দ আহমেদ (৩) জোনপুরের শেখ করমৎ আলী (৪) ফরিদপুরের হাজি শরিয়াত-উল্লা।২১

এই চারটে আন্দোলনেরই প্রকৃতি অনেকটা পুনরুত্থানপন্থী ছিল।

আহমদীয়া আন্দোলন

১৮৮৯ সালে মির্জা গোলাম আহমদ প্রবর্তিত আহমদীয়া আন্দোলন অনেকটাই উদারনীতিভিত্তিক ছিল। এই আন্দোলন নিজেকে মুসলমান নব-জাগরণের ধারক বলে গণ্য করত। ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনের মতো এই আন্দো-লন সমগ্র মানবতার সর্বজনীন ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত ছিল। এই আন্দোলনের

প্রবর্তক মির্জা গোলাম আহমদ পাশ্চাত্য উদারপন্থী নীতি, অধ্যাত্মবাদ এবং হিন্দুদের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন।

আহমদীয়া আন্দোলন অ-মুসলমানদের বিরুদ্ধে জেহাদ অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধের বিরোধিতা করত। এই আন্দোলন ছিল সমস্ত মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কের সমর্থক।২২

এই আন্দোলন ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য উদার শিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছিল। সেই উদ্দেশ্যে এই আন্দোলন স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং ইংরেজী ও দেশী উভয় ভাষাতেই সাময়িক পত্রিকা ওরাই প্রকাশ করেছিল।

উদারপন্থী নীতি থাকা সত্ত্বেও আহমদীয়া আন্দোলন অতীন্দ্রিয়বাদী ধারণায় বদ্ধ ছিল। পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোতে একদা সমৃদ্ধ বাহাইবাদও এই অতীন্দ্রিয়বাদের শিকার ছিল। অবশ্য আহমদীয়া আন্দোলনে ইসলাম ধর্মের মধ্যে পাশ্চাত্য উদারপন্থী নীতি আত্তীকরণ করার চেষ্টা দেখা গিয়েছিল।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ঐতিহাসিক কারণে হিন্দুদের থেকে পরে মুসলমান সম্প্রদায় জাতীয় গণতান্ত্রিক প্রগতির পথে পদক্ষেপ করেছিল। '১৮৫৭-৮ সালের মহাবিদ্রোহের করুণ পরিস্থিতিতে পুরানো রীতিনীতির বিলোপ ঘটেছিল এবং ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থ-নৈতিক দুর্দশা ঘটেছিল। এতে করে নতুন ব্যবস্থার প্রতি তাদের বিরূপ মনোভাব, উদাসীনতা এবং অবদমিত ঘৃণা আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে···। সমস্ত পরিস্থিতির মধ্যে প্রবেশ করার মূল কথা ছিল নতুন পরিবেশের সংগে মানিয়ে নেওয়া, যে নতুন শক্তি গড়ে উঠেছে তা ব্যবহার করা, এবং ইংরেজী শিক্ষার মধ্যে দিয়ে প্রগতির যে মাধ্যম তাকে গ্রহণ করা।'২৩

নতুন ব্যবস্থার প্রতি এই মুখ ফিরিয়ে থাকা চিরদিন চলতে পারে না। মুসলমানরা খুব তাড়াতাড়িই নতুন শিক্ষা গ্রহণ করল ও একটা বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী গড়ে তুলল। বাণিজ্য ও শিল্পের ক্ষেত্রেও তাদের আবির্ভাব ঘটতে লাগল। এই নবশিক্ষিত মুসলমান ও মুসলমান ব্যবসায়ী শ্রেণী ও শিল্পপতিরা দ্রুত একটা জাতীয় দৃষ্টিভংগী গড়ে তুলল এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক বিষয়ে গণতান্ত্রিক সংস্কারের পথ গ্রহণ করল।

আলিগড় আন্দোলন

মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় জাগরণ সেই আন্দোলনে প্রথম রূপ লাভ করেছিল যা ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন করেছিল এবং তাদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার করেছিল। সৈয়দ আহমেদ খান এই আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন। তার সহযোগী ছিলেন Khwaja Altaf Hussain Hali, Maulvi Nazir Ahmad এবং Maulvi Shibli Numani.

সৈয়দ আহমেদ খান প্রবর্তিত উদার সমাজসংস্কার এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনই আলিগড় আন্দোলন নামে পরিচিত। কেননা এই আন্দোলনের ফলেই আলিগড়ে ১৮৭৫ সালে মহামেডন অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯০ সালে এই কলেজ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।

এরই সঙ্গে সঙ্গে একটা নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন সংগঠিত হয়েছিল।

আলিগড় আন্দোলন ইসলাম ধর্মের প্রতি অনুরাগ শিথিল না করেও মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার করতে চেয়েছিল। ধর্মীয় শিক্ষা এই আন্দোলনে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেওয়া ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাকে আরও জোরালো করত।

দ্বিতীয় যে কাজটা এই আন্দোলন করেছিল তা হল মুসলমান সমাজের মধ্যে সমাজ সংস্কারের সূচনা করা।

আলিগড় আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল মোটামুটি আধুনিক ভিত্তিতে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্প্রদায় গড়ে তোলা। এই আন্দোলন বহুবিবাহ এবং বিধবাদের পুনর্বিবাহের ওপর সামাজিক নিষেধের নিন্দা করেছিল। ইসলাম ধর্মে বিধবাদের পুনর্বিবাহ অনুমোদিত হলেও হিন্দুধর্ম থেকে সদ্য ধর্মান্তরিত হয়েছে যেসব মুসলমানরা তাদের কোনো কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে এই প্রথা নিষিদ্ধ ছিল।

আলিগড় আন্দোলন কোরানের উদার ব্যাখ্যার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই আন্দোলন ইসলামকে আধুনিক উদার সংস্কৃতির সঙ্গে সমন্বিত করতে চেয়েছিল।

আলিগড় আন্দোলন আরম্ভ হবার পর বোম্বাই, মাদ্রাজ, পঞ্জাব, হায়দ্রাবাদ এবং অন্যান্য জায়গাতেও স্বতন্ত্রভাবে কমবেশী প্রগতিশীল আন্দোলন গড়ে উঠেছিল।

স্যর মহম্মদ ইকবাল

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কবি স্যর মহম্মদ ইকবাল ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। উদারনৈতিক আন্দোলন সমর্থন করেও তিনি মুসলমান উদারপন্থীদের সাবধান হতে বলেছিলেন যাতে 'জাত ও কুলের গুরুত্বে ইসলাম ধর্মের ব্যাপক মানবিক নীতিসমূহ দৃষ্টির বাইরে না চলে যায়।'২৪

ইকবাল ইউরোপীয় সভ্যতাকে অমানবিক, লোলুপ, লুঠেরা এবং অবক্ষয়ী বলে বর্ণনা করেছেন। এমনকি তিনি Nietzsche, Schopenhauer, Spengler এবং কার্ল মার্কসের মতন লেখকদের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে ইউরোপীয় সভ্যতার বিভিন্ন বিষয়ের ওপর দোষারোপ করে এদের পরস্পরবিরোধী মত দেখিয়েছেন। তার যে কবিতাগুলো ফারসী ও উর্দু কাব্যের রত্নসম্ভার সেই কবিতাগুলোতে আবেগপূর্ণ ভাষায় ইউরোপীয় সভ্যতাকে আক্রমণ করেছেন। তিনি ছিলেন প্রকৃতই একজন মানবতাবাদী এবং ইসলামকে ব্যাপকতম মানবতাবাদের ধর্ম বলে গণ্য করতেন।২৫

যাহোক তার জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে ইকবালের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। তিনি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন হয়ে পড়েন।২৬

Modern Islam in India গ্রন্থে W. C. Smith লিখেছেন, "পুঁজিবাদের পরিবর্তে 'পাশ্চাত্য প্রভাব' সম্পর্কে তাঁর বিরোধিতা··· তাঁর মনে উদারতা-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলতা সঞ্চার করে··· এবং এইভাবে আগামীদিনের ন্যায়-বোধ এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের দ্রষ্টাদের মধ্যে মহত্তম ব্যক্তিটি সবচেয়ে পশ্চাদ্‌পদ··· বিভেদপন্থীদের প্রধান মুখপাত্র হয়ে উঠলেন।"

মুসলমানদের অন্যান্য সংস্কার আন্দোলন

কালক্রমে মুসলমান নারীদের মুক্তির জন্য এবং পর্দা ইত্যাদি প্রথার মোকাবিলা করবার জন্য আন্দোলন গড়ে উঠতে লাগল। তয়াবজী নামে একজন শিক্ষিত এবং প্রগতিশীল মুসলমান বোম্বাইতে এই আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন। Shaikh Abdul Halil Sharar (১৮৬০-৯৬) নামে একজন বিখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক উত্তরপ্রদেশে পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে দারুন সংগ্রাম শুরু করেছিলেন।

মুসলমানদের মধ্যে উদারনীতি বিস্তারের সঙ্গে মুসলমান মহিলাদের সামাজিক অবস্থা উন্নতির জন্য এবং যেসব প্রথা তাদের পক্ষে ক্ষতিকারক ছিল সেগুলো বিলোপসাধনের জন্য আন্দোলন জোরদার হতে আরম্ভ করল। বহু-বিবাহ এবং সেইসঙ্গে বাল্যবিবাহও হ্রাস পেতে লাগল। মুসলমান মহিলাদের শিক্ষার অগ্রগতির জন্য নিখিল ভারত মুসলিম কনফারেন্স একটা বিশেষ ও নিয়মিত আর্থিক সাহায্যের বিধান দিয়েছিল।

মুসলমানেরা ব্যক্তিগতভাবে এবং মুসলমান সংগঠনগুলো দেশজুড়ে মুসলমান মহিলাদের জন্য অনেক বেশীসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলল। ধীরে ধীরে মুসলমান মহিলাদের মধ্যেও শিক্ষার বিস্তার ঘটতে লাগল।

এইভাবে মুসলমানদের মধ্যেও ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার আন্দোলন গড়ে উঠতে লাগল এবং জোরদার হতে লাগল। তুর্কী ও আরব জাতীয়তাবাদের উদ্ভব এবং তুর্কীতে একটা ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ভারতীয় মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাপকতর করতে সাহায্য করেছিল। আধুনিক তুর্কী ভারতীয় মুসলমানদের অধিকতর সংখ্যায় আধুনিক করতে পেরেছিল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উদ্ভব ও অগ্রগতি উত্তরোত্তর মুসলমানদের ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করেছিল। পরে ভারতবর্ষে যেসব স্বাধীন শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন দ্রুত গড়ে উঠেছিল সেগুলো প্রধানতঃ কমিউনিস্টদের দ্বারা, সমাজতন্ত্রীদের দ্বারা অথবা জওহরলাল নেহেরুর মতো বামপন্থী জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা পরিচালিত হত। এইসব আন্দোলন মুসলমান জনগণকে জাতীয়তাবোধসম্পন্ন ও শ্রেণীসচেতন করে তুলেছিল। এই আন্দোলনগুলো উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষে প্রশিক্ষণকেন্দ্রবিশেষ হয়ে উঠেছিল এবং জাতীয় ও সর্বতোপ্রযোজ্য শ্রেণীগত কর্তব্যসাধনের পথে সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসাবে দেখা দিয়েছিল। অর্থনৈতিক কাঠামো এবং তৎকালীন বিদেশী শাসন তাদেরকে একত্রিত হতে এবং জনসাধারণের মুক্তির জন্য সহযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

পরবর্তীকালে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রথম পর্বে যখন সবে জাতীয়তাবাদ জাগ্রত হচ্ছে তখন যেসব ধর্মসংস্কার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সেগুলো ছিল অপরিণত এবং ছোটগোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত। এটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে এই ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমেই জাতীয় জাগরণ রূপ লাভ করেছিল এবং কিছু সময়ের জন্য উন্নতিলাভ করেছিল। কিন্তু এর পরবর্তী পর্বে যখন নতুন শ্রেণী এবং সম্প্রদায়ের উদ্ভব হতে লাগল এবং একটা জাতীয় শ্রেণী অথবা গোষ্ঠীসচেতনতা গড়ে উঠতে লাগল এবং আবার যখন জাতীয় আন্দোলন বহুশ্রেণী এবং বহু সম্প্রদায়ভিত্তিক হয়ে উঠল, তখন এই অধিকাংশ ধর্মসংস্কার আন্দোলনগুলো জাতীয় সচেতনতার অভিব্যক্তি হওয়ার পরিবর্তে জাতীয় সচেতনতার পক্ষে প্রতিবন্ধকই হয়েছিল। এমনকি এদের মধ্যে কোনো কোনো আন্দোলনগুলো স্বাধীনতার জন্য সংহত জাতীয় আন্দোলনের পথে জাতীয়তাবিরোধী শক্তিতে পর্যবসিত হয়েছিল। তাদের ভূমিকা সম্পূর্ণ উল্টে যাওয়ার কারণ প্রধানত হল জাতীয় ধর্মসংস্কার আন্দোলনগুলোর ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক আন্দোলনে পরিণত হওয়া। ১৯১৮ সালের পর থেকে এ ব্যাপারটা বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই বছর থেকে দেশে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী এবং শ্রেণী আন্দোলনের অভাবনীয় প্রসার হওয়ার সংগে কিছু পুরানো এবং অন্যান্য নতুন গড়ে ওঠা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক আন্দোলন কায়েমী স্বার্থের প্রচ্ছন্ন হাতিয়ারে পরিণত হল। এই আন্দোলনগুলো ভারতীয় জনসাধারণের দ্রুত গড়ে ওঠা জাতীয় সংহতিকে দুর্বল করে দিয়েছিল ও সেই কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দরিদ্র লোকেরা যে ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক আন্দোলন ও অন্যান্য আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক একতাও দুর্বল করে দিয়েছিল।

এছাড়া এই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক আন্দোলনগুলো ব্রিটিশের স্বার্থরক্ষা করে চলত। সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ও নির্বাচকমণ্ডলীর মতো সব ব্যবস্থা উদ্দেশ্য-মূলকভাবে জাতীয় একতার প্রসার ব্যাহত করেছিল এবং সম্প্রদায়িক প্রভেদকে জিইয়ে রেখেছিল।

সমস্ত বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ও রাজনীতিবিদ্‌দের দ্বারা স্বীকৃত পুঁজি-বাদের পতনের এমন সাম্প্রতিক পর্যায়ে যখন প্রগতিশীল জাতীয় এবং শ্রেণী-আন্দোলনগুলো দ্রুত জোরদার হচ্ছিল তখন কায়েমী স্বার্থ তা সে বিদেশী হোক বা ভারতীয় হোক ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়বাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে তাদের জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে এই আন্দোলনগুলো চালিত করা ও দুর্বল করার প্রয়োজনীয় শক্তি দেখেছিল।

সূত্র নির্দেশ

১ Laski এবং Weisbord দ্রষ্টব্য।
২ Coudwell, পৃ. ২৭-৮।
৩ Laski দ্রষ্টব্য।

৪ B. C. Pal, Buch (2), পৃ. ১৮৪-তে উদ্ধৃত।
৫ Tawney, Laski, Hans Kohn এবং Weisbord দ্রষ্টব্য।
৬ Kohn, পৃ. ৫৫-৬।
৭ Buch, পৃ. ৬১।
৮ Raja Rammohan Roy, পৃ. ৫।
৯ R. P. Dutt, পৃ. ২৭৩-৪।
১০ Rabindranath Tagore, Brajendra Nath Seal কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ৯৫।
১১ Max Muller দ্রষ্টব্য পৃ. ৬৪।
১২ Kohn, পৃ. ৬৭-৮।
১৩ Vivekananda, পৃ. ১৯৩-৫ দ্রষ্টব্য।
১৪ Kohn, পৃ. ৭৩ দ্রষ্টব্য।
১৫ Annie Besant, Buch (2), পৃ. ১৭৪-এ উদ্ধৃত।
১৬ Buch (2) পৃ. ১৮২।
১৭ Laski, Tawney, Langue, Engels, Weisbord দ্রষ্টব্য।
১৮ O'Malley, পৃ. ৩৯২-৩।
১৯ Edib, পৃ. ৩৩৯-৪০।
২০ Jawaharlal Nehru, পৃ. ৫৭৭।
২১ O'Malley দ্রষ্টব্য।
২২ Kohn, পৃ. ৩৬ দ্রষ্টব্য।
২৩ O'Malley পৃ. ৩৯৮।
২৪ Sir M. Iqbal, পৃ. ২২৭ দ্রষ্টব্য।
২৫ O'Malley পৃ. ৪০৬ দ্রষ্টব্য।
২৬ M. R. Smith, পৃ. ১৫৬।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অভিব্যক্তিস্বরূপ রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্ভব

বিদেশী আধিপত্যের ফলস্বরূপ রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব

ব্রিটিশরা ভারত জয় করেছিল স্বার্থবুদ্ধির প্রেরণাতে। স্বভাবতঃই ব্রিটিশরা ভারত শাসন করত নিজেদের স্বার্থ অনুসারে। ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতা মূলতঃ ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষা করা এবং তার উন্নতি করার কাজেই নিযুক্ত হয়েছিল। ভারতের সংগে ব্রিটেনের স্বার্থসংঘাত লাগত বলে ভারতীয় জনসাধারণের সংগে ব্রিটেনের বিরোধ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর ও গোষ্ঠীর সংগে ব্রিটিশ স্বার্থের বিরোধ বাধত বিভিন্ন মাত্রায়। এই স্বার্থগত বিরোধের পরিণাম হল রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ এবং এর ফলেই দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্ম হয়। এই রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোর লক্ষ্য ছিল ক্রমবর্ধমান হারে দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা আয়ত্ত করা ও ক্রমশঃ ডোমিনিয়নের মর্যাদা, স্বায়ত্তশাসন এমনকি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা। ভারতীয় জনসাধারণ ও তার বিভিন্ন গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের প্রয়াস এই রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোতে রূপলাভ করেছিল। এই রাজনৈতিক ক্ষমতা তারা নিজেদের সামাজিক, আর্থিক ও অন্যান্য স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যবহার করতে পারত।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশের নিরংকুশ নিয়ন্ত্রণের ফলে দেশীয় শিল্প বুর্জোয়াদের পক্ষে অবাধ শিল্পোন্নয়ন করা সম্ভব হয় নি। শিক্ষিত শ্রেণীরা দেখল রাষ্ট্রশাসনের আসল ঘাঁটিগুলো ব্রিটিশের একচেটিয়া অধিকারে রয়েছে ফলে যে চাকরী তাদের পাওয়া উচিত তা তারা পাচ্ছে না। গ্রামের কৃষকেরা বুঝতে পারছিল ব্রিটিশ প্রবর্তিত ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থাই তাদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের মূল কারণ। শ্রমিকশ্রেণীর কাছে ব্রিটিশ শাসন একটা বিদেশী অগণতান্ত্রিক শক্তিরূপে প্রতিভাত হল। এই শাসন তাদের জীবনযাত্রার ও শ্রমের মান উন্নয়নে এবং যে মজুরী ব্যবস্থার ফলে তারা শোষিত হচ্ছে সেটির অবসানের উদ্দেশ্যে শ্রেণীসংগ্রাম গড়ে তোলার পক্ষে বাধাস্বরূপ।

উপরন্তু ভারতীয় জনসাধারণ সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে এমন এক বিদেশী শাসন বলে মনে করত যার প্রভাবে তাদের স্বাভাবিক, সামাজিক আর্থিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে বিঘ্ন ঘটছিল। বর্ণবৈষম্য এবং দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া, মালয়, সিংহল এবং অন্যান্য উপনিবেশের কাছে ভারতীয় স্বার্থহানি ইত্যাদি ত্রুটির অবসান ঘটানোর জন্য তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা

অর্জন করতে চেয়েছিল। বিদেশী জাতির দ্বারা শাসিত জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় চেতনা প্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এসে পড়ে কেননা এই শাসন পরাধীন জাতির অবাধ অগ্রগতিতে মূলগত বাধা সৃষ্টি করে।১

প্রথম উন্মেষ

সংগঠিত আন্দোলন রূপে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ যদিও উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে গড়ে উঠেছিল তবু এই শতকের শুরুতেই এর অঙ্কুর দেখা গিয়েছিল। ১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব অগ্রসর হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের নবোন্মেষিত জাতীয় চেতনার ধর্মীয় রূপ। এই বুদ্ধিজীবীরা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করেছিল এবং সেই শিক্ষার মাধ্যমেই পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক ভাবধারার সংস্পর্শে এসেছিল। ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠনও কিছু কিছু গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে একটা হল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি। এটি ১৮৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। ১৮৫১ সালে কতকগুলো রাজনৈতিক গোষ্ঠী মিলেমিশে এটার সৃষ্টি করেছিল।

প্রথম যুগের এইসব রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর মাধ্যমে ভারতীয় রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের উৎপত্তির যে সূচনা দেখা গিয়েছিল সেটা কিন্তু দুর্বল ছিল। এই রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলো শুধুমাত্র কয়েকজন ব্যক্তিবিশেষকে নিয়েই গঠিত ছিল এবং এগুলোর কোনো গণভিত্তি ছিল না। এগুলো সর্বভারতীয় সংগঠনও ছিল না কেননা এগুলো গঠিত হওয়ার অনেক পরেই সমগ্র ভারত ভূখণ্ড ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দশকেই কেবলমাত্র সংগঠিত এবং সর্বভারতীয় আন্দোলন হিসাবে (যদিও কিছুটা সংকীর্ণ সামাজিক ভিত্তিতে) ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়েছিল। এই সময়ের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি অনুকূল হয়েছিল বলেই এটা সম্ভবপর হয়েছিল।

কিন্তু সংগঠিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উৎপত্তি ও তার অগ্রগতি পর্যালোচনা করবার আগে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের উল্লেখ করব। পুরানো সমাজের যে শ্রেণীসমূহ ব্রিটিশ অধিকারের ফলে রাজনৈতিক ও আর্থিক দিক থেকে বিপন্ন হয়ে উঠেছিল তারাই এই বিদ্রোহ করেছিল। ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশদের উৎখাত করে প্রাক্-ব্রিটিশ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার এইটাই শেষ শক্তিশালী প্রয়াস।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের কারণ

ব্রিটিশের রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের সংগে সংগে নূতন অর্থনৈতিক শক্তি ও প্রক্রিয়া উদ্ভূত হয়েছিল এবং ব্রিটিশ সরকার দেশে যেসব নূতন সামাজিক ব্যবস্থা প্রচলন করেছিল তার ফলে পুরাতন ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত লোকের মনে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ তারই পরিণাম।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে শুধুমাত্র ভারতীয় সিপাইদের বিদ্রোহ বলে ব্যাখ্যা করলে ভুল করা হবে। এর সামাজিক পটভূমি ব্যাপকতর ছিল। Dr. Duff বলেছেন:

"যদি এটা শুধুমাত্র সামরিক বিদ্রোহ হতো তাহলে জনসাধারণের সহানুভূতি থাকত না, তারা সাহায্যও করত না। এই অবস্থায় পড়লে আমাদের হাতে বিদ্রোহীদের যেরকম চূড়ান্ত পরাজয় ঘটছে সেইরকম দু-চারবার পরাজয়ের পরেই বিদ্রোহ নির্মূল হয়ে যেত··· এবং ঘটনা এই যে এটা শুধুমাত্র সামরিক বিদ্রোহ নয়, এটা গণবিদ্রোহ—বিপ্লব···

"প্রথম থেকেই এটা উত্তরোত্তর গণবিদ্রোহে পরিণত হচ্ছিল—সিপাহীরা ছাড়া বিপুলসংখ্যক মানুষ ব্রিটিশ আধিপত্য ও সার্বভৌমিকতার বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল।"২

ব্রিটিশ সরকারের বিশেষ করে লর্ড ডালহৌসির সম্প্রসারণবাদী নীতির ফলে অনেকগুলো ভারতীয় সামন্তরাজ্য লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। নূতন ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার অতিরিক্ত চাপের দরুন ভারতীয় কৃষককুল নিদারুণ আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। সেই সঙ্গে ভারতীয় বাজারে ব্রিটিশ যন্ত্রশিল্প-জাত পণ্যের আমদানীর দরুন লক্ষ লক্ষ ভারতীয় হস্তশিল্পী ও কারিগর ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়েছিল। এ সবকিছুই হল ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের প্রধান কারণ। এই বিদ্রোহের মাধ্যমে এইসব সামাজিক শ্রেণীর মানুষদের গভীর অসন্তোষই প্রকাশ পেয়েছিল।

ক্ষমতাচ্যুত সামন্তরাজারা প্রধানতঃ এই বিদ্রোহ পরিচালনা করেছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল হৃতরাজ্য ফিরে পাওয়া। এমনকি যেসব রাজারা তখনো রাজ্যচ্যুত হননি তাদের মনেও ছিল ক্ষমতাচ্যুত হবার বিভীষিকা। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন।

ব্রিটিশ মালিকানাধীন নীল এবং অন্যান্য বাগিচা শিল্পে যেসব কর্মীরা কাজ করতেন তাদের মধ্যেও অসন্তোষ ছিল। তাদের অসন্তোষের কারণ হল বিদেশী মালিকের অধীনে যে পরিস্থিতিতে তাদের কাজ করতে হতো এবং জীবনযাপন করতে হতো সেটা দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। তাদের কিছু কিছু গোষ্ঠীর মধ্যেও ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠেছিল।

অন্যান্য আরো কয়েকটা কারণে জনসাধারণের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব জোরদার হয়। ইউরোপীয় খ্রীষ্টান মিশনারীদের ধর্মান্তরিত করার অত্যুৎসাহের ফলে এমন একটা সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল যে ব্রিটিশেরা সমস্ত ভারতীয়দের খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করার চক্রান্ত করছে। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃত্ব গৃহীত কতকগুলো ব্যবস্থা প্রচলন করার দরুন পণ্ডিত ও মৌলবীদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছিল। এই ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা, সতীদাহ ইত্যাদি প্রথার বিলোপসাধন এবং আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন অন্যতম। সাধারণভাবে আধুনিক শিক্ষাজগৎ ও সামাজিকসম্পর্ক সম্পর্কে ধর্মীয় মতবাদের পরিপন্থী। এইসব কারণে পণ্ডিত ও মৌলবীরা প্রায়ই জন-সাধারণের মনে ধর্মান্তরের সন্দেহ ঘনীভূত করে তোলার চেষ্টা করত।

আরো একটা দিক আছে। গায়ের জোরে দেশকে রাজনৈতিক পরাধীন করবার ফলে অবিশ্বাস ও শত্রুতার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। এর সংগে যোগ হয়েছিল নতুন আর্থিক ব্যবস্থার ধ্বংসাত্মক আর্থিক পরিণতি। এ সবের দরুন রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা প্রবর্তনের মতো প্রগতিশীল কাজও নেহাৎ যাদু-বিদ্যা বলে অভিহিত করা হতো। বলা হতো এসব শ্বেত যাদুকরের অপকীর্তি, তারা লৌহ শৃংখলে গোটা ভারতবর্ষকে বাঁধতে চায়। এই সমস্ত ব্যাপারগুলো ব্রিটিশ সরকারের প্রতি জনসাধারণের অবিশ্বাস ও বৈরীভাব আরো বেশী গভীর করেছিল। ভারতবর্ষে ব্রিটিশের রাজনৈতিক অধিকার ও নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে যারা বিপন্ন হয়ে উঠেছিল ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ প্রধানতঃ তাদেরই রোষের বহিঃপ্রকাশ।

ব্রিটিশ সরকার কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করেছিল।৩ বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে যাবার পেছনে কতকগুলো কারণ ছিল। যারা অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল তাদের মধ্যে একতা ছিল না। তাদের একটা সুসংহত সামরিক কৌশলের পরিকল্পনার অভাব ছিল। তাদের মধ্যে কোনোরকম সমন্বয় ব্যবস্থাও ছিল না। উপরন্তু বিদ্রোহটা সর্বব্যাপী হয় নি। নেতৃত্বের জোর ছিল না। তারপর বিদ্রোহীদের বিভিন্ন শ্রেণী যেমন একদিকে জমিদার ও সামন্তরাজা ও অন্যদিকে কৃষক—এদের মধ্যেও শ্রেণীস্বার্থের বিরোধ ছিল।

'ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যেসব শক্তি বিদ্রোহ করেছিল তাদের মধ্যে একতার অভাব ছিল এবং সেই একতার অভাবের পূর্ণ সুযোগ ব্রিটিশরা নিয়েছিল। দেশীয় রাজন্যবর্গ অচিরে অনুভব করতে পেরেছিলেন যে যদি তারা কৃষক ও কারিগরদের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন তাহলে ধীরে ধীরে আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণ তাদের হস্তচ্যুত হবে।'৪

উপরন্তু ব্রিটিশ সরকার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বিদ্রোহীদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীসমূহের ঐক্য ভেংগে দিয়েছিল।

'ব্রিটিশরা সর্বাত্মক রাজ্যাধিকারের নীতি পরিত্যাগ করল। কৃষকদের ওপর জমিদারদের বাধ্যতামূলক শ্রমের দাবী সরকার সমর্থন করার ফলে কৃষকদের ওপর জমিদারদের নিয়ন্ত্রণ আরও বেড়ে গেল।··· অন্যদিকে ব্রিটিশেরা কৃষকদের ঐক্য ভেংগে দেবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করল :

(১) অপেক্ষাকৃত বড় কৃষকদের কিছু কিছু সুবিধা দান।

(২) কৃষকদের জমি কেনাবেচা করার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন।৫

বিদ্রোহের প্রকৃতি ও তাৎপর্য

আধুনিকতম অর্থে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে জাতীয় বলে অভিহিত করা যায় না। বিদেশী বিরোধী চেতনা থাকা সত্ত্বেও এর মধ্যে কোনো যথার্থ জাতীয়তাবোধ ছিল না। যেসব বিভিন্ন গোষ্ঠী এতে যোগ দিয়েছিল তাদের কেউই মনে করত না যে তারা একটা নির্দিষ্ট আর্থিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে একটি জাতির অংশ। এই বিদ্রোহের নেতৃস্থানীয় সামন্ত রাজাদের রাজনৈতিক পরিকল্পনার তাৎপর্য ছিল শুধুমাত্র নঞর্থক—বিদেশী বহিঃষ্কার করা। তারা সমগ্র ভারতবর্ষ নিয়ে একটা জাতীয় রাষ্ট্র অথবা জাতীয় সমাজের

পুনর্গঠনের কোনো পরিকল্পনা রূপায়িত করে নি বা করতে পারে নি। তাদের মধ্যে কোনো জাতীয় সচেতনতাও ছিল না। বস্তুতপক্ষে শুধুমাত্র বিদেশী শাসককে দূর করার জন্যই তারা একত্রিত হয়েছিল। ব্রিটিশদের উচ্ছেদ করে প্রাক্-ব্রিটিশ আমলের অসংহত বিচ্ছিন্ন সামন্ততান্ত্রিক অবস্থা ভারতবর্ষে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এর চেয়ে বেশী কিছু হলে উদ্দেশ্য হয়তো ছিল দিল্লীর বাদশার অধীনে সামন্তরাজ সংঘ প্রতিষ্ঠা।

"মৌলিক চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য এবং মুখ্য নেতৃত্বের প্রশ্নে বিচার করলে ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানকে প্রাচীন রক্ষণশীল এবং সামন্ততান্ত্রিক শক্তির এবং সিংহাসনচ্যুত সামন্তবর্গের বিদ্রোহ বলে অভিহিত করতে হয়। নিজেদের ধ্বংসোম্মুখ অধিকার ও সুযোগসুবিধা রক্ষার জন্য এঁরা বিদ্রোহ করেছিলেন। প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের জন্য এই অভ্যুত্থান ব্যাপক গণসমর্থন লাভ করে নি এবং ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।"৬

রাজদ্রোহীদের মধ্যে মহৎ সংগ্রামী ব্যক্তিও ছিল। আদর্শের জন্য তাঁরা ফাঁসিকাঠে যেতেও দ্বিধা করেন নি। কিন্তু ঐতিহাসিক দিক থেকে এই আদর্শটা প্রতিক্রিয়াশীল ছিল। এই আদর্শ রাজনৈতিকভাবে বিদেশী শাসনমুক্ত ভারতবর্ষের ধারণা থেকে উদ্ভূত—কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এর লক্ষ্য ছিল সামন্ততান্ত্রিক, সামাজিক ও আর্থিক ভিত্তিতে কতকগুলো সামন্তরাজ্য সৃষ্টি করা।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাভিত্তিক জাতীয় ঐক্যসাধনের ঐতিহাসিকভাবে প্রগতিশীল চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয় নি। কিন্তু তবুও ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করবার এই প্রবল প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে অধিকাংশ ভারতীয়দের মনে দেশপ্রেমের প্রেরণা সঞ্চার করেছে। বিদেশী শৃংখল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য জনসাধারণের যে আকাঙ্ক্ষা—১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ তার প্রতীক হয়ে উঠল। ঝাঁসীর রানীর মতো বীর্যবান নায়কগণ জনমনে সশ্রদ্ধ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হলেন। কিছু কিছু রাজনৈতিক গোষ্ঠী যেমন সন্ত্রাসবাদী এবং চরম বামপন্থী জাতীয়তাবাদীরা এই বিদ্রোহকে ভবিষ্যতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহড়া বলেও মনে করতেন। অপরাপর রাজনৈতিক গোষ্ঠীসমূহের ধারণা অন্যরকম। এই বিদ্রোহ বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে পরাধীন ও শোষিত মানুষের অপরিহার্য ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম বলে স্বীকার করে নিলেও তাঁরা এর প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভংগী বিশেষ করে সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বের দিকটা দেখিয়ে দেন।৭

ব্যাপক হিন্দু মুসলমান ঐক্য যে সম্ভব সেটা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ উপলক্ষে ভারতবর্ষের ইতিহাসে সক্রিয়ভাবে প্রথম দেখা গেল।৮ ভারতীয় জনসাধারণের একত্রিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটা ঐতিহ্য এই বিদ্রোহ থেকেই সৃষ্টি হল।

ব্রিটিশ শাসনের নতুন কৌশল

সিপাহী বিদ্রোহের অবসান হবার পর ভারতবর্ষে ও ব্রিটেনের সম্পর্কের ইতিহাসের মধ্যে একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। ব্রিটিশরাজ সরকার ভারতবর্ষের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ তো গ্রহণ করলই, তার সংগে ব্রিটিশ শাসন নীতিতেও পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল।

১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশের লক্ষ্য ছিল দেশীয় রাজন্যবর্গকে উচ্ছেদ করে সমগ্র ভারতবর্ষকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে ব্রিটিশ রাজত্বে পরিণত করা। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের অভিজ্ঞতার আলোকে এই নীতি পরিত্যাগ করা হল এবং সিদ্ধান্ত হল যে, যে রাজ্য তখনো ব্রিটিশ শাসনাধীন হয় নি সেগুলোকে অধিকার করে নেওয়া হবে না। ব্রিটিশের নতুন নীতির লক্ষ্য হল এইসব রাজ্যের শাসকবর্গকে মিত্রশ্রেণীতে পরিণত করা—যাতে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অনেক অনুগত সমর্থন সৃষ্টি হয়।

স্পষ্টতঃই এটা ব্রিটিশের রাজনৈতিক কৌশলের পরিবর্তন সূচনা করে। অসংখ্য সামন্তরাজ্যের অবস্থিতিতে ভারতবর্ষ ঐক্যহীন ছিল, সেই অনৈক্যকে ধ্বংস করার কাজে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশরা রত ছিল। এটা সত্যি যে ব্রিটিশরা উগ্র আক্রমণাত্মক পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল এবং নিজ শাসনে ভারতবর্ষকে অধীনস্থ রাখার যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তাদের ছিল তা অগণতন্ত্রীয়। তবু কার্যতঃ ব্রিটেন ভারতবর্ষকে রাজনৈতিকভাবে একত্রিত ও সংহত করেছিল। নিঃসন্দেহে এটা ঐতিহাসিক দিক দিয়ে প্রগতিশীল।

১৮৫৭ সালের পর ব্রিটিশরা সাম্রাজ্যের স্বার্থে দেশীয় রাজ্যগুলোকে গ্রাস করবার নীতি পরিত্যাগ করল। ইংরেজদের আশ্রয়ে এইসব প্রতিক্রিয়াশীল রাজ্যগুলো টিকে রইল। ভেতর বা বাইরে থেকে কোনোরকম আক্রমণ হলে ব্রিটিশরা দেশীয় রাজ্যগুলোকে রক্ষা করত। সুতরাং ব্রিটেন ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের শত্রুপক্ষ না হয়ে তার রক্ষাকর্তা হয়ে দাঁড়াল। শুধুমাত্র বাইরের বিপদেই নয় এই রাজ্যগুলোর মধ্যে উদীয়মান প্রগতিশীল শক্তির চাপ থেকেও ব্রিটিশরা এই রাজ্যগুলোকে রক্ষা করে চলত।

এইভাবে যে ব্রিটিশ পুঁজিবাদ নিজদেশে সামন্ততন্ত্রের উৎখাত করেছিল ভারতবর্ষে সে-ই সামন্ততন্ত্রকে টিকিয়ে রেখেছিল। সামান্য কতকগুলো ব্যতিক্রম ছাড়া কৃত্রিমভাবে টিকে থাকা এইসব সামন্তরাজ্যগুলো রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়ার ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল।৯

কার্ল মার্কস বলেছেন, '...যে পরিস্থিতিতে এই দেশীয় রাজ্যগুলোকে তাদের আপাত স্বাধীনতা বজায় রাখতে দেওয়া হয়েছিল সেই পরিস্থিতিই আবার স্থায়ী অধঃপতন এবং চরম অক্ষমতার পরিপোষক। যন্ত্রণার ওপর যারা বেঁচে থাকে তাদের মতো এদের অস্তিত্বেই রয়েছে আভ্যন্তরিক গঠনগত দুর্বলতা। দেশীয় রাজারা বর্তমানের এই জঘণ্য ইংরাজ ব্যবস্থার ঘাঁটিবিশেষ এবং ভারতের ভবিষ্যৎ প্রগতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা।'১০

প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততান্ত্রিকতাভিত্তিক হবার ফলে ব্রিটিশ শাসনের যেটুকু প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল সেটাও আনুপাতিক হারে ক্ষয় পেতে লাগল।

এর ফলাফল

ব্রিটিশ শাসন কর্তৃক অনুসৃত এই নীতির ফলাফল একদিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। এইসব দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণকে নিপীড়নমূলক রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক পরিস্থিতিতে বাস করতে হতো। পরবর্তীকালে তারা যখন

রাজনৈতিক দিক দিয়ে সচেতন হয়ে উঠল এবং প্রতিনিধিমূলক সরকার ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক দাবীতে এইসব স্বৈরাচারী রাজাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করল তখন ব্রিটিশ সরকারের সংগে তাদের বিরোধ অপরিহার্য হয়ে উঠল। কেননা ব্রিটিশ সরকার আবার এই রাজাদের স্বার্থরক্ষা করে চলত। এইভাবে দেশীয় রাজ্যের রাজাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের সংগ্রাম ব্রিটিশ ভারতে স্বাধীনতার জন্য জনসাধারণের সংগ্রামে মিশে গিয়েছিল। এই সংগ্রাম দেশীয় রাজ্যের (অবশ্য পুরোপুরির যারা কুশাসনের দায়ে অভিযুক্ত তাদের বাদে) পৃষ্ঠ-পোষক এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের দ্বারা সমর্থিত ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতীয় জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলন রূপে দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল।

সিপাহী বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকার একদিকে রাজনৈতিক কৌশলগত কারণে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের এই দুর্বল ও ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত রাজ্যগুলোকে সঞ্জীবিত রেখেছিল অন্যদিকে ব্রিটিশের নীতি হিসাবে দেশের প্রগতিবিরোধী শক্তিসমূহের সংগে মিলেমিশে চলত এবং তাদের সমর্থন করত।

১৮৭৬ সালে লর্ড লিটন প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিলেন যে ব্রিটিশ সরকারকে শক্তিশালী দেশীয় অভিজাতবর্গের আশা, আকাঙ্ক্ষা, সহানুভূতি ও স্বার্থের পরিপোষণ করতেই হবে। টেম্পল লিখেছিলেন যে, "আমার কার্যকালের (১৮৪৮-৮০) শেষদিকে আমি ভেবেছিলাম যে প্রাচীনতা এবং এতদ্দেশীয় শাসনের ঐতিহ্যের ভিত্তিতে একটা দেশীয় অভিজাতমণ্ডলী ব্রিটিশ শাসনাধীনে সংহত হতে এবং বিকাশলাভ করতে পারবে।"[১১]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রিটিশ সরকার সংবাদপত্রের অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা মঞ্জুর করে। এটা ব্রিটিশ সরকারের প্রগতিশীল কাজগুলোর অন্যতম। সিপাহী বিদ্রোহের পর কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সরকারের সাধারণ নীতি ছিল উত্তরোত্তর সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হ্রাস করা।

সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে ব্রিটিশ সরকার খানিকটা জোরজবরদস্তি করে ভারতীয় জনসাধারণের সামাজিক জীবনে হস্তক্ষেপ করেছিল এবং সতীপ্রথার মতো বর্বর সামাজিক প্রথার উচ্ছেদ করেছিল এবং অন্য কতকগুলো প্রথার বিরুদ্ধে আইনও প্রণয়ন করেছিল। ১৮৫৭ সালের পর কিন্তু ব্রিটিশ সরকার সামাজিক নীতির ব্যাপারে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করে। প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারক-গণ পূর্ববর্তী যুগে সরকারের সক্রিয় সমর্থন পেয়েছিলেন। সিপাহী যুদ্ধের পর সামাজিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামেই শুধুমাত্র নয় প্রগতিশীল কাজের ব্যাপারেও সরকারের ঔদাসীন্য প্রকট হয়ে উঠল। সমাজে গোঁড়ামি আগে থেকেই প্রবল ছিল। সরকারের এইরকম মনোভাব গোঁড়ামির ভিত্তি আরও দৃঢ় করে তুলল।

দেখা যাচ্ছে ১৮৫৭ সালের পর ভারতবর্ষ সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতি প্রায় সর্বাত্মক পরিবর্তনের পথে এগোচ্ছিল। ইতিপূর্বে ভারতীয় সমাজের নতুন প্রগতিবাদী শক্তিসমূহের কথা চিন্তা করে ব্রিটিশ নীতি নির্ধারিত হত। অতঃপর ব্রিটিশ নীতির ঝোঁক ও সমর্থন পড়ল গিয়ে সমাজের রক্ষণশীল অংশগুলোর ওপরে।

১৮৫৭ থেকে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত মুখ্য ঘটনাসমূহ

উদারপন্থী ভারতীয় বুদ্ধিজীবী এবং একশ্রেণীর বাণিজ্যিক বুর্জোয়ারা মিলে ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত করল। এই ঘটনা সর্ব-ভারতীয় পর্যায়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম প্রকৃত অগ্রগতির সূচনা। জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভবের বিষয় আলোচনা করার আগে আমরা ১৮৫৭ থেকে ১৮৮৫ সালের মধ্যের কতকগুলো প্রধান প্রধান ঘটনার কথা উল্লেখ করব।

১৮৫৭ সালে পুরানো কালের সামাজিক শক্তিসমূহ পূর্বতন ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার শেষ চেষ্টা চালিয়ে পরাভূত হয়। এরপরে তারা এত দুর্বল ও নির্জীব হয়ে পড়েছিল যে ভবিষ্যতে নবোদ্যমে কাজ শুরু করা তাদের পক্ষে আর সম্ভব ছিল না।

নতুন যেসব সামাজিক শক্তি গড়ে উঠেছিল যথা বুদ্ধিজীবীশ্রেণী ও বাণিজ্যিক বুর্জোয়াশ্রেণী, তারা সংগঠিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ হতে পারত কিন্তু তারা তখনও এই ঐতিহাসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার পক্ষে তত উপযুক্ত হয়ে ওঠে নি। ১৮৭০ সালের পর কতকগুলো ঘটনা একত্রে ঘটে যাবার ফলে দেশে আবার প্রবল রাজনৈতিক আলোড়ন ছড়িয়ে পড়ল। অন্যদিকে নতুন সামাজিক শক্তিগুলোর মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন দেখা গেল। তাদের লোকবল ও আর্থিক সংগতি বেশ বেড়েছে এবং তারা রাজনৈতিকভাবে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এই নতুন বিকাশের ফলে ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হল।

১৮৫৭ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে দুটো ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন হয়েছিল। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল সশস্ত্র উপায়ে ব্রিটিশ সরকারের উচ্ছেদ-সাধন। এদের মধ্যে একটা হল ওয়াহাবী আন্দোলন। ওয়াহাবীরা একটা সংগ্রামী মুসলমান গোষ্ঠী। এদের অনুগত লোকরাই ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। বিদ্রোহ দমিত হয়ে যাওয়ার পরও কিছুকাল ধরে তারা কাজকর্ম চালিয়ে গিয়েছিল। অন্যটা হল, একদল মারাঠাও সেই সঙ্গে ১৮৫৭ সালের পরাজয়ে ভীত না হয়ে পরবর্তীকালে সেই একই উদ্দেশ্যে চক্রান্তমূলক কাজকর্ম করে যাচ্ছিল। ১৮৭১ সালে কয়েকটা সশস্ত্র সংঘর্ষের পর সরকার ওয়াহাবী আন্দোলন দমন করেছিল। ১৮৬৩ সালে পুনাতে ব্রিটিশবিরোধী চক্রান্তের মারাঠী ঘাঁটি আবিষ্কৃত হয় এবং ব্রিটিশ সরকার এটি উচ্ছেদ করেন। এই দুইটি আন্দোলনেই সিপাহী বিদ্রোহের অবশেষ লুপ্ত হয়ে যায়।

ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও কৃষক অভ্যুত্থান

অবশ্য ১৮৭০ সালের পরই রাজনৈতিক ও আর্থিক অসন্তোষ ব্যাপক আকার ধারণ করতে লাগল। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতির প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা এর পরিণতি। সিপাহী বিদ্রোহ পরবর্তী সময়ে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের দরুন কৃষিজীবীদের মধ্যে অসন্তোষ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগল। ভূমিরাজস্ব ও খাজনার অত্যধিক চাপ কৃষিজীবীদের কাছে মারাত্মক হয়ে উঠল। ১৮৭০ সাল নাগাদ হস্তশিল্প ও কারিগরি শিল্পের পঙ্গুতা ব্যাপক হয়ে ওঠবার ফলে কৃষির ওপর চাপ ভয়াবহ রূপে বেড়ে যেতে

লাগল। ১৮৭০ সালে কৃষি মন্দার ফলে কৃষকদের খুব ক্ষতি হয় এবং তাদের মধ্যে ঋণগ্রস্ততা খুব বেড়ে যায়। ১৮৬৭ থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে পর পর কয়েকটা ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ঘটে। ১৮৭৭ সালের দুর্ভিক্ষ অতিশয় ভয়ঙ্কর হয়েছিল '২00,000 বর্গমাইল এলাকা' এবং বোম্বাই, মাদ্রাজ ও দেশের অন্যান্য 'অংশের প্রায় ৩৬0 লক্ষ লোক' এই দুর্ভিক্ষের কবলিত হয়।[১২]

'১৮৬৫ থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে যেসব দুর্ভিক্ষগুলো ঘটেছিল সেগুলো বিশেষভাবে উল্লখযোগ্য ছিল। এইসব দুর্ভিক্ষের ফলে বিপুল পরিমাণ জীবন-হানি হয়েছিল। সে প্রশ্ন ছাড়াও গুরুত্বের কারণ এই যে দুর্ভিক্ষগুলো যে সময় ঘটেছিল সেটা ছিল একটা পরিবর্তনের সময় যখন নগদ টাকায় লেনদেন প্রথা ধীরে ধীরে চালু হচ্ছিল··· অধিকাংশ রায়ত মহাজনদের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হল। দুর্ভিক্ষের পর যে মন্দা দেখা গিয়েছিল তার পরিণামে উৎপাদনের অবস্থার অবনতি হল এবং তারা প্রায় দাসত্বে আবদ্ধ হয়ে পড়ল।'[১৩]

অর্থনৈতিক দুর্দশার দরুন কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ জন্মেছিল। তার পরিণতিস্বরূপ দেখা দিল বেশ কয়েকটা কৃষকবিদ্রোহ। এর মধ্যে ১৮৭৫ সালের দাক্ষিণাত্যের কৃষকবিদ্রোহ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে সরকার ওই বছরেই সমগ্র কৃষি পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবার জন্য Deccan Ryots Commission নিযুক্ত করেন। পর পর বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষ ঘটবার ফলে সরকার ১৮৭৮ সালে Famine Commission নিযুক্ত করেন।

যে সময় দেশ আবার দুর্ভিক্ষে বিধ্বস্ত হচ্ছে সেই সময় জনসাধারণের ওপর দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের ব্যয়ভার চাপানোর ফলে এবং ১৮৭৭ সালে রানী ভিক্টোরিয়াকে ভারতবর্ষের সম্রাজ্ঞীরূপে ঘোষণা করার জন্য দিল্লীতে ব্যয়-বহুল জমকালো দরবার অনুষ্ঠান করায় জনসাধারণের মধ্যে ক্রোধ তীব্রতর হয়ে উঠল। লর্ড লিটন ভাইসরয় থাকাকালীন ভারতীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য ১৮৭৮ সালে Vernacular Press Act প্রণীত হয় এবং ১৮৭৯ সালে প্রণীত হয় Arms Act। এই দুই আইনই জনসাধারণের দ্রুত বর্ধমান অসন্তোষের আগুন উদ্দীপিত করেছিল। পরিস্থিতিটা প্রায় বিস্ফোরক হয়ে উঠেছিল

ইলবার্ট বিল

অন্যান্য আরো কারণে ভারতীয় জনসাধারণ ও ব্রিটিশের মধ্যে প্রভেদটা বেড়ে যাচ্ছিল। শ্বেতকায় এবং শাসকশ্রেণীভুক্ত বলে সরকারী ও বেসরকারী অধিকাংশ ইংরেজদের মধ্যে ভারতীয়দের প্রতি তীব্র উদ্ধত অবজ্ঞার মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল।[১৪] এতে ভারতীয়দের মধ্যে তীব্র ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব সঞ্চারিত হয়েছিল।

লর্ড রিপন ইলবার্ট বিল উত্থাপন করেন। ফৌজদারী বিচারের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের তুল্যমূল্য করাই ছিল বিলটির উদ্দেশ্য। বিলটি উত্থাপিত হলে ইউরোপীয় সমাজ এর প্রবল ও ভয়ঙ্কর আন্দোলন সংগঠিত করে। 'ভাইসরয় লর্ড রিপনকে চাঁদপাল ঘাটে নিয়ে গিয়ে জাহাজে তুলে

একেবারে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ইংলণ্ডে ফেরৎ পাঠাবার চক্রান্ত করা হয়।'১৫

'ইউরোপীয় সহজাত উৎকর্ষ সম্বন্ধে এই চেতনার জোরেই আমরা ভারতবর্ষ জয় করেছি। দেশীয় লোক যত সুনিশ্চিত এবং চতুরই হোক না কেন এবং যত বড় সাহসী বলেই প্রতিপন্ন হোক না কেন, আমার বিশ্বাস যে কোনো পদই তাকে দেওয়া যাক না কেন তাতে সে ব্রিটিশ অফিসারের সমতুল্য বলে বিবেচিত হবে না।'১৬

ইউরোপীয় সমাজের প্রচণ্ড বিরোধিতার জন্য বিলটি প্রত্যাহৃত হয়েছিল। এর ফলে শ্বেতকায় ও অশ্বেতকায়দের মধ্যে তিক্ত মনোভাব আরো বেড়ে গিয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষপাতহীন আচরণ সম্বন্ধে ভারতীয়দের মোহ-মুক্তি ঘটেছিল। বর্ণবৈষম্যের দরুন শাসনকার্যের সব উঁচু পদগুলো শুধুমাত্র ইউরোপীয়রাই পেত। ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষিতশ্রেণীরা বিশেষ করে এতে ক্রুদ্ধ হয়েছিল।

১৮৭৭ সালে ইংলণ্ডে অনুষ্ঠিত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য বয়ঃসীমা একুশ থেকে কমিয়ে উনিশ করা হয়। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এর বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল যে ভারতীয়দের পক্ষে প্রশাসনে উচ্চপদ লাভ করা কঠিন করে তোলবার জন্যই ইচ্ছা করে এই পরিবর্তন করেছেন।

১৮৮২ সালে সরকার সুতীবস্ত্রের ওপর আমদানী শুল্ক আরও কমিয়ে দিলেন। লাঙ্কাশায়ার বস্ত্রশিল্পের পোষকতা করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। ভারতীয় স্বার্থের হানি করে ব্রিটিশ অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতি এইরকম খোলাখুলি পক্ষপাতিত্ব করায় ব্রিটিশ সরকারের জনপ্রিয়তা কমে গিয়েছিল। কৃষক, শিল্পী এবং বুদ্ধিজীবী ভারতীয় জনসাধারণের এই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল।

ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও নতুন নেতৃত্ব

শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণী ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচালনা করার সময় আরও একটা উচ্চতর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ব্রিটিশ কর্তৃক প্রবর্তিত স্কুল ও কলেজে এঁরা যে নতুন শিক্ষালাভ করেছিলেন তাতেই আধুনিক ইউরোপের গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা এবং বিভিন্ন দেশের জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। শিক্ষিত ভারতীয়রা আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ, অস্ট্রিয়ার অধীনতাপাশ থেকে জাতীয় মুক্তির জন্য ইটালীয়দের সংগ্রাম ও স্বাধীনতার জন্য আয়ারল্যাণ্ড-বাসীদের সংগ্রাম সম্বন্ধে পড়াশোনা করেছিলেন। Thomas Paine, Spencer, Burke, Mill, Voltaire, Mazzinni প্রভৃতি মনীষীগণ কর্তৃক প্রচারিত ব্যক্তি ও জাতীয় স্বাধীনতার মতবাদও শিক্ষিত ভারতীয়রা পাঠ করেছিলেন। এই শিক্ষিত লোকেরাই হয়ে উঠলেন ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক নেতা।

১৮৫৭ সালের ব্রিটিশবিরোধী বিদ্রোহের নেতৃত্ব ছিল সামন্ততান্ত্রিক। কিন্তু সৃজ্যমান ভারতীয় জাতীয়তাবাদে নতুন বুদ্ধিজীবীশ্রেণী যে নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন ঐতিহাসিক দিক দিয়ে তার তাৎপর্য প্রগতিশীল। নতুন বুদ্ধিজীবীশ্রেণী আধুনিক জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এঁরা চেয়েছিলেন যে প্রাথমিক পর্বে ব্রিটিশ গণতন্ত্রের সাহায্যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক সর্বদিক থেকেই ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন এবং প্রগতিশীল ভারতীয় জাতি গড়ে তুলতে হবে। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের নেতাদের আকাংক্ষা ছিল বিদেশী শাসনের অপসারণের পর প্রাচীন ভারতবর্ষেরই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যার ভিত হবে সামন্ততান্ত্রিক অসংহতি কি বড়জোর স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তিতে স্বাধীন সামন্ত রাজ্যগুলোর একটা যুক্তরাষ্ট্র গড়ে তোলা। নতুন নেতৃত্বের দৃষ্টিভংগী এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

১৮৭০ থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র ও সাহিত্যের দ্রুত প্রসার ঘটেছিল। এসবের মধ্যে দিয়ে জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষই প্রকাশ পেত। বিশেষ করে বাংলায় সংবাদপত্র, থিয়েটার ও গোপন বৈপ্লবিক সমিতিগুলো জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা এগিয়ে নিতে খুবই সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। গ্যারিবল্ডি ও ম্যাজিনির জীবনী অনুবাদ করা হয়েছিল। অন্যদিকে আবার History of India Gained in a Dream জাতীয় গ্রন্থে জাতীয় মুক্তির আদর্শ ব্যক্ত করা হয়েছিল।[১৭] নীলদর্পণ নামে একটা বাংলা নাটকে ইউরোপীয় মালিকানাধীন নীলচাষীদের দুর্দশা ও সংগ্রামের কাহিনী চিত্রিত করা আছে।

ভারতীয় জনসাধারণের যে রাজনৈতিক ও আর্থিক অসন্তোষ বিশেষ করে ১৮৭০ সালের পর দ্রুত বিস্তারলাভ করছিল ১৮৮৩ সাল নাগাদ তা প্রায় বিস্ফোরক অবস্থায় উপনীত হয়। লর্ড লিটল সরকারের জনপ্রিয়বিরোধী কার্যাবলী এই অসন্তোষকে ভয়ানকভাবে বাড়িয়ে তোলে। "এইসব দুর্ভাগ্যজনক প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার সংগে রাশিয়ার মতো পুলিসী অত্যাচারের পদ্ধতি যুক্ত হবার ফলে লর্ড লিটনের আমলে ভারতবর্ষ বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের কাছাকাছি এসে পড়েছিল। হিউম ও তার ভারতীয় উপদেষ্টাগণ ঠিক সময়মতোই হস্তক্ষেপ করবার উদ্যম করেছিলেন বলে অবস্থা সামলে যায়।"[১৮]

'নিরাপত্তা কপাটক' সম্পর্কে হিউমের ভাবনা

হিউম পরবর্তীকালে উদারনৈতিক ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের সংগে একত্রে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপন করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের অসন্তোষ বিদ্রোহে পরিণত হবার সম্ভাবনা আছে। হিউম ১৮৮২ সাল পর্যন্ত সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময় তিনি "বহুসংখ্যক পুলিশ রিপোর্টে দেখেছিলেন যে জনগণের অসন্তোষ ক্রমশ বেড়ে চলেছে এবং ষড়যন্ত্রমূলক গোপন সংগঠনের বিস্তার হচ্ছে।"[১৯]

প্রবল বিদ্রোহের সম্ভাবনা আন্দাজ করেই হিউম ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের সংগে সাক্ষাৎ করেন। এর অল্প পরেই হিউম বিশিষ্ট ভারতীয় উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের সংগে মিলিত হয়ে ভারতীয় জাতীয়

কংগ্রেস স্থাপন করেন। কংগ্রেস জাতীয় অসন্তোষ, বিশেষ করে শিক্ষিত শ্রেণীর অসন্তোষ ব্যক্ত করবার প্রধান সংগঠন হয়ে উঠতে পারত এবং ভারতীয়দের রাজনৈতিক অগ্রগতির উদ্দেশ্যে জাতির অসন্তোষ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে পরিচালিত করতে পারত, সরকারী ব্যবস্থাদি সম্পর্কে শিক্ষিতশ্রেণীর মতামত সরকারের গোচরে আনবার ব্যবস্থাও কংগ্রেস করতে পারত।

কংগ্রেস যে বৈপ্লবিক অসন্তোষ ঠেকানোর নিরাপত্তা যন্ত্র হিসাবে কল্পিত হয়েছিল সেটা হিউমের এই কথাতেই পরিষ্কার বোঝা যায়। "আমাদের কার্য-কলাপের ফলে যে বিপুল (বিরুদ্ধ) শক্তি বেড়ে চলেছে সেটা দূর করা অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছিল। নিরাপত্তা যন্ত্র হিসাবে আমাদের এই কংগ্রেস আন্দোলনের মতো কার্যকর আর কিছুই হতে পারে না।"২০

স্যার অকল্যাণ্ড কলভিনের সঙ্গে চিঠিপত্রে হিউম যা লিখেছিলেন সেটা উদ্ধৃত করা হল।

"যারা এই আন্দোলনে প্রাথমিক উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল তাদের সামনে আর কোনো বিকল্প ছিল না। পাশ্চমী ধ্যান-ধারণা, শিক্ষা, উদ্ভাবন ও যন্ত্র-পাতির প্রভাবে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে তার তীব্রতা দ্রুত বেড়ে চলেছে। এর ফলে উত্তেজনা সঞ্চার হচ্ছে। পরিণামে এই উত্তেজনা ক্ষতিকারক। ইতিমধ্যে ভেতরে ভেতরে ক্ষতিকর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। অবস্থাটা ঘুরিয়ে দিয়ে প্রকাশ্য নিয়মতান্ত্রিক পথে এই উত্তেজনা নিষ্ক্রমণের পথ তৈরী করে দেওয়া অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে।"২১

অন্যান্য ইতিহাসবিদও অনুরূপ কথা বলেছেন। "কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী কয়েক বছর ১৮৫৭ সালের পর সবচেয়ে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। ইংরাজ অফিসারদের মধ্যে হিউম আসন্ন বিপদের সংকেত ধরতে পেরেছিলেন এবং বিপর্যয় রোধ করবার চেষ্টা করেছিলেন···পরিস্থিতি যে কতদূর বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে সে কথা তিনি সিমলা গিয়ে কর্তৃপক্ষকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন।···সম্ভবতঃ তাঁর কথাতে প্রখর বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ভাইসরয় বুঝতে পেরেছিলেন যে অবস্থা কতটা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে এবং হিউমকে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হতে বলেছিলেন, সময়টাও ছিল সর্বভারতীয় আন্দোলন শুরু করবার পক্ষে খুবই উপযুক্ত। কৃষকবিদ্রোহ হলে শিক্ষিতশ্রেণী হয়ত তার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে সমর্থন করত, তার জায়গায় কংগ্রেস নতুন ভারতবর্ষ সৃষ্টিতে উদীয়মান শ্রেণীসমূহের জাতীয় মঞ্চ হিসাবে দেখা দিল।"২২

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগে দেশের বিভিন্ন অংশে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল, যথা বাংলায় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী কর্তৃক স্থাপিত ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন, দাদাভাই নওরোজী ও জগন্নাথ শেঠ প্রতিষ্ঠিত বোম্বাই-এর বোম্বাই এ্যাসোসিয়েশন, পুনার চিনলংকার প্রতিষ্ঠিত সর্বজনিক সভা প্রভৃতি। অবশ্য সর্বভারতীয় জাতীয় সংগঠন তখনও স্থাপিত হয় নাই।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা

ভারতীয় জনসাধারণের প্রধান রাজনৈতিক সংগঠন ভারতীয় জাতীয়

কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয় ১৮৮৫ সালে বোম্বাইতে। প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতাদের প্রায় সকলেই এই অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন।

১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত উদারপন্থী বুদ্ধিজীবীরা কংগ্রেসে প্রাধান্য লাভ করেছিলেন। এঁরাই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রথম পর্যায়ের নেতা ছিলেন। বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন বাংলার ডাবল্যু সি ব্যানার্জী, আনন্দমোহন বোস, লালমোহন ঘোষ, এ সি মজুমদার, রাসবিহারী ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এবং আর সি দত্ত; বোম্বাই থেকে ছিলেন দাদাভাই নওরজী, ফিরোজশাহ মেহেতা, বদরুদ্দীন তয়াবজী, অ্যাপ্টে, আগরকর, তেলাংগ, রানাডে, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, ডি ই ওয়াচা, বোম্বাই থেকে মালাবারী এবং চন্দ্রভারাকর; মাদ্রাজ থেকে ছিলেন পি আর নাইডু, সুব্রহ্মন্যম্ আয়ার, আনন্দ চারলু এবং বীররাঘবচারিয়ার। আর ছিলেন কেশব পিল্লাই, পণ্ডিত মালব্য, পণ্ডিত ধর। Hume, Wedderburn এবং Henry Cotton-এর মতো উদারপন্থী ইংরাজগণ কংগ্রেস সংগঠন এবং কার্যাবলী প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।২৩

প্রথম অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কংগ্রেসের মুখ্য উদ্দেশ্যগুলোকে নিম্নলিখিতভাবে বিবৃত করেছিলেন:

(১) জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা

(২) সমস্ত দেশপ্রেমিকদের মধ্যে জাতি, বর্ণ এবং প্রাদেশিক সংস্কার লোপ করা এবং তাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের ভাব সংহত করা

(৩) শিক্ষিত ভারতীয়রা মূলগত ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার পর যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হল সেগুলো নথিবদ্ধ করা

(৪) পরবর্তী বৎসরের জন্য কার্যক্রমের ছক তৈরি করা।

একটা জাতীয় সংগঠন উপযুক্ত কতকগুলো দাবীদাওয়া নিয়ে এই প্রথম কতকগুলো প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল—যথা ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের বিলোপসাধন, একযোগে I. C. S. পরীক্ষা গ্রহণ, পরীক্ষার্থীদের বয়ঃসীমা বাড়িয়ে দেওয়া, আইনসভায় নির্বাচিত সদস্য নেওয়ার ব্যবস্থা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ অযোধ্যা এবং পঞ্জাবে আইনসভার প্রবর্তন।২৪

দেখা যাচ্ছে উদারপন্থী রাজনীতিবিদ্‌গণ কর্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত প্রথম কংগ্রেসের দাবীদাওয়া খুব একটা বেশী কিছু ছিল না। শাসনতান্ত্রিক সংস্কার এবং আইনসভার নির্বাচনের নীতির মধ্যেই তা সীমিত ছিল। উপরন্তু অধিবেশনের শেষে হিউম সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার প্রতি অভিনন্দনজ্ঞাপক প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। এইভাবে ব্রিটিশের প্রতি কংগ্রেসের আনুগত্য স্পষ্ট করে দিলেন।

উদারপন্থী নেতৃত্বের নীতি এবং পদ্ধতি

আমরা এখন উদারপন্থী জাতীয়তাবাদের নীতি এবং সংগ্রামপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করব।

ব্রিটিশ গণতন্ত্রের প্রতি ভারতীয় উদারপন্থীদের প্রায় অপরিসীম আস্থা

ছিল। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনকে তারা সৌভাগ্যসূত্রে লব্ধ ব্যাপার বলে মনে করত এবং ভারতবর্ষকে অবাধ, প্রগতিশীল, গণতন্ত্রীয়, জাতীয় অস্তিত্বের উচ্চমার্গে উন্নীত করবার উপায় বলে মনে করত। জাস্টিস রানাডে বলেছেন, দেশবাসীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা দূর করার উপায় উদ্ভাবনের জন্য এবং প্রতিনিধিমূলক সরকার সম্বন্ধে শিক্ষিত করবার জন্যই ভারতীয় উদারপন্থীরা ব্রিটেনের ওপর নির্ভর করত।[২৫] সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯৫ সালে বলেছিলেন, 'প্রেরণা ও নির্দেশের জন্য আমরা ইংলণ্ডের দিকে তাকিয়ে থাকি।··· ইংলণ্ড থেকে প্রাপ্ত বিধান বলেই আমাদের দেশের লোক ভোটাধিকার লাভ করবে। উচ্চ রাজনৈতিক কর্তব্যের প্রশ্নে ইংলণ্ডই আমাদের নির্দেশক।'[২৬] সুরেন্দ্রনাথের আরও একটা কথা উল্লেখযোগ্য : "ইংরাজ জনসাধারণের মহত্ত্ব এবং ন্যায় বিচারের প্রতি আমাদের গভীর আস্থা আছে। বিশ্বের মহত্তম প্রতিনিধিমূলক সভা ও সকল পার্লামেন্টের জননীস্বরূপা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের হাউস অফ কমনস নব গণতন্ত্রের পীঠস্থান—তার স্বাধীনতাপ্রিয়তার ওপর আমাদের গভীরতম আস্থা আছে।··· যেখানেই ইংরেজরা তাদের পতাকা উত্তোলন করেছে ও সরকার গঠন করেছে সেখানেই প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত করেছে।"[২৭]

ভারতীয় উদারপন্থীরা ব্রিটেন এবং ভারতবর্ষের স্বার্থকে বিরোধী না ভেবে বরং মিত্রতামূলক বলে মনে করতেন। তাই তাঁরা ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্যপরায়ণ ছিলেন এবং ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক উৎসাহভরে সমর্থন করতেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ঘোষণা করেছিলেন, 'আমরা ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাই না। যে মহান সাম্রাজ্য থেকে বিশ্বের অন্যান্য অংশ স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের আদর্শ লাভ করেছে আমরা চিরদিনের জন্য সেই সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হতে চাই।'[২৮]

একই স্তরে দাদাভাই নওরোজীও বলেছেন, "আমরা প্রকৃতপক্ষে মানুষের মতো বলব যে আমাদের আনুগত্যে বিন্দুমাত্র খাদ নেই। ইংরেজশাসনের ফলে আমাদের যে পরম লাভ হয়েছে সেটা আমরা উপলব্ধি করতে পারি।"[২৯]

উদারপন্থীরা স্বীকার করতেন যে কংগ্রেস জনগণের প্রতিনিধি নয়, শুধু তাদের অভাব অভিযোগ ব্যক্ত করবার মাধ্যম মাত্র। 'কংগ্রেসে জনগণের কণ্ঠস্বর শোনা যেত না। কিন্তু জনগণের শিক্ষিত অংশ এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের অভিযোগ ব্যক্ত করে এবং তা প্রতিকারের পন্থা নির্ণয় করে কর্তব্য পালন করে।'[৩০]

উদারপন্থীরা মনে করতেন যে শৃংখলাবদ্ধ উপায়ে দেশের উন্নতি হবে। তাঁরা ধীরগতি বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করতেন এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন। "ভারতবর্ষের জনসাধারণ আকস্মিক পরিবর্তন এবং বিপ্লবের পক্ষপাতী নয়। ব্যবস্থাপক সভার দৌলতে নতুন শাসনতন্ত্র পাওয়ার ব্যাপারেও তারা উৎসাহী নয়। বর্তমান সরকার আরও শক্তিশালী হোক এবং জনগণের সঙ্গে তার যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হোক এইটাই তারা চায়। তারা চায় যে ভারতীয় কৃষি ও শিল্পের প্রতিনিধি হিসাবে আরও ভারতীয় Secretary of States-এর Council এবং Viceroy's Executive Council-এ সভ্য নিযুক্ত

হোক।... প্রতিটি উল্লেখযোগ্য শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নের আলোচনায় ভারতীয় জনসাধারণের আশাআকাঙ্ক্ষা স্থান লাভ করুক এটাই তারা চায়।"৩১

ব্রিটিশ জাতির সংগে মিত্রতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে সুশৃংখল অগ্রগতিতে উদারপন্থীরা বিশ্বাস করতেন। তাঁরা সর্বপ্রকার বৈপ্লবিক আকস্মিক পরিবর্তন এবং সংগ্রামের পদ্ধতি পরিহার করে চলতে চাইতেন। পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য তাঁরা সাংবিধানিক বিক্ষোভের পথ অবলম্বন করেছিলেন। এর দ্বারা একদিকে তাঁরা যেমন ভারতীয় জনসাধারণকে উদ্দীপিত এবং শিক্ষিত করে তুলতে আগ্রহী হয়েছিলেন, অন্যদিকে তাঁরা ভারতীয় জনসাধারণের দাবীর যৌক্তিকতা এবং দাবী মেটানোর জন্য ব্রিটিশদের গণতান্ত্রিক কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করতেন। শাসনতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষের কার্যধারার মাধ্যমে পরিবর্তন ঘটানোর জন্য যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করে বিক্ষোভ জাগানো নিয়মসম্মত, সেইটাই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন।... এই পদ্ধতিতে তিনটি জিনিসের স্থান নেই—বিদ্রোহ করা, বহিরাক্রমণে সহায়তা করা অথবা উৎসাহ দেওয়া এবং অপরাধমূলক কার্যক্রম অবলম্বন করা। 'মোটামুটিভাবে বলা যায় যে এই তিনটি ব্যাপার ছাড়া আর সবকিছুই ছিল নিয়মসম্মত। তবে যা কিছু নিয়মসম্মত—তা-ই যে যুক্তিযুক্ত এবং করণীয় সে কথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় না, কিন্তু সেটা একটা আলাদা ব্যাপার। একদিকে ছিল নিবেদন এবং সুবিচারের জন্য আবেদন অন্যদিকে ছিল নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ যার মধ্যে ছিল দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত করবন্ধের মতো চরমপন্থাও।'৩২

উদারপন্থীদের প্রগতিশীল ভূমিকা

অসংখ্য ভ্রান্ত রাজনৈতিক ধারণা থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের প্রাগ্রসর আধুনিক বুর্জোয়া স্বার্থের প্রতিনিধিস্থানীয় উদারপন্থীগণ প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরাই প্রথম সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের সংগঠক। উদারপন্থীরা ভারতীয় জনসাধারণের অংশবিশেষের মধ্যে জাতীয়তাবাদের চেতনা জাগ্রত করেছিলেন, তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা প্রচার করেছিলেন এবং প্রতিনিধিমূলক সংগঠনের ধারণা জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। সর্বপ্রকার প্রাদেশিক এবং সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সকল দেশবাসীকে ভারতীয় বলে ভাবতে উদারপন্থীরাই উৎসাহিত করেছিলেন। ভারতবর্ষে আধুনিক ইউরোপের সমন্বিত গণতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির বিস্তার তাঁরা সর্বান্তকরণে সমর্থন করতেন। প্রাক্-ব্রিটিশ আমল থেকে প্রাপ্ত মধ্যযুগীয় কুসংস্কার এবং সামাজিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে তাঁরা সোৎসাহে প্রচার করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন শিল্পায়নের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্কের গণতন্ত্রীকরণ এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির পক্ষপাতী।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সূচনাকালে বুদ্ধিজীবী শিক্ষিতশ্রেণীর মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের লোক এবং বাণিজ্যিক বুর্জোয়ারা (১৮৮৫ সালে শিল্পভিত্তিক বুর্জোয়ার প্রাদুর্ভাব বিশেষ ছিল না) ছিল এই সংগঠনের প্রধান সামাজিক ভিত্তি। কংগ্রেসে প্রধানতঃ যেসব বিষয় নিয়ে কথা হতো অর্থাৎ উচ্চপদের

চাকুরিতে ভারতীয়দের অধিকার স্থাপন, ব্যবসা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ প্রভৃতিতে ভারতীয় সমাজের এইসব শ্রেণীর স্বার্থই প্রতিফলিত হতো।

ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের মধ্যে তৎকালীন সম্পর্কের স্বরূপ ঠিকমত বুঝতে না পারার ফলে উদারপন্থীদের মধ্যে বহু ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁরা এটা বুঝতে পারেন নি যে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক উপনিবেশে পরিণত হয়েছে এবং সেই কারণেই ব্রিটেন ভারতবর্ষের অবাধ আর্থিক অগ্রগতি পছন্দ করতে পারে নি। ভারতবর্ষের আর্থিক ব্যবস্থা ব্রিটিশ পুঁজির প্রয়োজনমত নির্ধারিত হবে বলে তার গতিও ব্যাহত হবে। ব্রিটেন এবং ভারতবর্ষের স্বার্থ যে স্বতঃবিরোধী সেকথা উদারপন্থীরা অনুভব করতে পারেন নি। ব্রিটিশ রাজনৈতিক শাসনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষা করা। তাই ব্রিটিশদের পক্ষে ক্ষমতা পরিত্যাগ করা অথবা সুদূরপ্রসারী শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রচলন করা সম্ভব ছিল না। সমস্যাটা নীতিগত নয়, সমস্যাটা আসলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের বিরোধের ব্যাপার।

১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে কংগ্রেস ভারতীয় উদারপন্থীদের নেতৃত্বে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য সংগ্রাম করেছিল। এই সংস্কারগুলোর মধ্যে ছিল বিচার বিভাগীয় এবং প্রশাসনিক কার্যাবলীর পৃথকীকরণ, ইংরেজদের সংগে সমান শর্তে ভারতীয়দের সরকারি চাকুরি লাভের অধিকার এবং ক্রমে সরকারি চাকুরিতে শুধুমাত্র ভারতীয় নিয়োগ এবং অস্ত্র আইন রদ। এছাড়া যে আর্থিক শোষণের ফলে ভারতীয় জনসাধারণের দারিদ্র্য সৃষ্টি করছিল, এবং সরকারের বিপুল সামরিক ব্যয়—এসবের বিরুদ্ধেও কংগ্রেস লড়াই করছিল। ১৮৯২ সালে কংগ্রেসে পণ্ডিত মালব্যের প্রস্তাব পাশ হল। এতে ক্ষয়িষ্ণু হস্তশিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য সরকারকে সাহায্য করতে বলা হয়। উদারপন্থীরা স্বদেশী সমর্থন করতেন। ১৯০৬ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে ভারতবর্ষের শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত করবার উপায় হিসাবে স্বদেশী গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৮৯৫ সালে Transvaal, Free States, Cape Colony-র মতন ভারতীয় বিরোধী আইনসমূহের বিরুদ্ধেও তাঁরা সংগ্রাম করেছেন।

উদারপন্থীরা প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থা এবং নির্বাচনের নীতিতে বিশ্বাস করতেন। তাঁদের দাবী ছিল জনগণের দ্বারা নির্বাচিত বিধানসভা এবং প্রশাসনের ওপর নিয়ন্ত্রণ।

অপূর্ণ দাবীদাওয়া

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে উদারপন্থীরা দাবী আদায়ের চেষ্টা করেছিলেন। এর সংগে ব্রিটিশ জনসাধারণের গণতান্ত্রিক বিবেক ও ঐতিহ্যের প্রতি আবেদন করে দাবীদাওয়া জোরদার করে তুলতে চাইতেন। এইসব উপায়ে উদারপন্থীরা ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে নিম্নলিখিত দাবীদাওয়া আদায়ের চেষ্টা করতেন। দাবীগুলো হল শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান, আর্থিক শোষণের অবসান, জনপ্রিয় এবং কারিগরি শিক্ষার বিস্তার, ভারতীয় শিল্পের সংরক্ষণ ও নিপীড়নমূলক আইন রদ।

যা হোক, ১৯১৮ সাল পর্যন্তও কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে এবং কংগ্রেসের বিভিন্ন প্রস্তাবে যেসব দাবীদাওয়া জানানো হয়েছে তার অধিকাংশই পূরণ হয় নি। কংগ্রেস কর্তৃক প্রস্তাবাকারে গৃহীত দাবীসমূহের মধ্যে যেগুলো ১৯১৮ পর্যন্ত পূরণ করা হয় নি তার মধ্যে আছে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলের বিলোপসাধন, ভারত এবং ইংলণ্ডে একইসঙ্গে I.C.S-এর জন্য পরীক্ষা গ্রহণ (১৮৮৫); শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ (১৮৮৬); অস্ত্র আইন এবং নিয়ম সংশোধন করা (১৮৮৭); কারিগরি এবং শিল্পোন্নয়ন (১৮৮৮); ভূমিরাজস্ব নীতির সংস্কার (১৮৮৯); মুদ্রাব্যবস্থা সংস্কার (১৮৯২); বাধ্যতামূলক শ্রমের বিলোপসাধন (১৮৯৩); তুলোর ওপর শুল্ক রদ (১৮৯৩); উপনিবেশগুলোতে বসবাসকারী ভারতীয়দের অবস্থার উন্নতি-সাধন (১৮৯৪); যথাক্রমে বাংলা, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই-এর ১৮১৮, ১৮১৯ ও ১৮২৭ সালে Regulation ও ১৮৯৭ সালের রাজদ্রোহ আইন রদ করা; ১৯০৩ সালের Indian University's Act এবং Official Secrets' Act রদ করা; স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অগ্রগতি (১৯০৫); Criminal Law Amendment Act এবং Newspaper Act (১৯০৮) বাতিল করা; অবাধ এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা (১৯০৮); Seditious Meetings Act এবং Indian Press Act (১৯১০) রদ করা এবং গোখলের বিলের (১৯১০) অবাধ ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা।[৩৩]

ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগত থাকা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠিত হবার অল্প কিছু-দিনের মধ্যেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সরকারের বিরাগভাজন হয়ে উঠল। অ্যানি ব্যাসান্ট একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন, 'সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসারের কথা অগ্রাহ্য করে ১৮৮৭ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য একজনকে ২০,০০০ টাকা জামিন দিতে বলা হয়েছিল।'[৩৪] সরকার এই মর্মে সার্কুলার জারি করেছিলেন যে 'সেইসব সভায় দর্শক হিসাবেও সরকারি কর্মচারীদের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নয় এবং সেইসব সভার কার্যক্রমে যোগদান তাঁদের পক্ষে নিষিদ্ধ।'[৩৫]

শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, আর্থিক শোষণ বন্ধ ইত্যাদি অত্যন্ত নম্র দাবীর জন্যও সরকার কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন সুনজরে দেখতেন না।

কংগ্রেসের কার্যকলাপের মোকাবিলা করবার জন্য ১৮৯৭ সালে সরকার ১২৪(এ) এবং ১৫৩(এ) ধারার প্রবর্তন করলেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য ১৮৯৮ সালে Secret Press Committee গঠন করা হল। ১৯০০ সালে লর্ড কার্জন সেক্রেটারী অফ স্টেটকে লিখেছিলেন, "কংগ্রেস পতনোন্মুখ হয়েছে। ভারতবর্ষে আমার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল, কংগ্রেস যাতে নিঃশব্দে লোপ পায়, সর্বপ্রকারে তার সহায়তা করা।"[৩৬]

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সরকার দমনপীড়নের আরও কয়েকটা উপকরণ তৈরী করলেন। যেমন Criminal Law Amendment Act (১৯০৮); Newspaper Act (১৯০৮), Indian Press Act (১৯১০) এবং

Seditious Meetings Act (১৯১০)। নতুন বিধিনিষেধের ফলে সংবাদপত্র, সভা সমিতির স্বাধীনতা ইত্যাদি নাগরিক স্বাধীনতা বেশ খর্ব হল।

ক্রমান্বয়ে মোহমুক্তি

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার মধ্যেও উদারনৈতিকদের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ দাবী-দাওয়া পূর্ণ না হওয়ার ফলে এবং নিপীড়নের ফলে ধীরে ধীরে এদের মোহ-মুক্তি ঘটছিল। ব্রিটিশ গণতন্ত্রের সহায়তায় ভারতবর্ষে প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান-সমূহ স্থাপন করা এবং জনসাধারণের সামাজিক, শিক্ষাগত এবং আর্থিক উন্নতির আশা থাকছিল না। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'ভারতবর্ষে সিভিল সার্ভিসের ইতিহাস প্রতিজ্ঞাভংগের নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস।'৩৭ ১৯১১ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে পণ্ডিত ধর বলেছিলেন, 'ভারতীয়দের নবজাত আশা এবং আদর্শের প্রতি আমলাতন্ত্রের সহানুভূতিহীন এবং অনুদার মনোভাবই আমাদের অধিকাংশ দুর্ভাগ্যের মূল কারণ। এটা সংশোধিত না হলে ভবিষ্যতে ভয়াবহ দুর্দশা ঘটবে।'৩৮ ১৯১৪ সালে কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন্দ্রনাথ বসু বলেছিলেন, "দেশের সরকার বিদেশী সিভিল সার্ভিসের করায়ত্ত। দেশের সব বড় বড় বিভাগই তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। ইচ্ছা করলেই অমানুষিক আচরণ করা তাঁদের পক্ষে বিচিত্র নয়।"৩৯

উদারপন্থীদের মধ্যে পরিবর্তন শুরু হল। এর একটা কারণ ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তাদের দ্রুত আস্থানাশ। বিশেষ করে লর্ড কার্জনের আমলের অভিজ্ঞতার পর। আর একটা কারণ সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের চাপ। এই ধারা উনবিংশ শতকের শেষদিকে উদ্ভূত হয় এবং বিংশ শতকের প্রথমদিকে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। এইসব ঘটনার ফলে ভারতীয় উদারপন্থীদের রাজনৈতিক পরিকল্পনা প্রসারিত হল। এতদিন পর্যন্ত ছিল শুধুমাত্র শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবী। এবার তারা স্বায়ত্তশাসনের দাবী করতে শুরু করলেন। ১৯০৬ সালে দাদাভাই নওরোজীর সভাপতিত্বে কলিকাতা কংগ্রেসে স্বরাজ অথবা স্বায়ত্ত-শাসনের (স্বায়ত্তশাসনশীল ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহে প্রচলিত শাসনব্যবস্থা) নতুন পরিকল্পনা গৃহীত হল। এছাড়াও কলিকাতা কংগ্রেস বয়কট আন্দোলন, স্বদেশী এবং জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। উদারপন্থীরাও এইসব প্রস্তাব সমর্থন করেন।

শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবী থেকে সরে এসে ভারতীয় উদারপন্থীরা যে নতুন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য স্থির করেছিলেন তা হল স্বায়ত্তশাসন অর্জন করা। এ সত্ত্বেও কিন্তু তারা কোনোরকম নিয়মতান্ত্রিকতা বহির্ভূত সংগ্রামপদ্ধতি অবলম্বন করতে চান নি। এর কারণ হল নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন পদ্ধতির ওপর তাঁদের অবিচল আস্থা। 'আমাদের পক্ষে যেটা প্রয়োজন তা হল ইংরেজদেরই কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে আবেদন, বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সভা-সমিতি করে ধৈর্য সহকারে বিক্ষোভ দেখান। এসব কিছুই করতে হবে খুব শান্তিপূর্ণভাবে ও উৎসাহের সংগে।'৪০

কংগ্রেসের কর্মীদের মধ্যে উদারপন্থীদের নীতি ও পদ্ধতি বিষয়ে রাজ-

নৈতিক মোহভংগ হতে থাকায় সংগ্রামী জাতীয়তাবাদীদের একটা নতুন গোষ্ঠীর উদ্ভব হল। এদের রাজনৈতিক ভাবাদর্শ ছিল আলাদা ও সংগ্রাম সম্পর্কে ধারণাও ছিল বিভিন্ন। তাদের নতুন ধ্যানধারণা নিয়ে এই গোষ্ঠী কংগ্রেসের মধ্যে জোট বাঁধতে শুরু করল। এই দল চরমপন্থী নামে পরিচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে কতকগুলো কারণে এই নতুন দলটি দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে।

এই শতাব্দীর শেষের দিকে সারা দেশজুড়ে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। দেশের নানাস্থানে মারাত্মক প্লেগ রোগের প্রবল বিস্তার ঘটে, ফলে বহু লোক মারা যায়। এসব ঘটনার ফলে জনমনে ব্রিটিশ শাসনের মর্যাদা ক্ষয় পেয়েছিল।

লর্ড কার্জন ভাইসরয় থাকাকালীন কিছু কিছু জবরদস্তিমূলক বিধিব্যবস্থা প্রচলন করেন। এর ফলে জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক অসন্তোষ আরও বিস্তার লাভ করে। "কলিকাতা কর্পোরেশনের ক্ষমতা সংকোচন করে, Official Secrets' Act নামক আইন জারী করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন করে (যার ফলে শিক্ষা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে)··· তিব্বতে সামরিক অভিযান চালিয়ে এবং সর্বোপরি বংগভংগ করে কার্জন এমন অবস্থা সৃষ্টি করলেন যাতে ব্রিটিশ ভারতে শাসনের প্রতি আনুগত্য নষ্ট হয়ে গেল এবং সমগ্র জাতির মধ্যে নতুন চেতনার সঞ্চার হল। আমাদের অসততা সম্বন্ধে কলিকাতায় তিনি যে বক্তৃতা করেছিলেন তার থেকেও পীড়াদায়ক হল তার এই কথাটা যে পরিবেশ, ঐতিহ্য এবং শিক্ষাদীক্ষার কারণে আমরা ভারতীয়রা "ব্রিটিশ শাসনাধীনে উচ্চপদের দায়িত্ব বহনে অক্ষম।"৪১

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বিশেষ করে বাংলায় বেকারীত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। অভিজ্ঞতায় দেখা গেল যে ব্রিটিশ সরকারের সহযোগিতা নিয়ে ধীর অথচ শৃংখলাপরায়ণ অগ্রগতির মতবাদ এবং কেবলমাত্র আবেদন ও বক্তৃতার দ্বারা কার্যসিদ্ধির উপায় বাস্তবে ফলপ্রসূ হয় নি। এই কারণে এই যুবগোষ্ঠী উদারপন্থী ভাবাদর্শে বীতশ্রদ্ধ হয়ে নতুন মতবাদে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ, বারীন্দ্র ঘোষ এবং লালা লাজপত রায় ছিলেন এই নতুন মতবাদের প্রধান প্রবক্তা। বস্তুতপক্ষে মধ্যবিত্তশ্রেণীই হল এই নতুন জাতীয়তাবাদের সামাজিক ভিত্তি। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি এযাবৎকাল উচ্চবিত্ত বুদ্ধিজীবী-শ্রেণী এবং বাণিজ্যিক বুর্জোয়াদের কিছু গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমিত ছিল। ১৯০৫ সালের পর এই আন্দোলন নিম্নতর মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে।

আরও কয়েকটা ঘটনা ভারতবর্ষে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের প্রসারে প্রেরণা যুগিয়েছিল। ১৯০৫ সালে জাপানের হাতে জার সাম্রাজ্যের পরাজয়, আডোয়া হতে ইটালীর পরাজয়ের ফলে শ্বেতাংগরা অপরাজেয় এই যে ধারণা তা উৎপাটিত হল। ভারতীয়রা হীনমন্যতা ত্যাগ করল এবং ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ সম্পর্কে তাদের মনে প্রত্যয় জন্মাল।

সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের উদ্ভব

ব্রিটিশ সরকার রাজনৈতিক ও আর্থিক দাবী পূরণ করতে চায় নি। সেই সংগে ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে দমনশীল নীতি অবলম্বন করেছিল। এ সবের ফলে উদারপন্থী জাতীয়তাবাদীদের ভাবধারা ও পদ্ধতি সম্পর্কে ভারতীয়দের বিশ্বাস আর অটল রইল না। তারা তখন সংগ্রামী জাতীয়তাবাদীদের (চরমপন্থী) গোষ্ঠীর দিকে ঝুঁকতে লাগল। এই চরমপন্থী-দের ভাবধারা ও পদ্ধতি এখন সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

সংগ্রামী জাতীয়তাবাদীগণ ভারতবর্ষের অতীত থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন। তাঁরা ভারতীয় জনসাধারণের ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনাসমূহের কথা প্রচার করতেন এবং জাতীয় গর্ব ও আত্মসম্মান উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতেন। উদার-পন্থীরা পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে বিশেষ করে ব্রিটিশ সংস্কৃতিকে আদর্শস্থানীয় বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করতেন। সংগ্রামী জাতীয়তাবাদীগণ মনে করতেন যে এর ফলে ভারতীয়দের মনে হীনমন্যতা জাগবে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য অত্যাবশ্যক জাতীয় গর্ব এবং আত্মবিশ্বাসের হানি হবে।

সুপ্রাচীন হিন্দুদের বৈদিক যুগের কথা, মহামতি অশোক ও চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের গৌরবময় ইতিহাস, রানা প্রতাপ ও শিবাজীর বীরত্বময় ক্রিয়াকলাপ এবং ১৮৫৭ সালের জাতীয় বিদ্রোহের নেতা ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর গভীর দেশপ্রেম—এসব কিছুই সংগ্রামী জাতীয়তাবাদীগণ দেশবাসীর সামনে তুলে ধরলেন।

সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের তাত্ত্বিকগণের বিশ্বাস ছিল যে ভারতবর্ষের একটা বিশেষ প্রতিভা আছে। ভারতবর্ষের লোক একটা বিশেষ আধ্যাত্মিক চেতনায় সমৃদ্ধ—এই কথা তাঁরা প্রচার করতেন। 'হিন্দুরা সুনির্দিষ্ট স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী। আধ্যাত্মিক এবং চিরন্তন অস্তিত্বের চেতনাই হিন্দু চরিত্রের বিবর্তনধারা চালিত করেছে এবং হিন্দুজাতির ইতিহাসে বৈচিত্র্য সঞ্চার করেছে।'৪২

বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে পরিচালিত সংগ্রামী জাতীয়তা-বাদীর বাংলাগোষ্ঠী স্বামী বিবেকানন্দের নববৈদান্তিক ভাব আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। 'নব-বেদান্তবাদ নব্যহিন্দু চেতনার অন্তঃসারস্বরূপ। আধিভৌতিক জীবনকে ভাবাদর্শ ও আধ্যাত্মিকতায় সম্পৃক্ত করে প্রাচীন আধ্যাত্মিক আদর্শসমূহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই নব-বেদান্তবাদের উদ্দেশ্য। নব-বেদান্তবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক পুনর্গঠন আবশ্যক। বর্তমান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আধ্যাত্মিক চরিত্র পুরোপুরি এই বেদান্তদর্শন থেকে গৃহীত।'৪৩

এইভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ শাসন থেকে রাজ-নৈতিক স্বাধীনতা লাভ এবং গণতান্ত্রিক ও সেই সংগে আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠল সেটা আসলে সামগ্রিক ধর্মীয় আন্দোলন সম্ভূত। জাতীয়তাবাদের অভিব্যক্তিতে ধর্মীয় ভাব ছিল সুস্পষ্ট এবং এর ভংগী ছিল ধর্মীয় ও অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনাপূর্ণ।

তিলকের নেতৃত্বে সংগঠিত মহারাষ্ট্রের নতুন জাতীয়তাবাদীগণ ভারতের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গরিমা প্রচার করতেন এবং পাশ্চমী সংস্কৃতি অনুধাবনের জন্য উদারনৈতিকদের নিন্দা করতেন তবে তাঁদের স্বরাজ আন্দোলন ধর্মীয় অতিন্দ্রীয়বাদ সম্পৃক্ত ছিল না। মহারাষ্ট্রের জনসাধারণকে বীরত্ব ও আত্মত্যাগের কাজে উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে তিলক মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতার জন্য শিবাজীর সংগ্রামের স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করলেন। এমনকি রাজনৈতিক প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি গণপতি উৎসব পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে থেকে শৈথিল্য ও অকর্মণ্যতা দূর করবার জন্য তিনি ভগবদ্গীতার কর্মযোগ প্রচারও করতেন। বাংলাদেশের মতো মহারাষ্ট্রের নব-জাতীয়তাবাদ অতীন্দ্রিয় ধর্মানুভূতি দার্শনিকতায় সম্পৃক্ত ছিল না।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মুক্তির জন্য ব্রিটেনের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার জন্য সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী অথবা চরমপন্থীরা উদারপন্থীদের সমালোচনা করতেন। চরমপন্থীদের লক্ষ্য ছিল যেকোনো বিমূর্ত নীতি দ্বারা নয়, বাস্তব উদ্দেশ্য দ্বারা রাজনীতি নির্ধারিত হবে। তাঁরা বলতেন যে ভারতবর্ষকে সমৃদ্ধশালী করে তোলবার জন্য ভারতীয় শিল্পের অবাধ স্বচ্ছন্দ বিকাশ ইংরেজদের অভিপ্রেত হতে পারে না কারণ এটা ব্রিটিশ শিল্পের স্বার্থবিরোধী। ব্রিটিশ সরকার যদি চাকরিতে শুধু ভারতীয়দের নিযুক্ত করে তবে তাতে শত শত ইংরেজদের বাস্তবিক ক্ষতি হবে। একদিকে ব্রিটেন আর অন্যদিকে ভারতবর্ষ এই উভয় দেশের মধ্যে স্বার্থগত বিরোধের পরিণতিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উদ্ভব হয়। ব্রিটেনের গণতান্ত্রিক বিবেক এবং ঐতিহ্যের কাছে কেবলমাত্র যুক্তি ও আবেগের ফলে স্বার্থের সংঘাত মিটতে পারে না। লালা লাজপত রায় বলেছিলেন, "সর্বশক্তিমান ভগবানের নিকট প্রার্থনা দ্বারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা সুযোগ সুবিধা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হতে পারে।[৪৪] শাসক-জাতির কাছে আবেদন করার একটা উপযোগিতা হল এটা প্রমাণ করা যে রাজনৈতিক ব্যাপারে মানুষের বিবেকের কাছে আবেদন করাটা অর্থহীন যেখানে একটা জাতির সংগে আরেকটা জাতির স্বার্থের সংঘাত বাধে। তিলক যথার্থ-ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, 'রাজনৈতিক অধিকার সংগ্রাম করে অর্জন করতে হয়। উদারনৈতিকরা মনে করেন যে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করা যায় না। আমরা মনে করি যে কেবলমাত্র প্রচণ্ড চাপ দিলেই রাজনৈতিক অধিকার অর্জন সম্ভব।'[৪৫]

সংগ্রামী জাতীয়তাবাদীরা জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় চেতনা জাগিয়ে তুলেছিল। যুক্তি প্রদর্শন ও আবেদনের পদ্ধতিকে তারা অর্থহীন বলে মনে করেছিলেন। তারা বয়কটের মতো এমনসব কার্যক্রম অবলম্বন করেছিল যাতে জনসাধারণ বেশী করে যোগ দিতে পারে এবং যার চাপ ব্রিটিশ শাসক উপলব্ধি করতে পারে। ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের কার্যকারিতা সম্পর্কে লালা লাজপত রায় বলেছেন, "ন্যায়নীতিভিত্তিক কোনো যুক্তির চেয়ে ব্যবসাবাণিজ্য নষ্ট হবার যুক্তি দোকানদারের জাতির মনে অনেক সহজে লাগবে।"[৪৬]

সংগ্রামী জাতীয়তাবাদীরা মনে করতেন যে ব্রিটিশ ও ভারতের স্বার্থ

সহযোগী নয় বরং পরস্পরবিরোধী। এই কারণে শুধুমাত্র শাসনসংস্কার বা সরকারি চাকুরির ভারতীয়করণে তাদের আগ্রহ ছিল না। তারা মনে করতেন যে স্বায়ত্ত-শাসন অথবা রাজনৈতিক ক্ষমতা দ্বারাই কেবলমাত্র ভারতের মৌলিক, সামাজিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতি সম্ভব। অন্যভাবে বলা যায় যে ব্রিটিশ শাসন-পদ্ধতির সংস্কার নয়, অবসানই ছিল তাদের কাম্য। ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের কোনো সম্ভাবনা নেই দেখে উদারনৈতিকরা ১৯০৬ সালে স্বায়ত্তশাসনের দাবী সমর্থন করেন।

নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পর্কে চরমপন্থীরা বললেন যে বিদেশী জাতি যে দেশ যথেচ্ছভাবে শাসন করে সে দেশে এর কোনো উপযোগিতা নেই। তারা বললেন যে ভারতের শাসনতন্ত্র ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইনের সৃষ্টি। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ব্রিটিশ জনগণের সার্বভৌম ইচ্ছার প্রতীক। ভারতীয় জন-সাধারণ এটা তৈরী করে নি। ফলত এই শাসনভিত্তিক সরকার ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কাছেই দায়ী থাকে, ভারতীয় জনসাধারণের কাছে নয়, নিয়ম-তান্ত্রিক আন্দোলন শুধুমাত্র ইংলণ্ডের মতো দেশেই কার্যকর হতে পারে কারণ সেখানে জনগণ পার্লামেণ্ট নির্বাচন করে এবং পার্লামেণ্টের মাধ্যমে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে।

"স্বদেশী এবং বয়কট"

সংগ্রামী জাতীয়তাবাদীরা গভীরভাবে স্বদেশীতে বিশ্বাস করতন এবং সাগ্রহে জনসাধারণের মধ্যে স্বদেশী প্রচার করতেন। স্বদেশী সম্পর্কে লাজপত রায় বলেছেন, "স্বদেশীকে আমি আমার দেশের মুক্তির পথ মনে করি। স্বদেশী আন্দোলন আমাদেরকে আত্মসম্মানী, আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল এবং সর্বোপরি পুরুষোচিত করে তুলবে। কিভাবে আমাদের পুঁজি, আমাদের সম্পদ, আমাদের শ্রম, আমাদের শক্তি, আমাদের প্রতিভা গোষ্ঠী, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে সমস্ত ভারতীয়ের মহত্তম কল্যাণের জন্য চালিত করা যেতে পারে স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা সেই শিক্ষাই পেয়ে থাকি। ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক প্রভেদ অতিক্রম করে স্বদেশী আমাদের একত্রিত করে তুলবে। আমার মতে স্বদেশীকে ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের সর্বজনমান্য ধর্ম বলে গ্রহণ করা উচিত।"৪৭

নব্য জাতীয়তাবাদীগণ স্বদেশীকে ভারতবর্ষের শিল্পায়ন ও সাধারণ আর্থিক পুনরুজ্জীবন এবং অগ্রগতি অর্জনে জনসাধারণের নিজস্ব উপায় বলে গণ্য করতেন। তিলকের মতে স্বদেশী বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে অনেকটা আত্মত্যাগ করা দরকার হবে বিশেষ করে মধ্যবিত্তশ্রেণীর ক্ষেত্রে এই কথা প্রযোজ্য কারণ এরাই বিদেশী জিনিসের প্রধান ক্রেতা। তিলক বলেছেন, স্বদেশী কার্যক্রম সফল করে তোলার জন্য দরকার 'আত্মনির্ভরশীলতা, দৃঢ়সংকল্প ও ত্যাগ'।

অন্যদিকে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা বয়কট আন্দোলন সংগঠিত ও পরিচালিত হতো। এঁদের ব্রিটিশ বিরোধিতা প্রকাশ্য ও উগ্র ছিল। বয়কটের পরিকল্পনাটা ব্যাপক ছিল। শুধুমাত্র ব্রিটিশ পণ্য বর্জন নয়, সরকারী উপাধি ও সরকারী পদ পরিত্যাগ করা, কাউন্সিল ও স্কুল বর্জন—এ সবকিছুই বয়কট

আন্দোলনের কার্যক্রমের অন্তর্গত ছিল। বয়কট আন্দোলনের প্রবক্তাগণ বঙ্গভঙ্গ রদ এবং নিপীড়ন বন্ধে সরকারকে বাধ্য করার উপায় হিসাবে বয়কট প্রয়োগ করেছিলেন।

লালা লাজপত রায় বয়কট আন্দোলনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, "বয়কটের অর্থ নিম্নোক্ত রূপ··· সরকারের কাছে তার মর্যাদাই প্রথম কথা। বয়কট এই মর্যাদার মূলে আঘাত করে। মর্যাদা জিনিসটা মনোভ্রমমূলক বটে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এর শক্তি এবং সম্ভাবনা কর্তৃত্ববোধের তুলনাতেও বেশী। আমরা বয়কট দ্বারা সরকারী মর্যাদা নাশ করবার চিন্তা করছি। গভর্ণমেণ্ট হাউসের থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আমরা জনসাধারণের কুঁড়েঘরের দিকে তাকাতে চাই। আমরা আর সরকারের কাছে আবেদন করব না। পরিবর্তে আমরা জনসাধারণের কাছে নতুন আবেদন করব। এটাই হল বয়কট আন্দোলনের মানসিকতা, তার নীতিবোধ ও আত্মিক তাৎপর্য।"৪৮ এইভাবে বয়কট প্রধানতঃ স্বরাজ অর্জনের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের মনে সংগ্রামী সংকল্প উদ্দীপ্ত করার উপায় হিসাবে গণ্য হতো।

সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে জওহরলাল নেহেরুর বক্তব্য

হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুসমাজের ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে স্বরাজ আন্দোলন গড়ে তোলবার জন্য নব্য-জাতীয়তাবাদের প্রবর্তকগণ পরবর্তীকালে সমালোচিত হল। সমালোচকরা জোর দিয়ে একথা বলতেন যে এতে শুধুমাত্র ধর্মীয় কুসংস্কার ও অধ্যাত্মবাদের সূচনা হয়েছিল তাই নয় উপরন্তু এর ফলে ভারতীয় জনসাধারণের এক-তৃতীয়াংশব্যাপী মুসলমানদের মনে জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে বিরাগ সৃষ্টি হয়েছিল। এর ফলে রাজনৈতিক আন্দোলনের ধর্মনিরপেক্ষ পরিচয় শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

জাতীয় আন্দোলনের মূল সত্তা হিসাবে ধর্মীয় গোঁড়ামিকে প্রাধান্য দেওয়া, আধুনিক "পাশ্চাত্য" সভ্যতার তুলনায় প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ (নিঃসন্দেহে আধুনিক মনোবিজ্ঞান অনুসারে এটা···ক্ষতিপূরক আত্ম-প্রবঞ্চনা ভিন্ন আর কিছুই নয়) ধরে নিয়ে তার প্রচার—এ সবকিছুই জাতীয় আন্দোলনের প্রকৃত অগ্রগতি ও রাজনৈতিক সচেতনতা সুনিশ্চিতভাবে ব্যাহত ও দুর্বল করে তুলেছিল। আবার মুসলমানদের একটা বড় অংশ যে জাতীয় আন্দোলন থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকল তার একটা কারণ এই যে জাতীয় আন্দোলনে হিন্দুধর্মের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল।"৪৯

বি. সি. পাল এবং অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে বামপন্থী জাতীয়তাবাদ হিন্দুদের ধর্মীয় অধ্যাত্মবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই ভাবটা না থাকলে বহু জাতীয়তাবাদী এই আন্দোলন সমর্থন করতেন। কিন্তু এই কারণে বহু জাতীয়তাবাদী এর থেকে সরে গেলেন এমনকি উদারপন্থীদের সঙ্গে যোগ দিলেন। জওহরলাল নেহেরু মনে করেন যে ১৯০৭ সালে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু যে আন্দোলন থেকে সরে গিয়েছিলেন এটা তার অন্যতম মুখ্য কারণ। "এইসব আন্দোলনের পটভূমি ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ। এটা একেবারে তাঁর প্রকৃতি বিরোধী। প্রাচীন ভারতবর্ষের পুনরুজ্জীবন তিনি কখনো চান নি।

সামাজিকভাবে বলতে গেলে ১৯০৭ সালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পুনর্জাগরণ স্পষ্টতই প্রতিক্রিয়াজনক ছিল।"৫০

জনসাধারণের বৈষয়িক স্বার্থকে ভিত্তি করেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরিকল্পনা করা উচিত। একমাত্র তখনই জাতপাত ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমগ্র জাতি আন্দোলনে যোগ দিতে পারে। "জাতীয় আন্দোলনের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক কার্যক্রম ধর্মীয় সংকীর্ণতার অনেক উর্ধ্বে ভারতীয় জনসাধারণকে একত্রিত করতে পারে, করা উচিতও। এই ধরনের শক্তিশালী ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক মনোভাবাপন্ন ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনেই বর্তমান সময়ের সাম্প্রদায়িক আন্দোলন প্রতিহত করার প্রশ্নে সব থেকে বেশী কার্যকর হতে পারে।"৫১

১৯০৫ সালে এবং তার পরবর্তী সময়েও মুসলমানেরা যে কেন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগদান করে নি তার একটা কারণ সম্ভবতঃ এই যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ হিন্দু মতাদর্শে বিশ্বাসী নেতাদের দ্বারা সরাসরিভাবে পরিচালিত হতো। বিপিন পাল, অরবিন্দ এবং অন্যান্য নেতারা "হিন্দুধর্মের ওপর ভিত্তি করে আন্দোলন চালিত করেছিলেন এবং জাতীয় জাগরণ ও হিন্দু পুনর্জাগরণ এক করে দেখতে চেয়েছিলেন। তাদের এইরকম কার্যধারার ফলে মুসলমান সমাজ জাতীয় আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে সরকার সুকৌশলে পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ স্থাপনের ব্যবস্থা করল।"৫২

সংগ্রামী জাতীয়তাবাদীরা স্বাধীনতার জন্য বিপুল আত্মত্যাগ এবং কঠোর দুঃখভোগ করেছেন। এঁরাই ছিলেন প্রথম সারির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শহীদ। নিজেদের কার্যক্রম অনুসারে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদীগণ সরকারের সংগে বিরোধে লিপ্ত হয়েছিলেন। কারাবাস, নির্বাসন ও অপরিসীম ক্লেশ—এ সবকিছুই তারা ভোগ করেছিলেন। আদর্শ ও কার্যক্রমের প্রতি তাঁদের নিষ্ঠার দরুন জনমানসে এঁরা দেবতার আসন লাভ করেছিলেন। ঘরে ঘরে তাদের নাম উচ্চারিত হতো। হাজার হাজার যুবক তাঁদের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছিল এবং স্বরাজের জন্য কঠিন সংগ্রাম করেছিল। তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ, বারীন্দ্র ঘোষ এবং লাজপত রায় ছিলেন এই নতুন জাতীয়তাবাদের বিশিষ্ট নেতা। এঁরা সবাই স্বরাজের উদ্দেশ্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিলক স্বাধীনতার আদর্শের জন্য রাজনৈতিক নির্যাতন ভোগের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন।

এই নতুন জাতীয়তাবাদ ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সংগ্রামী মনোভাব ও স্বাধীনতাবোধ সঞ্চার করেছিল। সংগ্রামী জাতীয়তাবাদই আমাদের জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে গৌরবময় অহংবাদ ও আত্মনির্ভরশীলতার চেতনা এনেছিল। এই নতুন জাতীয়তাবাদই ভারতীয় জনসাধারণকে এই শিক্ষা দিল যে পীড়ন সহ্য না করে স্বরাজ অর্জন করা যায় না। নতুন জাতীয়তাবাদের প্রভাবে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণী এমনকি জনসাধারণের একটা অংশের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯০৮ সালে তিলককে গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদে বোম্বাই-এর সুতাকল শ্রমিকগণ সাধারণ ধর্মঘট করলেন। এটাই "ভারতীয়

শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম রাজনৈতিক পদক্ষেপ।" লেনিন এই ধর্মঘটকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছিলেন।

সংগ্রামী জাতীয়তাবাদীগণের প্রধান কার্যাবলী

এখন নব্য জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর সব থেকে উল্লেখযোগ্য কার্যকলাপসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করব।

এই নতুন গোষ্ঠীর নেতাদের মধ্যে তিলকই সব থেকে বিখ্যাত। এর কারণ তিলকের ছিল প্রখর বুদ্ধিমত্তা, গভীর রাজনৈতিক বাস্তববোধ, অনমনীয় ইচ্ছা এবং আত্মত্যাগের ক্ষমতা। প্রথম জীবনে তিলক চীপলন্‌কার এবং আগরকরের মতন নির্ভীক জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। আপত্তিকর প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্য ১৮৮২ সালে আগরকর সহ তিলক চার মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। সেই সময়ই তার রাজনৈতিক নির্যাতন ভোগের প্রথম অভিজ্ঞতা হয়।

তিলক New English School এবং Fergusson College-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুটির ছাত্র ও শিক্ষকগণ গভীর স্বদেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ১৮৮০ সালে তিলক "কেশরী" পত্রিকা (মারাঠী সাপ্তাহিক) এবং "মারাঠা" পত্রিকা (ইংরেজী সাপ্তাহিক) প্রবর্তন করেন। তিলকের এই দুই পত্রিকা নব্য জাতীয়তাবাদীদের আদর্শ ও নীতির প্রভাবশালী মুখপত্র হয়ে উঠেছিল।

১৮৯৩ সালে তিলক গণপতি উৎসব পুনঃপ্রবর্তন করেন। এই উৎসব উপলক্ষে ব্যাপক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংগঠিত করা যেত। "বক্তৃতা, শোভামাত্রা, গানের দল উৎসবের অপরিহার্য অংগ ছিল। এসবের দ্বারা কেবলমাত্র ধর্মীয় উদ্দীপনা সঞ্চার হতো তাই নয়, জাতীয় চেতনাও উদ্বুদ্ধ হতো এবং তৎকালীন বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে আগ্রহ সৃষ্টি হতো।"৫৩

এছাড়া তিলক ১৮৯৫ সালে শিবাজী উৎসব পুনঃপ্রবর্তন করেন। জনমানসে শিবাজীর স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করা ছিল এই উৎসবের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। শিবাজী মুঘল অধীনতাপাশ থেকে মহারাষ্ট্রকে মুক্ত করেছিলেন। শিবাজী উৎসবের প্রবর্তন করে তিলক জনসাধারণকে ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা অর্জন করবার বীর্যময় প্রতিজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ঘটেছিল তার জন্য তিলক ও তাঁর সহযোগীরা ত্রাণকার্য পরিচালনা করেছিলেন। বেশ সতর্কভাবে হলেও তিলক জনসাধারণকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যদি আর্থিক দিক থেকে সম্ভব হয় শুধুমাত্র তবেই যেন তারা সরকারের পাওনা মিটিয়ে দেয়। 'কেউ মারা যাক এটা মহারাণীর ইচ্ছা নয়, গভর্ণর বলেছেন সবাই বেঁচে থাকবে... এর পরেও কি তোমরা ভীরুতা ও অনাহারে প্রাণ বিসর্জন দেবে। সরকারী পাওনা দেওয়ার টাকা যদি তোমাদের থাকে তো বিনা দ্বিধায় মিটিয়ে দাও। কিন্তু যদি তোমাদের উপায় না থাকে তবে অধস্তন সরকারী অফিসারদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তোমরা কি ঘরের জিনিসপত্রও বিক্রি করে দেবে? এমনকি মৃত্যুর মুখে এসেও কি তোমরা সাহসী হতে পার না?'৫৪

এই সময় ভারতবর্ষে কুঁচকিঘটিত প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়। এর মোকাবিলা করবার জন্য সরকার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তাতে জনমনে প্রচণ্ড ক্রোধের সঞ্চার হয়। 'কেশরী' পত্রিকাতে তিলক কঠোরভাবে সরকারী ব্যবস্থাসমূহের সমালোচনা করেন। এর পরেই স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মী Rand এবং Ayerst সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে নিহত হন। এই সূত্রে ধৃত চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং বিচারে তাঁদের ফাঁসীর হুকুম হয়। সরকারের ধারণা হয় যে তিলকের প্রচার সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। ১৮৯৫ সালে রাজদ্রোহিতার অপরাধে তিলককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিচারে তিলক আঠারো মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

তিলক যে সময় জেলে ছিলেন তখন সরকার Indian Penal Code আইনে ১২৪(এ) এবং ১৫৩(এ) ধারা যুক্ত করেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রাথমিক বৎসরগুলো ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ছিল। প্লেগ ও দুর্ভিক্ষের সময় সরকার যথোপযুক্ত ত্রাণ ব্যবস্থা করতে না পারার দরুন মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক অসন্তোষ বেড়ে যাচ্ছিল। কংগ্রেসের দাবীদাওয়া পূরণ না হওয়াতে উদারপন্থীদের কার্যপদ্ধতি ও কার্যক্রম বিষয়ে সচেতন বুদ্ধিজীবীদের মনে সন্দেহ এমনকি অবিশ্বাসের মনোভাব দ্রুত বেড়ে যাচ্ছিল। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস, আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ, অস্ট্রিয়ার অধীনতার বিরুদ্ধে ইটালীর জনগণের জাতীয় বৈপ্লবিক সংগ্রাম এবং স্বাধীনতার জন্য আয়ারল্যাণ্ডের সংগ্রামের কাহিনী সহ ইউরোপের ইতিহাস শিক্ষিত ভারতীয়গণ সবিস্তারে পড়ছিলেন। Thomas Paine, Mazzini, Voltaire, Rousseau প্রমুখ নেতা ও চিন্তাবিদদের লেখা তাঁরা পাঠ করছিলেন। তাঁদের মধ্যে একটা নতুন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠেছিল। তাঁরা উত্তরোত্তর একদিকে নতুন জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হচ্ছিলেন অন্যদিকে ঝুঁকছিলেন ষড়যন্ত্র-মূলক সন্ত্রাসবাদের দিকে।

লর্ড কার্জনের আমলের রাজনৈতিক ব্যবস্থার দরুন জনসাধারণের পুঞ্জী-ভূত অসন্তোষ প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। বঙ্গভঙ্গের ফলে সেই দাহ বিষম অগ্নি-কাণ্ডে রূপান্তরিত হল।

প্রায় সব গোষ্ঠীরই রাজনীতিবিদরা কলিকাতা কর্পোরেশন অ্যাক্টের সমা-লোচনা করেছেন। তাঁরা এই আইনকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলে গণ্য করলেন। লর্ড কার্জনের Indian University's Act উচ্চশিক্ষা সীমিত করার প্রয়াস বলে গণ্য হল। বঙ্গভঙ্গ তাঁদের দৃষ্টিতে বাঙালীদের ঐক্য ব্যাহত করবার উপায় হিসাবে প্রতিভাত হল। মাননীয় চৌধুরী মহাশয় বলেছিলেন যে বঙ্গভঙ্গ "হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে। আপাতদৃষ্টিতে লর্ড কার্জন Vambery মতানুবর্তী হয়ে স্থির করেছিলেন যে একমাত্র জাতিগত বিরোধের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে অধীনস্থ রাখা যাবে। মুসলমান কেন্দ্র হিসাবে ঢাকা এবং হিন্দু কেন্দ্র হিসাবে কলিকাতাকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে গড়ে তোলাই ছিল বঙ্গভঙ্গের উদ্দেশ্য।"[৫৫]

সবাই বঙ্গভঙ্গের সমালোচনা করেছিলেন। সমস্ত রাজনৈতিক গোষ্ঠী একজোট হয়ে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করেছিলেন। কবি রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর, বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ময়মনসিংহ এবং কাশিমবাজারের মহারাজারা সবাই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন।

স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট এবং জাতীয় শিক্ষার ধ্বনি বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে ধ্বনিত হয়েছিল। তিলক এই কার্যক্রমের পক্ষে ব্যাপক প্রচার চালিয়েছিলেন এবং ১৯০৬ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে কংগ্রেস কর্তৃক এই কার্যক্রম অবলম্বনের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। দাদাভাই নওরজী এবং অন্যান্য উদারপন্থী নেতাদের সমর্থনে কংগ্রেসে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। এই বছর থেকেই তিলক সবথেকে জনপ্রিয় সর্বভারতীয় নেতা হিসাবে পরিগণিত হলেন।

তিলক, বিপিন পাল, অরবিন্দ, বারীন্দ্র ঘোষ, লাজপত রায় প্রমুখ সব জাতীয়তাবাদী নেতারাই পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার চালিয়েছিলেন। তাঁদের প্রচেষ্টার ফলে বিদেশী দ্রব্য বর্জন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই আন্দোলন সফল হয়েছিল। এর ফলে ব্রিটিশ দ্রব্যের চাহিদা গুরুতরভাবে ব্যাহত হয় এবং ভারতীয় শিল্পজাত পণ্যের আদর বেড়ে যায়। কলিকাতা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র Englishman-এ লেখা হয়েছিল যে "একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে কলিকাতার গুদামঘরগুলোকে অবিক্রিত বস্তুসম্ভার জমে রয়েছে। অনেক বড় বড় মাড়ওয়ারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। বেশ কয়েকটি বড় বড় ইউরোপীয় আমদানী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান কাপড়ের কারবার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে অথবা এর পরিমাণ খুব ছোট করতে হয়েছে। ভারতে ব্রিটিশ স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত করবার ব্যাপারে বয়কট ব্রিটিশ শাসনের শত্রুদের বেশ ধারালো অস্ত্র হয়ে উঠেছে।"[৫৬]

আন্দোলন দ্রুত বিস্তারলাভ করছিল। এর ফলে ইংরেজদের ব্যবসা খুব খর্ব হয়েছিল। জনসভা, বিক্ষোভ প্রদর্শন ও হরতালও হয়েছিল। বোম্বাইতে তিলকের 'কেশরী' ও 'মারাঠা' এবং বাংলায় 'সন্ধ্যা', 'বন্দে মাতরম্' ও 'যুগান্তর' জনসাধারণকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও কার্যক্রমের সঙ্গে পরিচিত করে তুলল।

সরকার পীড়ন শুরু করে দিলেন। ক্রমশঃ পীড়ন বাড়তে লাগল। শাসনতান্ত্রিক আদেশ জারি করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন ভেঙে দেওয়া হল। নেতৃবর্গ, সংবাদপত্রের সম্পাদক, প্রচারক এবং আন্দোলনের সংগঠকদের গ্রেপ্তার করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হতে লাগল।

সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীসমূহ যাঁদের উদ্ভব বাংলা, মহারাষ্ট্র এবং পঞ্জাবে, তাঁরাও সক্রিয় হয়ে উঠলেন। রাজনৈতিক ডাকাতি এবং উচ্চপদস্থ অফিসারদের হত্যা করা আরম্ভ হয়ে গেল। এই সময়কার সন্ত্রাসবাদী ও বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইতিহাস পরে বর্ণিত হচ্ছে।

১৯০৭ সালে কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ

১৯০৭ সালে কংগ্রেস দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। একভাগ হল উদারপন্থী এবং অন্যভাগ হল বামপন্থী জাতীয়তাবাদী। এই বিভেদ অপরিহার্য হয়ে

উঠেছিল কেননা উদারপন্থীগণের মনে সরকারের নীতি ও পদ্ধতি বিষয়ে মোহভঙ্গ ঘটলেও তাঁরা নব্য জাতীয়তাবাদের আদর্শ ও পদ্ধতি মেনে নিতে পারছিলেন না।

১৯০৭ সালের শুরুতে কংগ্রেস অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। দুই দিন ধরে অনেক উত্তপ্ত বাক্‌বিতণ্ডা হবার পর প্রচণ্ড গোলমালে অধিবেশন ভেঙ্গে গেল। কালক্ষেপ না করে উদারপন্থীরা একটা সম্মেলন করে নিম্নোক্ত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করলেন:

"ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য সদস্যদের মত ভারতের স্বায়ত্তশাসন অর্জন করাই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের চরম উদ্দেশ্য। সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে এবং বর্তমান শাসনব্যবস্থার ক্রমসংস্কার সাধন করে এই উদ্দেশ্য অর্জন করবার জন্য কংগ্রেস চেষ্টা করে যাবে।"

চরমপন্থীদের মনে ধারণা হল যে তাঁদের কংগ্রেস থেকে বাইরে রাখাই এই শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্য।

১৯০৭ সালের পর থেকে সরকারী পীড়ন বৃদ্ধি পেল। ১৯০৭ সালে সরকার Seditious Meetings Act এবং ১৯১০ সালে Indian Press Act প্রচলন করলেন।

সরকার 'বন্দে মাতরম্', 'যুগান্তর' প্রমুখ বাংলার কয়েকটা কাগজ বন্ধ করে দিলেন। কৃষ্ণকুমার মিত্র, অশ্বিনী কুমার দত্ত, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রমুখ আন্দোলনের প্রধান নেতাদের নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। বৈপ্লবিক চক্রান্তের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে অরবিন্দ ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণাভাবে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। নতুন কোনো অভিযোগে গ্রেপ্তার হবার আগেই অরবিন্দ ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করে পণ্ডিচেরীতে গিয়ে বসবাস শুরু করেন।

'স্বরাজ আমার জন্মাধিকার, স্বরাজ আমি অর্জন করবই' এই মন্ত্রের উদ্গাতা নব্য জাতীয়তাবাদের দুর্দমনীয় নেতা তিলককে ১৯০৮ সালে ছয় বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তাঁর কাগজে প্রকাশিত একটা রচনার জন্য তিলকের এই কারাদণ্ড হয়। কারাবাসের জন্য তাঁকে মান্দালয়ে পাঠান হয়।

বিচারালয়ে দাঁড়িয়ে তিলক বলেছিলেন, "মহত্তর শক্তি মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। হয়ত বিধাতার এই ইচ্ছা যে আমি যে উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করেছি আমি মুক্ত থাকার চেয়ে দণ্ডভোগ করলেই তার সিদ্ধির পথ সুগম হবে।"৫৭

মান্দালয় জেলে তিলক "The Arctic Home of the Vedas" এবং 'গীতা রহস্য' লিখেছিলেন। এই গ্রন্থদ্বয়ে তাঁর সুগভীর দার্শনিক ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা ও উপলব্ধি প্রকাশ পায়।

পঞ্জাবে ক্যানাল কলোনী বিল ও অন্যান্য বিক্ষোভের ফলে লাহোরে, লায়ালপুরে এবং রাওয়ালপিণ্ডিতে কৃষক দাঙ্গা শুরু হয়। লাজপত রায় এবং অজিত সিংকে পঞ্জাব থেকে নির্বাসন দেওয়া হয়।

মর্লে মিণ্টো সংস্কার ও পরবর্তী ঘটনাসমূহ

পীড়ন সত্ত্বেও আন্দোলন জোরদার হতে থাকলে ব্রিটিশ সরকার স্থির করলেন যে রাজনৈতিক সংস্কারের ব্যবস্থা করে জাতীয়তাবাদীদের সংগে মিটমাট করা রাজনৈতিকভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। সরকার তাই মর্লে মিণ্টো সংস্কারের প্রবর্তন করলেন। এই সংস্কার অনুসারে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন-সভায় অল্পসংখ্যক (বস্তুতঃ সংখ্যালঘিষ্ঠ) সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। আইনসভাগুলো পরামর্শ দিতে পারত, কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার চূড়ান্ত ক্ষমতা এদের ছিল না।

চরমপন্থী গোষ্ঠীরা এই সংস্কার অসন্তোষজনক বলে ঘোষণা করলেও উদারপন্থীরা কিন্তু শাসনসংস্কারে খুশীই হয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের সাম্প্রতিক কার্যকলাপের দরুন উদারপন্থীদের মধ্যে সরকারের উদ্দেশ্য ও অংগীকার সম্পর্কে আস্থা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। এই শাসনসংস্কার উদারপন্থীদের আস্থা কিছুটা ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল। ১৯১১ সালে বঙ্গভংগ রদ হওয়ার দরুন উদারপন্থীদের আস্থা দৃঢ়তর হল।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল।

সেক্রেটারি অফ্ স্টেট হাউস্ অফ্ কমন্সে ঘোষণা করলেন যে ভারতবর্ষে 'উত্তরোত্তর' দায়িত্বশীল প্রশাসন প্রবর্তন করাই হল ব্রিটিশ সরকারের নীতির লক্ষ্য।'

যুদ্ধে ভারতীয় বুর্জোয়াদের অধিকতর সমর্থন লাভের আশায় সরকার ১৯১৬ সালে তুলার ওপর সাড়ে তিন শতাংশ আমদানী শুল্ক ধার্য করেছিল। এর ফলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের প্রসার ঘটেছিল।

যাহোক, এই পদ্ধতিগুলো কিন্তু বামপন্থী জাতীয়তাবাদীদের খুশী করতে পারে নি। এঁরা যুদ্ধের সময়ও স্বরাজের আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগলেন। ১৯১৪ সালে জেল থেকে মুক্ত হয়ে তিলক হোমরুলের জন্য আন্দোলন সংগঠিত করলেন এবং ১৯১৬ সালে Home Rule League প্রতিষ্ঠা করলেন। এর ছয় মাস পরে Annie Besant মাদ্রাজে All India Home Rule League প্রতিষ্ঠা করলেন।

১৯১৬ সালে লক্ষ্মৌ কংগ্রেসে কংগ্রেসের দুই দল উদারপন্থী এবং চরম-পন্থীরা একত্রিত হলেন। তাদের এই একতা অবশ্য ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল।

এই সময়ের আর একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৯১৬ সালে কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের মৈত্রী। এটি লক্ষ্মৌ প্যাক্ট বা Congress-League Scheme নামে পরিচিত। মুসলীম রাষ্ট্র তুরস্কের সংগে ব্রিটেনের যুদ্ধ চলছিল। এর ফলে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে মুসলমানদের মনে প্রবল বিক্ষোভ জন্মেছিল। প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় কতকগুলো সংস্কারমূলক প্রস্তাব ছিল, যথা আইনসভায় নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা, আইনসভার ক্ষমতাবৃদ্ধি এবং Viceroy-এর Executive-এ অর্ধেক সভ্য ভারতীয় হতে হবে।

মুসলীম লীগ এবং কংগ্রেসের রাজনৈতিক মৈত্রী নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মহম্মদাবাদের রাজা Mazar-Ul-Haq, A. Rasul এবং জিন্না এরা সবাই লীগের নেতা ছিলেন।

সরকারী পীড়নের লক্ষ্য ছিল হোমরুল আন্দোলন। বেসান্ত পরিচালিত 'New India' পত্রিকার কাছে অনেক টাকা জামিন চাওয়া হয়েছিল এবং পত্রিকাটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। ১৯১৭ সালে বেসান্তকে উটকামণ্ডে অন্তরীণ করে রাখা হয়। বেসান্ত এবং ওয়াড়িয়া ও অরণ্ডেলের মতো নেতাদের অন্তরীণ করার ফলে হোমরুল লীগের জনপ্রিয়তা বেড়ে গেল। এর অল্প কিছুদিন পরেই জিন্না হোমরুল লীগে যোগ দিয়েছিলেন।

১৯১৭ সালে তিলক এবং বিপিন পালকে পঞ্জাব এবং দিল্লী থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

১৯১৮ সালে উদারপন্থীরা কংগ্রেস ত্যাগ করলেন এবং Liberal Federation গঠন করলেন। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনসংস্কার সম্বন্ধে মত-পার্থক্য এর কারণ। উদারপন্থীরা এই নতুন শাসনসংস্কার অনুসারে শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। অন্যদিকে ১৯১৮ সালে কংগ্রেস এই সংস্কার বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

সন্ত্রাসবাদী ও বৈপ্লবিক আন্দোলনের উদ্ভব

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলো বর্ণনা করবার আগে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে যে সন্ত্রাসবাদী ও বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলোর উদ্ভব হয় তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা প্রয়োজন।

উদারপন্থীদের কার্যক্রম ও পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্বন্ধে মোহভংগ হওয়াতে সেই সংগে স্বাধীনতার জন্য বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলন এবং রাশিয়ার নিহিলিস্ট ও ইউরোপের অন্যান্য গোপন দলগুলোর চক্রান্তকারী সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতি বিষয়ে পড়াশোনা করার ফলে কিছু লোকের মনে ভারতবর্ষে অনুরূপ সংগঠন করার জন্য আগ্রহ সঞ্চার হল।

লর্ড কার্জনের আমলে সরকারের রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতির দরুন এবং তারপর জাতীয়তাবাদীদের আন্দোলনের ওপর পীড়নের বিরুদ্ধে উদারপন্থীরাও সংগ্রামী বয়কট আন্দোলন সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এইসব অবিচার অত্যাচারই সংগ্রামী জাতীয়তাবাদীদের মনে রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদের উদ্দীপনা সঞ্চার করল।

সাধারণতঃ অপ্রিয় সরকারী কর্মচারীদের রাজনৈতিক কারণে হত্যা করা সন্ত্রাসবাদীদের কার্যক্রমের অংগ ছিল। সন্ত্রাসবাদীরা মনে করতেন যে এইভাবে সরকারী আমলাদের মনে ভীতি সঞ্চার করে তাদের মনোবল ধ্বংস করা সম্ভব হবে। সন্ত্রাসবাদীরা ভেবেছিলেন যে ব্যাপকহারে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড চালাতে পারলে দেশে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের অনুকূল পরিবেশ তৈরী হতে পারে।

রাজনৈতিক ডাকাতি সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমের আর একটা অংগ। গোপনে দল পরিচালনা ও দলের কাজকর্ম নির্বাহ, বোমা তৈরীর পরীক্ষাগার ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর কারখানার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দেশীয় ধনী ব্যক্তিদের ও সরকারী টাকা লুট করা হত।

সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ ঘটানো এবং কৃষকদের নিয়ে হাংগামা বাধানো

এই ধরনের ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যেও কয়েকটা বিপ্লবী গোষ্ঠী স্থাপিত হয়েছিল।

এইসব বৈপ্লবিক ও সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকর্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল বাংলা, পাঞ্জাব এবং মহারাষ্ট্র। বাংলার শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকারীত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাঙালী যুবকদের ক্রমবর্ধমান বেকারী ও বাঙালীদের তীব্র আবেগানুভূতির জন্যই বোধ হয় বাংলা সন্ত্রাসবাদের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

ভারতবর্ষের বাইরেও লণ্ডন, প্যারিস এবং নিউইয়র্কে বিপ্লবী এবং সন্ত্রাসবাদীদের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এখন এই আন্দোলনগুলোর সব থেকে উল্লেখযোগ্য কাহিনী ও ঘটনাগুলো বিবৃত করব।৫৮

১৮৯৭ সালে পুনাতে Rand এবং Ayerst-এর খুনের কথা আগেই বলা হয়েছে।

১৯০৫ সালে লণ্ডনে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা Indian Home Rule Society প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর অল্প কিছুদিন পরেই Highgate-এ India House প্রতিষ্ঠা করেন। এই দুই বৈপ্লবিক কেন্দ্রে বৈপ্লবিক রচনাদি প্রণয়ন করে এবং অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করে গোপনে ভারতবর্ষে চালান দেওয়া হতো। গোপনে ভারতবর্ষে যেসব পত্র-পুস্তিকা আমদানী করা হতো তার মধ্যে 'বন্দে মাতরম্' নামে একটা পুস্তিকা ছিল। ধিংড়া নামে ইণ্ডিয়া হাউসের জনৈক সদস্য ১৯০৯ সালে India Office-এর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী Carzon Wyille-কে হত্যা করেছিলেন। 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় এই হত্যাকাণ্ডের সমূহ প্রশংসা করে রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদের ভূমিকা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে "ইংরাজ ও ভারতীয় উভয় গোষ্ঠীর সরকারী কর্মচারীদের সন্ত্রস্ত করে তুলতে পারলে নিপীড়নমূলক শাসনযন্ত্র অচিরে ভেঙ্গে পড়বে।...বিচ্ছিন্ন হত্যাকাণ্ডই আমলাতন্ত্রকে পঙ্গু করা এবং জনগণকে উদ্দীপ্ত করার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।"৫৯

ইংলণ্ডে কৃষ্ণবর্মার অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন ভি. ডি. সাভারকার।

ভি. ডি. সাভারকারের ভাই জি. ডি. সাভারকার ভারতবর্ষে ছিলেন। বৈপ্লবিক ক্রিয়াকর্মে জড়িত থাকার জন্য তাঁকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। দণ্ডাজ্ঞা জারীর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দণ্ডদাতা বিচারক জ্যাকসনকে নাসিকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই সূত্রে নাসিক ষড়যন্ত্রের মামলায় কানহারকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং আরো সাতাশ জনকে কারাগারে বন্দী করা হয়। ১৯০৯ সালে তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড মিণ্টোকে হত্যা করবার চেষ্টা হয়েছিল।

বাংলাদেশে আন্দোলন খুব প্রবল হয়ে উঠেছিল। রাওলাট রিপোর্ট অনুসারে অনুশীলন সমিতির কলিকাতা এবং ঢাকায় দুটো এবং তার সঙ্গে প্রদেশ জুড়ে অসংখ্য ছোট ছোট কেন্দ্রে সন্ত্রাসবাদীরা সংগঠিত হচ্ছিলেন। এই সমিতি বৈপ্লবিক রচনাদি প্রচার করত এবং গোপন গোষ্ঠী গড়ে তুলেছিলেন।

বঙ্গভঙ্গের পর বাংলায় সন্ত্রাসবাদী সংগঠন খুব সক্রিয় হয়ে ওঠে। কিছু-সংখ্যক পুলিশ অফিসার, ম্যাজিস্ট্রেট, রাজসাক্ষী এমনকি কোনো কোনো সময় সরকারী উকিলরাও সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিহত হন। এই সন্ত্রাসবাদীদের প্রধান অস্ত্র ছিল বোমা এবং পিস্তল। আলিপুর ষড়যন্ত্রের মামলায় রাজসাক্ষী পরেশনাথ গোস্বামী ও তার সঙ্গে এই মামলার সঙ্গে জড়িত সরকারী উকিল ও পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট পরবর্তীকালে সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা নিহত হয়েছিলেন। এই ধরনের ষড়যন্ত্রের মামলা বাংলায় আরও হয়েছিল। এইসব ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে বৈপ্লবিক গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডের খুব প্রসার হয়েছিল।

অরবিন্দ, বারীন্দ্র ঘোষ প্রমুখ জাতীয়তাবাদী নেতারা বৈপ্লবিক ও সন্ত্রাস-বাদী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত আছেন বলে সন্দেহ করা হয়েছিল। ১৯০৮ সালে চক্রান্তের অভিযোগে অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণাভাবে তিনি মুক্তিলাভ করেন। এরপর তিনি ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করে পণ্ডিচেরীতে বসবাস শুরু করেন।

মর্লে মিণ্টো শাসনসংস্কার প্রবর্তিত হওয়ার পর ও ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পরও বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদ অব্যাহত ছিল।

পঞ্জাবে বৈপ্লবিক গোষ্ঠী গঠিত হয় ১৯০৭ সালে। এই বিপ্লবীদের অনেকেই আর্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ১৯১২ সালের পর কিছু মুসলমানও এই আন্দোলনে যোগদান করেন।

১৯১০ সালে হরদয়াল ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করে পঞ্জাবে বৈপ্লবিক গোষ্ঠী গড়ে তুললেন। এই কাজে তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন রাসবিহারী এবং আমিরচাঁদ। ১৯১১ সালে আমিরচাঁদ ও অন্য কয়েকজন লাহোরে বোমা বিস্ফোরণের সূত্রে গ্রেপ্তার হন। বিচারে তাঁদের ফাঁসী হয়।

তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যা করার একটা প্রচেষ্টা দিল্লীতে করা হয়েছিল।

১৯১১ সালে আমেরিকা পেঁছানোর পর হরদয়াল কতকগুলো বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে তোলেন এবং ১৯১৩ সালে সানফ্রান্সিসকোতে গদর (বিদ্রোহ) নামে একটা পত্রিকা প্রকাশ করেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরকার ১৯১৪ সালে তাকে গ্রেপ্তার করে। জামিনে তিনি মুক্ত হন এবং বরকতুল্লার সঙ্গে সুইজারল্যাণ্ড পলায়ন করেন। তিনি অন্তর্হিত হয়ে যাওয়ার পর রামচন্দ্র গদর আন্দোলনের নেতা হন।

আমেরিকাতে গদর গোষ্ঠী ইমিগ্রেশন আইনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের মধ্যে প্রচার চালাচ্ছিল। ১৯১৪ সালে বহু ভারতীয়, প্রধানতঃ শিখ ও মুসলমান যাত্রী সহ কামাগতা মারু হংকং ছেড়ে ভ্যাংকুভারের উদ্দেশে রওনা হন। জাহাজটি ভ্যাংকুভার পেঁছালে কানাডীয় সরকার যাত্রীদের অবতরণ করার অনুমতি দিল না। এর পেছনে যুক্তি ছিল এই যে যাত্রীরা কানাডার ইমিগ্রেশন আইনে যে শর্তাবলী নির্দিষ্ট আছে তা পূরণ করে নি। জাহাজটিকে জোর করে বন্দর থেকে বহিষ্কার করা হয়। জাহাজটিকে হংকংয়ের পরিবর্তে কলিকাতায় নিয়ে আসা হয়। কলিকাতাতে সরকার যাত্রীদের সরাসরি পঞ্জাব নিয়ে

যাওয়ার জন্য একটা ট্রেন মোতায়েন করে রেখেছিল। প্রায় তিন শত শিখ পঞ্জাবে যেতে চাইল না। এরপর পুলিশ গুলীবর্ষণ করলে আঠারোজন নিহত হয়। অতঃপর বহুসংখ্যক শিখকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। যারা পঞ্জাবে ফিরে গিয়েছিল তাদের মনে একটা ক্রোধ জাগরূক ছিল। এরা খুব শীঘ্রই বৈপ্লবিক কেন্দ্র গড়ে তুলল এবং জনসাধারণের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রচার চালাতে লাগল।

এই বৈপ্লবিক গোষ্ঠীগুলো ১৯১৪ এবং ১৯১৫ সালে পঞ্জাবে এমনকি অন্যান্য প্রদেশেও ব্যাপক বৈপ্লবিক ক্রিয়াকর্ম সংগঠিত করেছিল। এদের কার্য-কলাপের মধ্যে ছিল সশস্ত্র ডাকাতি, পুলিশ কর্মচারী নিধন এবং পঞ্জাব, মীরাট ও কানপুরের মতো সামরিক কেন্দ্রে সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রচার।

১৯১৫ সালে সরকার ভারতরক্ষা আইন পাশ করে। এই আইন অনুসারে কর্তৃপক্ষ যদৃচ্ছ আটক রাখার অধিকার হাতে পায়। এছাড়াও সরকার কতক-গুলো বিশেষ ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করেছিল। পরে এই ট্রাইব্যুনালের বিচারে ২০ জনের মৃত্যুদণ্ড হয়, আটান্ন জনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দেওয়া হয় এবং আটান্ন জনকে স্বল্পকালীন কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।[৬০]

এর পরে বৈপ্লবিক আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে।

গদর নেতৃবৃন্দ নিউইয়র্ক এবং সাংহাইতে অবস্থিত জার্মান দূতের সঙ্গে রাজনৈতিক যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। ১৯১৫ সালে তাঁরা রেঙ্গুনে অবস্থিত বালুচ রেজিমেণ্টে এবং সিঙ্গাপুরে অবস্থিত 5th Light Infan-tryতে বিদ্রোহ করার উৎসাহ দিয়েছিলেন। বিদ্রোহগুলো দমন করা হয়েছিল।

মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার

১৯১৮ সালে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। পরের বছরে এই রিপোর্টের ভিত্তিতে শাসনসংস্কার আইন পাশ হয়।

এই রিপোর্টে দ্বৈত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হল। এই ব্যবস্থা অনুসারে প্রাদেশিক সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়গুলো হস্তান্তরিত এবং সংরক্ষিত এই দুইভাগে ভাগ করা হয়। হস্তান্তরিত দপ্তরগুলো মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হল। এই মন্ত্রীরা নির্বাচিত আইনসভার নিকট দায়ী থাকবেন। স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি দপ্তর হস্তান্তরিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অর্থ, ভূমি রাজস্ব, পুলিশ প্রমুখ অন্যান্য দপ্তর হল সংরক্ষিত বিষয়। এগুলোর ওপর মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

শাসনসংস্কারের এই দিক সম্বন্ধে প্রধান সমালোচনার কারণ দ্বিবিধ। প্রথমত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল। 'হস্তান্তরিত' বিষয়গুলো সম্পর্কে কিছু করতে হলে যে আর্থিক সংস্থান থাকা প্রয়োজন তার ওপর মন্ত্রীদের কোনো হাত ছিল না।

এই রিপোর্টে কংগ্রেস লীগ পরিকল্পনায় উল্লিখিত কংগ্রেস ও লীগের দাবীসমূহ পূরণ হয় নি। এই দাবীগুলোর মধ্যে ছিল ভারতবর্ষে আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি প্রয়োগ করতে হবে এবং অবিলম্বে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

মুসলিম লীগ এই রিপোর্ট অগ্রাহ্য করে এবং ১৯১৮ সালে কংগ্রেস-লীগ পরিকল্পনার কথা আবার জোর দিয়ে বলতে থাকে।

১৯১৮ সালের শেষে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। অধিবেশনে এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে ভারতবর্ষকে অন্যতম প্রগতিশীল জাতি হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং প্রগতিশীল জাতি বলে ভারতবর্ষে আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি প্রয়োগ করা উচিত।

ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকারের দাবী করে দিল্লী কংগ্রেসেও একটা প্রস্তাব পাশ হয়। এতে কংগ্রেস-লীগ পরিকল্পনার উপরই জোর দেওয়া হয়েছিল।

যুদ্ধ চলাকালে এবং যুদ্ধের শেষে ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। যুদ্ধজনিত কারণে আর্থিক চাপ, মূল্যবৃদ্ধি এবং মুনাফা অর্জনের প্রচেষ্টা নিদারুণ আর্থিক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। যুদ্ধশেষে ভয়াবহ ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে প্রভূত জীবননাশ হয়েছিল।

যুদ্ধোত্তরকালে জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়াতে বিপ্লব ঘটবার ফলে শক্তিশালী Hohenzollern, Hapsburg এবং Romanoff রাজবংশসমূহের পতন ঘটে। অপরদিকে এইসব বিপ্লব এশিয়াবাসী জনসাধারণের মধ্যে প্রবল উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল। ভারতীয়সহ এশিয়াবাসী জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক রাজনৈতিক বিক্ষোভ দেখা দিল। এদের মধ্যে তিলক ও অন্যান্যদের হোমরুল আন্দোলন জনসাধারণের রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়িয়ে দিয়েছিল। গণভিত্তিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উপযুক্ত পরিস্থিতি গড়ে উঠল।

যুদ্ধশেষে ভারতরক্ষা আইন কার্যকর থাকবে না বলে ভারত সরকার ১৯১৯ সালে রাওলাট বিল আনলেন। এই বিলে শাসন বিভাগের হাতে বিনা বিচারে আটক রাখবার ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হল। সমস্ত লোক বিলটির বিরোধিতা করে। গান্ধীজী ঘোষণা করলেন যে বিলটি যদি আইনে পরিণত হয় তবে তিনি সত্যাগ্রহ করবেন। জনসাধারণের বিরোধিতা সত্ত্বেও মার্চ মাসে বিলটি আইনে পরিণত হয়।

নেতারা স্থির করলেন যে ৬ এপ্রিল এই আইনের বিরুদ্ধে নানা প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হবে। এইদিন দেশব্যাপী হরতাল, বিক্ষোভ প্রদর্শন, ধর্মঘট হল।

"এই সর্বব্যাপী উদ্দীপনার লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে অভূতপূর্ব ভ্রাতৃত্ববোধ। অবশেষে এই আন্দোলন উপলক্ষে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্ততপক্ষে নেতৃপর্যায়ে মিলন জাতীয়তাবাদী কার্যক্রমের অংগ হয়ে উঠল। এই জন-উদ্দীপনার সময়ে এমনকি নিম্নশ্রেণীর লোকেরা অন্তত একবারের মতো বিভেদ বিসম্বাদ ভুলে গেল। ভ্রাতৃত্ববোধের অভূতপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়ল। হিন্দুরা মুসলমানদের কাছ থেকে পানীয় জল গ্রহণ করল আর মুসলমানরা করল হিন্দুদের কাছ থেকে। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য হয়ে উঠল মিছিলের নীতিবাক্য যা ধ্বনি ও পতাকার শিরোনামে প্রকাশ পেতে লাগল। মসজিদের বেদী থেকে হিন্দু নেতারা ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন।" (India, 1919)

পঞ্জাবে কংগ্রেসের দুইজন নেতা সত্যপাল এবং ডাঃ কিচ্লুকে অমৃতসরের শাসন কর্তৃপক্ষ অজ্ঞাতস্থানে সরিয়ে দিল। এই খবর প্রচারিত হওয়াতে জনমনে

উত্তেজনা তীব্রতর হল। অমৃতসর, গুজরানওয়ালা এবং কেসুরে লোকে হিংসাত্মক কার্যকলাপ আরম্ভ করে দিল।

দিল্লী, কলিকাতা, বোম্বাই, আমেদাবাদ এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশেও গোলমাল শুরু হয়ে গেল। আন্দোলনকারীদের কারারুদ্ধ করে তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করে সরকার অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিল।

হাঙ্গামা শুরু হয়ে যাওয়ার দরুন গান্ধীজী সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করলেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগ ট্র্যাজেডি

অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগের শোচনীয় ঘটনাটা ঘটেছিল ১৩ এপ্রিল তারিখে। জেনারেল Dyer-এর আদেশে সৈন্যরা ওই বাগের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সভায় সমবেত নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলিবর্ষণ করেছিল। এতে প্রায় ৪০০ জন নিহত হয় এবং ১২০০ জন আহত হয়। এই ঘটনাটি আতঙ্কের শিহরণ সৃষ্টি করল।

১৫ এপ্রিল লাহোর, অমৃতসর এবং পঞ্জাবের কয়েকটা জেলাতে সামরিক আইন ঘোষণা করা হয়। সংক্ষেপে বিচার নিষ্পত্তির জন্য আদালত এবং বিশেষ ট্রাইবুনাল নিযুক্ত করা হয়। ব্যাপকহারে গ্রেপ্তার, অবরোধ ও হত্যাকাণ্ড চলতে লাগল। শাস্তিস্বরূপ বেত্রাঘাত করাও হচ্ছিল। অমৃতসরের একটা রাস্তায় লোকেদের বুকে হেঁটে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল।৬১

১১ জুন পর্যন্ত সামরিক আইন বলবৎ ছিল।

এই সময়ে কঠিন সংবাদ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে পঞ্জাবের খবর বিশেষভাবে গোপন রাখা হয়। ঘটনার আট মাস পরে জালিয়ানওয়ালাবাগের খবর ইংলণ্ডে প্রকাশ পায়।

গণদাবীর চাপে সরকার জালিয়ানওয়ালাবাগের গুলিবর্ষণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করবার জন্য হাণ্টার কমিটি নিযুক্ত করলেন। ১৯২০ সালের মার্চ মাসে কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশ পায়। প্রতিবেদনে বলা হয় যে গুলিবর্ষণ করে Dyer "গুরুতর ভ্রান্তিমূলক কাজ করেছেন, অবস্থা বিচারে এইরকম গুলিবর্ষণ করবার কোনো অবকাশই ছিল না।" ভারতবিষয়ক মন্ত্রী মণ্টেগু প্রতিবেদনে প্রকাশিত মতামত সমর্থন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে জেনারেল Dyer "সদুদ্দেশ্য এবং কর্তব্যনিষ্ঠা প্রণোদিত" হয়েই গুলিবর্ষণ করেছিলেন।

এই প্রতিবেদন জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। লোকে ডায়ার এবং অন্যান্য যেসব অফিসার খামখেয়ালীভাবে আটক করা, গুলি চালানো, বেত মারা এবং অনুরূপ উপায়ে আন্দোলন দমন করতে চাইছিল তাদের শাস্তি দাবী করছিল। কংগ্রেস ইতিমধ্যেই একটা পৃথক কমিটি নিযুক্ত করেছিল। এই কমিটির প্রতিবেদন মার্চ মাসে প্রকাশিত হয় এবং এতে সরকারের বিভিন্ন দমনশীল ক্রিয়াকলাপের বিবরণ দেওয়া হয়।

১৯১৯ সালে গণআন্দোলনের অভূতপূর্ব প্রসার ঘটে। রাজনৈতিক বিক্ষোভ প্রদর্শন, হরতাল এবং ধর্মঘট বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই প্রথম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গণভিত্তি প্রস্তুত হচ্ছিল। জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক অসন্তোষ বেড়ে যাচ্ছিল।

১৯১৯ সালের শেষদিকে অমৃতসরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। তিলক প্রত্যুত্তরমূলক (Responsive) সহযোগিতার নীতি অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশের অভিমত ছিল যে শাসনসংস্কার বাতিল করতে হবে। এই বিষয়ে মনোভাব ব্যক্ত করে গান্ধীজী বলেছিলেন যে "শাসন-সংস্কার আইন এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী ঘোষণা দেখলে বোঝা যায় যে ইংরাজরা ঐকান্তিকভাবে ভারতের প্রতি ন্যায়বিচারে আগ্রহী। এরপর এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়। সুতরাং শাসনসংস্কারের কঠোর সমালোচনা না করে শাসনসংস্কার যাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় শান্তভাবে তার জন্যে চেষ্টা করা কর্তব্য।"৬২

অমৃতসর কংগ্রেসে একটা আপসমূলক প্রস্তাব পাশ হয়। এতে বলা হল যে 'শাসনসংস্কার আইন অসম্পূর্ণ, অসন্তোষজনক এবং হতাশাব্যাঞ্জক।...কংগ্রেস জোর দিয়ে বলছে যে আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি অনুসারে ভারতবর্ষে পুরোপুরি দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য পার্লামেন্টের খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করা উচিত···'।

'অসন্তোষজনক সংস্কার আইন' ও রাওলাট আইন প্রণয়ন এবং পঞ্জাবে সামরিক শাসন ও সরকারের পীড়নমূলক নীতির ফলে যে উত্তেজনা সঞ্চার হয়েছিল সেটা ১৯২০ সালে খিলাফৎ সমস্যার দরুন তীব্র হয়ে উঠল। Treaty of Sevres অনুসারে মুসলমান রাষ্ট্র তুরস্কের হাত থেকে তার নিজস্ব ভূখণ্ডের অন্তর্গত সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, আরব এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যের অপরাপর এশীয় অঞ্চল বার করে নেওয়া হয়। ভারতীয় মুসলমানরা এই চুক্তির ফলে রুষ্ট হয়। তাদের কথা হল যে মুসলমানদের তীর্থস্থানসমূহ এইসব ভূখণ্ডে অবস্থিত বলে এগুলো তুরস্কের সুলতান, যিনি সমগ্র মুসলমান জাতির ধর্মগুরু, তাঁর অধিকারভুক্ত থাকবে।

গান্ধী এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা খিলাফৎ সমস্যা সমর্থন করেছিলেন এবং মহম্মদ আলি এবং সৌকত আলির সঙ্গে একজোট হয়ে দেশে একটা শক্তিশালী খিলাফৎ আন্দোলন সংগঠিত করেছিল।

Treaty of Sevres-এর শর্তাবলী ১৯২০-র মে মাসে প্রকাশিত হয়। জুন মাসে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন দলের অধিবেশনে গান্ধী এবং অন্যান্য বিখ্যাত কংগ্রেস নেতাদের নিয়ে একটা কমিটি গঠিত হয়েছিল একটা কাজের পরিকল্পনা রূপায়িত করার জন্য।

খিলাফৎ সমস্যা মুসলমানদের জাতীয় আন্দোলনের কক্ষপথে এনেছিল। 'খিলাফৎ সংক্রান্ত এবং পঞ্জাব সংক্রান্ত অপকর্মসমূহ এবং অসন্তোষজনক শাসনসংস্কারের অদৃশ্য প্রবাহ এই "ত্রিবেণী" জাতীয় ক্ষোভকে আকারে এবং প্রকারে উভয়দিক থেকেই বাড়িয়ে তুলেছিল। সমগ্র পরিস্থিতি অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে উপযোগী হয়ে উঠেছিল।'৬৩

অহিংস অসহযোগ প্রচারের ব্যাপারে তিলক উৎসাহী ছিলেন না। অবশ্য তিনি এতে বিরোধিতা করা বা 'বাধা দেন নি।'৬৪

১৯২০ সালের ১ আগস্ট তিলকের মৃত্যু হয়।

গান্ধী এবং গান্ধীবাদের যুগ

অসহযোগ আন্দোলন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরবর্তী অধ্যায়ের সূচনা নির্দেশ করল।

নেতা হিসাবে গান্ধীজী ছিলেন অনন্যসাধারণ। গান্ধীবাদ হল আন্দোলনের এই পর্যায়ের প্রধান ভাবাদর্শ।

ভারতের তৎকালীন রাজনীতি গান্ধীজীর বিরাট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গান্ধীজীর অবদান অতুলনীয়।

গান্ধীজীই প্রথম জাতীয় নেতা যিনি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে জনগণের এবং গণপ্রতিরোধের ভূমিকা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। গণপ্রতিরোধ ভিন্ন জাতীয় সংগ্রাম বেশী ফলপ্রসূ হতে পারে না। গান্ধীজীর পূর্ববর্তী জাতীয় নেতারা এটা বুঝতে পারেন নি।

গান্ধীজী এমনভাবে সংগ্রামের কার্যক্রম স্থির করলেন যাতে জনসাধারণ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে একত্র হতে পারে, জনসাধারণের বিভিন্ন গোষ্ঠী যথা শ্রমিক, কৃষক, পুঁজিবাদী, ছাত্র, আইনজীবী এবং অন্যান্য বৃত্তিজীবী গোষ্ঠীসমূহ এবং সর্বোপরি মহিলারা যেন সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে যোগদান করতে পারেন। গান্ধীজীর মতাদর্শের প্রভাবে ভারতীয় আন্দোলন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল একথা ঠিক। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে একত্রিত করে গান্ধীজীই আন্দোলনকে গণআন্দোলনে রূপান্তরিত করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ভারতীয় জনসাধারণ হয়ে উঠেছিলেন বীর্যবান, দেশপ্রেমিক এবং জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নির্ভীক সৈনিক। দেশবাসী দলে দলে কারাবরণ করেছিল এবং নির্ভীকভাবে সাম্রাজ্যবাদী পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনীর নৃশংস লাঠিচালনা ও বন্দুকের সম্মুখীন হয়েছিল। গান্ধীজী আপস করেছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরই প্রভাবে জনসাধারণের মনে একদিকে "শয়তানস্বরূপ" ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল ঘৃণা সঞ্চার হয়েছিল অন্যদিকে জেগেছিল স্বরাজলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

ভূমিরাজস্ব বন্ধ করে দিয়ে সরকারের আর্থিক বুনিয়াদ পংগু করে দেবার জন্য গান্ধীজী কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে পাশ করে ছাত্ররা শাসনবিভাগে নিযুক্ত হতো। গান্ধীজী ছাত্রদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জন করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বিচার বিভাগ অচল করে দেবার উদ্দেশ্যে তিনি আইনজীবীদের আদালত পরিত্যাগ করবার জন্য আহ্বান জানান। তিনি মহিলাদের মদ এবং বিদেশী বস্ত্রের দোকান অবরোধ করতে আহ্বান করেছিলেন। হাজার হাজার মহিলা তাঁর নির্দেশ পালন করে কারাবরণ করেছিলেন। গান্ধীজী জনসাধারণকে সরকার প্রবর্তিত "অবৈধ আইনসমূহ" অমান্য করবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর আহ্বানে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় মহিলা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং নিরবচ্ছিন্ন বুলেট ও লাঠিচার্জের মধ্যেও বেআইনী সমাবেশে সমবেত হয়েছিল।

এ এক অভূতপূর্ব দৃশ্য ! যে মহিলারা শত শত বৎসর ধরে কর্তৃত্বপরায়ণ সামাজিক প্রথার নিগড়ে সংকীর্ণ গার্হস্থ্য জীবনে আবদ্ধ হয়ে ক্রীতদাসের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েছিলেন সেই মহিলারাই প্রকাশ্য রাস্তায় বেরিয়ে এলেন এবং পুরুষ সহযোগীদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে বেআইনী রাজনৈতিক সভা-সমাবেশে যোগ দিতে লাগলেন।

পূর্ববর্তী পর্যায়ের মতো বয়কট ও স্বদেশী পদ্ধতি প্রয়োগ করে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে গান্ধী নতুন ও আরো বেশী কার্যকরী সংগ্রাম পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের ক্ষেত্রে গান্ধীজী কর্তৃক উদ্ভাবিত অস্ত্রসম্ভার হিসাবে উল্লেখ করা যায় ব্যক্তিগত ও গণ উভয় পর্যায়ে সত্যাগ্রহ, অসহযোগ, আইন অমান্য এবং কর বন্ধ, খোলাখুলিভাবে আইন অমান্য, স্বেচ্ছায় কারাবরণ, গণবিক্ষোভ ও গণপদযাত্রা, অনশন ধর্মঘট।

শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রেও গান্ধীর বিপুল অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর মনে ছিল সুগভীর মানবতাবোধ। সমাজজীবনের সর্বস্তরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করেছেন। স্মরণাতীত কাল থেকে হিন্দুসমাজের সবথেকে নিপীড়িত গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অমানুষিক অস্পৃশ্যতা প্রথার ঘোরতর অপরাধ ঘটে এসেছে। জ্বলন্ত নৈতিক ক্রোধে উদ্দীপ্ত গান্ধী এই প্রথার বিরুদ্ধে ধিক্কার দিয়েছেন। অত্যন্ত অমানুষিক এই প্রথা বিলোপ করবার জন্য তিনি আপ্রাণ সংগ্রাম করেছিলেন। এমনকি এই সংগ্রাম তাঁর রাজনৈতিক কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবেও গণ্য হয়েছিল।

"গান্ধী উচ্চতর শ্রেণীভুক্ত হিন্দুদের কাছে নৈতিক আবেদন করেছিলেন এবং এই সুপ্রাচীন অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের বিবেক উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। চিরায়ত ধরনের জাতীয়তাবাদী ছিলেন বলে গান্ধী মনেপ্রাণে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছিলেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সাম্প্রদায়িকতাকেই জাতীয়তাবিরোধী ও মানবতাবিরোধী বলে মনে করতেন এবং অক্লান্তভাবে উভয়ের বিরুদ্ধেই প্রতিরোধ চালিয়েছিলেন। এমনকি পরিশেষে গান্ধী "ভারতীয় জনসাধারণের সামাজিক সাম্প্রদায়িকতা উচ্ছেদের জন্য নিজের প্রাণ জীবন্ত আহুতিরূপে উৎসর্গ করে গেছেন।"

গান্ধীজীর আগ্রহ ছিল সর্বতোমুখী এবং ভারতীয় জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা ব্যাপ্ত ছিল। এমনকি ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তিনি আগ্রহী ছিলেন। মাতৃভাষা গুজরাতীকে গান্ধী সমৃদ্ধ করেছিলেন। হিন্দীকে তিনি জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন এবং দেশের বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের ওপর তিনি প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

তাঁর বহুমুখী জাতীয় পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য গান্ধী স্বয়ং আত্মত্যাগী, একাগ্র, কর্মীবাহিনী তৈরীর জন্য শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন এবং অন্যদের অনুরূপ কেন্দ্র স্থাপন করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তিনি বহুসংখ্যক সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। এইসব প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ গান্ধীবাদের নীতি অনুসারে এবং স্বয়ং গান্ধীকর্তৃক বিস্তারিত কার্যক্রম পরিচালনা করতেন।

অসহযোগ আন্দোলন

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে অহিংস অসহযোগের কার্যক্রম গ্রহণ করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইতিপূর্বে তিনি এইরকম সংগ্রামে পূর্বতন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন বলে গান্ধীজীকে এই আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। পঞ্জাব এবং খিলাফৎ প্রসঙ্গে যে অন্যায় করা হয়েছিল তার প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত হয়।

গান্ধীজী নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক নীতির ওপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। এইভাবে তিনি রাজনীতির মধ্যে ধর্ম ঢুকিয়ে ছিলেন। ফলে রাজনীতি ধর্মভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল এবং পরে তা অধ্যাত্মবাদ হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় জনসাধারণের আধ্যাত্মিক শক্তি বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের নীতি এবং কার্যক্রম নির্ধারণ করতেন। তিনি প্রায়ই "আত্মার শক্তি" বিমূর্ত "সত্য" (সত্য বলতে কি বোঝায় সেটা কখনো স্পষ্ট করেন নি) ও রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীর মনে নৈতিক শুভ-বুদ্ধি সঞ্চারের কথা বলতেন। রাজনৈতিক কার্যক্রম যদি বাস্তব ঘটনার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পরিবর্তে বিমূর্ত এমনকি অস্পষ্ট ধর্মীয় নীতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় তবে তাতে সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য, নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং যুক্তি-সংগত পদ্ধতি থাকে না।

জনসাধারণ কংগ্রেসের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। অধিকাংশ ভোটদাতাই ১৯২০ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভোট দেয় নি। ছাত্ররা স্বেচ্ছায় সরে আসাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অবশ্য আদালত বর্জনের সিদ্ধান্ত বিশেষ কার্যকর হয় নি।

এই সময়ে স্বাধীন জাতীয় ভাবধারার ভিত্তিতে আলিগড়ের জাতীয় মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়, গুজরাট বিদ্যাপীঠ, তিলক মহারাষ্ট্র বিদ্যাপীঠ, বাংলার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, কাশী বিদ্যাপীঠ, বিহার বিদ্যাপীঠের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়।

১৯২০ সালের ডিসেম্বরে নাগপুরে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে অসহযোগ কার্যক্রম বিনা প্রতিবাদে গৃহীত হয়। এতাবৎ রাজনৈতিক আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল সাংবিধানিক পদ্ধতিতে সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন অর্জন করা তার পরিবর্তে নতুন নক্ষ্য হল 'শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়ে স্বরাজ অর্জন।'

ঠিক হয়েছিল যে অসহযোগ আইন যদি কার্যকরী না হয় তবে গণ আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা হবে। আইন অমান্য সম্পর্কে কোনো কার্যক্রম এমনকি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যও কিছু স্থির ছিল না।

"কিন্তু গণ আইন অমান্য আন্দোলনই জনসাধারণকে প্রলোভিত করেছিল। এটা কি ছিল, কি হবে ? গান্ধীজী নিজেও তা পরিষ্কার করে কখনো ব্যাখ্যা করেন নি, বিস্তারিত করে বলেন নি। গান্ধীর নিজের কাছেও জিনিসটা পরিষ্কার ছিল না। দ্রষ্টার মনশ্চক্ষে, নিষ্কলঙ্ক মানুষের হৃদয়ে গণ আইন অমান্যের কথা ধীরে ধীরে পদে পদে পরিস্ফুট হবে।"৬৫

কংগ্রেসের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন ছাড়াও দেশে আরও অনেক সংগ্রাম আরম্ভ হয়ে গেল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আসাম-বাংলা রেলওয়ে শ্রমিকদের ধর্মঘট, মেদিনীপুর জেলায় কৃষকদের কর বন্ধ আন্দোলন, মালাবারে মোপলা বিদ্রোহ এবং পঞ্জাবে মহান্তদের বিরুদ্ধে আকালীদের সংগ্রাম ইত্যাদি।

১৯২১ সালের ৫ নভেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটি এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সভায় প্রত্যেকটি প্রাদেশিক কমিটিকে নিজ দায়িত্বে এবং নিজ নিজ অঞ্চলের পরিস্থিতি অনুসারে কর্মপদ্ধতি স্থির করে কর বন্ধ আন্দোলন সহ আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। তবে আন্দোলনে যোগদানের কয়েকটা শর্ত নির্দেশ করা হয়েছিল। যোগদানেচ্ছু ব্যক্তি শর্তগুলো পূরণ করলে তবেই আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

এই সময়েই ব্রিটিশ সরকার প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স-এর ভারত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করেছিলেন। কংগ্রেস এই পরিদর্শন সংক্রান্ত সমস্ত অনুষ্ঠান বর্জন করবার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানায়। ১৭ নভেম্বর প্রিন্স ভারতে পদার্পণ করেন। এইদিন দেশব্যাপী হরতাল এবং বিক্ষোভ হয়। বেশ কয়েকটা স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ হয়ে গেল। বোম্বাইতে প্রায় চারদিন ধরে দাঙ্গা চলে। পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। মোট ৫৩ জন নিহত হয় এবং ৪০০ জন আহত হয়।

হিংসার প্রসার দেখে গান্ধীজী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন স্বরাজে পচন ধরেছে।

জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠল। কংগ্রেস এবং খিলাফৎ স্বেচ্ছাসেবীরা বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং আরম্ভ করল এবং হরতাল করতে লাগল। এমনকি সংগঠনগুলো অবৈধ বলে ঘোষিত হওয়ার পরও তারা তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিল এবং দলে দলে গ্রেপ্তার হচ্ছিল।

এই বছর শেষ হওয়ার আগেই সরকার সি আর দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, লালা লাজপত রায় এবং আলি ভ্রাতৃদ্বয় সহ আন্দোলনের প্রায় সব বড় নেতাদেরই কারারুদ্ধ করেন। একমাত্র গান্ধীজী মুক্ত ছিলেন।

এই বছরের শেষে যখন সি আর দাশের অনুপস্থিতিতে (সি আর দাশই নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন, কিন্তু তখন তিনি জেলে) হাকিম আজমল খানের সভাপতিত্বে আমেদাবাদে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় এই অধিবেশনে গৃহীত মুখ্য প্রস্তাবে এই কথা বলা হয় :

'...কংগ্রেসকে এই কথা বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত পঞ্জাব ও খিলাফৎ সংক্রান্ত অন্যায়ের প্রতিকার না হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত না হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত দায়িত্ববোধহীন সংগঠনের হাত থেকে ভারতে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব দেশের জনসাধারণের হাতে না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত অহিংস অসহযোগ আন্দোলন প্রবলতরভাবে চালাতে হবে।

'আঠারো এবং তার বেশী বয়সের প্রত্যেকটি ব্যক্তি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে যোগ দেবে বলে কংগ্রেসের বিশ্বাস।

কংগ্রেসের ধারণা এই যে উপযুক্ত রক্ষাব্যবস্থাসহ ব্যক্তিগত বা গণভিত্তিক আইন অমান্য আন্দোলনে মনোসন্নিবেশ করবার জন্য যেখানে যতখানি প্রয়োজন সেইমত কংগ্রেসের অন্যসব কাজ স্থগিত রাখতে হবে।

'এই কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীকে একমাত্র কর্মকর্তা হিসাবে সর্ববিধ ক্ষমতা অর্পণ করছে।'

এই অধিবেশনে কংগ্রেসের বিশিষ্ট মুসলমান নেতা মৌলানা হজরত মোহানী স্বরাজের রাজনৈতিক তাৎপর্য স্পষ্টরূপে নির্ধারণ করতে চাইলেন। তিনি বললেন যে স্বরাজের ব্যাখ্যা হল "সর্বপ্রকার বিদেশী নিয়ন্ত্রণমুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা" গান্ধী অবশ্য এই ব্যাখ্যার বিরোধিতা করেন। তিনি বললেন, "আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ যে চাপল্যের সঙ্গে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন তাতে আমি ক্ষুব্ধ। এতে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা প্রকাশ পাচ্ছে দেখে আমি ক্ষুব্ধ না হয়ে পারছি না।"৬৬

আমেদাবাদ কংগ্রেসে কর বন্ধ করবার প্রস্তাব বাদ দেওয়া হয়। লর্ড রিডিং একে সুলক্ষণ বলে বিবেচনা করেছিলেন।

"ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে আমেদাবাদ কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বোম্বাইয়ের দাঙ্গা গান্ধীজীকে খুব নাড়া দিয়েছে···দাঙ্গা দেখে তিনি গণ আইন অমান্য আন্দোলনের বিপদ উপলব্ধি করতে পেরেছেন, কংগ্রেসের প্রস্তাবে এর প্রমাণ আছে···দিল্লী শর্তাবলী পূরণের পর আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা হবে। এ কথা থাকলেও প্রস্তাবে কর বন্ধের উল্লেখ করা হয় নি।"৬৭

১৯২২ সালের জানুয়ারীর মাঝামাঝি এম্ বিশ্বেশ্বরায়ের সভাপতিত্বে জিন্না, জয়কর এবং অন্যান্যদের উপস্থিতিতে সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গান্ধী এই সম্মেলনে যোগ দেন এবং কংগ্রেসের বক্তব্য বুঝিয়ে বলেন। এই সম্মেলনে সরকারের দমনশীল নীতির নিন্দা করা হয়। এই সম্মেলন ভাইসুরয়দের সঙ্গে আলোচনা চলাকালীন সময়ে আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখবার জন্য কংগ্রেসকে পরামর্শ দেয়। এছাড়া এই সম্মেলনে খিলাফৎ, পঞ্জাব এবং স্বরাজের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে গোলটেবিল বৈঠক আহ্বানের প্রস্তাব করা হয়।

১৭ জানুয়ারী কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি আইন অমান্য আন্দোলন ঐ মাসের শেষ পর্যন্ত স্থগিত রাখবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

ভাইসুরয় কিন্তু সর্বদলীয় সম্মেলনের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না। ফলস্বরূপ গান্ধী ১ ফেব্রুয়ারী বড়লাটকে জানিয়ে দিলেন যে তিনি গুজরাটের বরদৌলি জেলায় আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ফেব্রুয়ারী মাসের ৫ তারিখে সংযুক্ত প্রদেশের চৌরিচৌরাতে একটা ভয়ানক হিংসাত্মক ঘটনা ঘটল। একদল লোক প্রধানতঃ কৃষক একটা পুলিশ থানা আক্রমণ করে এবং তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এর ফলে বাইশ জন পুলিশ কর্মীর মৃত্যু ঘটে। গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলনের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করা স্থির করলেন। তিনি ১২ ফেব্রুয়ারী বারদৌলিতে ওয়ার্কিং কমিটির একটা বৈঠক ডাকলেন। এই বৈঠকে প্রস্তাব গ্রহণ করে বলা হয় যে, "চৌরিচৌরাতে জনতার অমানুষিক ব্যবহারের" জন্য আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখা

হল। প্রস্তাবে আরও বলা হল যে, "ওয়ার্কিং কমিটি সমস্ত কংগ্রেস কর্মী ও সংগঠনসমূহকে এই পরামর্শ দিচ্ছেন যে তাঁরা যেন কৃষকদের অবহিত করেন যে জমিদারের খাজনা বন্ধ করা কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবসমূহের পরিপন্থী এবং দেশের স্বার্থের পক্ষে হানিকর।" প্রস্তাবে জমিদারদের এই আশ্বাসও দেওয়া হয়েছিল যে "কংগ্রেস আন্দোলন কোনোভাবেই তাঁদের আইনগত অধিকার ক্ষুন্ন করতে চায় না। এমনকি যেক্ষেত্রে রায়তদের অভাব অভিযোগ আছে সেক্ষেত্রেও কমিটি চায় যে পারস্পরিক আলোচনা এবং সালিসের মাধ্যমে প্রতিকারের উপায় বের করতে হবে। এই প্রস্তাব থেকে বোঝা যায় যে গান্ধী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা জমিদারদের মৌলিক অধিকার রক্ষা করতে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন।

ওয়ার্কিং কমিটি 'গঠনমূলক কার্যক্রম' গ্রহণ করল। চরকা প্রচলন, মাদক বর্জন, জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন এই কার্যক্রমের অন্তর্গত।

কংগ্রেসের অনেক নেতা তখন কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁরা বরদৌলি প্রস্তাবে তীব্র অসন্তোষ জ্ঞাপন করেন। "জনগণের উদ্দীপনা যখন ফেটে পড়ার উপক্রম হয়েছে সেই সময় পিছু হটে যাওয়ার আদেশ জাতীয় বিপর্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়। দেশবন্ধু দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এবং লালা লাজপত রায় প্রমুখ মহাত্মার প্রধান সহকারীবৃন্দ তখন জেলে বন্দী। এঁরা সকলেই প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। সেই সময় দেশবন্ধুকে দেখে আমি বুঝতে পারছিলাম যে রাগে দুঃখে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েছেন।"৬৮

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, লালা লাজপত রায় এই সিদ্ধান্তে আপত্তি জ্ঞাপন করে গান্ধীজীকে কারাগার থেকে চিঠি দিয়েছিলেন। "একটা জায়গায় যে অপরাধ ঘটেছে তার জন্য সমগ্র দেশের ওপর দণ্ডবিধান করবার দায়ে তাঁরা গান্ধীজীকে অভিযুক্ত করেছিলেন। পণ্ডিতজী প্রশ্ন করেন কন্যাকুমারিকার একটা গ্রাম অহিংস নীতি পালনে ব্যর্থ হলে হিমালয়ের পাদদেশের একটা শহর কেন দণ্ড পাবে ?"৬৯

মার্চের ১৩ তারিখে স্বয়ং গান্ধীজী রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার হন, বিচারে তাঁর ছয় বৎসরের কারাদণ্ড হয়। দণ্ডকালের দুই বছর শেষ হবার আগেই তিনি মুক্ত হন।

আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলে ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পর্কে সরকারের মনোভাব জানা যাবে ভারত সচিবের কাছে পাঠানো বড়লাটের Telegraphic correspondence regarding the situation in India, 9 February, Cmd, 1586, 1922-এর নিম্নলিখিত অংশে :

"শহরে নিম্নশ্রেণীভুক্ত লোকেরা অসহযোগ আন্দোলনে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে। কোনো কোনো অঞ্চলে বিশেষ করে আসাম উপত্যকা, সংযুক্ত প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা এবং বাংলায় কৃষকসমাজ খুব প্রভাবিত হয়েছে। পঞ্জাবে অকালী আন্দোলন গ্রামীণ শিখদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। দেশব্যাপী মুসলমান জনসাধারণের অধিকাংশই তিক্ত এবং রুষ্ট হয়ে আছে... মারাত্মক পরিণতির সম্ভাবনা... ভারত সরকার পূর্বাপেক্ষা ভয়ানক বিশৃঙ্খলার জন্য প্রস্তুত। অবস্থা যে অত্যন্ত উদ্বেগজনক তাতে কোনো সন্দেহই নেই।"

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার এবং তার ফল

বরদৌলি সিদ্ধান্তের ফলে অসহযোগ আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটল। অসহযোগ আন্দোলন প্রধানত গণভিত্তিক আন্দোলন। এইটাই আগেকার আন্দোলনের তুলনায় অসহযোগ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যের কারণ। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন উচ্চ এবং মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যেই সীমিত ছিল। শ্রমিক এবং কৃষকদের কিয়দংশ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। ফলে অসহযোগ আন্দোলনের সময়েই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সর্বপ্রথম গণ-ভিত্তিক হয়ে উঠেছিল। শ্রমিকদের এবং কৃষকদের কিন্তু তখনো পর্যন্ত এমন কোনো সুস্পষ্ট শ্রেণী অথবা গোষ্ঠীসচেতনতা গড়ে ওঠে নি যাতে তারা স্বাধীন রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, নিজস্ব শ্রেণী-নেতৃত্ব, কার্যক্রম এমনকি পতাকা উদ্ভাবন করতে পারে এবং নিজেদের জোরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগদান করতে পারে। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে তারা কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্বই মেনে চলছিল। বরদৌলি প্রস্তাব পড়লে বেশ বোঝা যায় যে কংগ্রেস নেতৃত্ব জমিদারদের মত কায়েমী স্বার্থের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল এবং এইসব কায়েমী স্বার্থের হানি ঘটতে পারে এমন যেকোনো গণ আন্দোলন সম্পর্কে নেতৃত্বের মনে আশংকা ছিল।

লাজপত রায়, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, সুভাষ বোসের মতন নেতাদের ধারণা হয়েছিল যে গান্ধীর ভ্রান্ত রণকৌশলের ফলেই আন্দোলন নষ্ট হয়ে গেল, একথা আগেই বলেছি।

ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত প্রশ্ন ছাড়া জনসাধারণের অন্য কোনো সুস্পষ্ট আর্থিক দাবী যেমন শ্রমিকদের বর্ধিত মজুরী, শ্রমিকদের জন্য সামাজিক আইন, কৃষকদের খাজনা এবং ঋণ হ্রাস প্রভৃতি এই আন্দোলনের কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। জনগণের রাজনৈতিক অসন্তোষের মূলে নিহিত রয়েছে তাদের আর্থিক পরিস্থিতি কোনো বিমূর্ত জাতীয়তাবাদের চেতনা নয়—এই কথাটা নেতারা ভেবে দেখেন নি।

যুদ্ধের সময় শিল্প বিস্তারের সুযোগে শিল্পনির্ভর বুর্জোয়ারা আর্থিক শক্তি সঞ্চয় করেছিল। এরা অসহযোগ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিল এবং এই আন্দোলন সমর্থন করেছিল। এই সময় থেকে শিল্পনির্ভর বুর্জোয়ারা কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নীতি এবং কার্যক্রমের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। কংগ্রেসের অনেক সিদ্ধান্তই এই প্রভাবের ফল।

বরদৌলি সিদ্ধান্তের পর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের মৈত্রীর অবসান ঘটল। আন্দোলনের সময় যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য গড়ে উঠেছিল তাও ভেঙে পড়তে লাগল।

স্বরাজ দল গঠন

আইনসভায় যোগ দেবার কার্যক্রম নিয়ে স্বরাজ দল ১৯২৩ সালে গঠিত হয়। ইতিমধ্যে কারামুক্ত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, বিঠলভাই প্যাটেল এই দলের বিশিষ্ট নেতা ছিলেন।

স্বরাজ দলের লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই ডোমিনিয়নের মর্যাদা অর্জন করা। পুঁজিবাদ ও জমিদারী প্রথা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই দলের কার্যক্রমে বলা হয় যে, "ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্বীকৃত এবং রক্ষিত হবে"। স্বরাজ দল ঘোষণা করে যে পুঁজিপতির শোষণ থেকে শ্রমিকদের রক্ষা করবে এবং অপরদিকে শ্রমিকদের অন্যায্য দাবী থেকে পুঁজিকে বাঁচাবে। "একদিকে আমরা সংগঠন এমনভাবে গড়ব যাতে শ্রমিকদের ওপর পুঁজিপতি এবং জমিদারদের শোষণ বন্ধ করা যায় অন্যদিকে এটাও দেখতে হবে যে যদৃচ্ছ ও অযৌক্তিক দাবীদাওয়া তুলে এইসব সংগঠন নিজেরাই পীড়ন শুরু করে না দেয়। নিঃসন্দেহে শ্রমিকদের রক্ষা করা দরকার তবে অনুরূপভাবে শিল্পপতিদেরও রক্ষা করা প্রয়োজন।"৭০ স্বরাজীরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শ্রেণীসমন্বয় এবং শ্রমিক ও পুঁজির স্বার্থ সমতুল্য বলে স্বীকার করে নিয়েছিল।

স্বরাজ দল রাজনৈতিক কার্যকলাপ আইনসভার অভ্যন্তরে স্থানান্তরিত করল। কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্যক্রম এই দলের মনঃপূত ছিল না। স্বরাজ পার্টি প্রথমে বলেছিল যে আইনসভার ভেতরে গিয়ে আইনসভা পঙ্গু করে দেওয়াই হবে দলের নীতি। কিন্তু স্বরাজ পার্টির নীতি বেশ বদলে গেল। স্বরাজীরা ১৯২৪ সালে সরকারের Steel Protection Committee এবং ১৯২৫ সালে Skeen Committeeর সদস্য হিসাবে কাজ করেন। আদিতে নীতি ছিল "ভেতর থেকে আইনসভা পঙ্গু করে দিতে হবে।" ক্রমান্বয়ে এই নীতি পরিত্যাগ করে স্বরাজীরা আইনসভার কার্যক্রমে যোগ দিতে লাগলেন। আইনসভা দিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে লাগলেন। এমনকি সরকারের সংগে সহযোগিতা করতেও এঁদের দ্বিধা ছিল না।৭১

১৯২৪ সালে কেন্দ্রীয় আইনসভায় স্বরাজ দল Steel Protection Bill-এর পক্ষে ভোট দিলেন। বিলে টাটা স্টীল কোম্পানীকে একটা অনুদান দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু শিল্প শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য কোনো ব্যবস্থাই ছিল না।

১৯২৫ সালে স্বরাজ দলের সবচেয়ে বেশী শক্তি বৃদ্ধি হয়। এই সময়ে কংগ্রেসের রাজনৈতিক কার্যাবলীর সমস্ত দায়িত্ব স্বরাজ পার্টির ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিল।

স্বরাজ দল ভারতীয় বুর্জোয়ার সাংবিধানিক দল হয়ে উঠল। গণ-জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ভাটা পড়বার পর ভারতীয় বুর্জোয়া অবাধ শিল্পোন্নয়ন, ভারী শিল্প বিস্তার সম্বলিত শ্রেণীগত কার্যক্রম প্রচলিত করবার উদ্দেশ্যে আইনসভাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছিল।

সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বিস্তার

এ বিষয়ে আলোচনা আরও বেশী এগোনোর আগে অসহযোগ আন্দোলনের পরবর্তী সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এবং বিরোধ বিস্তারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া উচিত। আন্দোলনের সময়ে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য দেখা গিয়েছিল এমনকি এই সময়ে উভয় সম্প্রদায় যুক্তভাবে ব্যাপক আন্দোলনও করেছে। যাহোক, আন্দোলন শেষ হলে বিপরীত প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হল। উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি-

ক্রিয়াশীল লোকেরা এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষের মনোভাব সৃষ্টি করতে লাগল। মুসলিম লীগ এবং হিন্দু মহাসভা উভয়েই বিরোধমূলক সাম্প্রদায়িক প্রচার চালাতে লাগল। এর ফলে জাতীয় একতা এবং জাতিসচেতনতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

এই দুইটি সাম্প্রদায়িক দলই নিজ সম্প্রদায়ের জমিদার এবং প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থপরায়ণ লোকেদের দ্বারা পরিচালিত হতো। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেছেন, 'হিন্দু এবং মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার কোনোটাই যথার্থ সাম্প্রদায়িকতা নয়। সাম্প্রদায়িকতার মুখোশের আড়ালে রয়েছে রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রতিক্রিয়া।'৭২

অসহযোগ আন্দোলনের পরে পরপর বেশ কয়েকটা সাম্প্রদায়িক হাংগামা ঘটেছিল। ১৯২৪ সালে দিল্লী, গুলবার্গ, নাগপুর, লক্ষ্ণৌ, শাহাজাহানপুর, এলাহাবাদ, জব্বলপুর ও কোহাটে এবং ১৯২৫ সালে দিল্লী, কলিকাতা এবং এলাহাবাদে ও অন্য কয়েকটা জায়গায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঘটেছিল। এর পরের কয়েক বছরেও বিভিন্ন পর্যায়ে দেশে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঘটতে থাকে।

সমাজতন্ত্রী এবং সাম্যবাদী ধারণার বিস্তার

অসহযোগ আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে দূরপ্রসারী, তাৎপর্যময় আরও কতকগুলো ঘটনা ঘটেছিল। এই সময় ভারতে সমাজতন্ত্রী এবং সাম্যবাদী গোষ্ঠীর বিস্তার এবং শ্রমিক-শ্রেণীর স্বাধীন আর্থিক এবং রাজনৈতিক শ্রেণী সংগঠনের উদ্ভব হয়।

রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয় এবং সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে ভারতবর্ষের আমূল পরিবর্তনাকাঙ্ক্ষী জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে সমাজতন্ত্রী এবং সাম্যবাদী মতবাদে আগ্রহ সঞ্চার হয়। এদের (Radical) মধ্যে একটি গোষ্ঠী গান্ধীবাদী মতাদর্শ ও গান্ধীর গঠনমূলক কার্যক্রম এবং স্বরাজ দলের সাংবিধানিকতা কোনোটাই মেনে নিতে পারে নি। সমাজতন্ত্রী মতাদর্শ চর্চা করে এবং সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাস স্থাপন করে এরা নতুন মতবাদের ভিত্তিতে ভারতীয় স্বাধীনতার বিকল্প পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে লাগল। ১৯২৩ সালে এস. এ. ডাঙ্গে The Socialist নামে ভারতবর্ষের প্রথম সমাজতন্ত্রবাদী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯২৪ সালে সরকার ডাঙ্গে, মুজফ্ফর আহমদ ও অন্যান্য কয়েকজনকে চক্রান্তের অভিযোগে গ্রেপ্তার করেন। এইটাই কানপুর চক্রান্ত বলে খ্যাত। এর বিচারে অভিযুক্তদের প্রত্যেকের চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। সমাজতন্ত্রী মতবাদের প্রসার অত্যন্ত স্বল্প ব্যাপ্তিতে হলেও ভারতবর্ষে একটা নতুন ঘটনা।

এরপর আমূল পরিবর্তনপন্থী তরুণদের মধ্যে সমাজতন্ত্রী মতবাদ বিস্তারলাভ করতে লাগল। বোম্বাই, বাংলাদেশ এবং পঞ্জাবে শ্রমিক ও কৃষকদের দল গড়ে উঠল। এই দলগুলো জাতীয় স্বাধীনতার কার্যক্রম জনপ্রিয় করে তুলল। সমাজতন্ত্রবাদী দলগুলো শ্রমিক ও কৃষকদের আর্থিক ও রাজনৈতিক দাবীদাওয়া তুলে ধরত এবং শ্রেণীগত দাবীদাওয়ার জন্য তাদের শ্রেণীভিত্তিতে সংগঠিত

করত। তারা আবার স্বাধীনতা অর্জনের পদ্ধতি হিসাবে কৃষকদের ও শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পক্ষপাতী ছিল।

শ্রমিক ও কৃষকদের দলসমূহ ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তুলেছিল। দেশে বেশ কয়েকটা ধর্মঘটও তারা সংগঠিত করেছিল। বোম্বের দল ১৯২৮ সালে গিরনি কামগার ইউনিয়ন স্থাপন করে। এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৬৫০০০।

১৯২৮ সালে বোম্বাই সুতাকলের ধর্মঘট, বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে ধর্মঘট, সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ধর্মঘট প্রভৃতি বেশ কয়েকটা ধর্মঘট হয়। প্রধানতঃ এইসব দলের লোকেরাই ধর্মঘটগুলো সংগঠিত ও পরিচালনা করেন।

এই সময়েই ইংলণ্ডের সুসংগঠিত ট্রেড ইউনিয়নসমূহ এবং সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী দলসমূহ ভারতের বর্ধমান শ্রমিক আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সহায়তা করার জন্য কয়েকজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন Fenner Brockway, Spratt ও Ben Bradley. পরে Spratt এবং Bradleyকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাদের বিচার হয়। ১৯২৯ সালে মীরাট ষড়যন্ত্রের মামলায় এঁরা দণ্ডিত হন।

সাইমন কমিশন বর্জন থেকে লাহোর কংগ্রেস

১৯২৬ সাল থেকে জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। গান্ধীর গঠনমূলক কার্যক্রম এবং স্বরাজ দলের নিয়মতান্ত্রিকতা উভয়ের সম্পর্কেই হতাশা বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

সরকার কর্তৃক গৃহীত আর্থিক ব্যবস্থাসমূহ ভারতীয় বুর্জোয়াদের মনে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় টাকা ও ব্রিটিশ পাউণ্ডের অনুপাত ১ শিলিং ৬ পেন্সে নির্দিষ্টরূপে ধার্য করা, ১৯২৭ সালে ব্রিটিশজাত ইস্পাতের পক্ষপাতমূলক মূল্য ধার্য করা প্রভৃতির কথা উল্লেখযোগ্য।

১৯২৭ সালে সম্পূর্ণ অভারতীয় সদস্য নিয়ে সাইমন কমিশন নিয়োগ করা হলে সমস্ত রাজনৈতিক গোষ্ঠী ও দলের মধ্যে অসন্তোষ তীব্রতর হয়ে উঠল।

ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অসন্তোষের পরিস্থিতিতে ১৯২৭ সালে মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের মধ্যে একটা বামপন্থী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। এরা শুধুমাত্র ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের দাবীতে সন্তুষ্ট ছিল না। এরা চাইত পূর্ণ স্বাধীনতা। এরা সংগ্রামের একটা কার্যক্রম স্থির করার ওপর জোর দিয়েছিলেন।

মাদ্রাজের অধিবেশনে কংগ্রেসের ইতিহাস নতুন দিকে মোড় নিল। কংগ্রেসের লক্ষ্য হিসাবে এই সর্বপ্রথম পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করা হল। এই অধিবেশনেই সাইমন কমিশন বয়কট করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। কংগ্রেস International League Against Imperialism-এর সঙ্গে যুক্ত হল।

জাপানী এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে চীনা জনসাধারণের সংগ্রামও কংগ্রেস সমর্থন করেছিল।

গান্ধী মাদ্রাজে অধিবেশনের স্বাধীনতা প্রস্তাব অনুমোদন করেন নি। তাঁর

মতে এই প্রস্তাব "তাড়াহুড়ো করে রচনা করা হয়েছে এবং চিন্তাভাবনা না করে গৃহীত হয়েছে।"

পূর্ণ স্বাধীনতা কংগ্রেসের লক্ষ্য হিসাবে ঘোষিত হবার ফলে স্বরাজপার্টির লোকেরাও অসুবিধায় পড়ে গেলেন কারণ তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ডোমিনিয়ন মর্যাদা অর্জন করা। মাদ্রাজে অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্বে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু বলেছিলেন যে "সরকারের বর্তমান কার্যাবলীর ফলে যে ক্রমবর্ধমান গোষ্ঠী পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য চেষ্টা করছে তাদেরই শক্তিবৃদ্ধি হবে বলে মনে হয়। আমার আশংকা যাঁরা সাম্রাজ্যের মধ্যে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ভবিষ্যতে তাঁদের পক্ষে এখনকার মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখা কঠিন হবে।"৭৩

১৯২৮-৯ সালে দেশব্যাপী বিশেষতঃ বোম্বাই এবং বাংলায় ছাত্র এবং যুবক আন্দোলনের অভূতপূর্ব প্রসার ঘটে। এর সঙ্গে সঙ্গে জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে All India Independence League গঠিত হল। অনেক জায়গায় এই প্রতিষ্ঠানের শাখা স্থাপিত হয়েছিল। এই সংগঠনগুলো পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করত। জনগণের দাবী এবং সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থনসূচক আমূল পরিবর্তনের কার্যক্রম এরা গ্রহণ করেছিল। সাধারণতঃ এই সংগঠনগুলো স্বাধীনতার ভিত্তিতে জাতীয় গণতান্ত্রিক কার্যক্রমের পক্ষপাতী ছিল। এরা দেশীয় রাজ্যসমূহ ও জমিদারী প্রথার বিলোপ এবং জনগণের অবস্থার উন্নতি চাইত। Independence League এবং শ্রমিক কৃষকদের দলের সঙ্গে মিলে ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলো সাইমন কমিশন বর্জনের অভিযানে একটা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

১৯২৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী সাইমন কমিশন ভারতবর্ষে পেঁছায়। এর প্রতিবাদস্বরূপ ওইদিনে সারা ভারতব্যাপী হরতাল পালিত হয়। দেশের বেশ কয়েকটা স্থানে সভা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়।

দিল্লী, লক্ষ্মৌ, মাদ্রাজ, কলিকাতা, পাটনা এবং অন্যান্য শহরে প্রবল বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়েছিল। বেশ কয়েকটা স্থানে পুলিশ এবং বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়।

লাহোরে পুলিশ একটা সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করবার সময় লালা লাজপত রায়ের ওপর লাঠির আঘাত পড়ে। অনেকেরই বিশ্বাস যে এই আঘাতজনিত কারণেই কয়েক মাস পর তার মৃত্যু ঘটে।

ফেব্রুয়ারী মাসে সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু প্রভৃতি কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী ভাগের প্রতিনিধিগণ এবং তেজবাহাদুর সপ্রু, আলি ইমামের মতো উদারপন্থী নেতারা যোগ দিয়েছিলেন। আগস্ট মাসে এই সম্মেলন নেহেরু রিপোর্ট নামে পরিচিত একটা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে ভারতবর্ষের সংবিধানের একটা ছক দেওয়া হয়েছিল। স্বশাসিত ডোমিনিয়নের ভিত্তিতে সংবিধান তৈরীর কথা এই ছকে বলা হয়েছিল। নেহেরু রিপোর্টে "নিজস্ব এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির সর্বপ্রকার অধিকার" মেনে নেওয়া হয়েছিল।

সমাজবাদী এবং বামপন্থী জাতীয়তাবাদীরা এই পরিকল্পনার সমালোচনা

করে বলেন যে এতে স্বাধীনতার লক্ষ্য পরিত্যাগ করা হয়েছে এবং জমিদারী এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল মালিকানার স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৯২৮-৯ সালে দেশব্যাপী পরপর কয়েকটা ধর্মঘট হয়েছিল। বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলোতে সাধারণ ধর্মঘট হয়েছিল, এতে ১৫০০০ শ্রমিক যুক্ত ছিল। এই ধর্মঘট গিরনি কামগার ইউনিয়ন এবং বোম্বাই টেক্সটাইল লেবার ইউনিয়ন দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।

ধর্মঘটের প্রসার চূড়ান্ত হল ১৯২৯ সালে। এই বছরে ধর্মঘটী শ্রমিকের সংখ্যা উঠল ৫৩১,০৫৯-তে। ১৯২৭ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৩১,৬৫৫।

ধর্মঘট আন্দোলনে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান শ্রেণীসচেতনতা এবং সংগ্রামশীলতা প্রকাশ পায়। উপরন্তু অনেক ক্ষেত্রেই (যেমন বোম্বাইতে) ধর্মঘট-গুলো শ্রমিক ও কৃষকদের দলের দ্বারা পরিচালিত হতো। শ্রমিকদের মধ্যে এদের রাজনৈতিক প্রভাব বেশ বোঝা যাচ্ছিল। শ্রমিকশ্রেণী একটা স্বাধীন সামাজিক শক্তিতে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল।

শ্রমিকেরা নিজেদের পতাকা নিয়ে রাজনৈতিক মিছিলে যোগদান করছিল। এটা তাদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সচেতনতার লক্ষণ। বহুসংখ্যক শ্রমিক সাইমন কমিশন বয়কটে যোগদান করেছিল।

১৯২৮ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশন ডোমিনিয়ন মর্যাদার সমর্থকদের সংগে যাঁরা অবিলম্বে স্বাধীনতা লাভ করতে চান তাঁদের রাজনৈতিক সংঘাতের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। সুভাষ বোস এবং জওহরলাল নেহেরু ছিলেন শেষোক্ত দলের নেতা। গান্ধী এই অধিবেশনে যোগ-দান করেছিলেন। সমস্ত রকম প্রভাব প্রয়োগ করে তিনি প্রতিনিধিদের আপস প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিতে সম্মত করেছিলেন। প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে যদি এক বৎসরের মধ্যে পাওয়া যায় তবে ডোমিনিয়ন স্টেটাস মেনে নেওয়া হবে অন্যথায় অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করা হবে।

বোস এবং জওহরলাল নেহেরু যে সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেছিলেন সেটা নাকচ হয়ে যায়। এই সংশোধনী প্রস্তাবে বলা হয়েছিল "মাদ্রাজ কংগ্রেসে ভারতীয় জনসাধারণের লক্ষ্য হিসাবে যে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল এই কংগ্রেস সেই সিদ্ধান্তের পরিপোষক। কংগ্রেসের অভিমত এই যে ব্রিটিশের সম্পর্ক ছিন্ন না করলে প্রকৃত স্বাধীনতা পাওয়া সম্ভব নয়।"[৭৪]

কংগ্রেসের মধ্যে আমূল পরিবর্তনপন্থী জাতীয়তাবাদীদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব কলিকাতা কংগ্রেসে প্রকাশ পেয়েছিল।

কলিকাতার কারখানাসমূহ থেকে ৫০০০০ শ্রমিক মিছিল করে কংগ্রেস অধিবেশনে এসে প্রায় দুই ঘণ্টা কংগ্রেস সামিয়ানার মধ্যে অবস্থান করেছিল এবং জাতীয় স্বাধীনতার জন্য একটা প্রস্তাব পাশ করেছিল। এই ঘটনায় শ্রমিক-শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সচেতনতার ইংগিত দেখতে পাওয়া যাবে।

এই সময়ই কলিকাতাতে কৃষক এবং শ্রমিক দলগুলোর প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে পূর্ণ স্বাধীনতা, দেশীয় রাজ্য এবং জমিদারী প্রথার বিলোপ, মৌল শিল্পসমূহের জাতীয়করণ, দিনে আট ঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারণ এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

১৯২৯ সালের মার্চ মাসে সরকার শ্রমিকশ্রেণীর এবং জাতীয় আন্দোলনের বেশ কয়েকজন নেতাকে চক্রান্তের অভিযোগে গ্রেপ্তার করেন। এই মামলাটি মীরাট ষড়যন্ত্রের মামলা নামে পরিচিত। এই মামলা চার বছর ধরে চলেছিল। মামলার শেষে কয়েকজন অভিযুক্ত ছাড়া পেয়ে যান এবং অন্যান্যদের দীর্ঘদিনের কারাদণ্ড হয় অবশ্য আপীলে মেয়াদ অনেক কমে যায়। অভিযুক্তদের মধ্যে কমিউনিস্ট, অকমিউনিস্ট দুইই ছিলেন। এদের মধ্যে Spratt, Bradley এবং Hutchinson নামে তিনজন ইংরাজও অভিযুক্ত হয়েছিলেন। অভিযুক্তদের মধ্যে তিনজন নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির সভ্য ছিলেন।

১৯২৯ সালের মাঝামাঝি ভাইসরয় জন-নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স জারী করলেন। এতে সপরিষদ বড়লাটকে 'ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ এবং বিদেশী কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদের বিতাড়িত করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।'৭৫

এই সময়ই শিল্পবিরোধ আইন (Trade Disputes Act) পাশ হয়। এই আইন অনুসারে সহানুভূতিসূচক ধর্মঘট, 'সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে' ধর্মঘট এবং 'জনকল্যাণমূলক সংস্থাতে (Public Utility Service) আচমকা ধর্মঘট' বেআইনী ঘোষিত হল।

যেসব আন্দোলন বৃদ্ধি পাচ্ছিল ১৯২৯ সালে সরকার তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। India in Bondage প্রকাশ করবার দায়ে Modern Review-র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। অধিবেশন চলাকালে কেন্দ্রীয় আইনসভায় বোমা নিক্ষেপ এবং প্রচার পত্রিকা ছুঁড়বার দায়ে ভগৎ সিং এবং দত্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। কলিকাতাতে সুভাষ বোস এবং অন্যান্য কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কংগ্রেসীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং রাজনৈতিক অভিযোগে বিচার করা হয়েছিল।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবার পর ভগৎ সিং ও দত্ত যখন লাহোর জেলে বন্দী ছিলেন তখন লাহোরের পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট স্যাণ্ডার্সকে হত্যার অভিযোগে তাঁদের অভিযুক্ত করা হয়। এই মামলাটা লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলা নামে পরিচিত। এই মামলাতে দত্ত ছাড়া পেয়ে যান কিন্তু কিছুদিন পরে ভগৎ সিং, শুকদেব এবং রাজগুরুর মৃত্যুদণ্ড হয়।

কারাগারে উন্নততর ব্যবস্থার দাবীতে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীগণ এবং যতীন দাস সহ অনেক রাজনৈতিক বন্দী অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। চৌষট্টি দিন অনশনের পর যতীন দাস প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর ফলে জনসাধারণের মনে প্রচণ্ড উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল।

ব্রহ্মদেশে Rev. Wisaya রাজদ্রোহিতার অভিযোগে কারারুদ্ধ ছিলেন। উন্নততর ব্যবহারের দাবীতে তিনি অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করলেন। অনশন ধর্মঘটের ১৬৪ দিন পরে তিনি মারা গেলেন।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থা উত্তরোত্তর উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

অক্টোবরের ৩১ তারিখে ভাইসরয় লর্ড আরুইন বিবৃতি প্রকাশ করে বললেন, "মহামান্য ভারত সম্রাটের সরকারের পক্ষে আমি পরিষ্কারভাবে বলতে পারি যে তাঁদের বিবেচনা অনুসারে ১৯১৭ সালের ঘোষণাতেই এটা বোঝানো

আছে যে ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির প্রকৃতি অনুসারে ডোমিনিয়ন মর্যাদা অর্জনই স্বাভাবিক প্রস্তাব।”

ভাইসরয়ের বিবৃতির ফলে কংগ্রেস এবং অকংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে রাজনৈতিক নিষ্পত্তির আশা সৃষ্টি হল। নেতারা দিল্লীতে মিলিত হয়ে আলোচনান্তে একটা ঘোষণাপত্র (দিল্লী ঘোষণাপত্র) প্রকাশ করেন। এতে অন্যান্য প্রসঙ্গ সহ তাঁরা বলেন যে “ভারতবর্ষের প্রয়োজনের উপযোগী করে ডোমিনিয়ন মর্যাদার পরিকল্পনা রূপায়িত করার জন্য আমরা মহামান্য সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারব বলে আশা করি।” প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক যাতে সফল হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করবার জন্য ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল যে ‘রাজবন্দীদের ক্ষমা করতে হবে’ এবং বৈঠকে ভারতীয় রাজনৈতিক দলের কার্যকরী প্রতিনিধিত্ব রাখতে হবে।

গান্ধী, মতিলাল নেহেরু, জওহরলাল নেহেরু, অ্যানি ব্যাসান্ট, স্যার টি. বি. সপ্রু এবং অন্যান্যরা এই ঘোষণাপত্রে সই করেছিলেন।

জওহরলাল নেহেরুর পক্ষে এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করা ব্যত্যয়মূলক বলা যেতে পারে কারণ তিনি যেহেতু স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন এবং কোনোরকম আপস চান নি। পরবর্তীকালে জওহরলাল এই ঘোষণাপত্রকে রাজনৈতিক ভুল বলে ঘোষণা করেছিলেন।

কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে গান্ধী ও মতিলাল নেহেরু, জিন্না এবং সপ্রু অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতামতের প্রতিনিধি হিসাবে ২৩ ডিসেম্বর, ১৯২৯ তারিখে বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভারতবর্ষের পূর্ণ ডোমিনিয়ন মর্যাদার স্বীকৃতির ভিত্তিতে গোলটেবিল বৈঠকের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা শুরু করতে হবে গান্ধী এই আশ্বাস চাইলেন। বড়লাট জানালেন যে এই ধরনের আশ্বাস দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে সবরকম আলাপ আলোচনা ভেঙ্গে গেল।

পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য ঘোষণা

উত্তেজনাপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে লাহোরে কংগ্রেস অধিবেশন আরম্ভ হল।

লাহোর কংগ্রেসে বলা হল স্বরাজের অর্থ পূর্ণ স্বাধীনতা। এই অধিবেশনে কর বন্ধ সহ আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করবার ক্ষমতা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ওপর অর্পণ করা হল।

সভাপতির ভাষণে জওহরলাল নেহেরু নিজেকে সমাজতন্ত্রবাদী ও প্রজাতন্ত্রী বলে ঘোষণা করলেন “আমাদের কাছে স্বাধীনতার অর্থ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি।” তিনি আরও বললেন যে, “যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন ক্ষমতা অর্জন করাই আসল কথা। ডোমিনিয়ন মর্যাদা কোনোক্রমেই আমাদের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা এনে দিতে পারবে না।”

লাহোর কংগ্রেস আর একটা জাতীয়তাবাদের গণ আন্দোলনের প্রস্তাবনাস্বরূপ দেখা গেল।

কংগ্রেস প্রত্যেক বছরের ২৬ জানুয়ারী স্বাধীনতার দিবস বলে ঘোষণা করল। ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারী প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হল এবং ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন হল।

৩০ জানুয়ারী গান্ধী ইয়ং ইণ্ডিয়াতে ১১ দফা দাবীপত্র প্রকাশ করলেন। দাবীপত্রে ছিল মাদকবিক্রয় সম্পূর্ণ বন্ধ, পাউণ্ডের সঙ্গে টাকার অনুপাত ১ শিলিং ৪ পেন্স-এ কমান, ভূমি রাজস্ব অন্ততঃ ৫০ শতাংশ কমান, লবণের ওপর কর বিলোপ, দেশী বস্ত্রশিল্প রক্ষা করার জন্য বিদেশী বস্ত্রের ওপর শুল্ক আরোপ, Coastal Tariff Reservation বিল পাশ ইত্যাদি। তিনি লিখলেন, '...দাবীগুলো খুব সাধারণ। কিন্তু এর সঙ্গে ভারতবর্ষের পক্ষে এগুলো অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন। বড়লাট যদি এই দাবীগুলো পূরণ করেন তবে আইন অমান্যের কথা উঠবে না এবং কংগ্রেস সাগ্রহে যে কোনো বৈঠকে যোগদান করবে।...'

বামপন্থী জাতীয়তাবাদীরা এই ১১ দফা দাবীর সমালোচনা করেছিলেন। তাদের মতে এতে স্বাধীনতার দাবী সরিয়ে রেখে সংস্কারের কথা বলা হয়েছে। সরকার গান্ধীর এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন না।

আইন অমান্য আন্দোলন

ফেব্রুয়ারী মাসে সাবরমতীতে কংগ্রেস কমিটির সভা হল। এই সভায় গান্ধীজী এবং তাঁর সঙ্গে যারা কাজ করছিলেন তাদের ওপর আইন অমান্য আন্দোলনের নেতৃত্ব ও পরিচালনা করবার পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হল।

সামান্যতম হিংসার অবকাশও যাতে না থাকে আন্দোলন শুরু করবার আগে গান্ধী সে বিষয়ে নিঃসংশয় হতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন যদি অহিংস আন্দোলন আরম্ভ না হয়, তবে জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য অধৈর্য হয়ে হিংসাত্মক আন্দোলন আরম্ভ করে দেবে। ২ মার্চ, ১৯৩০ তারিখে বড়লাটকে লেখা চিঠিতে গান্ধী এই মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন, "হিংসাপন্থীদের প্রসার হচ্ছে, এদের প্রভাব বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে। ব্রিটিশ শাসনের সংগঠিত হিংসাত্মক শক্তি এবং ক্রমবর্ধমান হিংসাপন্থীদের অসংগঠিত হিংসাত্মক কার্য-কলাপ একযোগে উভয়ের বিরুদ্ধে অহিংসার শক্তি কার্যকর করে তোলাই আমার উদ্দেশ্য। নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকলে উভয়েরই প্রসার ঘটবে।"

পরিশেষে গান্ধী সংগ্রাম আরম্ভ করবার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে প্রথম পর্যায়ে আন্দোলন হবে সীমিত : তিনি স্বয়ং এবং তাঁর ৮০ জন বিশ্বস্ত অনুগামী ৬ এপ্রিল ডাণ্ডীতে সরকারের লবণ আইন অমান্য করবেন।

গান্ধী এবং অন্যান্য যাঁরা লবণ আইন ভঙ্গ করলেন তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় নি। এর ফলে দেশের লোক উদ্দাম হয়ে উঠল এবং বেআইনী ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পেল।

৯ এপ্রিল গান্ধী আন্দোলনের কার্যক্রম নির্ধারণ করে বললেন : 'প্রতিটি গ্রামেই লোক বেআইনী লবণ সংগ্রহ করুক অথবা প্রস্তুত করুক, মেয়েরা এগিয়ে এসে মদের দোকান, আফিমের ঘাঁটি এবং বিদেশী বস্ত্র বিক্রেতাদের দোকানে

পিকেটিং করুক। আবাল-বৃদ্ধ সকলকেই...সুতা কাটতে হবে, বিদেশী বস্ত্র পুড়িয়ে ফেলতে হবে, হিন্দুদের অস্পৃশ্যতা বর্জন করতে হবে... ছাত্ররা সরকারী স্কুল কলেজ থেকে বেরিয়ে আসুক এবং সরকারী কর্মচারীরা চাকুরী ছেড়ে দিক...(এইগুলো সম্পন্ন হলে) অচিরে আমরা পূর্ণ স্বরাজ লাভ করব।'৭৬

পিকেটিং প্রচারের মাধ্যমে বিদেশী বস্ত্র ও মদ বর্জনের কার্যক্রম সাফল্য-লাভ করেছিল। বহুসংখ্যক ছাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করেছিল। পুলিশের নিষেধ অগ্রাহ্য করে কংগ্রেস কমিটি সভা অনুষ্ঠান করত। নিষিদ্ধ সমাবেশ ভংগ করার জন্য পুলিশ গুলি বর্ষণ করত এবং লাঠি চালাত।

দেশে অন্য ধরনের আন্দোলনও ছড়িয়ে পড়েছিল। এপ্রিল মাসে একদল বিপ্লবী চট্টগ্রামের পুলিশ অস্ত্রাগারে অভিযান করে। মে মাসে শোলাপুরে গণ-বিক্ষোভ উপলক্ষে জনতা এবং পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। বেশ কয়েকটা সরকারী ভবন এবং মদের দোকান ধ্বংস করা হয়। পুলিশের গোলাবর্ষণে বহু লোক হতাহত হয়। সামরিক আইন জারী করে আন্দোলন দমনের জন্য সৈন্য-বাহিনী নামানো হয়।

সব থেকে গুরুতর ঘটনা ঘটে এপ্রিল মাসে পেশোয়ারে। শহরে বেশ কয়েকটা গণবিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয় এবং বিক্ষোভ উপলক্ষে জনতা ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। বিক্ষোভকারীরা একটা সাঁজোয়া গাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছিল। এর ফলে পুলিশ গুলি চালালে বহুসংখ্যক ব্যক্তি আহত ও নিহত হয়। এই সময়ে একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে। 18th Royal Garhwali Rifles-এর একদল ভারতীয় সৈন্যকে জনতার ওপর গুলিবর্ষণের হুকুম দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁরা সে হুকুম তামিল করেন নি। সামরিক আদালতের বিচারে এঁরা দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তারপর বিরাট সেনাবাহিনী মোতায়েন করে অবশেষে পেশোয়ার শহরের অবস্থা আয়ত্তে আনা হয়।

৫ মে গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে দেশব্যাপী হরতাল, বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং ধর্মঘট হল। বেশ কয়েক জায়গায় হাংগামা শুরু হল। শোলাপুরের ঘটনার কথা আগে বলা হয়েছে, সেসব গান্ধীর গ্রেপ্তারের ফলে ঘটেছিল।

সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আরম্ভ করল। কতকগুলো অর্ডি-ন্যান্স জারী করা হল। জুন মাসে কংগ্রেস এবং তার শাখাসমূহ নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হল। প্রেস অর্ডিন্যান্সের বলে সরকার ৬৭টি সংবাদপত্র এবং ৫৫টি ছাপাখানা জুলাই-এর শেষে বন্ধ করে দিল।

পীড়ন তীব্রতর হতে থাকল। কংগ্রেস ঐতিহাসিক পট্টভি সীতারামিয়ার মতে এই সময়ে রাজবন্দীদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৯০,০০০।

১৯৩১-এর জানুয়ারী মাসে সরকার গান্ধী এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সভ্যদের ছেড়ে দিলেন।

গান্ধী-আরউইন চুক্তি

অনেক আলাপ-আলোচনার পর মার্চ মাসে গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত

হল। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সরকার পীড়ন বন্ধ করতে এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য অভিযুক্ত যারা তাদের বাদ দিয়ে আর সব রাজবন্দীদের মুক্ত করতে সম্মত হলেন। তাঁর দিক থেকে গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করতে রাজী হলেন। ভারতবর্ষের সংবিধানের খসড়া সম্বন্ধে আলোচনার উদ্দেশ্যে গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের যোগদানের পক্ষে গেলেন 'যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এই পরিকল্পনার অত্যাবশ্যক অংগ ছিল। অনুরূপভাবে ভারতীয় পক্ষের দায়িত্বসমূহ সংরক্ষিত অধিকারসমূহ এবং প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, সংখ্যালঘুদের অবস্থা, ভারতের নামে জমা অর্থ ও দায়দায়িত্ব পালনে ভারতীয় স্বার্থের ব্যাপারে রক্ষাকবচ প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অপরিহার্য অংগ হিসাবে বিবেচিত হবে।'

বামপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতারা এই চুক্তির সমালোচনা করেছিলেন। এঁদের মতে আপসমূলক এই চুক্তি স্বাধীনতা অর্জনের যে লক্ষ্য নিয়ে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তা থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

১৯৩১ সালে কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে এই চুক্তি অনুমোদিত হল। মতদ্বৈধতা সত্ত্বেও জাতীয় ঐক্য রক্ষার জন্য সুভাষ বোস এবং জওহরলাল নেহেরু চুক্তির পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন।

এই অধিবেশনে কংগ্রেস মৌলিক অধিকারের বিষয়েও একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাশ করেছিল। এই প্রস্তাবে প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছিল। এতে মূল শিল্প এবং যানবাহনের জাতীয়করণ, শ্রমিকদের জীবনযাত্রা এবং কার্যাবস্থার উন্নয়ন, সুদূরপ্রসারী ভূমিসংস্কার, অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রভৃতি অনুমোদিত হয়।

এর পরেই গান্ধীজী ইংলণ্ডে গিয়ে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা, সংখ্যালঘু সমস্যা, সৈন্যবাহিনী, বিভিন্ন রক্ষাকবচ সম্বন্ধে অনেকগুলো বিবৃতি দিয়েছিলেন এবং কংগ্রেসের মতামত ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন। এই প্রশ্নে মতভেদের দরুন গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়ে গেল। বৈঠকের ভারতীয় প্রতিনিধিরা দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন।

গান্ধীজী যে কয়েক মাস দেশে অনুপস্থিত ছিলেন সেই সময় কৃষকদের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ দেখা দিল। ১৯২৯ সালে বিশ্বব্যাপী যে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়েছিল তখনও তার নিরসন হয় নি। এর প্রভাবে ভারতে কৃষি সঙ্কট দেখা দেয় এবং কৃষিপণ্যের মূল্য হ্রাস পাবার ফলে ভারতীয় কৃষক বিশেষভাবে আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত হয়। ১৯৩১ সালের দ্বিতীয়ার্ধে যুক্তপ্রদেশ, গুজরাটের কয়েকটি অংশে এবং ব্রহ্মদেশে কৃষিজীবীদের কিয়দংশ খাজনা এবং কর দেওয়া বন্ধ করে দিল। কংগ্রেস কৃষকদের এতে উৎসাহ দিয়ে গান্ধী-আরউইন চুক্তি খেলাপ করেছে বলে সরকার কংগ্রেসের নামে দোষারোপ করল। অপরপক্ষে কংগ্রেসের অভিযোগ ছিল যে চুক্তি সত্ত্বেও সরকারী পীড়ন বন্ধ হয় নি।

আইন অমান্য আন্দোলনের পুনরুজ্জীবন

ডিসেম্বর মাসে দেশে ফেরার পরেই গান্ধী পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য নতুন বড়লাট উইলিংডনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন। বড়লাট অবশ্য দেখা করতে সম্মত হলেন না।

সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ব্যর্থ হয়ে গেলে কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত করার সিদ্ধান্ত নিল। গান্ধীজী ১৯৩২ সালের ৪ তারিখে গ্রেপ্তার হলেন। সঙ্গে সঙ্গে সরকার বেশ কয়েকটা অর্ডিন্যান্স জারি করলেন যেমন Emergency Powers Ordinances, The Unlawful Instigation Ordinance, The Prevention of Molestation and Boycotting Ordinance এবং The Unlawful Association Ordinance। কংগ্রেস সংগঠনগুলো নিষিদ্ধ হল। প্রায় সব কংগ্রেস নেতা গ্রেপ্তার হলেন এবং বহুসংখ্যক আইন অমান্যকারীকে গ্রেপ্তার করা হল। অর্ডিন্যান্সসমূহ থেকে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে সরকার অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল এবং যেসব সংবাদপত্র এই সংগ্রাম সমর্থন করেছিল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করল।

কংগ্রেসের হিসাব অনুযায়ী ১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাসে গ্রেপ্তারের সংখ্যা ১২০,০০০-তে দাঁড়িয়েছিল।

আইন অমান্য আন্দোলন ছাড়াও ১৯৩২ সালে আরো দুটো বিদ্রোহ ঘটেছিল। একটি ঘটে কাশ্মীরে এবং অপরটি ঘটে আলওয়ারে। উভয়েই স্বৈরতন্ত্রী রাজা দ্বারা শাসিত দেশীয় রাজ্য। আলওয়ারে কৃষক বিদ্রোহের অর্থনৈতিক কারণ ছিল, এখানে ভূমিরাজস্বের পরিমাণ ছিল অত্যধিক।

বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করেছিল। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সাহায্য নিয়ে তবেই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয়েছিল।

জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনাল্ড পশ্চাদ্‌পদ গোষ্ঠীসমূহ এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষণা করলেন। গান্ধী পশ্চাদ্‌পদ গোষ্ঠীসমূহের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন। তাই তিনি সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের বিরুদ্ধে 'আমরণ অনশন' শুরু করলেন। এর ফলে পুনা চুক্তি সম্পাদিত হল। এই চুক্তি অনুসারে হিন্দুদের যৌথ নির্বাচনী ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাদ্‌পদ গোষ্ঠীসমূহের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখবার ব্যবস্থা হল। রোয়েদাদ পশ্চাদ্‌পদ গোষ্ঠীসমূহের জন্য যে পরিমাণ আসনের ব্যবস্থা ছিল সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা তার থেকে বেশী হল।

গান্ধী ১৯৩৩-এর মে মাসে আর একবার অনশন আরম্ভ করলেন। তিনি এবং তাঁর সহযোগীবৃন্দ যাতে হরিজন উন্নয়নের কাজ আরও ব্যাপকভাবে করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে আত্মিক শক্তি দৃঢ়তর করবার আকাঙ্ক্ষায় গান্ধী এই অনশন আরম্ভ করেন। লক্ষ্য বিচার করে বলতে হয় যে সংগ্রাম থেকে জনসাধারণের মনোযোগ ভিন্নমুখী করে তোলাই ছিল অনশনের উদ্দেশ্য।

সরকার অবিলম্বে গান্ধীকে জেল থেকে মুক্তি দিল। অনশনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং গান্ধীর পরামর্শে কংগ্রেস সভাপতি আইন অমান্য আন্দোলনকে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখলেন।

আইন অমান্য আন্দোলনের শিক্ষা

সুভাষ বোস এবং বিঠলভাই প্যাটেল ইউরোপ থেকে আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিতের সমালোচনা করেছিলেন। একটা যুগ্ম ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে তারা বলেছিলেন, "শ্রীগান্ধীর সর্বশেষ কাজ অর্থাৎ আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত করা পরাজয়ের স্বীকৃতি।...আমাদের সুস্পষ্ট মত এই যে রাজনৈতিক নেতা হিসাবে গান্ধী ব্যর্থ হয়েছেন। নতুন নীতিতে নতুন পদ্ধতি অনুসারে কংগ্রেসের আমূল পরিবর্তন করবার সময় উপস্থিত হয়েছে। এর জন্য নতুন নেতার আবশ্যক।"৭৭

গান্ধীর পরামর্শ অনুসারে কংগ্রেস জুলাই মাসে আইন অমান্য আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

১৯৩৪-এর মে মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে, ব্যক্তিগতভাবে ও গণভিত্তিতে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন। অবশ্য, গান্ধী স্বয়ং ইচ্ছা করলে আইন অমান্য করবার অধিকার তাঁর থাকল।

১৯৩৪-এর জুন মাসে সরকারী আদেশে সব কংগ্রেস সংগঠনগুলো আইনানুমোদিত হল তবে বেশ কিছু যুব সংগঠন ও অন্যান্য দল অবৈধ রয়ে গেল।

এর অল্প কিছুদিন পরেই একদল কংগ্রেস কর্মীর সংগে ক্রমবর্ধমান মতপার্থক্যের দরুন গান্ধী কংগ্রেসের সদস্যপদ পরিত্যাগ করলেন।

কংগ্রেস সংগঠন থেকে গান্ধী পদত্যাগ করবার আগে তাঁর প্রভাবে কংগ্রেসের সংবিধান এবং সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তন করা হয়েছিল। কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী জাতীয়তাবাদী এবং সমাজতন্ত্রবাদীদের ক্রমবর্ধমান শক্তিই এর কারণ। কংগ্রেসের প্রাদেশিক কমিটিগুলোর সদস্যসংখ্যা কমে গেল এবং উচ্চতর কমিটিতে নির্বাচনের পদ্ধতি এমনভাবে পরিবর্তন হল যাতে সেটা সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে। বামপন্থীরা ন্যায্য কারণেই এইসব পরিবর্তনকে অগণতান্ত্রিক বলে সমালোচনা করেছিলেন।

১৯৩৫ সালে পার্লামেণ্টে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র গৃহীত হল। অবশ্য ১৯৩৫ সালে ভারতবর্ষে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পরিকল্পনা কার্যে রূপায়িত হল।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে দ্বিতীয় গণসংগ্রাম হল আইন অমান্য আন্দোলন এবং তা ১৯৩৪ সালে শেষ হয়। ১৯২০-২১ সালের আন্দোলনের তুলনায় এর গণভিত্তি অনেক বেশী ছিল। আইন অমান্য আন্দোলনে ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সচেতনতার প্রমাণ পাওয়া গেল। কৃষকসহ জনসাধারণ অধিকতর সংখ্যায় জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে আকৃষ্ট হয়েছিল। জনগণ নিজেদের স্বাধীন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলল। প্রথম আন্দোলনে এই রকমটা হয় নি। তবে আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল।

গান্ধী কর্তৃক পরিচালিত কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্ব গান্ধীর রাজনৈতিক ভাবাদর্শ ও এর শ্রেণীর একান্ত অনুবর্তী থাকার ফলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরিধি সংকীর্ণ করে দিয়েছিল। রীতি অনুসারে এই ভাবাদর্শ ও

নেতৃত্ব শ্রমিক এবং কৃষকদের স্বাধীন কর্মধারা অনুমোদন করত না। শ্রমিক ও কৃষকদের নিজস্ব শ্রেণী নেতৃত্বে এবং আপসহীন শ্লোগানের দ্বারা পরিচালিত ধর্মঘট ও কর বন্ধের কার্যক্রম আন্দোলনে প্রাণশক্তি সঞ্চার করত। কিন্তু এসব কংগ্রেস নেতৃত্বের অনভিপ্রেত ছিল। এইসব স্বতন্ত্র ধারার আন্দোলন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে এবং ভয়ানকভাবে জমিদারীর মতো কায়েমী স্বার্থ ব্যাহত করতে পারে এই আশংকা কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতাদের মনে সর্বদা জাগরূক ছিল। স্বতন্ত্র আন্দোলনের প্রতি এঁদের মনোভাব এই আশংকার দ্বারা প্রভাবিত হত।* উপরন্তু গান্ধীর ১১ দফা দাবী দেখলেই বোঝা যায় যে আপস এবং নিষ্পত্তির ইচ্ছা তাঁর মনে সর্বদা প্রবল ছিল।

আন্দোলন ব্যর্থ হবার ফলে জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে এক ধরনের হতাশা দেখা দিল। ১৯৩৬ সালের শেষ দিকে কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা কমে দাঁড়ায় পাঁচ লক্ষের কাছাকাছি।

গান্ধী এবং গান্ধীবাদের সীমাবদ্ধতা

গান্ধীর মধ্যেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছিল। তবে তাঁর সম্পর্কে কিছু সংশয়ও আছে। এই প্রসঙ্গে New Perspective-এর একটা সম্পাদকীয় থেকে উদ্ধৃত করছি ঃ "প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করলেও সামাজিক উৎস এবং পূর্বতন সমস্ত অভিজ্ঞতা ও প্রভাবের দরুন তিনি (গান্ধী) ভাবাদর্শের প্রশ্নে বুর্জোয়া সংকীর্ণতা অতিক্রম করতে পারেন নি।

* পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং জমিদারীর ভিত্তিতে গঠিত ভারতীয় সমাজের বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো গান্ধী সমর্থন করতেন এবং এই ব্যবস্থাকে বজায় রাখবার পক্ষপাতী ছিলেন। উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্কের বর্তমান পরিস্থিতিতে শোষণ অপরিহার্য একথা তিনি মানতেন না। যেসব নিয়ম দ্বারা দেশের আর্থিক কাঠামো পরিচালিত হচ্ছে তাদের প্রভাবেই জনসাধারণের দৈন্যদশা বাড়ছে এই মতও তিনি স্বীকার করতেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল পুঁজিবাদী এবং জমিদারদের মধ্যে নৈতিক ইচ্ছার জোর সঞ্চারিত করতে পারলে জনগণের আর্থিক দুর্দশা দূর করা যাবে।

"ন্যায্য কারণ ছাড়া বিত্তবান শ্রেণীর বিত্ত সম্পত্তি কেড়ে নেবার প্রচেষ্টা আমি সমর্থন করতে পারি না। আমার লক্ষ্য হল আপনাদের হৃদয় স্পর্শ করা এবং আপনাদের মন এমনভাবে পরিবর্তিত করা যাতে আপনারা প্রজাদের হয়ে সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির ন্যায়রক্ষক হবেন ও সেই সম্পত্তি প্রধানতঃ প্রজাদের কল্যাণেই ব্যবহার করবেন।...আমি যে রামরাজ্যের স্বপ্ন দেখি তাতে রাজা ও প্রজা উভয়েরই অধিকার সমানভাবে রক্ষিত হবে। শ্রেণী-সংঘর্ষ নিবৃত্ত করাতে আমি আমার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করব এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ রাখবেন না।...যদি অন্যায়ভাবে আপনাদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবার কোনো প্রচেষ্ট হয় তবে আমি আপনাদের পক্ষভুক্ত হয়ে সংগ্রাম করব।...আমাদের সমাজতন্ত্রবাদ অথব সাম্যবাদ অহিংসার ওপর এবং শ্রম ও পুঁজিপতি, ভূস্বামী ও প্রজার মধ্যে সুসংবদ্ধ সহ যোগিতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে।" (১৯৩৪ সালের জুলাই মাসে উত্তরপ্রদেশে ভূস্বামীদের উদ্দেশে গান্ধীর বিবৃতি ১৯৩৪ সালের ১২ আগস্ট তারিখের মারাঠা পত্রিকা প্রকাশিত)।

"জাতীয়তাবাদের সত্তা, বিদেশীর দাসত্বের প্রতি প্রবল ঘৃণা এবং দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করবার সংকল্প তাঁর মধ্যে রূপলাভ করেছিল। গান্ধীর মধ্যে জাতীয়তাবাদের সর্বোত্তম গুণাবলী বিকশিত হয়েছিল। তাঁর চেতনায় প্রাদেশিক স্বার্থবুদ্ধি বা সাম্প্রদায়িকতার সামান্যতম আভাসও ছিল না।

"মূলগতভাবে গান্ধীর চেতনা বুর্জোয়া ভাবাশ্রিত। ফলতঃ তাঁর জাতীয়তাবাদ বুর্জোয়াশ্রেণীর দৃষ্টিভংগী দ্বারা পরিচালিত। এর তাৎপর্য কি ? এর অর্থ এই যে, সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পদ্ধতি, জাতীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর ধারণা বুর্জোয়াশ্রেণীর দৃষ্টিভংগী দ্বারা নির্ধারিত হতো।"

গান্ধীর ভাবাদর্শ এবং এই ভাবাদর্শের রাজনৈতিক তত্ত্ব, অর্থনৈতিক মতবাদ ও নৈতিক ধ্যানধারণা জাতীয় বুর্জোয়ার ঐতিহাসিক প্রয়োজনে উদ্ভূত হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী শাসন ভারতীয় সমাজের অবাধ শিল্পায়ন ও সাধারণ অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বাধা দিচ্ছিল বলে ভারতীয় বুর্জোয়ারা বাস্তবতানুসারে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী ছিল। তাই এরা একটা প্রগতিশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। তাই গান্ধীবাদের একটা প্রগতিশীল দিকও ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ এবং বৈদেশিক আর্থিক পুঁজির ওপর নির্ভরশীলতার ফলে এবং তদুপরি জমিদারী স্বার্থের সংগে জড়িত থাকার ফলে জাতীয় বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের সংগে আপস করে চলতে হতো। এছাড়া দেশীয় পুঁজিপতিদের মনে গণ আন্দোলনজনিত চ্যালেঞ্জের ভীতি নিরন্তর জাগরূক ছিল। ফলে, জাতীয় বুর্জোয়া বিপ্লববিরোধী হলেও সংস্কারকামী সরকারবিরোধী সামাজিক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

গান্ধীবাদ জাতীয় বুর্জোয়ার উভয়বিধ প্রয়োজনই মিটিয়েছিল। অর্থাৎ কিনা গণসংগ্রামের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। অন্যপক্ষে সেই গণসংগ্রামকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল এবং এমনসব পথে ঘুরিয়ে দিয়েছিল যাতে ভারতীয় সম্পদশালী শ্রেণীরও ক্ষতি না হয়।

গান্ধী সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতেন যে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার ভিত্তিতেই একটা সম্পন্ন, স্বাচ্ছন্দ্যময় জাতি গঠন করা যায়। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভংগীর শ্রেণীগত সংকীর্ণতাই এর কারণ। ভারতীয় পুঁজিবাদ উজ্জ্বল ভবিষ্যৎসম্পন্ন নতুন গড়ে ওঠা পুঁজিবাদ নয়। এটা পতনশীল বিশ্ব পুঁজিবাদের একটা দুর্বল অংশ মাত্র। যেখান থেকে অতিরিক্ত লাভ তোলা যেতে পারে এমন কোনো বাজার বা উপনিবেশ এর আয়ত্তে ছিল না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং অন্যান্য বড় পুঁজিবাদের সংগে প্রতিযোগিতায় এর সাফল্যলাভের সম্ভাবনা সামান্যই ছিল। ভারতীয় পুঁজিবাদ একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলত। সীমিত লাভের ওপর চলত বলে শ্রমিকশ্রেণীর জন্য স্বাচ্ছন্দ্য জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করা ভারতীয় পুঁজিপতিদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

অবশ্য শ্রেণীগত বাধার জন্য এই বস্তুগত ঐতিহাসিক ঘটনার তাৎপর্য গান্ধী উপলব্ধি করতে পারেন নি। প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদী আর্থিক ব্যবস্থার নিয়মকানুন যে বস্তুগত ব্যাপার এটা তিনি বুঝতে পারেন নি, পুঁজিপতির স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই। তাদের কার্যকলাপ পুঁজিবাদের প্রতি-

যোগিতামূলক অর্থনৈতিক সংগ্রামের প্রয়োজন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা থেকে শ্রেণীসংগ্রাম জন্মলাভ করে।

শ্রেণীগত বাধার জন্য গান্ধী বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গীর বাইরে যেতে পারেন নি। এইজন্য তিনি যুদ্ধ, শোষণ ও পীড়নের সামাজিক উৎস ধরতে পারেন নি; তিনি মনে করতেন যে মানুষের শিথিল নীতিবোধের জন্য এইসব গ্লানির উদ্ভব হয়। মনুষ্যসমাজের দুঃখদুর্দশা মোচনের জন্য সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করার পরিবর্তে তিনি 'হৃদয়ের পরিবর্তন' দ্বারা সমস্ত গ্লানি মোচনের বিধান দিয়েছিলেন সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন নয়, মানুষের মনে মৌলিক নীতিগত পরিবর্তন ঘটানো প্রয়োজন। পুঁজিবাদী সামাজিক সম্পর্কের জায়গায় সমাজতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করার পরিবর্তে তিনি পুঁজিবাদী সামাজিক সম্পর্ককে মানবতাসম্মত করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। পুঁজিবাদী সামাজিক সম্পর্কের সহজাত প্রবৃত্তি ও চরিত্র যে শোষণমূলক এবং এই কারণে সেটা যে কোনোভাবেই মানবতাসম্মত হতে পারে না এটা তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি। গান্ধী সমাজের শ্রেণীগত কাঠামোর মধ্যে সামাজিক গ্লানির উৎস ধরতে পারেন নি। মানুষের যে নীতিগত অবনমন পুঁজিবাদী সামাজিক ব্যবস্থা থেকেই সঞ্জাত গান্ধীর মতে সেইটাই সামাজিক গ্লানির কারণ।

অবশ্য গান্ধীর বুর্জোয়া চেতনা সাধারণ বুর্জোয়ার হীন চেতনার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা বা একাত্ম করে দেখা চলে না। গান্ধী এই অর্থে বুর্জোয়া ছিলেন যে পুঁজিবাদী মালিকানা ব্যবস্থাভিত্তিক প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় তাঁর একান্ত আস্থা ছিল এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে এটা উৎখাত হলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। গান্ধী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোষণ ঠিকই বুঝতেন এবং জ্বলন্ত ভাষায় এই শোষণকে ধিক্কার দিয়েছেন, কিন্তু মূলগত বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গী অতিক্রম করতে পারেন নি। জনসাধারণের প্রতি গান্ধীর ভালবাসা ছিল। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার ওপরও তাঁর আস্থা ছিল। এই ব্যবস্থার মধ্যে মানুষের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয় নি কারণ ঐতিহাসিক কারণে বিশ্বময় পুঁজিবাদের অবক্ষয়ের কালে, বিশেষ করে ভারতের মতো দেশে যেখানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমৃদ্ধি হয় নি, মানবতাবাদী বা সংস্কারবাদী কার্যক্রম চালু করবার কোনো আর্থিক ভিত্তি ছিল না। "এইরকম অবস্থায় একটা পীড়াদায়ক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে হয় : একজন মহানুভব মানবতাবাদী মানুষের দুঃখ মোচনের নিষ্ফল প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন, কিন্তু একই কালে তিনি আবার সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের সমস্ত প্রচেষ্টার বিরোধী, কারণ তিনি এই সমাজব্যবস্থাকে নীতিসম্মত ও অপরিবর্তনীয় মনে করেন। এই মহানুভব মানবতাবাদী ক্ষীয়মাণ (পুঁজিবাদী) সমাজব্যবস্থার প্রতিক্রিয়াশীল প্রকৃতি উপলব্ধি করতে না পেরে ঐতিহাসিকভাবে যে সামাজিক পরিবর্তন আবশ্যক তার বিরোধিতা করেছেন।"

পূর্বেই বলা হয়েছে যে গান্ধী মনেপ্রাণে সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী ছিলেন এবং হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে বাস্তবে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ কমে যাওয়ার বদলে ক্রমে ক্রমেই বেড়ে চলেছিল।

এর কারণ গান্ধী হিন্দু-মুসলমান বিরোধের সামাজিক-ঐতিহাসিক মূল সন্ধান করতে পারেন নি। তিনি এই বিরোধের কারণ দেখতে পেয়েছিলেন। "জনসাধারণের দুর্বল নৈতিক কাঠামোর মধ্যে, ভারতীয় সমাজের বৈষয়িক জীবনযাত্রা প্রক্রিয়ায় নয়। বস্তুত ঐতিহাসিক কারণ অনুসন্ধান করলে বোঝা যায় যে মুসলমান জনসাধারণের সাম্প্রদায়িকতা তাদের ওপর পুঁজিপতি, মহাজন, ব্যবসায়ীদের (ভারতে এরা প্রধানত হিন্দু) শোষণজনিত ব্যাপক আর্থিক অসন্তোষের বিকৃত কদর্য প্রকাশ। মুসলমান উচ্চতর শ্রেণীসমূহ আর্থিকভাবে দুর্বল ছিল। ক্ষমতাশালী হিন্দু প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে সংগ্রামে তারা মুসলমান জনসাধারণের অসন্তোষ সাম্প্রদায়িক পথে পরিচালিত করেছিল। মুসলমানদের সাম্প্রদায়িকতার মূল এইটা।

মুসলমানদের সাম্প্রদায়িকতা এইভাবে উদ্ভূত হয়েছে বলে এর একমাত্র প্রতিষেধক ছিল হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বী জনসাধারণকে তাদের নিজস্ব আর্থিক স্বার্থের ভিত্তিতে সমবেত করে তাদেরকে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করা। একমাত্র এই উপায়েই মুসলমান জনসাধারণ থেকে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হতো। "তিন দশক ধরে গান্ধী সাম্প্রদায়িকতা উচ্ছেদ করবার জন্য আবেগপূর্ণ দেশপ্রেমাত্মক আবেদন করে, মানুষের অন্তরের অন্তস্থলে মানবসত্তা জাগ্রত করবার চেষ্টা করে এবং বারবার অনশন প্রভৃতি করে নানান বীরত্বপূর্ণ উপায়ে সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা বেড়েই চলেছিল।"

দেখা যাচ্ছে গান্ধীর নেতৃত্বাধীন এবং গান্ধীবাদী মতাদর্শ দ্বারা পরিচালিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বিষম ঘটনার বিচিত্র সমাবেশ হয়েছে ঃ বিরাট অগ্রগতির পরেই খেয়ালখুশী মতো আকস্মিক পশ্চাদপসরণ, চ্যালেঞ্জের পরেই অসঙ্গত আপস এবং তার ফলস্বরূপ অনিশ্চয়তা, বিভ্রান্তি এবং জনমুখী প্রেক্ষাপটের কুয়াশার আবরণ সৃষ্টি।

এর ফলে যে প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতা গান্ধী উচ্ছেদ করতে চাইছিলেন, সেইগুলোই প্রবলতর হয়ে উঠল।

আমূল পরিবর্তনপন্থী সংগঠনসমূহের উদ্ভব

১৯৩৬ সালের পর থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে একটা নতুন গতিবেগের সঞ্চার হয়েছিল। কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে জওহরলাল নেহেরু স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শক্তিকে সমবেত করার কার্যক্রম গ্রহণ করবার আহ্বান জানান। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে শ্রমিক ইউনিয়ন এবং কৃষক সংগঠনসমূহকে (দেশে ইতিমধ্যে কিসানসভার উদ্ভব হয়েছে) অনুমোদন দেবার প্রস্তাব করেন। এর ফলে কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গণভিত্তি সংহত হতে পারত। যৌথ অনুমোদনের প্রস্তাব কংগ্রেসে নাকচ হয়ে যায় কিন্তু একটা জনসংযোগ কমিটি গঠিত হয়েছিল।

ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা আমূল পরিবর্তনপন্থী সংগঠন গড়ে উঠেছিল। কংগ্রেসের মধ্যে সর্বভারতীয় পর্যায়ে সোস্যালিস্ট পার্টি গঠিত হয়। কংগ্রেসের

বাইরে স্বামী সহজানন্দ, অধ্যাপক রঙ্গ এবং ইন্দুলাল যাজ্ঞিকের নেতৃত্বে কিসান সংগঠন গড়ে উঠেছিল। জমিদারী প্রথার বিলোপ এবং ভূমিরাজস্ব, খাজনা এবং ঋণ হ্রাস করবার জরুরী দাবী নিয়ে এদের কার্যক্রম নির্ধারিত হয়েছিল। এইসব শক্তিসমূহের প্রভাব লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে প্রতিফলিত হয়েছিল।

১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে স্থির হয় যে কংগ্রেস নতুন সংবিধান অনুযায়ী ১৯৩৭ সালে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তাতে যোগ দেবে। এই বছরে ডিসেম্বর মাসে আবার কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে "(কংগ্রেস) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন এবং জনসাধারণের সুস্পষ্ট ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেশের ওপর আরোপিত শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে গ্রহণের অযোগ্য বলে মনে করে।" প্রস্তাবে আরো বলা হয় যে, "কংগ্রেস প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমর্থক।··· সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত এবং দেশের শাসনতন্ত্র নির্ধারণের চূড়ান্ত ক্ষমতা যার হাতে আছে এইরকম একটা গঠনতন্ত্র পরিষদের মাধ্যমেই প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপিত হতে পারে। কংগ্রেস এই লক্ষ্য সামনে রেখেই কাজ করে এবং জনসাধারণকে সংগঠিত করে এবং বিধানসভায় কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা এই লক্ষ্যকে সবসময়ই সামনে রেখে চলবে···।"

কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে নাগরিক স্বাধীনতা এবং নাগরিকদের সমানাধিকারের দাবী জানান হয়। ইস্তাহারে আরও বলা হয় যে 'কংগ্রেস জমির ভোগাধিকার, রাজস্ব ও খাজনা ব্যবস্থার সংস্কার, ভূমিরাজস্ব ও খাজনা বিশেষভাবে হ্রাস করে এবং অর্থনৈতিকভাবে অলাভজনক ক্ষেতের রাজস্ব ও খাজনা মকুব করে কৃষিসংক্রান্ত দায়ের সমানুপাতিক সামঞ্জস্য করতে হবে। ইস্তাহারে কৃষি ঋণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা এবং কৃষি ঋণ বিশেষভাবে মকুব করবার কথাও বলা হয়েছিল।

শিল্প শ্রমিকদের জন্য ইস্তাহারে জীবনযাত্রার মান, কাজের নির্দিষ্ট সময় ও পরিস্থিতি এবং সামাজিক পরিবেশ সংক্রান্ত আইন প্রভৃতি বিষয়ক কার্যক্রমের উল্লেখ ছিল। "শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠন করা এবং তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য ধর্মঘট করবার অধিকারের" পক্ষেও এই ইস্তাহারে বলা হয়েছিল।

ইস্তাহারে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নারী-পুরুষে বৈষম্য বিলোপের সপক্ষেও বলা হয়েছিল। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়নের কথাও এতে বলা হয়।

ইস্তাহারে খাদি এবং গ্রামীণ শিল্প প্রসারের এবং এদের স্বার্থ ব্যাহত না করে বৃহৎ শিল্পকে সংরক্ষণ দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

যে কংগ্রেস অতীতে ব্যাপক জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ ও পরিচালনা করেছিল তার কার্যক্রম ও মর্যাদার ফলে কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে মানুষের মনে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। নির্বাচনে কংগ্রেস বিরাট সাফল্য অর্জন করল। বোম্বাই, মাদ্রাজ, সংযুক্ত প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার এবং উড়িষ্যাতে কংগ্রেস চূড়ান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল। বাংলায় ও আসামে কংগ্রেস সব থেকে শক্তিশালী দল হিসাবে প্রতিপন্ন হল।

বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা

১৯৩৭ সালে মার্চ মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি স্থির করে যে, যেসব প্রদেশে কংগ্রেস বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে সেখানে তারা মন্ত্রিসভা গঠন করবে। "অবশ্য কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা যতক্ষণ পর্যন্ত এই বিষয়ে নিশ্চিত না হচ্ছেন যে গভর্ণর শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করবার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না অথবা মন্ত্রীদের বিধিসম্মত কাজে বাধা দেবেন না, ততক্ষণ মন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রশ্ন ওঠে না।" সমাজতন্ত্রবাদী ও বাম জাতীয়তাবাদীরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হলেও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন।

যে সমস্ত প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল সেখানে কিছুদিনের জন্য অন্যান্য দলের লোক নিয়ে গঠিত অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ২২ জুন তারিখে বড়লাট ঘোষণা করলেন যে সাধারণতঃ গভর্ণররা এমনভাবে কাজ করবেন যাতে "মন্ত্রীদের (যে দলেরই লোক হোক না কেন) সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে না হয়, শুধুমাত্র তাই নয়, সংঘর্ষ পরিহার করবার জন্য এবং সংঘর্ষ উপস্থিত হলে নিরসনের জন্য সর্ববিধ উপায় অবলম্বন করা যায়।" এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

এরপর বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিহার, সংযুক্ত প্রদেশ, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশে অবিলম্বে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হল। পরে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল। আইনসভায় কিছু অকংগ্রেসী সদস্য কংগ্রেসের শৃঙ্খলা মেনে নিতে রাজী হওয়াতে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করতে পেরেছিল।

অধিষ্ঠিত হবার অল্পকালের মধ্যেই কংগ্রেস মন্ত্রীরা রাজবন্দীদের মুক্তি দিলেন। কয়েকটি নিষিদ্ধ প্রতিষ্ঠানকে তাঁরা বৈধ করলেন। রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর যেসব অন্তরীণ ও দ্বীপান্তরের আদেশ জারি করা হয়েছিল সেগুলোও তাঁরা নাকচ করে দিলেন। বেশ কয়েকটা খবরের কাগজের জামিন ফিরিয়ে দেওয়া হল।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই নাগরিক অধিকার সংকুচিত করা এবং দমননীতি অবলম্বনের দায়ে কংগ্রেস সরকার বামপন্থী জাতীয়তাবাদী, সমাজতন্ত্রী এবং কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের নেতাদের সমালোচনার সম্মুখীন হল।

কংগ্রেস Criminal Law Amendment Act-কে সর্বদাই পীড়নমূলক আইন বলে অভিহিত করেছে। সমালোচকরা বললেন রাজাগোপালাচারী দ্বারা সমর্থিত মাদ্রাজের কংগ্রেস মন্ত্রিসভা হিন্দু বিরোধী বিক্ষোভের বিরুদ্ধে এই আইনের ব্যবহার করেছেন। গান্ধী এই আইন প্রয়োগ সমর্থন করাতে সমালোচকগণ উষ্মা প্রকাশ করলেন। গান্ধী হরিজন পত্রিকায় লিখলেন যে, 'আমি এই আইনটি পর্যালোচনা করে দেখি নি তবে রাজাজীর প্রকাশ্য ঘোষণা থেকে আমি বুঝতে পারছি যে কংগ্রেস যে নতুন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে তার পক্ষে উপযোগী বেশ কিছু জিনিস এতে আছে। অবস্থা যদি এইরকমই হয় তবে এই আইন প্রয়োগ না করা রাজাজীর পক্ষে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে না।'

বিশিষ্ট সমাজতন্ত্রবাদী বাটলিওয়ালা মাদ্রাজ থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন।

বোম্বাইতে ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস সরকার শিল্পবিরোধ আইন প্রণয়ন

করে। এই আইনে ধর্মঘট করবার অধিকার সংকুচিত করা হয়েছিল এবং ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রিকরণের নিয়মাবলী নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এই নিয়মাবলী নিয়োগ কর্তাদের দ্বারা পরিপোষিত ইউনিয়নের পক্ষে সুবিধাজনক বলে শ্রমিক নেতাদের মনে হয়েছিল। বোম্বাই প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এর বিরুদ্ধে ধর্মঘট আহ্বান করেছিল। ধর্মঘট উপলক্ষে পুলিশের গুলিবর্ষণে একজন নিহত হয়েছিল এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়।

নির্বাচনী ইস্তাহারে শ্রমিকদের ধর্মঘট করবার অধিকার অনুমোদিত হয়েছিল। কংগ্রেস সরকার কর্তৃক এই অধিকার সংকোচন নির্বাচনী ইস্তাহারে নিহিত প্রতিজ্ঞাভঙ্গের দায়ে সমালোচিত হল। পুলিশী গুলিবর্ষণেরও নিন্দা করা হয়েছিল।

শ্রমিকেরা যখন ধর্মঘট করেছিল তখন কংগ্রেস সরকার আমেদাবাদে ১৪৪ ধারা এবং অন্যান্য ধারা জারি হয়েছিল। 'রাজবন্দী মুক্তির দিবসে' শ্রমিক নেতারা বিক্ষোভ সংগঠিত করলে বেশ কয়েকজন শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর মধ্যে কয়েকজনের এরপর বিচার হল ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হল।

তরুর রাজার বিরুদ্ধে কৃষকেরা সংগ্রাম শুরু করলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেস সরকার Criminal Law Amendment Act প্রয়োগ করে। এই কারণে সেখানকার কংগ্রেস সরকারেরও সমালোচনা করা হয়েছিল।

সারা ভারত কিসানসভার সভাপতি স্বামী সহজানন্দ The Other Side of the Shield (বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের প্রতি প্রদত্ত উত্তর) নামে একটা পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকায় তিনি নির্বাচনের আগে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন না করার দরুন এবং কিসান আন্দোলনের বিরুদ্ধে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার দায়ে বিহারের কংগ্রেস সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন।

ভারতীয় নাগরিক অধিকার ইউনিয়নের সচিব ডঃ মেনন Civil Liberties Under Provincial Autonomy গ্রন্থে লিখেছিলেন :

"একথা স্পষ্টভাবে বলতেই হবে যে প্রধান প্রধান পীড়নমূলক আইন-সমূহের কোনোটাই এখনও প্রত্যাহার করা হয় নাই। Criminal Law Amendment Act এর মধ্যে অন্যতম···

"এই আইন প্রয়োগে সবচেয়ে বড় অপরাধী পঞ্জাব সরকার। পঞ্জাবে ১৯২৭ সালে ২৪ জনকে এই আইন অনুসারে অভিযুক্ত করা হয়। এর পরেই আসে বাংলা···

"এই আইন প্রয়োগের ব্যাপারে শুধুমাত্র সংখ্যার প্রশ্নে মাদ্রাজের কংগ্রেস সরকার উপরিউক্ত প্রদেশদ্বয় থেকে অনেক এগিয়ে আছে।

"আমেদাবাদে বস্ত্রকল ধর্মঘটের ব্যাপারে বোম্বাই সরকার Criminal Law Amendment Act প্রয়োগ করে। শোলাপুরেও এই আইন প্রয়োগ করা হয়।"

আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য মন্ত্রীরা সমাজ উন্নয়নমূলক কোনো বড় পরি-কল্পনা প্রণয়ন অথবা রূপায়িত করতে পারেন নি। কৃষকদের সম্পর্কে কংগ্রেস সরকার কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তার

পরিমাণ সামান্যই। কংগ্রেস সরকারের বোম্বাই প্রজাস্বত্ব বিল কৃষকদের কেবলমাত্র চার শতাংশের প্রতি প্রযোজ্য একথা বিলের মুখবন্ধেই স্বীকার করা হয়েছিল। কৃষি শ্রমিকদের জন্য বিশেষ কিছুই করা হয় নি।

কৃষকদের অসন্তোষ বাড়ছিল। কৃষক ইউনিয়নের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কংগ্রেস সরকারসমূহের ব্যর্থতায় কৃষকদের কঠোর সমালোচনায় এর প্রমাণ পাওয়া যাবে।

নির্বাচনী ইস্তাহারে কংগ্রেস যেরকম বলেছিল তার বিপরীতভাবে নতুন সংবিধানের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করবার জন্য কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলোর বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়। এই সমালোচনা কংগ্রেস বামপন্থী-দের মধ্যে থেকে এসেছিল।

১৯৩৫ সালের পর আর একটা নতুন অগ্রগতির লক্ষণ দেখা দিল। দেশীয় রাজ্যসমূহে জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার বিস্তার হতে থাকে। বেশ কয়েকটা দেশীয় রাজ্যে প্রজামণ্ডল বা জনসাধারণের সংগঠন গড়ে ওঠে। কালক্রমে নিখিল ভারত প্রজা সম্মেলন গঠিত হল। অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যের প্রজামণ্ডল এই সংগঠনের অন্তর্গত হল। প্রজামণ্ডলসমূহের কার্যক্রমের মধ্যে ছিল নাগরিক অধিকারের স্বীকৃতি, প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন, কৃষকদের অবস্থার উন্নতি, বেগার প্রথার বিলোপ এবং দেশীয় রাজ্যগুলোর একচেটিয়া অধিকারসমূহের অবলুপ্তি। গান্ধী এবং জওহরলাল নেহেরুর মতন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণের আন্দোলন এবং সংগঠন সম্পর্কে বিপুল এবং সক্রিয় উৎসাহ প্রদর্শন করেন।

১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয় :

"কংগ্রেস পুনরায় Federal পরিকল্পনার নিন্দা করছে এবং প্রাদেশিক ও স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিগুলোর কাছে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণের কাছে এবং তৎসহ প্রাদেশিক সরকারসমূহের কাছে এই ব্যবস্থা প্রবর্তনে বাধা দেবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। যদি জনগণের ঘোষিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা চালিয়ে দেবার চেষ্টা হয় তবে সর্বপ্রযত্নে সেই প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করতে হবে এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহ এবং মন্ত্রিমণ্ডলী এই ব্যবস্থার সঙ্গে কোনোপ্রকার সহযোগিতাই করবেন না। এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হলে প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ ও দায়িত্ব নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে দেওয়া হল।"

গান্ধী এবং সুভাষ বোসের মধ্যে পার্থক্য

কংগ্রেসের বামপন্থী এবং দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে বিভেদ বেড়ে যাচ্ছিল। কংগ্রেস মন্ত্রিসভার আমলে এই বিরোধ বিশেষভাবে প্রসার লাভ করল।

১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র বোস কংগ্রেস সভাপতির পদে নির্বাচন প্রার্থী হন। তিনি Federation-এর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ব্যাপক সংগ্রামের কার্যক্রম পেশ করলেন। তিনি কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের নীতি এবং রাজনৈতিক কার্যাবলীর কঠোর সমালোচনা করেন।

সোস্যালিস্ট পার্টি, কমিউনিস্টরা এবং কংগ্রেসের আমূল পরিবর্তনপন্থীরা তাকে সমর্থন করে।

অপর প্রার্থী ছিলেন প্রবীণ ও বিশিষ্ট দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতা পট্টভি সীতারামিয়া, গান্ধী এঁকে সমর্থন করেন।

ত্রিপুরিতে কংগ্রেসের যে পরবর্তী অধিবেশন হবার কথা সুভাষ বোস নির্বাচনে জিতে তার সভাপতি পদ লাভ করলেন। তিনি পেলেন ১,৫৭৫ ভোট। তাঁর বিরোধী প্রার্থী ১,৩৭৬ ভোট পান।

বোসের সাফল্যে দুটো জিনিস বোঝা গেল। প্রথমতঃ কংগ্রেসের মধ্যে আমূল পরিবর্তনপন্থীদের দ্রুত বিস্তার হচ্ছে এবং দ্বিতীয়তঃ দক্ষিণপন্থী নেতৃবর্গ কর্তৃক অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বোস সভাপতি নির্বাচিত হবার পরিণামে ওয়ার্কিং কমিটির পনের জন সদস্যের মধ্যে বারো জনই পদত্যাগ করলেন।

কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনে ফেডারেল ব্যবস্থা নাকচ করে 'জাতীয় দাবী' সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব পাশ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয় যে ফেডারেশন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলে কংগ্রেস তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে।

অপর একটি প্রস্তাব পাশ করে গান্ধীর নেতৃত্বে আস্থা জ্ঞাপন করে বলা হল যে সভাপতিকে গান্ধীর ইচ্ছার সঙ্গে সংগতি রেখে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে হবে।

এই প্রস্তাবে গান্ধীর হাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা তুলে দেওয়া হল।

ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের ব্যাপারে বোস এবং গান্ধী একমত হতে পারলেন না, ফলে বোস পদত্যাগ করলেন। তার জায়গায় রাজেন্দ্রপ্রসাদ সভাপতি পদে নির্বাচিত হলেন।

অতঃপর বোস ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেন।

মে মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র আরও অনমনীয় করা হল। কংগ্রেস মন্ত্রিসভার ওপর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হ্রাস করা হল এবং কংগ্রেস কমিটিসমূহের সম্মতি ব্যতিরেকে কোনো কংগ্রেস সদস্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করতে পারবেন না বলে স্থির করা হল। এর ফলে কোনো কংগ্রেস সদস্যের পক্ষে ক্ষমতাধিষ্ঠিত কংগ্রেস নেতৃত্বের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনোরকম প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ করা অসম্ভব হয়ে গেল।

বামপন্থী গোষ্ঠীসমূহের কার্যক্রম স্তব্ধ করে দেবার জন্য দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের প্রাধান্যাধীন কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বামপন্থীরা প্রতিবাদ জ্ঞাপন করবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করল। এই কারণে সুভাষচন্দ্রকে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হল। তাকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ পরিত্যাগ করতে হল।

কংগ্রেস যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়েছিল। এই ব্যবস্থা চালু হলে গণসংগ্রাম শুরু করবে বলে কংগ্রেস ঘোষণা করেছিল।

শ্রমিক ও কৃষকদের আন্দোলন দৃঢ়তার সংগে এগিয়ে চলছিল। জনসাধারণের গণতান্ত্রিক সামন্ততন্ত্রবিরোধী আন্দোলন প্রসারলাভ করছিল।

দেশের পরিস্থিতি যখন এইরকম তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

আলোচ্য বিষয় আরও বিস্তারিত করলে স্থানাভাব হতে পারে। তাছাড়া এই বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য ভারতীয় জাতীয়তাবাদ উদ্ভবের সামাজিক পটভূমি এবং মৌল সামাজিক কারণসমূহ আলোচনা করা, রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের পূর্ণাংগ ইতিহাস প্রণয়ন করা নয়, সুতরাং এই বিষয়ের আলোচনা এখানে সমাপ্ত করাই বাঞ্ছনীয়।

সূত্র নির্দেশ

১ W. Roy Smith দ্রষ্টব্য।
২ Buch (2), পৃ· ১৪-৫-তে উদ্ধৃত।
৩ Kaye and Malleson দ্রষ্টব্য।
৪ Joan Beauchamp, পৃ· ৩৫।
৫ উপরিউক্ত, পৃ· ৩৫।
৬ R. P. Dutt, পৃ· ২৭৪ দ্রষ্টব্য।
৭ Kaye and Malleson, Wintringham, Dutt এবং Krishna দ্রষ্টব্য।
৮ Hans Kohn, পৃ· ৩৫৯ দ্রষ্টব্য।
৯ Jawharlal Nehru, Brailsford এবং Chudgar দ্রষ্টব্য।
১০ Karl Marx, পৃ· ৫৫ দ্রষ্টব্য।
১১ Temple, পৃ· ৭৮ দ্রষ্টব্য।
১২ Thompson and Garrat, পৃ· ৪৯২ দ্রষ্টব্য।
১৩ উপরিউক্ত, পৃ· ৪৯৩।
১৪ John Stuart Mill, Hans Kohn দ্রষ্টব্য।
১৫ Buch, পৃ· ১৫১।
১৬ Sir G. Arthur, পৃ· ১৭৭।
১৭ Hans Kohn, পৃ· ৩৬০।
১৮ Sir William Wedderburn, পৃ· ১০১।
১৯ R. P. Dutt, পৃ· ২৭৯।
২০ Sir William Wedderburn কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ· ৭৭।
২১ Buch, পৃ· ১৭০-এ উদ্ধৃত।
২২ Andrews and Mukherjee, পৃ· ১২৮-৯।
২৩ Pattabhi Sitaramayya, পৃ· ২৬-৭ দ্রষ্টব্য।
২৪ Annie Besant, পৃ· ৭ দ্রষ্টব্য।
২৫ Kellock কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ· ১২০।
২৬ Surendranath Bannerji, পৃ· ৯৪-৫।

২৭ উপরিউক্ত, পৃ· ৩১৫–৬।
২৮ **Congress Presidential Addresses, First Series,** পৃ· ২৫৪-৫।
২৯ Congress Presidential Addresses, First Series পৃ· ৭-৮।
৩০ Pherozshah Mehta, R. P. Dutt কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ· ২৮৮।
৩১ R. C. Dutt, পৃ· XVIII.
৩২ Gokhale, পৃ· ১০০৫-৬।
৩৩ Pattabhi Sitaramayya, পৃ· ৯৪–৫ দ্রষ্টব্য।
৩৪ উপরিউক্ত, পৃ· ১০৯।
৩৫ উপরিউক্ত, পৃ· ১০৯।
৩৬ Ronaldshay, Vol. II, পৃ. ১৫১।
৩৭ Pattabhi Sitaramayya কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ· ১১২-১৩।
৩৮ **Congress Presidential Addresses, Second Series,** পৃ· ১২।
৩৯ উপরিউক্ত, পৃ· ১৬৭।
৪০ Congress Presidential Address, First Series, পৃ· ৭৩৮–৯।
৪১ Pattabhi Sitaramayya, পৃ· ১১।
৪২ B. C. Pal, Bucr (2), পৃ· ১০৩–এ উদ্ধৃত।
৪৩ B. C. Pal, পৃ· ৩৬।
৪৪ Buch (2) কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ· ১৪৪।
৪৫ উপরিউক্ত, পৃ· ৪৫।
৪৬ উপরিউক্ত, পৃ· ১৪৫–৬।
৪৭ উপরিউক্ত, পৃ· ১২৭–৮।
৪৮ উপরিউক্ত, পৃ· ১৪৬।
৪৯ R. P. Dutt, পৃ· ২৯২।
৫০ Jawharlal Nehru, পৃ· ২৩–৪।
৫১ R. P. Dutt, পৃ· ৪১৮।
৫২ উপরিউক্ত, পৃ· ৪১৬।
৫৩ Tilak, Buch (2), পৃ· ২৮–এ উদ্ধৃত।
৫৪ উপরিউক্ত, পৃ· ২৯।
৫৫ উপরিউক্ত, পৃ· ৩৪–৫।
৫৬ উপরিউক্ত, পৃ· ৪৯।
৫৭ Pattabhi Sitaramayya কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ· ১৬৪–৫।
৫৮ এই তথ্যটি প্রধানতঃ Rawlatt Committee Report ভিত্তিক।
৫৯ W. Roy Smith, পৃ· ৬৩–৪।
৬০ W. Roy Smith, পৃ· ৮০ দ্রষ্টব্য।
৬১ Pattabhi Sitaramayya, পৃ· ২৮০ দ্রষ্টব্য।
৬২ **Young India,** 31 December, 1919.
৬৩ Pattabhi Sitaramayya, পৃ· ৩৩৫।
৬৪ উপরিউক্ত, পৃ· ৩৩১।
৬৫ উপরিউক্ত, পৃ· ৩৩১।
৬৬ Pattabhi Sitaramayya কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ· ৩৮৪।

৬৭ Lord Reading, **Telegraphic Correspondence Regarding the Situation in India,** Cmd. 1586, 1922.
৬৮ Subhas Bose, পৃ: ৯০।
৬৯ Pattabhi Sitaramayya, পৃ: ৩৯৯-৪০০।
৭০ স্বরাজ দলের নেতার বিবৃতি, Pattabhi Sitaramayya কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ: ৪৬২।
৭১ Pattabhi Sitaramayya দ্রষ্টব্য।
৭২ Jawharlal Nehru, পৃ: ৪৫৯।
৭৩ John Beauchamp কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ: ১৮৫।
৭৪ Pattabhi Sitaramayya কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ: ৫৬০।
৭৫ **Government of India Report, India, 1928-9.**
৭৬ Gandhi, R. P. Dutt কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ: ৩৩১।
৭৭ R. P. Dutt কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ: ৩৪২।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠী ও সংখ্যালঘু সমস্যা

ভারতে জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠী ও সংখ্যালঘু সমস্যা

জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠী ও সংখ্যালঘু সমস্যা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রধান সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম।

অন্ধ্র, মালয়ালী, কর্ণাটকী, মহারাষ্ট্রীয়, বালুচি ইত্যাদি জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীসমূহ ও ভারতীয় মুসলমান, শিখ, অবনত শ্রেণী ও অন্যান্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক জাগরণ বৃদ্ধি পাওয়াতে সমস্যাটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পেঁছেছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলন ও স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষের রাষ্ট্রকাঠামোর প্রকৃতি—উভয়ের দিক থেকেই সমস্যাটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

জাতি ও সংখ্যালঘু সমস্যা কেবলমাত্র ভারতীয় জাতীয়তাবাদেরই সমস্যা নয়। অস্ট্রীয়, হাঙ্গেরীয়, রুশ এবং অন্যান্য কিছুসংখ্যক আধুনিক জাতের ইতিহাসে ঐ ধরনের সমস্যা উদ্ভূত হয়েছিল এবং তার সমাধান করবার প্রশ্ন উঠেছিল।

প্রতিটি জাতিই যে তাদের ঐতিহাসিক অগ্রগতির পথে জাতিভাবসম্পন্ন গোষ্ঠীর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংরেজ ও ফরাসীদের কথা বলা যায়। জাতি হিসাবে তাদের গড়ে ওঠার পথে ও জাতি হিসাবে তাদের সংহতি এবং পরবর্তীকালে পরিপূর্ণ বিকাশের প্রশ্নে এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় নি। এর বিপরীত দৃষ্টান্ত পূর্ব ইউরোপীয় দেশের জাতিসমূহ যেমন অস্ট্রীয়, হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্য, বলকানজাতিসমূহ প্রভৃতি। এরা এইরূপ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল।[১] এই অবস্থাভেদের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কারণ আছে।

জাতীয়তাবাদ উদ্ভবের মৌল কারণ

আধুনিক জাতিসমূহের ঐতিহাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করলে একটা মূলগত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় : এই জাতিগুলো সমাজের পুঁজিবাদী বিকাশের পরিণতি। পুঁজিবাদী আর্থিক ব্যবস্থার ব্যাপক বিকাশ ও অগ্রগতি আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অনৈক্য দূর করে জনসাধারণকে একটা রাজনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে সংঘবদ্ধ করে এবং একটা সুসঙ্গতিপূর্ণ জাতিতে পরিণত করে।

'আধুনিক পুঁজিবাদ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে জনসাধারণের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সংযোগ সৃষ্টি হয়। এটা একটা

প্রবল সংহতিসাধনকারী শক্তি। এর প্রভাবে সামন্ততন্ত্রের বাধাগুলো ভেঙে যায়, বড় বড় শিল্পকেন্দ্রগুলোতে জনসাধারণ একত্রিত হয়, গ্রাম শহরের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং একটা মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে ওঠে। এই মধ্যবিত্তশ্রেণী শুরুর দিকে জাতীয়তাবাদের নতুন ধারণার মুখ্য প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং আধুনিক জাতির উদ্ভব বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সামন্ততান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতা ও প্রভেদ লোপ করে দেয় এবং সর্বপ্রথম একটা সাধারণ সংগ্রামে সাধারণ ভাবধারায় বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করে। এইভাবে ব্রিটিশ জাতি সপ্তদশ শতাব্দীর বিপ্লব থেকে জন্মেছিল এবং ফরাসী জাতি ১৭৮৯ সালের বিপ্লব থেকে উদ্ভূত হয়েছিল।'২

যেসব দেশে কেন্দ্রীভূত জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগেই বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীসমূহ আর্থিক ও তজ্জনিত ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক সংহতি সাধনের দ্বারা একত্রিত ও সংহত জাতিতে পরিণত হয়েছিল সেইসব দেশে জাতি ও সংখ্যালঘুর কোনো উল্লেখযোগ্য সমস্যা দেখা দেয় না। অন্যদিকে যে সব দেশে ঐতিহাসিক কারণে বিচ্ছিন্ন কোম ও জনগোষ্ঠী পুঁজিবাদী আর্থিক বিকাশের দরুন সংহত জাতিতে পরিণত হয়ে সর্বজনীন আর্থিক ব্যবস্থাভুক্ত ও সর্বজনীন সাংস্কৃতিক বোধের অভিজ্ঞতা অর্জনের আগেই কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের পত্তন হয়েছে সেসব দেশে ঐতিহাসিক ঘটনাক্রমে জাতিভাবসম্পন্ন গোষ্ঠী ও জাতীয় সংখ্যালঘু সমস্যা উদ্ভূত হয়েছে।

এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্টালিন সুন্দরভাবে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিয়েছেন। স্টালিনের উক্তি ঃ

"আধুনিক জাতি একটা নির্দিষ্ট কালে বিধৃত ঘটনা সংস্থানের পরিণতি ঃ এটা প্রসারমান পুঁজিবাদের ফল। সামন্ততন্ত্রের অবলুপ্তি ও পুঁজিবাদের বিকাশের প্রক্রিয়াই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জাতিতে রূপান্তরিত হবার প্রক্রিয়াও বটে। পুঁজিবাদের জয়যাত্রা এবং সামন্ততান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে এর বিজয়াভিযানের সময়ই ব্রিটিশ, ফরাসী, জার্মান ও ইটালীয়রা জাতি হিসাবে গড়ে উঠেছিল।

যেখানে জাতিগঠন ও কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রগঠন মোটামুটি একই সময়ে ঘটেছিল সেখানে স্বাভাবিকভাবেই জাতি রাষ্ট্রের বহিরাবরণ হয়ে উঠেছিল এবং স্বাধীন বুর্জোয়া জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। এর দৃষ্টান্ত গ্রেট ব্রিটেন (আয়ারল্যান্ড বাদে) ফ্রান্স ও ইটালী। অন্যদিকে পূর্ব ইউরোপে আত্মরক্ষার তাগিদে (তুর্কী, মোঙ্গল ও অন্যান্যদের আক্রমণের বিরুদ্ধে) সামন্ততন্ত্র ভেঙে যাবার আগেই এবং সেইজন্য জাতিগঠনের আগেই কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল। এর ফলে এইসব জায়গায় জাতি জাতীয় রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে ওঠে নি বা উঠতে পারে নি। এইসব ক্ষেত্রে কতকগুলো মিশ্রিত বহুজাতির বুর্জোয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল—অস্ট্রীয়, হাঙ্গেরী ও রাশিয়া এর দৃষ্টান্ত।"৩

ফলস্বরূপ আরো বেশী আর্থিক ও অন্যবিধ অগ্রগতির ফলে ও সেই সঙ্গে প্রভুত্বপরায়ণ জাতিভাবসম্পন্ন গোষ্ঠীসমূহের রাজনৈতিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক পীড়নের দরুন এইসব বহুজাতীয় রাষ্ট্রের দেশগুলোতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতিসত্তার চেতনা বেড়ে গিয়েছিল।৪ এইসব জাতিভাবসম্পন্ন গোষ্ঠীসমূহ অবদমিত হয়েছিল। কিন্তু এখন আর্থিক প্রশ্নে সংঘবদ্ধ

এবং জাতিসচেতন হয়েছিল। এরা আবার নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করত। এরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা এমনকি সার্বভৌম রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য আন্দোলন শুরু করেছিল।

অনুরূপভাবে রাষ্ট্রের মধ্যে ইতস্তত বিচ্ছিন্ন ধর্মীয় (যথা ইহুদী) অথবা গোষ্ঠীগত সংখ্যালঘুরা সচেতন হয়ে ধর্মীয় স্বাধীনতার উপযুক্ত রক্ষাকবচ, ভাষা সংস্কৃতি ইত্যাদির অবাধ অগ্রগতির দাবীতে আন্দোলন শুরু করেছিল।

জাতি ও জাতীয় সংখ্যালঘু : এদের পার্থক্য

জাতীয় সংখ্যালঘুর সঙ্গে জাতির তফাৎ এই যে জাতিভুক্ত জনগণ একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করে থাকে, সাধারণতঃ একই ভাষায় কথা বলে ও সর্বোপরি একটা সর্বজনীন আর্থিক ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়। উপরন্তু তাদের একটা সর্বজনীন মানসিক গঠন দেখা যায়। এটা সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রকাশ হয়।

'একটা জাতি ঐতিহাসিকভাবে বিবর্তিত একটা স্থায়ী সর্বজনীন ভাষা, ভূখণ্ড, আর্থিক জীবন ও মানসিক গঠনসম্পন্ন জনগোষ্ঠী।'৫

একটা জাতিভুক্ত লোকেদের বিভিন্ন ধর্ম থাকতে পারে কিন্তু তা মূল জাতিত্বকে প্রভাবিত করবে না, কেননা ধর্ম স্থায়ী ব্যাপার নয়। "প্রাণহীন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান এবং বিলীয়মান মনস্তাত্ত্বিক সংস্কার সচল, সামাজিক আর্থিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাবে" পরিবর্তিত হয়ে যায়।৬

এইভাবে দেখা যায় ব্রিটিশদের মধ্যে রয়েছে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ও ক্যাথলিক, উপরন্তু আছে জড়বাদী ও অজ্ঞাবাদীগণ। কিন্তু ব্রিটিশরা একটা জাতিতে পরিণত হয়েছে।

ভারতীয় মুসলমান এবং অন্যান্য অবনমিত শ্রেণীসমূহের জাতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা রাষ্ট্রের সমগ্র ভূখণ্ড জুড়ে ছড়িয়ে আছে। যখন কোনো-রকম গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি থাকে না, তখন তারা এক ধর্মের ছত্রছায়ায় একত্রিত হয়, অথবা কোনো সুনির্দিষ্ট সামাজিক অভিযোগের ফলে সংবদ্ধ হয়। অবশ্য তারা কিন্তু পৃথক জাতিতে পরিণত হতে পারে না, কেননা তাদের সব সভ্যরা একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করে না ও একটা সর্বজনীন আর্থিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে তাদের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন জাতিত্ববোধসম্পন্ন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে ও তারা বিভিন্ন ভূখণ্ডে বসবাস করে এবং বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও পৃথক থাকে।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য

প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের ভারতীয় জনসাধারণ সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে অসংবদ্ধ ছিল। ভারতীয়গণ যেভাবে সুসংহত আধুনিক জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল সেটা ইংরেজ ও ফরাসী জাতির পথের অনুরূপ নয়। বিদেশী অধিকার ও ঔপনিবেশিক শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ পুঁজিবাদই ভারতীয় সামন্ততন্ত্রকে অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে পঙ্গু করে দিয়েছিল। নতুন পুঁজিবাদী

আর্থিক ব্যবস্থার সূচনা করে ভারতবর্ষকে অর্থনৈতিক দিক থেকে একত্রিত করেছিল। সর্বতোমুখী অগ্রগতির জন্যও ঢিলেঢালা প্রকৃতির মধ্যযুগীয় জনসাধারণকে আধুনিক জাতে রূপান্তরিত করার পক্ষে অত্যাবশ্যক আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল এবং ভারতীয় জনসাধারণকে এক কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের অধীনে এনেছিল।৭

অবশ্য এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে হবে। ভারতীয় সমাজের এই রূপান্তর বিদেশী পুঁজিবাদের স্বার্থে পরিচালিত হয়েছিল এবং তার প্রকৃতি, ব্যাপকতা ও গভীরতা এই স্বার্থের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এই কারণে ভারতীয় সমাজের এই রূপান্তর অসম্পূর্ণ ছিল এমনকি বিকৃত হয়ে উঠেছিল। একদিকে এই রূপান্তর অপরিণত মধ্যযুগীয় জনগোষ্ঠী থেকে ভারতীয় জাতি সৃষ্টির বস্তুগত ভিত্তি হয়ে উঠেছিল। অপরদিকে এর অসম্পূর্ণতার দরুন ভারতীয় জনসাধারণ ইংরাজ বা ফরাসীদের মতো ঘনসংবদ্ধ জাতিতে পরিণত হতে পারে নি।

ইউরোপে এইসব দেশে সামন্ততন্ত্রকে পরাজিত করে যে জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল সে রাষ্ট্র সামাজিক ও আর্থিক জীবনে সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসাবশেষ প্রায় বিলুপ্ত করে দিয়েছিল এবং সোৎসাহে অবাধ ও দ্রুত আর্থিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে সহায়তা করেছিল। কিন্তু ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব বজায় রেখেছিল এবং ব্রিটিশ শাসনের সামাজিক সহায় হিসাবে সাধারণত ভারতীয় সমাজের রক্ষণশীল শক্তিসমূহকে সমর্থন করেছিল। উপরন্তু সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী, ব্যবস্থাপক সভায় বিচ্ছিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি ব্যবস্থা যেগুলো বিভেদ টিকিয়ে রাখতে পারে এবং ভারতীয় জনসাধারণের জাতীয় সংহতিসাধন ব্যাহত করতে পারে, সেইগুলো ব্রিটিশ জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক প্রতিষেধকরূপে অবলম্বন করেছিল। এছাড়াও ব্রিটিশ সরকার সাধারণতঃ ভারতীয় অর্থনীতির স্বার্থকে ব্রিটিশ অগ্রাধিকারের অধীনস্থ করে রাখত। এর ফলে জাতীয় সংহতিসাধন ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনে যেটা অপরিহার্য সেই দ্রুত আর্থিক অগ্রগতির পথ বিঘ্নিত হয়েছিল। যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, শিল্পায়ন ও শহরের প্রসার এবং তার ফলস্বরূপ সামাজিক সুসঙ্গতি ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সীমিত এমনকি বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। প্রতিষেধক নীতি হিসাবে বিশেষ সাম্প্রদায়িক এবং অন্যান্য স্বার্থভাগ সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িক ও অন্যান্য গোঁড়া শক্তিকে সমর্থন করার যে কৌশল ব্রিটিশ সরকার অবলম্বন করেছিল তার ফলে জাতিবিরোধী বিভেদের প্রবণতা ত্বরান্বিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ ও ফরাসীদের জাতীয় সংহতি যে পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল ভারতবর্ষে ততটা না হবার মুখ্য কারণসমূহের মধ্যে এইগুলোর উল্লেখ করতে হয়।

অনুন্নত ঔপনিবেশিক পরিবেশে ও আর্থিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ব্যাহত হওয়া অবস্থায় যেসব সাম্প্রদায়িক ও অন্যান্য দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি পুষ্টিলাভ করেছিল জাতীয় সংহতি অপরিণত থাকার ব্যাপারেও তাদেরও অবদান আছে।

বস্তুতপক্ষে ব্রিটিশ আমলে নতুন ভারতীয় সমাজের মধ্যে যে প্রগতিশীল গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল তাদের উত্তরোত্তর সংহতি সচেতন সংগ্রামের ফলেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রসারিত হয়েছিল। অবাধ, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে রাজা, জমিদার, সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও অন্যান্য দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সমর্থনে ব্রিটিশ সরকার যে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিল প্রগতিশীল গোষ্ঠীর সংগ্রাম ছিল তার বিরুদ্ধে। ফলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ দেশীয় সামন্ততন্ত্রের অবশিষ্টাংশ দ্বারা সমর্থিত পুঁজিবাদের সংগে বিরোধে লিপ্ত হয়েছিল। ইংরেজ ও ফরাসীদের জাতীয়তাবাদের এটা একেবারে বিপরীত। জাতীয় গণতান্ত্রিক সংগ্রামে ইংরাজ ও ফরাসীরা স্বদেশীয় সামন্তশ্রেণীর সংগে বিরোধে লিপ্ত হয়েছিল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূলগত বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আর একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে বিদেশী পুঁজিবাদী জাতির ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনস্থ জনসাধারণের আন্দোলন ১৯২০ সালের পর গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। অর্থাৎ এই ঘটনা ঘটেছিল একদিকে বিশ্ব পুঁজিবাদের অবক্ষয় এবং অন্যদিকে শক্তিশালী সমাজতন্ত্রী বিশ্ব আন্দোলন গড়ে ওঠবার সময়। সমাজতন্ত্রী আন্দোলনগুলো যে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চালিত হয়েছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও সেই তারই বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের কথা বলি। এই আন্দোলনের মধ্যে বুর্জোয়ারা ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে বুর্জোয়ারা জাতীয় আন্দোলনকে গণআন্দোলনরূপে গড়ে তুলেছিল বটে, কিন্তু এরাই আবার শাসক সাম্রাজ্যবাদের সংগে মীমাংসা করতে চেয়েছিল। এর কারণ এই যে ভারতীয় বুর্জোয়ারা দেশের প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার ও মহাজনশ্রেণীর সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। অর্থনৈতিক দুর্বলতার দরুন তারা ব্রিটিশের পুঁজির ওপর নির্ভর করত এবং গণআন্দোলনকে শ্রেণীস্বার্থের বিপদ হিসাবে গণ্য করে তার ব্যাপকতাতে ভীত হয়ে উঠেছিল। বুর্জোয়াদের শ্রেণীস্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে এটা যুক্তিসংগত। এইরকম অবস্থায় ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের শক্তিগুলোর অ-বুর্জোয়া বিজয়ে পরিণতি লাভ এবং স্বাধীনতা-উত্তরপর্বে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথে চলার পরিপ্রেক্ষিত দেখা গিয়েছিল।

ইংরেজ ও ফরাসীদের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের অভ্যুত্থানকালে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে বুর্জোয়াদের জয় হয়েছিল এবং আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ থেকে সারা বিশ্বে পুঁজি-বাদী যুগের সূচনা হয়। বিশ্ব পুঁজিবাদের অবক্ষয়কালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিশ্বের অন্যান্য অংশের সমাজ-তান্ত্রিক অগ্রগতির সংগে সামঞ্জস্য রেখে বুর্জোয়া শক্তির বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক পথে বিকাশ ঘটবার সম্ভাবনা ছিল।

সুপ্ত জাতিভাবসম্পন্ন গোষ্ঠীসমূহের জাগরণ

আগেই বলা হয়েছে জাতিভাবসম্পন্ন গোষ্ঠী ও সংখ্যালঘুদের সমস্যা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটা অন্যতম প্রধান সমস্যা। আমরা

এখন দেখব কিভাবে এই সমস্যা উদ্ভূত হয়েছিল ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতির পুরোভাগে এসেছিল।

বিভিন্ন সম্প্রদায় ও প্রদেশের মধ্যে গতি ও সময় উভয়দিক দিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও প্রদেশের মধ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রসার অসম ছিল। আগেই দেখান হয়েছে যে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অধিকার ও শাসনের দরুন যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল এবং তার সংগে আসা শক্তিগুলোর কার্যকলাপের ফলে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়েছিল। ব্রিটিশ অধিকার ও নতুন শক্তিসমূহের অনুপ্রবেশ সারা দেশ জুড়ে একই সময়ে ঘটে নি বলে যে পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক ও জাতীয় সচেতনা জাগ্রত হয় তাও দেশের বিভিন্ন অংশে ও সম্প্রদায়ের মধ্যে অসমভাবে বেড়ে উঠেছিল। কোনো কোনো প্রদেশ ও সম্প্রদায় অন্যান্যদের থেকে কিছুটা আগে রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন হয়েছিল। এর ফলে ভারতীয় জনসাধারণের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সংগে মুসলমান, অবনত শ্রেণীসমূহ, শিখ ও অব্রাহ্মণদের মতো সামাজিক-ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং এক ভাষা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন অন্ধ্র, মালয়ালী, কর্ণাটকী, তামিল, মারাঠী, ওড়িয়া, গুজরাটি, পঞ্জাবী, সিন্ধি, বাঙালী, বিহারীদেরও মতো প্রাদেশিক সামাজিক গোষ্ঠীসমূহের আন্দোলন সমান্তরালভাবে চলছিল।

এইসব 'সুপ্ত' জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীসমূহের রাজনৈতিক জাগরণ বর্তমান শতাব্দীর ত্রিশের দশকে এমন একটা স্তরে উন্নীত হয়েছিল যে তারা নিজেদেরকে একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হিসাবে, একটা স্বতন্ত্র জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠী হিসাবে গণ্য করতে লাগল। কতকগুলো কারণে এ ব্যাপারটা ঘটেছিল। এইসব প্রদেশের অধিকতর আর্থিক অগ্রগতির ফলে, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীশ্রেণীর উল্লেখযোগ্য বিকাশ হয়েছিল। এদের মধ্যে শিক্ষিতশ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছিল। উপরন্তু ১৯৩০-৪ সালের বিরাট গণআইন অমান্য আন্দোলনের প্রভাব। এই আন্দোলন উপলক্ষে জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীসমূহের লোকেরা এই প্রথম জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়ে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। আরও একটা ব্যাপার উল্লেখযোগ্য এই সময় যে প্রাদেশিক সাহিত্য গড়ে উঠেছিল তাতে এইসব প্রদেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে জাতি সচেতনতার উন্মেষ হয়েছিল এবং জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীসমূহের স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অস্ফুট আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছিল। সাহিত্যের প্রভাবে জাতি-গোষ্ঠীচেতনা জনসাধারণের মধ্যে ক্রমশ বেড়ে চলছিল।

এইসব জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীসমূহের আন্দোলন আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রেরণা, স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা এবং স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসাবে স্বচ্ছন্দে উন্নতি করবার আকাঙ্ক্ষা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের ফলে তাদের ওপর যে বিশেষ চাপ পড়েছিল আন্দোলনগুলো তারই পরিণতি।

তৎকালীন প্রাদেশিক বিভাগ ভাষা অনুযায়ী তৈরী ছিল না, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রসারের সংগে সংগে শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে প্রদেশগুলো গঠিত হয়েছিল। জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে গোষ্ঠীসচেতনতা যত বেড়ে যেতে লাগল ততই এদের মধ্যে প্রাদেশিক বিভাগের বাধা ছাড়িয়ে স্বাধীন যৌথ জীবনের আকাঙ্ক্ষা বাড়তে লাগল। বিহারী, অন্ধ্র, কর্ণাটকীদের মতন জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীসমূহ যারা নিজস্ব ভাষায় কথা বলত এবং যাদের একটা নিজস্ব

সংস্কৃতি ছিল তারা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে একত্রিত ও সংহত হবার উদ্দেশ্যে প্রদেশগুলোর পুনর্বিন্যাসের দাবী তুলল। দৃষ্টান্তস্বরূপ অন্ধ্রবাসীরা মাদ্রাজ থেকে অন্ধ্রকে আলাদা করতে চেয়েছিল, কর্ণাটকীরা মহারাষ্ট্র থেকে আলাদা করে সংযুক্ত কর্ণাটকের দাবী করেছিল। বিহারী, ওড়িয়া এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ দাবী করেছিল।

এইসব জাগ্রত জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীরা তাদের নিজ ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিসাধন করল, নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করল, নিজেদের 'জাতীয় রংগমঞ্চ' সৃষ্টি করল এবং নিজেদের সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত ও সমৃদ্ধ করল। অন্ধ্রবাসী, মহারাষ্ট্রীয়, কর্ণাটকী এবং অন্যান্য জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীসমূহ নিজেদের 'চেম্বারস্ অফ কমার্স' প্রতিষ্ঠা করল। এ সবকিছুর মধ্যেই জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীভুক্ত জনসাধারণের সচেতনতা এবং তাদের সংহত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ পেত।

এক ভাষাভাষী এবং এক সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষের স্বতন্ত্র বাসভূমির প্রয়োজনে প্রদেশ পুনর্গঠনের দাবীর সঙ্গে এক ভারতীয় রাষ্ট্রের ধারণার কোনো বিরোধ নেই। মূলতঃ ব্রিটিশ শাসনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য এই প্রদেশগুলো সৃষ্টি করা হয়েছিল—সেই প্রদেশগুলোরই পুনর্গঠনের দাবী এরা করেছিল।

জাগ্রত জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীসমূহ কিন্তু পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবী করে নি। তারা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বিভাগ চায় নি।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই নতুন ভাবধারা স্বীকার করে নিয়েছিল এবং ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলোর পুনর্গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। কংগ্রেস যে স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের কথা চিন্তা করত সেটা যুক্তরাষ্ট্র—সব অংগের স্বার্থে সে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকার প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পররাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি সামগ্রিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ আর অন্যান্য সব বিষয়ে 'প্রদেশগুলো ব্যাপকতম স্বায়ত্তশাসনের অধিকার' পাবে। উপরন্তু কংগ্রেসের নীতি ছিল যে কোনো অংশকেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে জোরজবরদস্তি করে ধরে রাখা হবে না, কোনো অংগ ইচ্ছা করলে এর থেকে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে।

দুই বিপরীতমুখী প্রবণতা

এই জাগ্রত জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীসমূহের ক্রমবর্ধমান আন্দোলনের মধ্যে দুটো প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল। এর একটা প্রগতিশীল, অন্যটা হল প্রতিক্রিয়াশীল, জাতিবিরোধী ও বিধ্বংসী।

জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীসমূহের আঞ্চলিক সংহতি, ভাষা ও সংস্কৃতির অবাধ, অপ্রতিহত বিকাশের দাবী তাদের আত্মপ্রকাশ ও অগ্রগতির জাতীয় গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি মাত্র। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য ব্যাপক জাতীয় আন্দোলনে অন্যান্য জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীসমূহের সঙ্গে একত্রিত হওয়া বা বাকী ভারতবর্ষের সঙ্গে মিলিত হবার প্রশ্নে এই আশা-আকাঙ্ক্ষার কোনো বিরোধ ছিল না। বস্তুতপক্ষে এই জাগরণ জাতীয় স্তরে অন্যান্য গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিত হয়ে সুখ-সমৃদ্ধির প্রয়োজনে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য

সংগ্রাম করবার ইচ্ছা প্রবলতর করতে পারত। বস্তুতপক্ষে এই প্রবণতার মধ্যে জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীপোষিত বহুমুখী, সমৃদ্ধ, সমাজ ও সংস্কৃতি সমন্বিত স্বাধীন ভারতবর্ষের সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল।

কিন্তু সচেতন জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীসমূহের ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও কৃষিজীবী সম্প্রদায় অবস্থা বদলে দিতে লাগলেন। এক গোষ্ঠীর ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা অন্য গোষ্ঠী ও প্রদেশের প্রতিযোগীদের সম্বন্ধে ঘৃণা ও বিরূপের ভাব পোষণ করত, তাদের গোষ্ঠীগত স্বার্থকে জাতীয় আবরণে আবৃত করত। আবার এক গোষ্ঠীর বৃত্তিজীবীরা পেশাগত সুবিধা আদায়ের জন্য অন্য গোষ্ঠীর বৃত্তিজীবীদের বিরুদ্ধে নিজ গোষ্ঠীর মনে বিরূপভাব জাগাত এবং নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থকে জাতীয় ছদ্মবেশে ঢেকে দিল। এই বৃত্তিজীবীশ্রেণী, শিল্পপতি, ব্যবসায়ীরা ভারতীয় জাতীয় স্বাধীনতা এবং প্রগতির পক্ষে অত্যাবশ্যক জাতীয় ঐক্য ব্যাহত করেছে। শুধু তাই নয় এরা অনেক জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত ভারতীয় সমাজের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর অপ্রতিহত বিকাশও ব্যাহত করেছে। এইভাবে আন্তঃ প্রাদেশিক বিদ্বেষ এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে তার ফলে জাতীয় একতা ও সংহত জাতীয় আন্দোলনের প্রেরণা দুর্বল হয়ে গিয়েছিল এবং দেশে প্রগতিশীল সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগে সমস্ত সামাজিক গোষ্ঠীর সহযোগিতার উপায় আটকে গিয়েছিল।

ভারতীয় মুসলমান : জাতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

জাগ্রত জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীসমূহের ক্রমবর্ধমান আন্দোলনের সংগে সংগে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কাঠামোর মধ্যে আরো এক ধরনের আন্দোলন গড়ে উঠেছিল—এটা মুসলমান, অবনত শ্রেণীসমূহ, শিখ ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আন্দোলন।

এর আগে যে মাপকাঠির কথা বলা হয়েছে সেই অনুসারে গোষ্ঠীগুলোকে সংখ্যায় জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠী বলা যাবে না। তার কারণ এরা একই ভাষায় কথা বলত না, কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করত না বা এদের আর্থিক জীবন একরকমের ছিল না।

এদের মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য হল মুসলমান ও অবনত শ্রেণীসমূহ। এরা সমগ্র দেশজুড়ে ছড়িয়ে ছিল। তাদের বিভিন্ন অংশ সাধারণতঃ যে প্রদেশে বসবাস করত সেই প্রদেশের ভাষায় কথা বলত এবং যে প্রাদেশিক সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিল আর্থিক জীবনে তাদের সংগে একত্রে থাকত। মালাবারে মুসলমানেরা (মোপলারা) হিন্দুদের মতন পোষাক-পরিচ্ছদও পরত। বাংলা ও অন্যান্য কয়েকটা প্রদেশেও এইরকমটাই ছিল। প্রায়ই তাদের খাওয়াদাওয়াও সংশ্লিষ্ট প্রদেশের মতো ছিল। মোপলা এবং বাঙালী মুসলমানেরা প্রধানত ভাত খেত, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক কারণে ভাতই হল এইসব প্রদেশের প্রধান খাদ্য। অন্যদিকে পঞ্জাবের মুসলমানেরা গম আহার করত। হিন্দু বা মুসলমান সমস্ত পঞ্জাবীর পক্ষে গমই হল প্রধান খাদ্য। ধর্মই হল এইসব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সভ্যের সাধারণ বন্ধন। তারা যে প্রদেশের অন্তর্গত

ছিল সেই প্রদেশের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সংগে তাদের সামাজিক ও আর্থিক আদান-প্রদান চলত।

মুসলমানরা সংখ্যায় ছিল প্রায় ৯ কোটি এবং বাস্তবিকপক্ষে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে পরিব্যাপ্ত ছিল। তাদের কোনো সর্বজনীন আর্থিক স্বার্থ ছিল না। হিন্দুদের মতন তারাও জমিদার, রাজা (নবাব) বৃত্তিজীবী শ্রেণী, দোকানদার, মহাজন, কৃষক, শ্রমিক ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। হিন্দুদের মতন মুসলমানদেরও পৃথক পৃথক এমনকি বিরোধী স্বার্থসম্পন্ন একটা শ্রেণী-কাঠামো ছিল বস্তুতপক্ষে আর্থিক অবস্থার চাপে এইসব আপাতদৃষ্টিতে একত্রবদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণী অন্য ধর্মাবলম্বী সমশ্রেণীর সংগে মিলিত হবার দিকে যাচ্ছিল। কৃষকগণ নিজ নিজ শ্রেণীগত আর্থিক স্বার্থ দ্বারা চালিত হয়ে অন্য ধর্মাবলম্বী স্বশ্রেণীর লোকের সংগে শ্রেণীস্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টায় নিয়োজিত হবে। ধর্মের বন্ধন এই বাস্তব ঘটনাকে লোপ করতে পারে নি। সাম্প্রদায়িকতামূলক প্রচার কেবলমাত্র শ্রেণীবিভাগের ভিত্তিতে ঐতিহাসিক প্রগতিশীল ঐক্যের প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করতে পারে।

অনুরূপভাবে রাজনীতির ক্ষেত্রেও ভারতীয়রা নিজেদের স্বার্থে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সামগ্রিক জাতীয় আন্দোলনে একত্রিত হতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল কারণ ব্রিটিশ শাসন ভারতীয় সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছিল। আবার নিজস্ব আর্থিক ও গোষ্ঠীগত স্বার্থে প্রণোদিত হয়ে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শ্রেণীসমূহ তাদের নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলেছিল—যেমন জমিদারদের ইউনিয়ন, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন এবং সমাজতন্ত্রী দলসমূহ, চেম্বার অফ কমার্স, কিসানসভা প্রভৃতি।

ভারতীয় মুসলমানদের কোনো স্বতন্ত্র ভূখণ্ড ছিল না, নিজেদের স্বতন্ত্র কোনো আর্থিক জীবনও ছিল না, এই কারণে তাদের স্বতন্ত্র জাতি বলা চলে না। বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়াতে সাধারণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ-সহ কোনো সংহত সামাজিক কাঠামোও তারা গড়ে তোলে নি। ভূস্বামী, বুর্জোয়া স্বার্থসম্পন্ন লোকেরা মুসলমানদের প্রধান সংগঠন অল্ ইণ্ডিয়া মুসলীম লীগে প্রাধান্য লাভ করেছিল। এই সংগঠন এবং মুসলমানদের যে বৃত্তিজীবী গোষ্ঠী চাকরি ও ব্যবস্থাপক সভায় আসনের প্রশ্নে হিন্দু বৃত্তিজীবী শ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। উভয়েই মুসলমান জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতাকে সাম্প্রদায়িক খাতে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু এর ফলে ওপরে বর্ণিত মূলগত অবস্থার পরিবর্তন হয় নি। ব্রিটিশ শাসনের ফলে এবং ভারতীয় সমাজের শ্রেণীকাঠামো থেকে উদ্ভূত ভারতীয় জনগণের ক্রমবর্ধমান জাতীয় ঐক্য এবং ভারতীয় সমাজের নিম্নতর শ্রেণীর লোকেদের শ্রেণী ঐক্যের প্রক্রিয়া এইসব কার্যকলাপের ফলে কেবলমাত্র ব্যাহত হয়েছিল।

এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে প্রধানতঃ মুসলমান অধ্যুষিত সিন্ধু, বালুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ইত্যাদি প্রদেশের জনসাধারণ সুস্পষ্টভাবে জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠী ছিল। এদের প্রত্যেকেই নিজস্ব ভূখণ্ড, ভাষা, সংস্কৃতি ও আর্থিক জীবনের প্রশ্নে স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। এরা অন্ধ্র, মালয়ালী ইত্যাদি জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীর অনুরূপ। তবে একটা পার্থক্য আছে। পার্থক্যের কারণ

হল জনসাধারণের বৃহত্তম অংশ এক ধর্মাবলম্বী। প্রধানতঃ মুসলমান এই কারণেই তারা আলাদা জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠী তা নয়। এদের স্বতন্ত্র জাতি-ভাবাপন্ন গোষ্ঠী হবার কারণ এই যে এদের প্রত্যেকেই একটা নিজস্ব ভূখণ্ডে বাস করত, এক ভাষায় কথা বলত এবং নিজেদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও স্বতন্ত্র আর্থিক জীবন ছিল। তারা কোনো কল্পিত ভারতীয় মুসলমান জাতির অংশ ছিল না, তারা ছিল সুস্পষ্ট জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠী যার অধিকাংশ লোক এক ধর্মাবলম্বী ছিল।

মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কারণ

অনেকগুলো কারণে মুসলমান জনসাধারণের রাজনৈতিক জাগরণ ভ্রান্ত সাম্প্রদায়িক খাতে প্রবাহিত হয়েছিল। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বৃত্তিজীবী-শ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণী হিন্দু সমাজের থেকে কিছুটা পরে গড়ে উঠেছিল। মুসলমান বৃত্তিজীবী ও বুর্জোয়াশ্রেণী দেখল ইতিপূর্বেই হিন্দুরা সরকারী চাকরিতে, ব্যবসাবাণিজ্য ও আর্থিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত আসল জায়গাগুলো দখল করে নিয়েছে। চাকুরী ও শিল্প বাণিজ্যিক স্বার্থে হিন্দু প্রতিযোগীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মুসলমান বৃত্তিজীবী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে নিজ সম্প্রদায়ের জনগণের সমর্থন প্রয়োজন হল। একই শ্রেণীর বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে তারা হিন্দুসমাজ ও মুসলমান সমাজের সাম্প্রদায়িকতা বলে ব্যাখ্যা করল। দেশে ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও তৎকালীন ব্যবস্থাতে জনগণের দারিদ্র্যের দরুন রাজনীতি সচেতন মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় চেতনা উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছিল। মুসলমানদের বৃত্তিজীবী ও বুর্জোয়াশ্রেণী এদের সমর্থন আদায় করতে লাগল। জমিদার, বুর্জোয়াগোষ্ঠী এবং বৃত্তিজীবী শ্রেণীদের নিয়ে গঠিত ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের উচ্চতর শ্রেণী, মুসলমান জনগণের ক্রমবর্ধমান জাতীয় ও শ্রেণী জাগরণকে একটা বিকৃত সাম্প্রদায়িক রূপ দিতে চেষ্টা করেছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল যাতে শ্রেণীগত স্বার্থরক্ষার জন্য তাদের সমর্থন আদায় করা যায় এবং সেই সঙ্গে কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সম্প্রদায়ের দরিদ্রশ্রেণীর লোকেদের সংহত গণআন্দোলনকে আটকে দেওয়া যায়।

উপরন্তু শাসনক্ষমতা বজায় রাখার জন্য ব্রিটিশরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিকেন্দ্র তৈরী করবার নীতি গ্রহণ করেছিল। এই উদ্দেশ্যে তারা সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব, সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী ও প্রদেশ পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করেছিল। এই নীতি সাম্প্রদায়িকতা তীব্রতর করেছে এবং সংঘবদ্ধ ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্তরায় সৃষ্টি করেছে।[৮] পরে দেখান যাবে যে প্রতি-কেন্দ্রের নীতি যে ব্রিটিশ শাসনাধিকার শক্তিশালী করবার জন্যই প্রযুক্ত হয়েছিল একথা অনেক ব্রিটিশ রাজনীতিকই তা স্বীকার করেছেন।

ব্রিটিশ শাসনে ভারতের সামাজিক আর্থব্যবস্থার অদ্ভূত বিকাশ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অসম আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশ এবং অপরদিকে ব্রিটিশ সরকার এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কায়েমী স্বার্থসমূহের কৌশল—প্রধানতঃ এই দুই কারণে সাম্প্রদায়িকতার প্রসার ঘটে।

মুসলমানদের বিলম্বে জাগরণের কারণ

ভারতবর্ষের ৪০ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ১৯ কোটি লোক মুসলমান এবং এরা ভারতবর্ষের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘু গোষ্ঠী বলে এদের মধ্যে যে রাজনৈতিক অগ্রগতি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল আমরা এখন তার সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা করব।

ওয়াহাবি আন্দোলনই হল ভারতীয় মুসলমানদের সর্বপ্রথম সংগঠিত আন্দোলন। যদিও আদিতে এটা একটা ধর্মসংস্কার আন্দোলন হিসাবে শুরু হয়েছিল তবু পরবর্তী পর্বে এই আন্দোলন রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক স্তরে পেঁছিছিল।৯

রাজনীতির পরিচ্ছেদে আগেই বলা হয়েছে যে ওয়াহাবি আন্দোলনের একটা ব্রিটিশবিরোধী চরিত্র গড়ে উঠেছিল। এমনকি বাংলার একশ্রেণীর কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। এর ফলে কতকগুলো কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল। বিদ্রোহগুলো দমন করা হয়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহের কয়েক বছর পরেই আন্দোলনের অবসান ঘটে।

সিপাহী বিদ্রোহ-উত্তর কালই সম্ভবতঃ ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাসে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক উভয় দিক থেকে সবথেকে অন্ধকারময়। এই বিদ্রোহে হিন্দুদের থেকে মুসলমানদের ভূমিকা বড় ছিল বলে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় মুসলমানদের আর বিশ্বাস করতে পারল না এবং তাদের সম্বন্ধে বিরূপ নীতি অবলম্বন করল।১০

এইটাই হল প্রতিকেন্দ্র স্থাপনের নীতি। ক্ষমতা বজায় রাখবার জন্য ব্রিটিশরা এই নীতি বরাবর অনুসরণ করে গেছে। এমনকি বিদ্রোহের আগেই ১৮৪৩ সালে লর্ড এলেনবরা বলেছিলেন, "মুসলমানরা যে মূলতঃ আমাদের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই এবং আমাদের প্রকৃত নীতি হল হিন্দুদের সঙ্গে মিত্রতা করা।"১১ বিদ্রোহ দমনের অল্প কিছুদিন পরেই লর্ড এলফিনস্টোন মন্তব্য করেছিলেন, "'বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন কর' এইটাই ছিল প্রাচীন রোমানদের উদ্দেশ্য, এখন এইটাই হবে আমাদের নীতি।"১২

মুসলমানদের বস্তুতপক্ষে সেনাবিভাগে নেওয়া হতো না।১৩ এতে উচ্চতর শ্রেণীর মুসলমানরা খুব ক্ষতিগ্রস্ত হল কারণ সামরিক পেশাই ছিল এদের জীবিকা।

ব্রিটিশ সরকার শাসনতান্ত্রিক ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে ভারতে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন। ফলে আরবী ও পার্সীর গুরুত্ব কমে গিয়েছিল এবং মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে দারিদ্র্য সৃষ্টি হয়েছিল। সরকারের নতুন নীতির প্রতি গভীর বিতৃষ্ণাবশতঃ মুসলমানেরা নতুন শিক্ষা গ্রহণে অনীহা দেখাল। কিন্তু সেইসময়ে হিন্দুরা নতুন শিক্ষাগ্রহণ করে ইংরেজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী-শ্রেণী গড়ে তুলেছিল। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে কেবলমাত্র যে সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা এনেছিল তাই নয় সবরকম শাসনতান্ত্রিক পদ, আইন, ডাক্তারি ও অন্যান্য বৃত্তি থেকে তারা বাইরে পড়ে গিয়েছিল। নতুন শিক্ষা আত্তীকরণ করে নব্য হিন্দু শিক্ষিতশ্রেণী পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার ধারণায় উদ্বুদ্ধ

হয়েছিল এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পুরোগামী হয়ে নেতৃত্ব অর্জন করেছিল।

হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা যে পরে গড়ে উঠেছিল তার আরও একটা কারণ আছে। আর্থিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে অগ্রগণ্য মুসলমানদের অধিকাংশ বাস করত উত্তর ভারতে। অধিকাংশ হিন্দু অধ্যুষিত অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় উত্তর ভারতে ব্রিটিশ শাসন পরে প্রতিষ্ঠিত হয়। "বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই তিনটে বন্দর এলাকা যেখান থেকে ব্রিটেনের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল সেখানে স্বাভাবিকভাবেই বুর্জোয়াশ্রেণী অনেক তাড়াতাড়ি গড়ে উঠেছিল এবং ফলতঃ অনেক আগে স্বাধীনতার পর্যায়ে এসে পেঁছেছিল। এখন ব্যাপারটা এইরকম যে এইসব হল মূলতঃ হিন্দুপ্রধান এলাকা (অন্ততঃ মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তশ্রেণীর পক্ষে)। বাংলায় প্রচুর মুসলমান ছিল কিন্তু তারা ছিল কৃষক, সুতরাং তারা এতে প্রভাবিত হতো না।"[১৪]

এইসব হিন্দু প্রধান এলাকাতেই তাই নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আধুনিক যানবাহন ব্যবস্থা বিস্তারলাভ করেছিল, শিল্পনগরী গড়ে উঠেছিল এবং নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এমনকি প্রাক্-ব্রিটিশযুগে হিন্দুরাই ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত এবং রাজস্ব বিভাগের কর্মচারী ছিল তারাই। এরা নতুন আমলের সংগে নিজেদেরকে মানিয়ে নিল ও নতুন অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করল। ফলে হিন্দুরাই সবার আগে জাতীয়তাবাদী ও সামাজিক দিক থেকে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী গড়ে তুলেছিল।

স্যার সৈয়দ আহমেদ ও মুসলমান জাগরণ

স্যার সৈয়দ আহমেদ খানই (১৮১৭-৯৮) প্রথম মুসলমান নেতা যিনি মুসলমানদের একত্রিত করবার জন্য একটা আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন ও তাদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার ও ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য তিনি চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৬০ সালে তিনি 'The Loyal Muhammadens of India নামে একটা বই লেখেন। এই বইতে তিনি প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে মুসলমানরা হল মূলতঃ রাজভক্ত। তাদের সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক সন্দেহের মনোভাব পরিত্যাগ করা উচিত। অন্যদিকে এই বইতে তার বক্তব্য হল যে নিজেদের পক্ষ থেকে মুসলমানদেরও শাসনকার্যে যোগ দেওয়া উচিত এবং ভারতবর্ষে ব্রিটিশেরা যে প্রগতিশীল নতুন সংস্কৃতির সূচনা করেছিল তা গ্রহণ করা উচিত।

স্যার সৈয়দ ভারতীয় মুসলমানদের জন্য পাশ্চাত্য ধাঁচের শিল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন। এই পরিকল্পনাতে পাশ্চাত্য শিক্ষার সংগে মোটামুটি যুক্তিগ্রাহ্যভাবে ব্যাখ্যা করা ইসলামের মূল শিক্ষাগুলো একত্রিত করা হয়েছিল। মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের আর্থিক সাহায্য ও সরকারের সমর্থনে তিনি আলিগড়ে মহামেডান এ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এটা একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।

মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণী উৎসাহের সংগে আলিগড় আন্দোলনে সাড়া দিয়েছিল। আলিগড় কলেজ থেকে একটা আধুনিক বুদ্ধিজীবী মুসলমান সম্প্রদায় সৃষ্টি হল। এরা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি রাজনৈতিকভাবে আনুগত্য-পরায়ণ ছিল এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতিও এদের আগ্রহ ছিল। কলেজের লক্ষ্য ছিল 'ভারতবর্ষের মুসলমানদের ব্রিটিশ সম্রাটের যোগ্য ও সেবাপরায়ণ প্রজা হিসাবে গড়ে তোলা।'১৫ এই প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তকরা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনকে বিশ্বের সবথেকে চমকপ্রদ ঘটনা বলে অভিহিত করেছিল।১৬

স্যার সৈয়দ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতা করেছিলেন এবং মুসলমানদের এতে যোগদান থেকে নিরত করেছিলেন, "আমি তথাকথিত জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটা কঠিন কাজ হাতে নিয়েছি এবং 'ইণ্ডিয়ান ইউনাইটেড প্যাট্রিয়টিক এসোসিয়েশন' নামে একটা সমিতি গঠন করেছি।"১৭ তিনি দৃঢ়তার সংগে এই মত পোষণ করতেন যে ব্রিটিশ সরকার মুসলমান বৃত্তিজীবীশ্রেণীর প্রতি দাক্ষিণ্যপরায়ণ হবে। "সরকারের প্রতি আনুগত্যহীনতার ভাব যদি তোমরা না দেখাও তবে সরকার এটা অবশ্যই করবে (সেনাবাহিনীতে কর্ণেল, মেজর প্রভৃতি পদে নিয়োগ)।"১৮ স্যার সৈয়দের ভয় ছিল যে মুসলমান-দের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের সমর্থন না থাকলে উন্নতির আর্থিক ক্ষমতা ও শিক্ষার জোরে হিন্দুরা মুসলমানদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তাই তিনি ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের নীতি প্রচার করেছিলেন এবং যে কংগ্রেস সরকারের প্রতি উদারপন্থী সমালোচনার ও বিরোধিতার নীতি অবলম্বন করেছিল সেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধতা করেছিলেন।

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হবার পর স্যার সৈয়দ উদারপন্থী বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সক্রিয় বিরোধিতা করেছিলেন।

কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে স্যার সৈয়দ যৌথ নির্বাচনের পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন সমর্থন করেছিলেন।

স্যার সৈয়দের নেতৃত্বে যে আলিগড় আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা মুসলমানদের বিশেষতঃ মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে চেতনা সঞ্চারে তার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। চিরাগ আলি, সৈয়দ মাহদী আলি, মুস্তাফা খান, খুদা বক্স, কবি হালি, নাজির আহমেদ, মহম্মদ সিবলী নুমানীরা ছিলেন এই আন্দোলনের বিখ্যাত নেতা ও তার ভাবধারার প্রচারক। তারা মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে উদ্যোগী হতে, বর্তমান যুগে মুসলমানদের উপযোগী করে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে কোরানের ব্যাখ্যা করতে ও মোটামুটিভাবে আধুনিক ও গণতান্ত্রিক ধারায় সামাজিক ব্যবস্থা সংস্কার করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।১৯

আলিগড় আন্দোলনের প্রগতিশীল শিক্ষামূলক উদ্যোগের দরুন মুসলমান সমাজের মধ্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে উঠতে লাগল। ক্রমোন্নতির পথে এই শ্রেণী ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে উল্লেখযোগ্য আকার লাভ করল।

১৮৯০ সাল থেকে ১৯০৫ সালের বছরগুলোতে ভারতবর্ষে বিপুল রাজ-নৈতিক আলোড়ন দেখা গিয়েছিল। কোন কোন ঘটনার জন্য এই আলোড়ন হয়েছিল তা রাজনীতির পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে

যে কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ক্রমে ক্রমে তিলক, পাল, লাজপত রায় ও ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয়ের মতন চরমপন্থীদের প্রভাবাধীনে পড়েছিল।

পাল, ঘোষ ও অন্যান্য নেতারা নতুন পর্বে জাতীয়তাবাদকে যে হিন্দু ভাবধারায় আবৃত করেছিলেন তা রাজনীতি সচেতক মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণীর মনে সাড়া জাগাতে পারে নি। কিন্তু ১৯০৫ সালে ও তার পরবর্তী সময়ে এরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে কেন যোগদান করে নি এটা তার একটা কারণ মাত্র। অন্য কারণও ছিল। কংগ্রেসের প্রধান হাতিয়ার ছিল ব্রিটিশ পণ্য বর্জন বা বয়কট। বয়কট আন্দোলনের সাফল্যে ব্রিটিশ পুঁজিবাদীদের ক্ষতি হতে লাগল এবং ভারতীয় শিল্পপতিরা উপকৃত হচ্ছিল। ভারতীয় শিল্পপতিরা ছিল প্রধানতঃ হিন্দু। "১৯০৫ সাল নাগাদ ভারতবর্ষে শিল্পায়ন···আর নগন্য ছিল না। কিন্তু তখনও মধ্যবিত্ত মুসলমানরা ছিল প্রধানত বৃত্তিজীবী ও কেরানী, মিল-মালিক নয়। বিদেশী দ্রব্যের পরিবর্তে ভারতীয় দ্রব্য ব্যবহার করলে তাদের কোনো লাভ হতো না। বস্তুতপক্ষে তারা যেসব জিনিস কিনত বয়কটের ফলে সে সবের দাম বেড়ে গিয়েছিল।"২০

মুসলমানদের মনে হল যে তারা স্বদেশী আন্দোলন করলে কেবলমাত্র হিন্দু মিল মালিকরাই উপকৃত হবে। লর্ড কার্জন শাসনকার্যে সুবিধা হবে এই যুক্তিতে বাংলা বিভাগ প্রস্তাব করেছিলেন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উদারপন্থী নেতারা মনে করেছিলেন যে জাতীয়তাবাদকে দুর্বল করার জন্যই বঙ্গভঙ্গ করা হয়েছে। এই কারণে তাঁরা বঙ্গভঙ্গের সমালোচনা করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন মুসলমান প্রধান পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশকে প্রধানতঃ হিন্দু অধ্যুষিত পশ্চিমবাংলার প্রতিকেন্দ্র হিসাবে তৈরী করে রাজনীতিতে অগ্রসর বাংলার জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করাই বাংলা ভাগের উদ্দেশ্য। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদের মতে রাজনীতিতে অগ্রসর হিন্দুদের বিরুদ্ধে অনুন্নত মুসলমান সম্প্রদায়ের সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে বাংলা বিভাগ করা হয়েছিল।

যাহোক, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে রাজনীতি সচেতনতা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ব্রিটিশ সরকার তাদের শাসন-ব্যবস্থায় নিয়োগ করতে পারছিল না বলে তাদের মধ্যে মৃদুভাব হলেও সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনার মনোভাব গড়ে উঠছিল।

মুসলীম লীগের সাম্প্রদায়িক ও উচ্চবর্গীয় চরিত্র

১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত মুসলীম লীগ মুসলমানদের আদি রাজনৈতিক সংগঠন। মুসলীম লীগ প্রধানতঃ মুসলমান সম্প্রদায়ের উচ্চতম পর্যায়ের লোক ও বৃত্তিজীবীশ্রেণীর লোকেদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। মহামান্য আগা খানের নেতৃত্বে একটি মুসলমান প্রতিনিধিদল তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড মিণ্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এর কিছু পরেই মুসলীম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমান নেতারা সর্বপ্রকার নির্বাচনী ব্যবস্থায় মুসলমানদের পৃথক প্রতিনিধিত্ব দাবী করেছিল। তাদের এই দাবীর প্রতি ভাইসরয়ের মনোভাব ছিল সহানুভূতিসূচক। ভাইসরয় তাদের এই কথা বলেছিলেন ঃ

"আপনারা আমাকে যা বললেন তার সারবস্তু হল এই যে পৌরসভা, জেলা বোর্ড বা ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে যখনই নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন বা প্রসার করার কথা হবে তাতে মুসলমানদের সম্প্রদায় হিসাবে প্রতিনিধিত্বের অধিকার দিতে হবে। আপনারা দেখিয়েছেন যে বর্তমান নির্বাচকমণ্ডলী যেভাবে গঠিত তাতে মুসলমান প্রার্থীদের নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা নেই। যদি কোনোক্রমে হয়ও তাহলে তাকে স্বসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধবাদী সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা নির্বাচিত হতে হবে। আপনারা যথার্থই বলেছেন যে আপনাদের প্রস্তাব মুসলমানদের সংখ্যা দেখে বিচার করলে চলবে না। আপনাদের সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং এই সম্প্রদায় সাম্রাজ্যের জন্য যে সেবা করেছে তার কথা মনে রাখতে হবে। আমি আপনাদের সংগে সম্পূর্ণ একমত।"২১

লর্ড মর্লে এই মত পোষণ করতেন যে লর্ড মিণ্টো মুসলমান নেতাদের পৃথক প্রতিনিধিত্বের দাবী সমর্থন করবার ফলেই মুসলমানেরা সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগঠনের কথা চিন্তা করেছিল এবং মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলেছিল। তিনি লর্ড মিণ্টোকে লিখেছিলেন. "মুসলমান সম্পর্কিত বিতর্কে আমি আর আপনাকে সমর্থন করব না। সশ্রদ্ধভাবে আমি কেবলমাত্র এই কথাটাই আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে তাদের অতিরিক্ত দাবী সম্পর্কে আগেকার ভাষণের ফলেই মুসলমান সমস্যা শুরু হয়।"২২

ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক বিবর্তনে মুসলীম লীগের প্রতিষ্ঠা খুব উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এটাই ভারতীয় মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন। লীগ নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য ঘোষণা করেছিল। "(১) ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের ভাব বাড়িয়ে তোলা···(২) ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক ও অন্যান্য অধিকার রক্ষা করা ও সরকারের কাছে নম্র ভাষায়, তাদের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা পেশ করা (৩) উপরিউক্ত উদ্দেশ্য-সমূহের (১), (২) হানি না করে মুসলমানদের সংগে ভারতবর্ষের অন্যান্য সম্প্রদায়ের বন্ধুত্বের মনোভাব তৈরী করা।"২৩

১৯০৮ সালে অমৃতসরে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে লীগ যেসব দাবী পেশ করেছিল তাতে এর সাম্প্রদায়িক ও সেই সংগে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী-প্রকৃতি প্রকাশ পেয়েছিল। এই অধিবেশনে যেসব দাবী পেশ করা হয়েছিল তাতে স্থানীয় বোর্ড ও প্রিভি কাউন্সিলে মুসলমান প্রতিনিধিত্বের কথা এবং চাকুরীতে মুসলমানদের নির্দিষ্ট অংশের কথা বলা হয়েছিল। লীগ এইভাবে চাকুরী ও পদাধিকারের জন্য মুসলমান বৃত্তিজীবী শ্রেণীর স্বার্থ ও সংগ্রামের কথা ব্যক্ত করেছিল।

"সম্প্রদায়, শ্রেণী ও স্বার্থগোষ্ঠী" সম্পর্কিত ব্রিটিশ কৌশল

১৯০৯ সালের মর্লে-মিণ্টো শাসনসংস্কার ভারতীয় মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ও প্রতিনিধিত্বের সূচনা করেছিল। ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় রাষ্ট্রের সাংবিধানিক শাসনযন্ত্রে সাম্প্রদায়িক নীতির পত্তন করল। এই নীতি পরবর্তীকালে শিখ, অবনত শ্রেণীসমূহের মতো সম্প্রদায় এবং অন্যান্য

সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছিল। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন বেশ কয়েকটা সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা দিয়েছিল।

এছাড়া ব্রিটিশ সরকার জমিদার, ইউরোপীয় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি শ্রেণী ইত্যাদি অসাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর জন্যও পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা করেছিল।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা পৃথক নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করেন, কারণ তাঁদের মতে এতে জাতীয় একতার প্রসার ব্যাহত হবে এবং সাম্প্রদায়িক প্রভেদ বজায় থাকবে। তাঁরা এমনকি একথাও বলেছিলেন যে ভারতীয় জনসাধারণের জাতীয় একতা দুর্বল করে দেবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশরা এটাকে সুচিন্তিত রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে গ্রহণ করেছে।

অনেক ব্রিটিশ রাজনীতিক এই মত পোষণ করতেন যে প্রতিকেন্দ্র স্থাপনের নীতি অর্থাৎ একটা শ্রেণী অথবা সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর একটা শ্রেণী অথবা সম্প্রদায়ের ভারসাম্য রক্ষা করা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্ব রক্ষার পক্ষে অপরিহার্য। ইতিপূর্বে Lord Ellenborough এবং Mountstuart Elphinstone-এর কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে।

১৯২৬ সালে লর্ড অলিভার লিখেছিলেন "ভারত সম্পর্কে যাঁরা বিশেষ-ভাবে ওয়াকিবহাল তাঁরা কেউই একথা অস্বীকার করতে পারবেন না যে মোটের ওপর ব্রিটিশ সরকারী মহলে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি বেশীরকম অনুকূল ভাব আছে। এর কারণ ছিল কিছুটা ঘনিষ্ঠ সহানুভূতি কিন্তু এর প্রধান কারণ হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে পাল্লাভারী করে তোলা।"[২৪]

আগেই বলা হয়েছে যে ১৯০৬ সালে মুসলমান প্রতিনিধিবর্গকে লর্ড মিণ্টো খোলাখুলিভাবেই বলেছিলেন যে তারা যা করছে তার পুরস্কারস্বরূপ সাম্রাজ্যের স্বার্থে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। ব্যবস্থাপক সভায় ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন "...ভারতীয় স্বার্থগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়সমূহের ক্রমবর্ধমান প্রতিনিধিত্ব ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে দুর্বল তো করবেই না বরং শক্ত করবে।"[২৫]

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা বজায় রাখাই ছিল ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য মাথায় রেখেই ব্রিটিশ শাসকরা বিভিন্ন পর্বে রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণ করেছিলেন এমনকি উদারপন্থী ব্রিটিশ তত্ত্ববেত্তা ও রাজ-নীতিজ্ঞরাও ভারতবর্ষে সুশাসন চাইতেন। কিন্তু ভারতে স্বাধীন সরকারের কথা তারা ভাবতেন না। কোনো দেশের সুশাসক সরকার কখনো স্বাধীন সরকার ছাড়া হতে পারে না। জেমস্ মিল লিখেছেন, সাম্রাজ্যবাদের অধীনে স্বাধীন সরকার "পুরোপুরি অসম্ভব"। সাম্রাজ্যবাদের আওতার বাইরে এলে তবেই স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। মিণ্টো ১৯০৭ সালের ১৬ মে মর্লেকে লিখেছিলেন, "আমরা সেইদিকে (নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে দায়বদ্ধ সরকারের দিকে) বেশী দূর অগ্রসর হতে পারি না এবং আমরা যে কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করি না কেন, সেটা শুধুই অসম্ভব উচ্চাশাকে খুশী করার জন্য।"[২৬]

ফলে প্রতিকেন্দ্রের নীতি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়

হয়ে পড়েছিল ও গৃহীত হয়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পর দেশীয় রাজা ও জমিদারেরা প্রতিকেন্দ্র হিসাবে কার্যকর হয়ে উঠেছিল। লর্ড লিটন ভারতীয় অভিজাতশ্রেণীর সমর্থনের ওপর ভিত্তি করে ব্রিটিশ শাসন চালাতে চেয়েছেন। লর্ড ডাফরিন উদার বুদ্ধিজীবীদের সহায়তায় কাজ চালাতে চেয়েছিলেন। এই উদার বুদ্ধিজীবীরা গণবিদ্রোহের ক্রমবর্ধমান শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিকেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছিল। তিনি সাংবিধানিক আন্দোলনের মঞ্চ হিসাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিলেন। অবশ্য অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর মনে হয়েছিল যে কংগ্রেস 'রাজদ্রোহী' হয়ে উঠছে। মিণ্টো ক্রমবর্ধমান মুসলমান বৃত্তিজীবীশ্রেণীকে প্রধানতঃ হিন্দু বৃত্তিজীবীশ্রেণী ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যবিত্তশ্রেণীর উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রতিকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

এই নীতির সমালোচনা

পরবর্তী যুগে অবনত শ্রেণীসমূহ শিখ ও অন্যান্য সংখ্যালঘুগোষ্ঠীর মধ্যে যতই রাজনীতি সচেতনতা বাড়তে লাগল ততই শাসনসংস্কার উপলক্ষে তাদের বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলী ও প্রতিনিধিত্ব ও অন্যান্য অধিকার ও সুবিধা দেওয়া হতে লাগল। এর ফলে নবজাগ্রত রাজনীতিসচেতন গোষ্ঠীর মধ্যে পরিতুষ্টি দেখা দিতে লাগল। এই গোষ্ঠীগুলো ক্রমবর্ধমান গণ আন্দোলনের প্রতিকেন্দ্র হিসাবে কার্যকর হয়ে উঠল। কে. বি. কৃষ্ণও এই অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে যা লিখেছেন সেটা নীচে উদ্ধৃত হল :

"ব্রিটিশেরা কৃত্রিমভাবে কতকগুলো শ্রেণী সৃষ্টি করেছিল। যে মুহূর্তে এই শ্রেণীগুলোর উদ্ভব হল সেই মুহূর্তে তাদের মধ্যে সংগ্রামও শুরু হল। ব্রিটিশেরা এই সংগ্রামে প্রেরণা যুগিয়েছিল এবং একে আইনানুগতভাবে বাড়িয়ে তোলায় সহায়তা করেছিল। দেশীয় রাজন্যবর্গ, ভূস্বামী, শিল্পনির্ভর শ্রেণীসমূহ এবং মুসলমানদের দিয়ে আইনজীবী, শিক্ষক, ছাত্র এবং অন্যান্য মধ্যবিত্তশ্রেণীসমূহের দাবীদাওয়াগুলোর প্রতিকূলতা করার ব্যবস্থা করা হল। ···লর্ড লিটন এবং লর্ড কার্জন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে এমন একটা সমিতি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যেটা কংগ্রেসের সংগঠক বন্ধুদের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারবে। মিণ্টো এবং মর্লে উভয়েই চিঠিপত্রে এবং নির্দেশনামায় বিরুদ্ধবাদীতার দ্বারা ভারসাম্য রক্ষার কথা প্রকাশ্যেই বলেছেন। আজকের নতুন ভারতীয় সংবিধান ভারসাম্য নীতির প্রকৃষ্ট প্রয়োগের ওপর নির্ভরশীল।"২৭

এই লেখকের আরও কিছু মতামত উল্লেখযোগ্য : ভারতীয় মহাবিদ্রোহ থেকে নতুন ধরনের সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে মহাবিদ্রোহের সময় থেকে ব্রিটিশরা ভারতে যে নীতি অনুসরণ করে এসেছে সেটা উদারনীতি ও সাম্রাজ্যবাদের যুগ্ম রূপ। প্রতিকেন্দ্র তৈরী করার নীতি এই নতুন ধরনের সাম্রাজ্যবাদের একটা দিক। এই নীতি যুগপৎ উদারনৈতিক এবং সাম্রাজ্যবাদী, উদারনৈতিক এই অর্থে যে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব হলে তাদের দাবীদাওয়া মেনে নেওয়া হতো। অপরপক্ষে সাম্রাজ্যবাদী এই

কারণে যে দাবীদাওয়া যা কিছু মেনে নেওয়া হয়েছে তা সবসময় বিভিন্ন শ্রেণী এবং স্বার্থগোষ্ঠীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সংগে সঙ্গতি রেখে করা হতো।"২৮

আরও কথা আছে, "এই নীতির প্রধান তত্ত্বগত যুক্তি হল 'সম্প্রদায়, শ্রেণী ও স্বার্থগোষ্ঠীর নীতি।' শুরু থেকে এই ধারনার সংগে নিয়মমাফিক গণতন্ত্রের কোনো যোগ নেই। বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী ও শ্রেণী ক্ষমতালাভের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠতে থাকলে এই নীতি দ্বারা বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী শ্রেণী এবং কয়েকটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর (সম্প্রদায়) মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা হচ্ছিল। এইটাই ছিল এই নীতির একমাত্র উদ্দেশ্য।"২৯

"(১) ভারত সরকার যেভাবে শ্রেণীবিভাগ করেছে সেটা অবৈজ্ঞানিক, এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র নয় ; এতে প্রকৃত জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠী অথবা ঐতিহাসিক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব উপেক্ষা করা হয়েছে···

"(২) এই নীতি ভারতীয় নরমপন্থী রাজনীতি গোষ্ঠী তৈরী করেছে।

"(৩) এই নীতির ফলে পুরোপুরি ধর্মীয় ভিত্তিতে গঠিত কৃত্রিম সহযোগী, স্বার্থগোষ্ঠী ও শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিল। মুসলমানদের পরে শিখরা, তারপর ভারতীয় কৃষকেরা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় তারপর অস্পৃশ্য এইরকমভাবে ব্যাপারটা এগিয়ে চলছিল।···

"সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলীর প্রকৃত লক্ষ্য হল ভূস্বামীবর্গ, বণিক ও ব্যবসায়ীদের পৃথক পৃথক সীমাবদ্ধ নির্বাচকমণ্ডলী তৈরী করবার পর হিন্দু বৃত্তিজীবী শ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ভারসাম্য রক্ষা করবার জন্য মুসলমান বৃত্তিজীবীশ্রেণী সৃষ্টি করা। এই চিন্তার মধ্যেই সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব তত্ত্বের মূল খুঁজে পাওয়া যাবে।"৩০

লেখক ভারতে ব্রিটিশ নীতির চরিত্র নির্দেশ করে বলেছেন, "এটা হল বাধ্য করা, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ভারসাম্য, সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং সর্বময় প্রাধান্য দৃঢ়ীকরণ—এই সব কিছুর সংমিশ্রণ।"৩১

এমনকি যেসব সুযোগ-সুবিধাগুলো দেওয়া হতো সেগুলো সাধারণতঃ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনকে অক্ষুন্ন রাখবার উদ্দেশ্যেই দেওয়া হতো···। "যেসব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে বা ভবিষ্যতে যে কোনো সময় দেওয়া হবে সেগুলো যত উদারভাবাপন্নই হোক না কেন, ভারতের ওপর অধিকার ছাড়বার কোনো ইচ্ছাই আমাদের নেই, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়দেরও থাকবে না।"৩২ সামগ্রিক জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠীর জন্য যেসব সুবিধা ও সংস্কার অনুমোদন করা হয়েছিল সেগুলোর লক্ষ্যই ছিল জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে সংহত জাতীয় আন্দোলন প্রসার ব্যাহত করা। মর্লে-মিণ্টো শাসন সংস্কার, মণ্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার এবং ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন থেকে উদ্ভূত সংবিধান এ সব কিছুই দেশে অধিকতর সংখ্যায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও স্বার্থগোষ্ঠীকে বিশেষ প্রতিনিধিত্বের অধিকার দিয়েছিল, এইসব গোষ্ঠীর কতকগুলোর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল। ভারতীয় জনসাধারণের নিম্নতরশ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক জাগরণের

ফলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ক্রমশঃ প্রবলতর হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকারী নীতি বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে।

১৯১২ সালের পর থেকে মুসলমানদের মধ্যে উগ্র সংগ্রামশীলতার ক্রমবিকাশ

ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল এমনকি ১৯১২ সালের পর এই সচেতনতা উগ্ররূপ নিচ্ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী বছরগুলোতে মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণী রাজনীতিতে উত্তরোত্তর পরিপক্কতা লাভ করছিল। এনভার পাশার নেতৃত্বে জাতীয় গণতান্ত্রিক ইয়ং টার্ক মুভমেণ্টও ভারতীয় মুসলমানদের অনেকাংশে প্রভাবিত করেছিল। এই আন্দোলন ভারতীয় মুসলমানদের ভারতবর্ষের জন্য স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন সরকার স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণে উৎসাহিত করেছিল। পরে ১৯১৩ সালে লীগ এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে। মুসলমানরা এইভাবে দ্রুত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে এসে পড়তে লাগল।

"প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক আগে মুসলমানদের শিক্ষিত ও মুখর নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার মধ্যে নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং নিজেদের অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগল।"৩৩

রাজনৈতিক জাগরণের এই নতুন ও উন্নততর পর্বে মুসলমানদের প্রধান নেতা ছিলেন ডঃ আনসারী, আবুল কালাম আজাদ, মৌলানা মহম্মদ আলি এবং হাকিম আজমল খান। ১৯১২ সালে আজাদ 'অল হিলাল' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং মহম্মদ আলি 'কমরেড' নামে একটা ইংরেজী কাগজ এবং 'হামদর্দ' নামে একটা উর্দু কাগজ নিজে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাগুলো মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতা আরো গভীর করে তুলেছিল এবং তাদের জাতীয়তাবাদী প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করেছিল।

১৯১৩ সালে অনুষ্ঠিত লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে মুসলীম লীগ ঘোষণা করে যে তাদের লক্ষ্য হল "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ভারতবর্ষের উপযোগী স্বায়ত্তশাসন অর্জন করা।"

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর যেসব মুসলমান রাজনৈতিক নেতা এবং গোষ্ঠীর কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে যুদ্ধ পরিচালনার পক্ষে প্রতিকূল মনে হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করল। অল হিলাল, কমরেড, হামদর্দ ইত্যাদি কাগজের প্রকাশনা বন্ধ করে দেয় এবং ১৯১৫ সালে মহম্মদ আলি, সৌকত আলি, মৌলানা আজাদ, হজরত মোহানি প্রভৃতি মুসলমান নেতাদের অন্তরীন করে রাখে।

লীগ ও কংগ্রেস উভয়েরই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় লক্ষ্ণৌ শহরে। পণ্ডিত মালব্য, গান্ধী প্রমুখ বিখ্যাত কংগ্রেস নেতারা লীগের অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। লীগের এই নতুন জাতীয়তাবাদী মনোভাব মাননীয় আগা খানের কাছে অবাঞ্ছিত বলে মনে হল। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি লীগের স্থায়ী সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিলেন, লীগ যে রাজনৈতিক দিক দিয়ে আমূল সংস্কারপন্থী হয়ে উঠছিল এতে তারই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে ১৯১৬ সালে লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে সম্পাদিত লক্ষ্ণৌ চুক্তির কথা বলা হয়েছে। এই দুই সংগঠনের মধ্যে সহযোগিতার এটাই হল সর্বপ্রথম নিদর্শন। এই চুক্তি অনুসারে যেসব অঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যালঘু ছিল সেইসব অঞ্চলের মুসলমানদের বিশেষ সুবিধাসহ স্বতন্ত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্যে এই চুক্তির বক্তব্য ছিল, (ক) "যে সংস্কারের কথা বলা হয়েছে তা অনুমোদন করে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং (খ) সাম্রাজ্যের পুনর্গঠন উপলক্ষে ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতার অবস্থা থেকে উঠিয়ে স্বায়ত্তশাসিত ডোমিনিয়নের মর্যাদাসহ সাম্রাজ্যের সমান অংশীদার হিসাবে গণ্য করতে হবে।"

প্রধানতঃ মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীভিত্তিক লীগ নিশ্চিতভাবে জাতীয়তাবাদী ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিল। অবশ্য তার ভিত্তিটা ছিল সাম্প্রদায়িক।

১৯১৮ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে লীগ ভারতবর্ষের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী ব্যক্ত করেছিল।

খিলাফৎ এবং হিজরৎ আন্দোলন

খিলাফৎ বিক্ষোভ এবং আন্দোলনের জন্ম এবং ইতিহাস রাজনীতির অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, গান্ধীজী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতাদের সক্রিয় সমর্থনে মুসলমান নেতৃবৃন্দ খিলাফৎ কনফারেন্স গঠন করলেন। খিলাফৎ কনফারেন্সে স্থির হয় যে খিলাফৎ সংক্রান্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করা হবে। ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জন ও সরকারের সংগে অসহযোগিতার কর্মসূচীও এই কনফারেন্সে গৃহীত হয়েছিল।

পবিত্র ভূখণ্ড, অটোমান থ্রেস এবং স্মিরনা তুরস্ককে প্রত্যার্পণের জন্য কনফারেন্স এবং লীগ যে দাবী জানিয়েছিল তার প্রতি গান্ধী এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সোৎসাহে সমর্থন জ্ঞাপন করেছিল।

উলেমা অর্থাৎ মুসলীম ধর্মোপদেষ্টাগণ ১৯১৯ সালে জামাইত-উল-উলেমা নামে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠন খিলাফৎ কনফারেন্সের দাবী সমর্থন করে। এই সংগঠন ভারতীয় মুসলমানদের অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান জানিয়েছিল, অসহযোগ আন্দোলন ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয়তাবাদী গণ আন্দোলন, কংগ্রেস খিলাফৎ সম্মেলনের সমর্থন নিয়ে এই আন্দোলন শুরু করেছিল। এর লক্ষ্য ছিল সেভর চুক্তিজনিত অবিচার মোচন করা, পঞ্জাবে এবং দেশের অন্যান্য অংশে প্রচলিত দমনমূলক ব্যবস্থাদি রদ করা এবং 'স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করা'।

অসহযোগ আন্দোলনের বিভিন্ন পর্বের ইতিহাস অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। মুসলমানেরা তাদের নেতাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিপুল সংখ্যায় আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল "সর্বজনীন উত্তেজনার একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে অভূতপূর্ব ভ্রাতৃত্ববন্ধন।"[৩৪]

মহম্মদ আলি, সৌকত আলি ও আরো অনেক মুসলমান নেতা আন্দোলনের সময়ে বন্দী হয়েছিলেন। তাদের সংগঠনের ওপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য

করার জন্য শত শত মুসলমান স্বেচ্ছাসেবককে বন্দী করা হয়েছিল। মুসলমানরা আন্দোলনের সব পর্যায়েই যোগ দিয়েছিল।

সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের একদল মুসলমানরা হিজরত আন্দোলন সংগঠিত করেছিল। সেভর চুক্তির প্রতিবাদ হিসাবে তারা ভারতবর্ষ ত্যাগ করে আফগানিস্থানে গিয়ে বসবাস করা স্থির করল। আফগান সরকার কিন্তু তাদের প্রবেশ করতে দিল না, আন্দোলন ব্যর্থ হল। ১৯২১ সালে মোপলা বিদ্রোহ হয়। সরকারের মনে হয়েছিল যে খিলাফৎ নেতারা মোপলাদের অসহযোগ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য যে প্রচার করেছিলেন এই বিদ্রোহ তারই পরোক্ষ ফল।

কৃষক ও জমিদার ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলে মূলগতভাবে কৃষক ও জমিদারদের মধ্যে আর্থিক সংগ্রাম কিভাবে জটিল সাম্প্রদায়িক রূপ গ্রহণ করে মোপলা বিদ্রোহ তারই প্রকৃত দৃষ্টান্ত।

"মোপলা বিদ্রোহ ছিল আসলে হিন্দু মহাজন, জমিদার ও সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন। মাদ্রাজ পাবলিসিটি ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত একটি প্রচারপত্রে সমস্যাটা এইভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে : 'মোপলাদের বিদ্রোহের পেছনে দুই ধরনের কারণ আছে। ধর্মীয় প্রেরণাটাই বেশী জোরদার, তবে মোপলাদের কঠোর জীবনযাত্রা ও নাম্বুদ্রী জমিদারদের অতিস্বচ্ছল জীবনযাপনের আর্থিক বৈপরীত্যের পরিণতিও আছে।' "৩৫

মৌলানা হজরত মোহানী ১৯২১ সালে আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত মুসলীম লীগের অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "মুসলমানদের একথা বোঝা উচিত যে ভারতবর্ষে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলে তাদের দুই ধরনের লাভ হবে, প্রথমতঃ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের নাগরিক হিসাবে তারা সকলের সংগে সমানাধিকার ভোগ করবে এবং অন্যান্যদের সংগে সমান সুবিধা পাবে এবং দ্বিতীয়তঃ ব্রিটিশ প্রভাব সংকুচিত হলে গঠনমূলক কার্যকলাপের জন্য ইসলামী জগতের যে অবকাশ প্রয়োজন সেটা পাওয়া যাবে।"৩৬

আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে মোহানী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য হিসাবে স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে ভারতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করলে গান্ধীজী অসম্মত হন এবং তার 'চাপল্যের' জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করেছিলেন।

মোহানীর প্রস্তাব কংগ্রেস বাতিল করে দিয়েছিল।

চৌরিচৌরার ঘটনার পর গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেছিল।

ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতার বিবর্তনে অসহযোগ আন্দোলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিপুল। যে রাজনৈতিক সচেতনতা এতদিন মুসলমান সম্প্রদায়ের অভিজাত ও উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে সীমিত ছিল তা এখন জনসাধারণের এক অংশের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে—এতে এই ঘটনাই প্রকাশিত হয়েছে। এটা সত্যি যে খিলাফৎ আদতে একটা ধর্মীয় প্রশ্ন। কিন্তু স্বরাজের সংগ্রামের সংগে জড়িত হওয়ায় এই প্রশ্ন মুসলমান জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা জাগিয়ে তুলেছিল। আবার এই প্রথম হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বড় অংশ একটা জাতীয় লক্ষ্যের জন্য অর্থাৎ ভারতবর্ষে

স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য পরস্পরের সহযোগিতা করছিল। কংগ্রেস ও মুসলমান রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর সম্মিলিত নেতৃত্ব দ্বারা নির্ধারিত প্রত্যক্ষ আন্দোলন হিন্দু ও মুসলমানরা একত্রে যোগ দিয়েছিল। এই সংগ্রাম আর ব্যবস্থাপক সভায় আসনসংখ্যা বা সরকারী চাকরিতে পদপ্রাপ্তির লড়াই মাত্র নয়।

গান্ধীজী ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আন্দোলন প্রত্যাহার করায় জনসাধারণের মধ্যে নৈরাশ্যের ভাব এসেছিল। অন্যদিকে ১৯২২ সালে তুরস্কের জনগণ কর্তৃক ষষ্ঠ মহম্মদকে সুলতান ও খালিফা পদ থেকে অপসারণ এবং অল মজিদকে শুধুমাত্র খালিফা পদে প্রতিষ্ঠা করা ভারতীয় মুসলমানদের মনে নৈরাজ্য ঘনীভূত করেছিল। ইতিহাস ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে এক নিষ্ঠুর পরিহাস করল। ভারতীয় মুসলমানরা যে সংগ্রাম শুরু করেছিল তার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পবিত্র ভূখণ্ডের ওপর মুসলমান জগতের ধর্মগুরু তুরস্কের সুলতানের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। কিন্তু তুরস্কের জনগণই ধর্ম এবং রাষ্ট্রকে পৃথক করে তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করল।

যে হিন্দু মুসলমান একতা বিশেষভাবে বেড়ে গিয়েছিল অসহযোগ আন্দোলনের পর তা ভাঙতে শুরু করল। জাতীয় ঐক্যের জায়গায় সাম্প্রদায়িক শত্রুতা ও বিভেদ উত্তরোত্তর প্রবল হতে লাগল। অসহযোগ পরবর্তীকালে পরপর বেশ কয়েকটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটল। এর মধ্যে কোহাটের দাঙ্গাই সবথেকে ভয়াবহ।

১৯২২ সালের পর যে রাজনৈতিক নৈরাশ্য দেখা দিয়েছিল জওহরলাল নেহেরু তাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। "অকস্মাৎ আন্দোলনের গতি রোধ করবার (নেহেরু অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের বরদৌলি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করছেন) ফলেই দেশে দুঃখজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। রাজনৈতিক সংগ্রামে বিক্ষিপ্ত এবং বৃথা হিংসাত্মক ঘটনার অবসান ঘটল। কিন্তু এই দমিত হিংস্রতা বাইরে ফুটে বার হবার চেষ্টা করছিল এবং পরবর্তী বৎসরগুলো তাই বোধহয় সাম্প্রদায়িক অশান্তি বাড়িয়ে দিয়েছিল।"৩৭

সম্ভবতঃ এটা সত্য নয় যে 'চাপা হিংস্রতাই' 'সাম্প্রদায়িক অশান্তি' বিস্ফোরণের কারণ। সাম্প্রদায়িক প্রকোপের দুটো সাক্ষাৎ কারণ নির্দেশ করা যায়। প্রথমতঃ, জাতীয় সচেতনতার শিকড় তখনো বিশেষ করে অনুন্নত মুসলমানদের মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করে নি। দ্বিতীয়তঃ অসহযোগ আন্দোলন শেষ হয়ে যাওয়ার পর জাতীয়তাবাদী নেতারা কোনো উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী দিতে পারে নি। গান্ধীজীর মদ্যপান নিরোধ, সুতাকাটা, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ প্রভৃতির মতো অরাজনৈতিক গঠনমূলক পরিকল্পনা মুসলমান জনগণের কাছে আকর্ষণীয় হতে পারে নি। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পুরোবর্তী কংগ্রেস ভারতীয় জনসাধারণের জন্য কোনো উপযুক্ত রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক কর্মসূচী প্রণয়ন করতে পারে নি। এই কারণেই সাম্প্রদায়িক প্রচার বেশ সাফল্যলাভ করেছিল।

মুসলমানরা উত্তরোত্তর জাতীয়তাবাদ থেকে বিচ্যুত হয়ে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী কেন অবলম্বন করেছিল তার আরও একটা কারণ নির্দেশ করা যায়।

যদিও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারতীয় জনসাধারণের অসাম্প্রদায়িক ধর্ম-নিরপেক্ষ সামাজিক সংগঠন এবং এর লক্ষ্য ছিল জাতীয় স্বাধীনতা তবু গান্ধীজীর মতো এর বিখ্যাত নেতারা কোনো কোনো সময় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে হিন্দু-ধর্মীয় ভাবধারা ঢুকাতে চেয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় গান্ধীজী স্বরাজকে রামরাজ্য বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন। রাম-রাজ্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করে নি। রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য ভারতীয় জনসাধারণের ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনের মধ্যে হিন্দু ধর্মীয় ভাবধারা চাপিয়ে দেবার ফলে মুসলমানদের মনে একটা ভ্রান্ত সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল যে কংগ্রেস পরিচালিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আসলে হিন্দু আন্দোলন। এই প্রসঙ্গে আর পি দত্তের কথা উদ্ধৃত করা যায় ঃ "জাতীয় আন্দোলনের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক কার্যসূচী ধর্মীয় চেতনার ঊর্ধ্বে ভারতীয় জনসাধারণকে একত্রিত করতে পারে। বর্তমান সময়ে ঐ সাম্প্রদায়িক বিক্ষোভ প্রতিহত করবার জন্য ঐ ধরনের একটা প্রবল ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক একতাবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনই সবথেকে কার্যকর শক্তি হতে পারে।"৩৮

সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃত সত্তা

সাম্প্রদায়িকতা বিভিন্ন ধর্মের কায়েমী স্বার্থবাদীদের মধ্যে সংগ্রামের ছদ্মবেশ মাত্র। এরা এই বিরোধকে সাম্প্রদায়িক রূপে পরিণত করে। সাম্প্রদায়িক বিরোধের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৃত্তিজীবীশ্রেণী পদ ও আসন নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে যায়। সাম্প্রদায়িকতা দমন করার অন্যতম কার্যকরী উপায় হল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিম্নতর বর্গকে তাদের সর্বজনীন আর্থিক ও অন্যান্য স্বার্থরক্ষার আন্দোলনে একত্রিত করা।

হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক স্বার্থ একই। ব্যবস্থাপক সভায় সভ্যপদ বণ্টন অথবা সরকারী কাজে পদ বণ্টন তাদের প্রভাবিত করে নি। তাদের নিজেদের রাজনৈতিক ও আর্থিক স্বার্থ ভিত্তি করে একটা কর্মসূচী নিলে তার ভিত্তিতে তারা একত্রিত হতে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। এইরকম সর্বজনীন স্বার্থরক্ষার আন্দোলনে লোকে যত নিবিষ্ট হবে সেই অনুপাতে সাম্প্রদায়িকতার আবেদন কমে যায় ও জাতীয় একতা গড়ে ওঠে।

"সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মধ্যে ধর্মীয় ব্যাপারের কোনো ভূমিকা নেই। সাম্প্র-দায়িক রাজনীতি আসলে লাভালাভ, আসনসংখ্যা ও অনুগ্রহ প্রাপ্তির রাজনীতি। সাধারণভাবে সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন হল বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বৃত্তিজীবীশ্রেণীর বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংগ্রামের প্রশ্ন।

বোম্বাই সরকার Indian Statutory Commission-এ যে স্মারকলিপি পেশ করেছে তাতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার নিম্নলিখিত বিশ্লেষণ আছে।" মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার এর একটা কারণ। মুসলমান ও অন্যান্য অনুন্নতশ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের দুর্বলতা সম্পর্কে তাদের চেতনা আসতে লাগল। এই চেতনা সঞ্চারের বিভিন্ন

কারণ আছে। তার মধ্যে একটা কারণ জনসংখ্যার অনুপাতে অনেক বেশী পরিমাণে সরকারী পদ ও সংশ্লিষ্ট মর্যাদা ও প্রতিপত্তি উন্নত শ্রেণীর লোকের পক্ষে করায়ত্ত। "এখানে বোম্বাই সরকার সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে পদ ও প্রাপ্তির জন্য উন্নত ও অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে বিরোধের কথা মেনে নিয়েছে।"৩৯

অন্য এমন ধরনের সংগ্রামও ছিল যা মূলতঃ অর্থনৈতিক হলেও সাম্প্রদায়িক রূপ নিয়েছিল। বাংলার মতো প্রদেশে ঐতিহাসিক কারণে যা ঘটেছিল তাতে কৃষকেরা ছিল মূলতঃ মুসলমান অন্যদিকে জমিদারেরা ছিল প্রধানত হিন্দু। কৃষকদের সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতার জন্য মুসলমান কৃষক ও হিন্দু জমিদারদের মূলতঃ অর্থনৈতিক বিরোধকে সাম্প্রদায়িক বিরোধ বলে ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করা এবং পরবর্তীকালে তাকে সাম্প্রদায়িক বিরোধে পরিণত করা সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের পক্ষে কঠিন ছিল না। অনুরূপভাবে অধিকাংশ মহাজন হিন্দু ছিল বলে মহাজনদের সঙ্গে মুসলমান ঘাতকদের বিরোধকে মুসলমানদের ওপর হিন্দুদের অত্যাচার বলে অনেক সময় ভুল ব্যাখ্যা করা হতো এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা এটার সাম্প্রদায়িক রূপ দিত। জমিদার-প্রজা ও মহাজন-ঘাতকের বিরোধকে সাম্প্রদায়িক বিরোধ বলে ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করা হতো।

এইভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রেণীসমূহের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিরোধকে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা একটা সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়েছিল।

কে বি কৃষ্ণ তার বই The Problem of Minorities গ্রন্থে এই বিভিন্ন বিরোধকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবিভাগ করেছেন :

"১। বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের বৃত্তিজীবীশ্রেণীদের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। মুসলমান, শিখ, ভারতীয়, খৃষ্টান, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান অস্পৃশ্য বৃত্তিজীবী-শ্রেণীরা শিক্ষার দিক থেকে, রাজনীতির দিক থেকে ও আর্থিক দিক থেকে হিন্দু বৃত্তিজীবীশ্রেণীদের তুলনায় অসম। শাসনসংস্কার ও রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা এই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়িয়ে দিয়েছে। এই বিরোধই সংখ্যালঘুর সমস্যা অথবা সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলীর সমস্যা নামে অভিহিত।

"২। এই বিরোধ বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের বাণিজ্যিক, শিল্পগত, দোকানদারী-ব্যবসায়ীশ্রেণীর মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ছুটির দিন ও আইন অমান্য আন্দোলনের সময় হিন্দু ও মুসলমান দোকানীদের বিরোধ বেড়ে যায়। হিন্দু মহাজন ও মুসলমান ঘাতকের বিরোধ, হিন্দু জমিদার ও মুসলমান প্রজার বিরোধ, হিন্দু মহাজন ও মুসলমান মহাজনদের বিরোধ, হিন্দু জমিদার ও মুসলমান জমিদারদের মধ্যে বিরোধ এই পর্যায়ে পড়ে।

"৩। সর্বশেষে আছে বিভিন্ন ধর্মের গোঁড়া গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ। অনগ্রসরতা, অশিক্ষা, কখনো কখনো প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতিবিদ্‌দের ষড়যন্ত্র, গণ উন্মাদনা এবং সমাজের সবরকম সামাজিক বিরোধের দরুন এই বিরোধ উদ্ভূত হয়।

"দেশের সামাজিক আর্থিক ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত এইসব বিরোধ সামন্ত-তান্ত্রিক পরিস্থিতিতে ভারতীয় পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-

বাদের দ্বারা এবং ব্রিটিশ শাসকদের প্রতিকেন্দ্রের নীতির ফলে তীব্রতর হয়েছে।"৪০

অসহযোগ আন্দোলন শেষ হয়ে যাওয়ার পর মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক আন্দোলন হ্রাস পেয়েছিল। মুসলীম লীগ আবার মুসলমানদের গোঁড়া সম্প্রদায়ের সংগঠন হয়ে দাঁড়াল। লীগ মহাজনদের কোনো প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতে পারে নি। তবে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের একটা ছোট গোষ্ঠী এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সম্পূর্ণ অভারতীয়দের নিয়ে সাইমন কমিশন গঠিত হয়েছিল। এতে ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে প্রায় সর্বজনীন অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল। সমস্ত রাজনৈতিক দলই এই কমিশন বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এমনকি প্রধানতঃ মুসলমান গোঁড়া গোষ্ঠীর নেতৃত্বাধীন মুসলীম লীগের মধ্যেও সাইমন কমিশনের সংগে সহযোগিতার প্রশ্নে ঐকমত্য ছিল না। এর ফলে লীগে ভাঙ্গন দেখা দেয়, স্যার মহম্মদ সফী, ফিরোজ খাঁ নুন এবং স্যার মহম্মদ ইক্‌বালের নেতৃত্বে একদল লাহোরে মহম্মদ সফীর সভাপতিত্বে সম্মেলন করল। এই সম্মেলন সাইমন কমিশনকে স্বাগত জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে।

লীগের অন্য অংশ জিন্নার সভাপতিত্বে কলিকাতায় সম্মেলন করে। এতে কমিশন বয়কট করে একটা প্রস্তাব পাশ করা হয়েছিল।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নেহেরু কমিটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল। এতে ভারতীয় সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো লিপিবদ্ধ ছিল (অষ্টাদশ অধ্যায় দেখুন)। এই কমিটি আসন সংরক্ষণ সহ যৌথ নির্বাচকের পরিকল্পনা, সিন্ধু প্রদেশ পৃথকীকরণ এবং বালুচিস্থান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে অন্যান্য পূর্ণ প্রদেশের মতো মর্যাদাদানের সুপারিশ করে। এতে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর নিন্দা করা হয়। এছাড়া এই কমিটি সুপারিশ করেছিল যে মোট জনসংখ্যার মুসলমানদের অনুপাত অনুসারে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় বিধানসভায় আসন সংরক্ষণ করা হবে।৪১ লীগের স্বীকৃত নেতা জিন্নার মাধ্যমে লীগ কংগ্রেসের কাছে নেহেরু কমিটি-প্রণীত সংবিধানের কতকগুলো সংশোধন প্রস্তাব করে। এর মধ্যে একটা প্রস্তাব ছিল যে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক-তৃতীয়াংশ আসন মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। কংগ্রেস এই প্রস্তাবিত সংশোধনও মানতে রাজী হল না, ফলে সম্মিলিত সংগ্রামের জন্য কংগ্রেস ও লীগের সহযোগিতার আশা অবলুপ্ত হল।

জিন্নার চৌদ্দ দফা

এরপর ১৯২৯ সালে জিন্না তাঁর বিখ্যাত চৌদ্দ দফা প্রস্তাব প্রকাশ করলেন। পরবর্তীকালে এই চৌদ্দ দফাই লীগের প্রচার অভিযানের ভিত্তি হয়েছিল। চৌদ্দ দফায় উল্লিখিত প্রস্তাবগুলো নেহেরু কমিটি রিপোর্টে উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবসমূহের একেবারে বিপরীত। এই প্রস্তাবের মধ্যে ছিল ফেডারেশনের পক্ষে অত্যাবশ্যক ক্ষমতা ছাড়া বাদবাকী সমস্ত ক্ষমতা প্রদেশের হাতে ন্যস্ত করা, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমান প্রতিনিধিত্ব এক-

তৃতীয়াংশের কম হবে না। পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিভাষায় এক-তৃতীয়াংশ মুসলমান হওয়া চাই।

এরপর খুব শীঘ্রই জাতীয়তাবাদী মুসলমান ও লীগের গোঁড়া গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা সামান্য সংশোধন সহ নেহেরু রিপোর্টকে সমর্থন করতে চেয়েছিলেন। এঁরা জাতীয়তাবাদী মুসলমান দল গঠন করলেন।

১৯৩০-৪ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের ইতিহাস অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা এতে সোৎসাহে যোগ দিয়েছিলেন।

আগা খাঁ গোলটেবিল বৈঠকে বেসরকারীভাবে লীগের প্রতিনিধিত্ব করেন। বৈঠকে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের ব্যাপারে ভারতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে মতৈক্য না হওয়ায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী Ramsay Macdonald সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষণা করলেন।

১৯৩৩ সালের পর মুসলীম লীগ জিন্নার নেতৃত্বে পুনর্গঠিত ও সংহত হতে আরম্ভ করল। জিন্না মুসলীম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং লীগ প্রবল রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করে।

১৯৩৬ সালে বোম্বাই অধিবেশনে লীগ ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নিন্দা ও প্রত্যাখ্যান করে কেননা লীগের মতে এতে স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী পূরণ করা হয় নি।

১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিপুল সাফল্যের দরুন কংগ্রেস কতক-গুলো প্রদেশে সরকার গঠন করতে পারল। জিন্না এবং অন্যান্য মুসলমান নেতারা কংগ্রেস সরকার সম্বন্ধে অসন্তোষ জ্ঞাপন করেছিল। তারা এই বলে কংগ্রেস সরকারকে দোষারোপ করত যে এই সরকার মুসলমান স্বার্থের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এবং হিন্দুদের প্রতি দাক্ষিণ্যপরায়ণ।

কংগ্রেস মন্ত্রিসভাসমূহের বিরুদ্ধে জিন্নার সমালোচনা

১৯৩৭ সালে লক্ষ্ণৌতে মুসলীম লীগের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে জিন্না বলেছিলেন ঃ

"কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃত্ব বিশেষতঃ গত দশ বছরে পুরোপুরি হিন্দু-ভাবাপন্ন নীতি অবলম্বন করে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। সংখ্যা-গরিষ্ঠতা পেয়ে যে ছয়টা প্রদেশে কংগ্রেস সরকার গঠন করেছে সেখানে তাদের কথায়, কাজে এবং কর্মসূচীতে এটা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে মুসলমানরা কংগ্রেসের কাছে সদ্ব্যবহার ও সুবিচার পেতে পারে না। সামান্য যেটুকু ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেটুকু হাতে পেয়েই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে দিয়েছে যে হিন্দুস্থান হিন্দু ছাড়া আর কারও নয়।"[৪২]

লীগের সঙ্গে একজোট হয়ে প্রদেশগুলোতে কোয়ালিশন সরকার গঠন না করে কংগ্রেস হয়তো ভুল করেছে এবং ওতে এই ধারণাই সৃষ্টি হয়েছে যে কংগ্রেস ক্ষমতার একাধিপত্য চায়। কংগ্রেসের বিদ্যামন্দির পরিকল্পনায় হয়তো বা কিছু হিন্দুয়ানির ভাব ছিল। হয়তো এরকম দৃষ্টান্ত কিছু কিছু আছে যে

কোনো কোনো কংগ্রেস মন্ত্রী কোনো কোনো হিন্দু ব্যক্তিবিশেষকে সচেতন অথবা অচেতনভাবে দাক্ষিণ্য দেখিয়েছিলেন। এমনকি কংগ্রেস সরকারের সামাজিক ও আর্থিক কার্যক্রম ভারতীয় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা যথাযথভাবে পূরণ করে নি। প্রাক্-নির্বাচনী ঘোষণা লঙ্ঘন করে কংগ্রেস সরকার Criminal Law Amendment Act-এর আইন প্রয়োগ করেছিল, ধর্মঘটী শ্রমিকদের ওপর গুলিবর্ষণ অনুমোদন করেছিল, এমনকি বোম্বাই প্রদেশে কংগ্রেস সরকার শিল্পবিরোধ আইন প্রণয়ন করে শ্রমিকদের ধর্মঘট করার গণতান্ত্রিক অধিকার সঙ্কুচিত করে দিয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস সরকার মুসলমান সম্প্রদায়কে দমিত রাখার জন্য ও হিন্দু নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা কারর জন্য সুচিন্তিত নীতি অবলম্বন করেছিল বলে লীগ যে প্রচার করত সেটা পুরোপুরি অসত্য।

কংগ্রেস সরকার প্রধানতঃ ভারতীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থরক্ষাকারী। তাই সামান্য কিছু সংস্কার করলেও কংগ্রেস সরকার ভারতীয় সমাজের দরিদ্র জনসাধারণের আর্থিক ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটাতে পারে নি। এর ফলে সাম্প্রদায়িক লীগ নেতারা মুসলমান জনগণের একটা অংশকে কংগ্রেসের সম্বন্ধে বিরূপ করে তোলে ও লীগের দিকে টেনে আনতে পেরেছিল। অধিকাংশ পুঁজিবাদী ও জমিদারেরা ছিল ধর্মে হিন্দু। আবার অবস্থাগতিকে কংগ্রেস নেতাদের বেশীরভাগই হিন্দু ছিলেন। তাই লীগ নেতারা খুব সহজেই গরীব মুসলমানদের একথা বোঝাতে পেরেছিলেন যে কংগ্রেস নেতৃত্ব সাম্প্রদায়িক মনোভাবের দরুন ইচ্ছাকৃতভাবে গরীব মুসলমানের ওপর হিন্দু জমিদার ও শিল্পপতিদের অত্যাচার বজায় রাখবার ব্যবস্থা করছে। এইভাবে মুসলমান জনগণের শ্রেণীগত আর্থিক অসন্তোষ ও ক্ষোভ সাম্প্রদায়িক প্রচারের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক পথে চালিত করে দেওয়া হয়েছিল ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে পরিণত হয়েছিল।

মুসলীম লীগ পরবর্তী অধিবেশনগুলোতে কংগ্রেসবিরোধী প্রচার তীব্রতর করে তোলে। কংগ্রেস প্রস্তাব করেছিল যে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচকের ব্যবস্থা সহ সর্বজনীন ভোটে সংবিধান রচনা পরিষদ নির্বাচন করা হোক। লীগ কংগ্রেসের এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রচার করে যাচ্ছিল এই যুক্তিতে যে মূলতঃ হিন্দু ভারতবর্ষে ঐ ধরনের সংবিধান পরিষদ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

মুসলীম লীগ কর্তৃক পাকিস্তানের দাবী উত্থাপন

লীগের পূর্বেকার দাবী ছিল বিশেষ নির্বাচনের দাবী। এই দাবী থেকে লীগ নিশ্চিতভাবে নতুন এক দাবীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। লীগের সেই নতুন দাবী হল পুরোপুরি পাকিস্তানের দাবী অর্থাৎ ভারতবর্ষকে সার্বভৌম মুসলমান রাষ্ট্র ও সার্বভৌম হিন্দু রাষ্ট্রে বিভাগ করা। এই দাবীর রাজনৈতিক মতাদর্শগত ভিত্তি ১৯৪০ সালের লাহোর অধিবেশনে ঘোষিত হয়েছিল। ভিত্তিটা হল দুই জাতি তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে সারা ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত মুসলমানেরা একটা স্বতন্ত্র সামাজিক ধর্মীয় বর্গ হিসাবে পৃথক জাতি বলে

গণ্য। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী, এক ভাষাভাষী, এক মানসিক গঠন ও সংস্কৃতিসম্পন্ন ও এক আর্থিক ব্যবস্থায় ঐতিহাসিকভাবে বিবর্তিত একটা সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত হয় বলে জাতির যে ধারণা প্রচলিত আছে মুসলীম লীগের বক্তব্যের সঙ্গে তার কোনো সাদৃশ্য নেই।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার ফলে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গেল। ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় জনসাধারণের সম্মতি না নিয়েই ভারতকে যুদ্ধে লিপ্ত করায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ক্রুদ্ধ হয়। দলের নির্দেশ অনুসারে প্রাদেশিক কংগ্রেস মন্ত্রিসভাসমূহ পদত্যাগ করে।

কংগ্রেস মন্ত্রিসভাসমূহ পদত্যাগ করায় মুসলীম লীগ আনন্দ প্রকাশ করে 'মুক্তি দিবস' উদ্‌যাপন করে।

১৯৪০ সালে লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে পাকিস্তান দাবী সম্বলিত প্রস্তাব অর্থাৎ দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমানদের সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি উদ্ধৃত করা হচ্ছে। "এই প্রস্তাব গৃহীত হচ্ছে যে নিখিল ভারত মুসলীম লীগের এই অধিবেশনের সুচিন্তিত অভিমত অনুসারে নিম্নলিখিত মৌলিক নীতি দ্বারা নির্ধারিত না হলে কোনো শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা কার্যকর হবে না বা মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। (ক) উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বভাগের মতো যেসব এলাকা মুসলমান প্রধান সেইসব এলাকায় ভৌগোলিকভাবে সন্নিবিষ্ট অংশসমূহ প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্যসহ এমনভাবে অঞ্চল হিসাবে পুনর্গঠিত করতে হবে যাতে সেগুলোকে নিয়ে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' গঠন করা যায় এবং সব রাষ্ট্রের অন্তর্গত অংশসমূহ হবে স্বশাসিত এবং সার্বভৌম। (খ) এইসব অংশ এবং অঞ্চলের সংখ্যালঘুদের জন্য যথোপযুক্ত এবং কার্যকর সাংবিধানিক রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সংখ্যালঘুদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে তাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, আর্থিক, রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক এবং অন্যান্য স্বার্থ ও অধিকারসমূহ রক্ষা করা যায় ঃ এবং ভারতবর্ষের অন্য যেসব অংশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু সেইসব ক্ষেত্রে তাদের এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের জন্য যথোপযুক্ত এবং কার্যকর সাংবিধানিক রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে নাকি তাদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে তাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, আর্থিক, রাজ-নৈতিক, শাসনতান্ত্রিক এবং অপরাপর অধিকার এবং স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়।

"এই অধিবেশন কার্যনির্বাহক সমিতির ওপর উপরিউক্ত নীতি অনুসারে সংবিধানের পরিকল্পনা প্রণয়ন করার দায়িত্ব অর্পণ করছে। এই পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলসমূহ যাতে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, যোগাযোগ, শুল্ক এবং অন্যান্য সকল প্রয়োজনীয় ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা থাকবে।"

১৯৪১ সালে লীগের অধিবেশন হয় মাদ্রাজে। সভাপতির অভিভাষণে জিন্না বলেন, "কোনো অবস্থাতেই কেন্দ্রে একটামাত্র সরকার সহ সর্বভারতীয় শাসনতন্ত্র আমরা চাই না।... উপ-মহাদেশে স্বাধীন রাষ্ট্রসহ স্বাধীন জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আমরা বদ্ধপরিকর।"

অন্যান্য মুসলমান সংগঠনসমূহ

মুসলীম লীগের পাকিস্তান পরিকল্পনা সম্পর্কে কংগ্রেস, উদারপন্থী, অবনত শ্রেণীসমূহ প্রভৃতি দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক গোষ্ঠী এবং সংগঠনের মনোভাব ও মত সম্পর্কে আলোচনা করার আগে অন্য কয়েকটা মুসলমান সংগঠনের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯২৮ সালের পর উদ্ভূত এইসব সংগঠনগুলোতে ভারতীয় মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক ও জাতীয় সচেতনতা প্রকৃষ্ট হয়েছিল।

আবদুল গফফুর খান ১৯৩০ সালে খুদাই খিদমত্‌গার নামে একটা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এটি হল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাজনীতি সচেতন মুসলমানদের জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস সমর্থক সংগঠন। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় এই সংগঠন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কৃষকদের একাংশের মধ্যে খাজনাবন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করেছিল। গান্ধীজীর সংগ্রাম-পদ্ধতি অবলম্বন করে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করাই ছিল এই সংগঠনের উদ্দেশ্য।

বালুচিস্তানে জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা কংগ্রেস সমর্থক ওয়াতন পার্টি গঠন করেছিল।

অল্‌ ইণ্ডিয়া মোমিন কনফারেন্স হল ভারতীয় মুসলমানদের আর একটা রাজনৈতিক সংগঠন। এটি প্রধানত মুসলমান তাঁতীদের নিয়ে গঠিত ছিল।৪৩ এই সংগঠনটি সাধারণতঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে সমর্থন করত এবং লীগ-বিরোধী ও পাকিস্তান-বিরোধী ছিল।

কিছু সংখ্যক মুসলমান জাতীয়তাবাদী নেতা ১৯৩০ সালে পঞ্জাবে অহড়ার পার্টি স্থাপন করেন। এই দল কিছুদিন পঞ্জাবের মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছিল। অহড়ারগণ ১৯৩০-৩৪ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল এবং ১৯৪০ সালে কংগ্রেস পরিচালিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল।

দি অল্‌ ইণ্ডিয়া শিয়া পলিটিক্যাল কনফারেন্স ছিল ভারতীয় শিয়াদের রাজনৈতিক সংগঠন। এই সংগঠন সাধারণতঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে সমর্থন করত।

বাংলায় কার্যকরী বিদ্রোহ উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী ও 'দ্রুত-পরিবর্তনশীল' রাজনৈতিক নেতা ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি গঠিত হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য ছিল 'পার্লামেণ্টারী এবং সাংবিধানিক উপায়ে কৃষি বিপ্লব' সাধন। তার এই কর্মসূচীর গুণে তিনি মুসলমান কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক সমর্থন লাভ করতে পেরেছিলেন। বাংলাদেশে জমিদাররা যে প্রধানতঃ হিন্দু এবং কৃষকেরা প্রধানতঃ মুসলমান ছিল বলেই কৃষকদের মধ্যে কৃষক প্রজা পার্টির ব্যাপক গণভিত্তি তৈরী হয়েছিল। হকের নেতৃত্বে এই দলে কখনো সাম্প্রদায়িক আবার কখনো জাতীয়তাবাদী প্রবণতা দেখা যেত।

১৯৩১ সালে আল্লামা মাশরিক কর্তৃক স্থাপিত খাকসার পার্টি হল ভারতীয় মুসলমানদের আর একটা উল্লেখযোগ্য সংগঠন।

খাকসার আন্দোলন আদি যুগে মুসলমানদের ধর্মীয় ভাবধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক কালে ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য এবং ভ্রষ্ট মুসলমান সমাজের নৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য আপ্রাণ সংগ্রামে খাকসাররা প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ। খাকসাররা বলত যে তারা মুসলমান সমাজের দরিদ্র পর্যায়ের লোকেদের নিয়ে আন্দোলন করছে। খাকসাররা পবিত্র জীবনযাপন করতে ও সমাজসেবার কাজে নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে প্রেরণা দিত।

খাকসার পার্টি প্রায় সামরিক শৃংখলায় গঠিত ছিল। নেতাদের প্রতি সদস্যদের অখণ্ড আনুগত্য অত্যাবশ্যক। খাকসাররা মাঝে মাঝে পৃথিবী বিজয়েরও স্বপ্ন দেখত। 'আমাদের লক্ষ্য হল আবার রাজা হওয়া, শাসক হওয়া, বিশ্ব-বিজেতা হওয়া এবং সারা পৃথিবীর সর্বময় অধিপতি হওয়া।'৪৪ এর ফলে খাকসার আন্দোলনে প্রবল ফ্যাসিবাদী ঝোঁক এসে গিয়েছিল।

পঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ এবং সিন্ধু প্রদেশে এই আন্দোলন বিশেষভাবে প্রবল হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের কিছু কিছু অংশেও এই আন্দোলন বিস্তারলাভ করেছিল।

১৯৪০ সালে আলিবক্সের সভাপতিত্বে আজাদ মুসলীম কনফারেন্স প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, জামায়েত উলেমা, অহড়র পার্টি এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা এই সম্মিলিত গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। এই দল মুসলীম লীগের পাকিস্তান দাবীর বিরোধিতা করত এবং কংগ্রেসের দাবীসমূহ যথা ভাষার ভিত্তিতে বর্তমান প্রদেশগুলোর পুনর্গঠন এবং 'ভারতের স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে আত্মনিয়ন্ত্রণ এমনকি পৃথক হয়ে যাওয়া' সমর্থন করত।৪৫

পাকিস্তান ভাবনার উদ্ভব ও বিকাশ

দেশের প্রধান প্রধান মুসলমান সংগঠনগুলোর কথা উল্লেখ করে এখন মুসলীম লীগের পাকিস্তান পরিকল্পনা এবং যে তত্ত্বের ওপর এর ভিত্তি অর্থাৎ মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতির সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামতের আলোচনা করা হবে। ধর্মের বন্ধনই হল এই তত্ত্বের ভিত্তি।

জিন্নার মতে প্রখ্যাত মুসলমান কবি ইকবাল থেকে পাকিস্তান ধারণার উৎপত্তি। এই প্রসঙ্গে জিন্নার উক্তি উদ্ধৃত হল :

"একথা সুপরিচিত যে পরলোকগত হজরত আল্লম ইকবালের মাথাতেই পাকিস্তান ধারণার সূচনা হয়। তিনি ছিলেন তাঁর জনসাধারণের সর্বোচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষার মুখপাত্র।"৪৬

১৯৩০ সালে মুসলীম লীগের সভাপতির ভাষণে ইকবাল বলেছিলেন, "আমার ইচ্ছা এই যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পঞ্জাব, সিন্ধু, বালুচিস্তান এক রাষ্ট্রে মিলিত হোক। স্ব-শাসিত অংশ হিসাবে অথবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে যাই হোক না কেন ঐক্যবদ্ধ উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় মুসলমান রাষ্ট্র মুসলমানদের অন্ততঃ উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমানদের সর্বশেষ লক্ষ্য বলে আমি মনে করি।"৪৭

অবশ্য নতুন সংবিধান ঘোষণা এবং কয়েকটা প্রদেশে কংগ্রেস সরকারের প্রতিষ্ঠার পরই মুসলমান রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলো পাকিস্তান ধারণায় আকৃষ্ট হয়।

১৯৪০ সালে লীগের লাহোর অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে জিন্না ঘোষণা করলেন যে ভারতীয় মুসলমানেরা শুধুমাত্র যে একটা ধর্মীয় সম্প্রদায় তা নয় তারা একটা সুস্পষ্ট আলাদা জাতি। "ভারতবর্ষের সমস্যার প্রকৃতি আন্তঃ-সাম্প্রদায়িক নয়, আন্তর্জাতিক এবং সেইভাবেই এই সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না এই মূল কথাটা স্বীকার করা হচ্ছে ততক্ষণ তার ফল বিপর্যয়কর হবেই। ব্রিটিশ সরকার যদি সত্যি সত্যি এই উপমহাদেশের জনসাধারণের সুখ ও শান্তির জন্য ব্যগ্র এবং আন্তরিক হয় তাহলে একটাই রাস্তা খোলা আছে তা হল ভারতবর্ষ ভাগ করে বড় বড় জাতিগুলোর জন্য পৃথক স্বয়ংশাসিত জাতীয় রাষ্ট্র তৈরী করা।"৪৮

জিন্না আরো বলেছিলেন যে হিন্দু এবং মুসলমানদেরকে একটা ভারতীয় জাতিতে পরিণত করা যায় না বা যেতে পারে না। তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেছিলেন :

"আমাদের হিন্দু বন্ধুরা কেন ইসলাম ও হিন্দুত্বের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারে না এটা বোঝা খুবই কঠিন। ঠিক ঠিক বলতে গেলে হিন্দু ও মুসলমান দুটো ধর্মমাত্র নয়, বস্তুতপক্ষে এরা পৃথক ও সুস্পষ্ট দুটো সামাজিক সংগঠন। হিন্দু ও মুসলমানেরা উভয়কে নিয়ে যে একটা জাতীয়তা গড়ে তুলতে পারে এটা নেহাতই একটা স্বপ্ন।... হিন্দু ও মুসলমানদের আলাদা ধর্মীয় দর্শন আছে, আছে আলাদা সামাজিক রীতি-নীতি ও সাহিত্য। এদের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত নেই, এরা একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করে না, বস্তুতপক্ষে হিন্দু মুসলমান দুটো পৃথক পরস্পর-বিরোধী ধারণাভিত্তিক সভ্যতা, জীবন সম্বন্ধে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং জীবনযাত্রা আলাদা। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে হিন্দু ও মুসলমানরা স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক ঐতিহ্য থেকে তাদের প্রেরণা পেয়েছে। তাদের মহাকাব্য আলাদা, তাদের নায়কও আলাদা, প্রায়ই দেখা যায় একজনের নায়ক অপরজনের শত্রুপক্ষ। এদের জয়-পরাজয়ের তাৎপর্যও স্বতন্ত্র। এইরকম একটা জাতির একটাকে সংখ্যালঘিষ্ঠ এবং অন্যটাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবে একটা রাষ্ট্রের মধ্যে জুড়ে দিলে অসন্তোষ প্রবলতর হবেই এবং এইরকম রাষ্ট্রের জন্য যে সরকার গঠিত হবে পরিণামে সেটা ধ্বংস হতে বাধ্য।

হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারে পরিণত হয় এমন কোনো সংবিধান মুসলমান মেনে নিতে পারে না, হিন্দু ও মুসলমানদের এক করে কোনো একটা গণ-তান্ত্রিক ব্যবস্থা যদি সংখ্যালঘুর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় তহালে সেটা আসলে হবে হিন্দু-রাজ। কংগ্রেস নেতৃত্ব যে ধরনের গণতন্ত্রের প্রতি আসক্ত সেটা ইসলামের সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু সম্পূর্ণ নষ্ট করে ফেলবে।

জাতির সংজ্ঞা অনুসারে মুসলমানেরা একটা স্বতন্ত্র জাতি। তাদের নিজস্ব বাসভূমি, স্বতন্ত্র ভূখণ্ড ও রাষ্ট্র চাই। যেটা আমাদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল মনে হয়, আমাদের আদর্শের অনুবর্তী এবং আমাদের জনমানসের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ সেইভাবে আমাদের জনসাধারণের পরিপূর্ণ, আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক,

আর্থিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিকাশ হোক এইটাই আমাদের ইচ্ছা।"৪৯

লীগের লাহোর অধিবেশনে জিন্নার সভাপতির ভাষণ থেকে এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিই হল তাঁর পাকিস্তানের সপক্ষে যুক্তির সংক্ষিপ্তসার।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করবে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার কাছে দায়ী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ও বৈদেশিক সম্পর্কের মতো অত্যাবশ্যক বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর—পাকিস্তানের প্রবক্তাগণ এইরকম যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা মানতে রাজী ছিলেন না। তাঁদের বক্তব্য ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে হিন্দুরাই কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় আধিপত্য করবে কেননা হিন্দুরাই হল ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ।

স্বয়ংশাসিত সার্বভৌম মুসলমান রাষ্ট্র এবং তার রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক ব্যবস্থার সম্যক পরিচয় দিয়ে কোন প্রামাণিক পরিকল্পনা মুসলীম লীগ তখনো প্রকাশ করে নি। তবে মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা নিজস্ব বিবেচনা মতো পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন এবং প্রকাশ করেছিলেন।

এইসব পরিকল্পনার মধ্যে আলিগড়ের 'পঞ্জাবী' অধ্যাপক ডঃ লতিফ, স্যার সিকন্দর হায়াৎ খান, রহমৎ আলি এবং স্যার আবদুল হারুণ কমিটি কর্তৃক প্রণীত পরিকল্পনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এইসব পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে পার্থক্য ছিল বটে কিন্তু একটা মৌলিক প্রশ্নে এদের একমত ছিল—ভারতবর্ষে হিন্দু এবং মুসলমানেরা দুটো পৃথক জাতি।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এই সব কর্মসূচীর কোনোটাই লীগ কর্তৃক সমর্থিত বা গৃহীত হয় নি। লীগ এ পর্যন্তও পাকিস্তান সম্পর্কে তার নিজস্ব কোনো স্পষ্ট ও বিস্তৃত পরিকল্পনা তৈরী করে নি।

পাকিস্তান সম্পর্কে বিভিন্ন নেতা ও দলের মতামত

ভারতীয় মুসলমানেরা যে একদা আলাদা জাতি এবং যেসব জায়গায় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে সেখানে মুসলমানদের আলাদা রাষ্ট্র থাকা উচিত এই বিষয়ে দেশের বিখ্যাত রাজনৈতিক সংগঠন এবং গোষ্ঠীর মতামত সম্পর্কে এখন আলোচনা করা হবে।

(ক) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ

উদারপন্থীদের এবং সেই সঙ্গে তিলক, বিপিন পাল এবং অরবিন্দ ঘোষের মতন উগ্রপন্থী জাতীয়তাবাদীদের নেতৃত্বাধীনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সবসময়ই বলেছে যে সকল ভারতীয় একই জাতির অন্তর্গত। এই নেতারা এমনভাবে প্রচার করতেন যাতে ভারতীয়রা এক জাতিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয় ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ও স্বায়ত্তশাসনের জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়। পূর্বতন নেতাদের উত্তরাধিকারী গান্ধী এবং অন্যান্য নেতারা এই মতই

পোষণ করতেন। তবে তাঁরা মুসলমান, অবনত শ্রেণী ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রয়োজনগুলো বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেগুলো মেটানো উচিত বলে মনে করতেন। তাঁরা মনে করতেন যে খাঁটি গণতান্ত্রিক সংবিধানে এদের স্বার্থ সর্বদাই রক্ষা করা সম্ভব।

কংগ্রেস নেতারা আলাদা সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী এবং সাম্প্রদায়িক গুরুত্ব নির্ধারণ সংক্রান্ত মূল নীতির বিপক্ষে ছিলেন। তাঁরা এগুলোকে সাম্প্রদায়িকতা জিইয়ে রাখা ও বাড়িয়ে তোলার উপায় বলে গণ্য করতেন। কংগ্রেস নেতারা মনে করতেন যে হিন্দু মুসলমান ঐক্য স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অত্যাবশ্যক, এই ঐক্য ভিন্ন আর কিছুই করা সম্ভব নয়। এই কারণে হিন্দু মুসলমান ঐক্যের স্বার্থে তাঁরা মুসলমান, অবনতশ্রেণীসমূহ ও অন্যান্য সংখ্যালঘুগোষ্ঠীর পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী, বিশেষ সুবিধা অথবা সংরক্ষণ প্রভৃতি দাবী মেনে নিয়েছিলেন। ১৯১৬ সালে কংগ্রেস-লীগ চুক্তি এবং ১৯৩৩ সালে ব্যবস্থাপক সভায় অবনত শ্রেণীসমূহের জন্য সংরক্ষণের ব্যাপারে গান্ধী যে বিশেষ সুবিধা দিয়েছিলেন (পুনা চুক্তি) এরই দুটি দৃষ্টান্ত। সে যাহোক, কংগ্রেস ভারতীয় মুসলমান অথবা ভারতবর্ষের অন্য কোনো সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে সরকারীভাবে পৃথক জাতি বলে গণ্য করতেন না।

কংগ্রেস এই মত পোষণ করত যে ভারতীয় জনসাধারণ সামগ্রিকভাবে একটিমাত্র জাতি। ব্রিটিশ সরকার যেভাবে বিভিন্ন প্রদেশে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করেছিল কংগ্রেস তার বিরোধী ছিল। কংগ্রেস এর সমালোচনা করত কারণ ব্রিটিশ প্রদেশ ভাগ ভারতীয় জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর অবস্থানের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কংগ্রেস ভারতবর্ষকে বিভিন্ন প্রদেশে এমনভাবে ভাগ করার পরিকল্পনা করেছিলেন যাতে প্রত্যেকটি প্রদেশে একই ভাষাভাষী লোকেরা বসবাস করে।

ভারতরাষ্ট্রের ভাষাগত ও প্রাদেশিক সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের দরুন কংগ্রেস ভারতবর্ষের জন্য একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রকাঠামোর পক্ষপাতী ছিল। এতে সর্বজনীন ও মূলগত স্বার্থের বিষয়গুলো কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত থাকবে এবং অবশিষ্ট ক্ষমতা অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর (ভাষাগত ভিত্তিতে) হাতে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে 'যতদূর সম্ভব প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হবে'।

১৯৪২ সালের দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সভায় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি একটা প্রস্তাব পাশ করে এই ঘোষণা করে যে কোনো ভূখণ্ডকেই জোর করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতীয় ইউনিয়নের সংগে যুক্ত হতে বাধ্য করা হবে না।

ভারতীয় মুসলমানেরা একটা আলাদা জাতি বলে লীগ যে তত্ত্ব প্রচার করত গান্ধী এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা কিন্তু সেটা মেনে নেন নি। বস্তুতপক্ষে তাঁরা এর বিরোধিতা করেছেন। ধর্মকে জাতির নির্ধারক হিসাবে তাঁরা কখনই মেনে নেন নি। অবশ্য বিশেষ কোনো ধর্মাবলম্বী একটা গোষ্ঠীকে তাঁরা সাংস্কৃতিক ও সাম্প্রদায়িক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলে গণ্য করতেন। লীগ নেতাদের দুই জাতি তত্ত্বের বিরোধিতা করে গান্ধী বলেছিলেন :

"দুই জাতি তত্ত্ব হল অসত্য। ভারতীয় মুসলমানদের বৃহত্তম অংশ ইসলামে ধর্মান্তরিত অথবা ধর্মান্তরিতদের বংশধররা ধর্মান্তরিত হবার সংগে

সঙ্গেই তারা একটা জাতিতে পরিণত হয় নি। একজন বাঙালী মুসলমান ও একজন বাঙালী হিন্দু একই ভাষায় কথা বলে, একই খাদ্য খায় এবং একই ধরনের আমোদ-প্রমোদে আনন্দ পায়। তাদের পোশাক পরিচ্ছদও একই রকম ···দরিদ্র লোকের ক্ষেত্রে (যাদের নিয়ে ভারতবর্ষের সর্বসাধারণ) দক্ষিণ ভারতেও মোটামুটি একই ব্যাপার দেখা যায়···অনেক মুসলমানগোষ্ঠী হিন্দু উত্তরাধিকার আইন দ্বারা পরিচালিত···ভারতবর্ষে হিন্দু এবং মুসলমান দুটো আলাদা জাত নয়। ঈশ্বর যাদেরকে এক করে দিয়েছেন মানুষ তাদেরকে পৃথক করতে পারে না।"৫০

বিখ্যাত আমেরিকান সাংবাদিক লুই ফিসারের কাছেও গান্ধীজী একই কথা বলেছিলেন। "আমরা দুটো জাতিতে বিভক্ত নই। ভারতবর্ষে আমাদের একটা সর্বজনীন সংস্কৃতি আছে। উত্তর ভারতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই হিন্দী ও উর্দু বুঝতে পারে। মাদ্রাজে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই তামিল ভাষায় কথা বলে, বাংলায় তারা বাংলা ভাষাতেই কথা বলে, হিন্দী বা উর্দুতে নয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সর্বদাই গরু নিয়ে কোনো ঘটনা অথবা ধর্মীয় শোভাযাত্রা থেকে উত্তেজনা সঞ্চারের ফলে ঘটে থাকে। অর্থাৎ কুসংস্কারের কারণে অশান্তিটা শুরু হয়, আমাদের পৃথক জাতিসত্তার কারণে নয়।"৫১

গান্ধী হিন্দু-মুসলমান বিভেদের জন্য ব্রিটিশ সরকারকে বহুলাংশে দায়ী করেছিলেন। তিনি ফিসারকে বলেছেন, 'যতদিন পর্যন্ত তৃতীয় পক্ষ ইংলণ্ড এখানে আছে ততদিন আমাদের সাম্প্রদায়িক প্রভেদ ক্ষতি করতে থাকবে। অনেকদিন আগেই তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড মিণ্টো ঘোষণা করেছিলেন, আধিপত্য রক্ষার জন্য হিন্দু এবং মুসলমানদেরকে আলাদা রাখা ব্রিটেনের পক্ষে প্রয়োজন।'৫২

অবশ্য গান্ধীজী স্থির নিশ্চিন্ত ছিলেন যে যদি ভারতীয় মুসলমানরা আলাদা হবে বলে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়, তাহলে কোনো ব্যক্তিই তাদেরকে বিরত করতে পারবে না। তিনি বলেছেন, "নয় কোটি মুসলমানকে বাকী ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠদের (গরিষ্ঠতা যত বড়ই হোক না কেন) ইচ্ছা অনুসারে চালিত করবার মতো কোনো অহিংস আন্দোলন আমার জানা নেই। অবশিষ্ট ভারতবর্ষের মতন মুসলমানদেরও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকবে, যে কেউ স্বাতন্ত্র্যের দাবী করতে পারে।"৫৩

এই প্রসঙ্গে গান্ধীর আরও কয়েকটা কথা উল্লেখযোগ্য। "আমি অহিংসায় বিশ্বাসী। তাই মুসলমানরা যদি জেদ করে তবে আমি জোর করে প্রস্তাবিত দেশভাগ বন্ধ করতে পারি না। কিন্তু আমি স্বেচ্ছায় দেশব্যবচ্ছেদে হাত লাগাতে পারি না। দেশভাগ প্রতিরোধ করতে আমি সর্বপ্রকার অহিংস উপায় অবলম্বন করব···দেশভাগ অসত্য আচরণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। হিন্দু ও ইসলাম যে দুটো বিরোধী সংস্কৃতি ও মতবাদ এই কথা শোনামাত্র আমার সর্বসত্তা বিদ্রোহ করে ওঠে।···কিন্তু সেটা আমার বিশ্বাস যে মুসলমানরা নিজেদেরকে একটা পৃথক জাতি বলে মনে করে তাদের ওপর আমার বিশ্বাস আমি জোর করে চাপাতে পারি না।"৫৪

মুসলমান সম্প্রদায় আর্থিক দিকে থেকে হিন্দু সম্প্রদায় দ্বারা শোষিত

হচ্ছে বলে মুসলমান নেতারা যে কথাটা বলতেন, বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা সত্যমূর্তি মনে করতেন সে কথাটা সম্পূর্ণ ভুল। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে দুটো সম্প্রদায়ের কোনোটাই আর্থিক দিক থেকে একরকম নয়। হিন্দুদের মধ্যে একদিকে যেমন পুঁজিবাদী জমিদার এবং সম্পন্ন লোক আছে অন্যদিকে তেমনি আছে শ্রমিক, কৃষক এবং দরিদ্র লোক। মুসলমান সমাজের গঠনও অনুরূপ। দরিদ্র মুসলমানদের অর্থনৈতিক স্বার্থ ধনী মুসলমানদের অর্থ-নৈতিক স্বার্থ থেকে যেমন পৃথক সেইরকম দরিদ্র হিন্দুদের আর্থিক স্বার্থ ধনী হিন্দুদের আর্থিক স্বার্থের সঙ্গে মেলে না। সুতরাং তিনি মনে করতেন যে মুসলমান সম্প্রদায় যে হিন্দু সম্প্রদায় দ্বারা শোষিত হচ্ছে এ কথাটা ঠিক নয়।৫৫

কংগ্রেসের আর একজন বিশিষ্ট নেতা রাজেন্দ্রপ্রসাদের মতে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার প্রসার হয়েছে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ও সাম্প্রদায়িক সংখ্যা অনুসারে রাজনৈতিক গুরুত্ব ব্যবস্থার কারণে। "এটা সমানভাবে স্পষ্ট যে সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব সৃষ্টি করা এবং জাগিয়ে তোলায় অন্য কিছুর থেকে পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রভাব অনেক বেশী এবং যেসব সম্প্রদায় এই পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ব্যবস্থার সুবিধা ভোগ করেছে তাদের মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ নয়, এখন অন্যান্য সম্প্রদায়ও এর ফাঁদে পড়েছে। আমাদের সাম্প্রতিক অতীত থেকে উত্তরাধিকারের এই বোঝা আমাদের ঘাড়ে এসে পড়েছে।"৫৬

রাজেন্দ্রপ্রসাদের মতে বর্তমান বিশ্বে 'রাষ্ট্রসমূহের জোট বাঁধার দিকে' যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তানের দাবী তার বিপরীত। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে ছোট রাষ্ট্রের পক্ষে টিকে থাকা এবং স্বাধীনতা ভোগ করা অত্যন্ত কঠিন। আধুনিক পরিস্থিতিতে পরিকল্পিত অর্থনীতিই আর্থিক অগ্রগতির একমাত্র উপায় এবং সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদবিশিষ্ট ছোট রাষ্ট্রে পরিকল্পিত উপায়ে আর্থিক বিকাশের দিকে যেতে পারে না। এই কারণে পাকিস্তান পরিকল্পনা অনুসারে ভারতবর্ষকে অনেকগুলো রাষ্ট্রে ভাগ করবার প্রস্তাব হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমগ্র ভারতীয় জনসাধারণের আর্থিক ভবিষ্যৎ বিপন্ন করে তুলবে। রাজেন্দ্রপ্রসাদ দেখিয়েছিলেন যে 'ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান দেশসমূহে ধর্ম ছাড়া অন্য বিষয়ের ভিত্তিতে রাজনীতি ও অর্থনীতি গড়ে তোলার প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। মুসলীম লীগ অথবা পাকিস্তানের সমর্থকরা যাই বলুক না কেন পৃথিবীর মুসলীম রাষ্ট্রগুলো যে ইউরোপের খৃষ্টীয় দেশগুলোর মতন ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখন প্রশ্নটা এই যে ভারতীয় মুসলমানরা ঘটনাস্রোত ঘুরিয়ে দিয়ে ভারতবর্ষে ধর্ম ব্যতিরেকে রাষ্ট্র রফা অথবা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে কিনা। এছাড়াও তিনি বলেছিলেন যে ভারতবর্ষ যদি হিন্দুস্তান এবং পাকিস্তান এই দুটো পৃথকভাগে বিভক্ত হয়, তাহলে সংখ্যালঘু সমস্যা আরো প্রকট হবে।'৫৭

ডঃ এস. এ. লতিফের কাছে ১৯৪২ সালে লেখা চিঠিতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু পাকিস্তান পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছিলেন। তিনি এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছিলেন এই যুক্তিতে যে এতে ভারত-বর্ষের আর্থিক সংহতি বিঘ্নিত হবে। এই সংহতি ভারতবর্ষের জনসাধারণের

বৈষয়িক সমৃদ্ধি এবং সেই সংগে দেশের প্রতিরক্ষার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কেননা সামরিক শক্তি আর্থিক শক্তির ওপর নির্ভর করে। দেশের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য, ভারতীয় জনগণের দারিদ্র্য দূর করবার জন্য এবং বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সুসভ্য মান স্থাপনের জন্য পরিকল্পিত অর্থ-নীতি অত্যাবশ্যক। কিন্তু পাকিস্তান পরিকল্পনা কার্যকর হলে পরিকল্পিত অর্থনীতি চালু করা যাবে না। 'জাতির পক্ষে পরিকল্পিত অর্থনীতি আজ খুব দরকার এবং এর জন্য সেইসংগে প্রতিরক্ষা ইত্যাদির জন্য একটা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজন।'৫৮ তিনি আরো বলেছিলেন যে রাজনৈতিক বিভাগের দরুন ভারতবর্ষ যদি কয়েকটা আর্থিক খণ্ডে বিভক্ত হয় তাহলে স্বল্প প্রাকৃতিক সম্পদের দরুন পাকিস্তানই ক্ষতিগ্রস্ত হবে সব থেকে বেশী।

এছাড়া পণ্ডিত নেহেরু আরো বলেছিলেন "আজকের পৃথিবীতে বৃহত্তর যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দিকে ঝোঁক দেখা যাচ্ছে।" পাকিস্তানের পরিকল্পনা এই প্রবণতার বিপরীতমুখী। জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন ভারতবর্ষ যদি কতকগুলো রাষ্ট্রে বিভক্ত হয় তাহলে রাষ্ট্রগুলো ছোট হবে এবং সেইজন্য হবে দুর্বল। ফলে বৃহত্তর রাষ্ট্রের লেজুড় হয়ে ওঠা ছাড়া তাদের আর কোনো গতিই থাকবে না। সুতরাং তিনি কোনোরকম ভারত বিভাগেরই বিরোধী ছিলেন। কংগ্রেসের বক্তব্য ব্যাখ্যা করে তিনি যা বলেছিলেন সে কথা নীচে উদ্ধৃত করা হচ্ছে ঃ

"সাধারণভাবে বলতে গেলে কংগ্রেস দৃঢ়ভাবে ভারতবর্ষের ঐক্যে বিশ্বাসী এবং পর্যাপ্ত স্বায়ত্তশাসনসহ যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা তার উদ্দেশ্য।...তবে দিল্লীতে কংগ্রেস খুব পরিস্কারভাবেই একথা বলে দিয়েছে যে কোনো ভূখণ্ড যদি দৃঢ় ও স্পষ্টভাবে ভারত যুক্তরাষ্ট্র থেকে পৃথক হতে চায় তবে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে আটকে রাখা হবে না। স্বাভাবিকভাবেই বিচ্ছিন্নতাকে আমরা স্বাগত জানাব না। তাছাড়া কারও পৃথক হয়ে যাওয়া অনিবার্যভাবে কতকগুলো ভৌগোলিক ও অন্যান্য কারণের ওপরে নির্ভর করবে।"৫৯

(খ) কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্তর্গত কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি লীগের দুই-জাতি তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং নানা আকারে প্রস্তাবিত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবীর বিরোধিতা করেছিল। দুইজন বিশিষ্ট সোস্যালিস্ট নেতা এ. মেহতা এবং এ. পট্টবর্ধন লিখেছিলেন, "পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার চরমপন্থী দাবী অপরিমিত ক্ষতিকর...সমাধান তো দূরের কথা দেশভাগ হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলবে এবং ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তি ব্যাহত করবে।"৬০

সোস্যালিস্ট পার্টির নেতারা মনে করতেন যে লোক বিনিময় করে সামাজিকভাবে সমভাবাপন্ন হিন্দু ও মুসলমান এলাকা গঠন করা বস্তুতপক্ষে অসম্ভব।

ডঃ লতিফের পরিকল্পনার সমালোচনা করে তাঁরা বলেছিলেন "কিন্তু এই বিনিময়ের ফলে ভুগতে হবে...ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ

মানুষকে। এর ফলে বিপুলসংখ্যক মানুষ বাস্তু থেকে উৎখাত হবে। ইতিহাসে এর কোনো নজির নেই। জনসাধারণ এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি জানাবে এবং এই পরিকল্পনা কার্যকর হলে লোকের দুর্দশার অন্ত থাকবে না।"৬১

এছাড়া নেতারা মনে করতেন যে যেহেতু বর্তমান ভারতীয় অর্থনীতি 'যৌগিক প্রকৃতি'র তাই ভারতবর্ষকে কয়েকটা সার্বভৌম রাষ্ট্রে ভেঙে ফেললে আর্থিক ব্যবস্থা ব্যাহত হবে এবং পাকিস্তান হিন্দুস্তান উভয় দেশেরই জন-স্বার্থের বিরোধী হবে।

পাকিস্তান এবং হিন্দুস্তান উভয় রাষ্ট্রেই 'বিদেশী' সংখ্যালঘু গোষ্ঠী থাকবে। মেহতা এবং পট্টবর্ধনের মতে এর ফলে সংখ্যালঘু সমস্যা আরও তীব্র হয়ে উঠবে। তাদের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে ঃ "দেশভাগের পরও হিন্দু ও মুসলমান উভয় রাষ্ট্রেই অপর সম্প্রদায়ের ছিটমহল থেকে যাবে। এর ফলে এদের শান্তি ও নিরাপত্তা বিপন্ন হবে···এই ছিটমহলের চাপ থাকবেই কেননা যেসব মুসলমানরা 'হিন্দুস্তানে' থেকে যাবে লীগ তাদের সংগঠিত এবং পরিচালিত করতে চায়। তাহলে প্রতিপক্ষে হিন্দুরাও অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করবে। উভয় রাষ্ট্রেই এমন সুসংগঠিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থাকবে দেশের প্রতি যাদের আনুগত্য সন্দেহজনক। এটা উভয় রাষ্ট্রের পক্ষেই অভি-শাপস্বরূপ···।"৬২

(গ) ভারতীয় উদারপন্থীগণ

ভারতীয় উদারপন্থীরা বিভিন্ন সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত ভারতীয় জনসাধারণকে একটা জাতি হিসাবে গণ্য করতেন। ফলতঃ উদারপন্থী নেতারা পাকিস্তান পরিকল্পনা এবং তার ভিত্তিস্বরূপ দুই জাতি তত্ত্বের বিরোধিতা করেছেন।

ডঃ আর. পি. পরঞ্জপে বলেছেন, 'এটা বুঝতে হবে যে বর্তমানের ভারত-বর্ষ হিন্দু ভারতবর্ষ নয়, মুসলমান ভারতবর্ষও নয়, কেবলমাত্র ভারতবর্ষ। সুতরাং যে কোনো শক্তি ভারতবর্ষের সংহতি দৃঢ়তর করবার পক্ষে সহায়ক তার পরিপোষণ করতে হবে এবং যা কিছু হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথক করে তোলে সচেতনভাবে তার বিরুদ্ধতা করতে হবে।'৬৩

চিমনলাল, এইচ. শীতলবাদ, জিন্নার যুক্তি খণ্ডন করে বলেছিলেন, "জিন্না বলেন যে হিন্দু ও মুসলমান কখনো মিলিতভাবে ভারতীয় জাতি গঠন করতে পারে না, কেননা তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হয় না, এরা কখনো একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে না, এবং এদের ধর্মীয় দর্শনও আলাদা। কিন্তু দেখুন হিন্দুদের মধ্যেও বিভিন্ন জাত আছে এরা একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে না, এদের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধও স্থাপিত হয় না···জৈন, বৌদ্ধ, লিংগায়েত, তামিল এবং তেলেগু এদের সবারই আলাদা আলাদা ধর্মীয় দর্শন আছে এবং এরা বিভিন্ন দেবতার পূজা করে। সিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে ধর্মীয় মতভেদ প্রচণ্ড। এর ফলে প্রায়ই রক্তাক্ত দাঙ্গা ঘটে। এদের সবাইকে কি আলাদা জাতি হিসাবে গণ্য করা হবে না সেইভাবে ব্যবহার করা হবে ?"৬৪

(ঘ) হিন্দু মহাসভা

হিন্দু মহাসভা লীগের পাকিস্তান দাবীর ঘোর বিরোধী ছিল। ভারত বিভাগের বিরোধিতায় মহাসভার মনোভাব ছিল আপসহীন। হিন্দু মহাসভার সভাপতি ভি. ডি. সাভারকর লিখেছিলেন, "আমাদের কাছে (হিন্দুদের কাছে) ভারতসভা এক এবং অবিভাজ্য। বৈদিক যুগ থেকে আজকের দিন পর্যন্ত হিন্দুস্তানের ঐক্য একটা প্রতিষ্ঠিত ঘটনা। সুতরাং হিন্দুরা কখনো মুসলমানদের দাবী মতো ভারতবর্ষকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করবার প্রস্তাব বরদাস্ত করবে না।..."৬৫

সাভারকার বলেছিলেন হিন্দুরা নিজেরাই একটা স্বতন্ত্র জাতি এবং সমগ্র ভারতবর্ষ তাদের জাতীয় পবিত্রভূমি। তিনি বলেছেন, '...ভারতবর্ষে আমরা হিন্দুরা স্থায়ী জাতি বলে পরিচিত। আমাদের যে একটা সর্বজনীন পিতৃভূমি, একটা ভৌগোলিক ঐক্য আছে তাই নয়, আমাদের একটা সর্বজনীন পবিত্রভূমি আছে যেটা আমাদের পিতৃভূমির সংগে একীভূত। এ ব্যাপারটা পৃথিবীতে আর কোনো জাতির ক্ষেত্রে দেখা যায় না। এই ভারতভূমি হিন্দুস্তান, ভারতবর্ষ হল আমাদের পিতৃভূমিও বটে, আবার আমাদের পুণ্যভূমিও। আবার আমাদের সর্বজনীন সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, ঐতিহাসিক, ভাষাগত ও বর্ণগত সম্পর্ক আছে। অগণিত শতাব্দীব্যাপী সংশ্লেষ ও সমন্বয় আমাদের একটা সমভাবাপন্ন, অঙ্গাঙ্গীভাবে আবদ্ধ জাতিতে পরিণত করেছে।'৬৬

এই ধারণার তাৎপর্য অনুসারে ভারতীয় মুসলমানেরা একটা আলাদা জাতি। সাভারকারও এটা মেনে নিয়েছিলেন।

সাভারকার ভারতীয় মুসলমানদের আলাদা জাতি হিসাবে স্বীকার করে নিয়েও তাদের স্বতন্ত্র বাসভূমির দাবী কিন্তু মেনে নেন নি। তিনি আর্যাবর্ত বা ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় হিন্দুদের নিজস্ব দেশ বলে মনে করতেন এবং হিন্দুরাজ্যের স্বপ্ন দেখতেন। এই মনোভাব অযৌক্তিক।

(ঙ) ডাঃ আম্বেদকর

ডাঃ আম্বেদকর তাঁর Thoughts on Pakistan নামক গ্রন্থে পাকিস্তান বিষয়ে তাঁর মতবাদ প্রকাশ করেছেন। তিনি জাতি সম্পর্কে রেননের আদর্শবাদী তত্ত্ব মানতেন। রেনন এই বিষয়ে লিখেছেন, "একটা জাতি হল একটা জীবন্ত আত্মা, একটা আত্মিক আদর্শ। এই আত্মিক আদর্শের দুটি দিক—যা প্রকৃতপক্ষে এক—একটা হল অতীত, অন্যটি হল বর্তমান। একটা হল সমৃদ্ধ সর্বজনীন উত্তরাধিকারের স্মৃতি, আর একটা হল একত্রে বাস করবার ইচ্ছা, অখণ্ড উত্তরাধিকারকে যথাযথভাবে সংরক্ষণের আগ্রহ।"৬৭

ডাঃ আম্বেদকর মনে করতেন এই মানদণ্ডে বিচার করলে হিন্দু ও মুসলমানরা একত্র মিলে একটা জাতি হয় না। হিন্দু ও মুসলমানরা আসলে "পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রামরত সশস্ত্রবাহিনী। অতীতে এরা পরস্পরের ধ্বংস কামনা করেছে—রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেছে...। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিদ্বেষের প্রভাবে দুই সম্প্রদায়ের

মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে তার প্রভাব তথাকথিত সর্বজনীন বিষয় যা এদের বন্ধনের মধ্যে রাখতে পারে তার চেয়ে বেশী প্রবল।"৬৮

ডাঃ আম্বেদকরের মতে মুসলমানরা কেবলমাত্র একটা সম্প্রদায় নয়, একটা জাতি। সুতরাং ভারত রাষ্ট্রের সংবিধানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা করে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। সাম্প্রদায়িকতা ও জাতির পার্থক্য আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি উদ্ধৃত করা হচ্ছে ঃ

"পার্থক্যটা হল এইরকম ঃ একটা সম্প্রদায়ের রক্ষাকবচ চাইবার অধিকার আছে। কিন্তু একটা জাতির পৃথক হওয়ার দাবী করার অধিকার আছে.… আমার মনে হয় এই পার্থক্যের কারণ অন্তিম লক্ষ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত রাষ্ট্র একটা সম্প্রদায় আরেকটা সম্প্রদায়ের বিপক্ষে যেতে পারে কিন্তু অন্তিম উদ্দেশ্যের প্রশ্নে তারা মনে করে যে তারা এক কিন্তু বিভিন্ন জাতি নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রে একটা জাতি যখন আরেকটা জাতির বিপক্ষে যায় তখন বিভেদ আসে অন্তিম লক্ষ্যের পার্থক্য নিয়ে। একটা সম্প্রদায় সরকারের পদ্ধতি ও রূপের পরিবর্তন চাইতে পারে…। জাতিকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার দিতে হবে কেননা শুধুমাত্র সরকারের রূপের পরিবর্তনেই জাতি সন্তুষ্ট হবে না। জাতি অন্তিম লক্ষ্যের প্রশ্ন নিয়ে বিবাদ করে।"৬৯

ভারতীয় মুসলমানরা যে একটা জাতি এ তত্ত্বটা লীগের মুসলমানরা অনেক পরে বুঝতে পেরেছিলেন। এই বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করে ডাঃ আম্বেদকর বলেছেন, 'জাতির সব উপাদান থাকা সত্ত্বেও একটা গোষ্ঠী নিজেকে সম্প্রদায় বলে ভুল করতে পারে।'৭০

ডাঃ আম্বেদকর এই মত পোষণ করতেন যে পাকিস্তান এবং হিন্দুস্তানের মধ্যে একতা কখনই সম্ভব নয়। তিনি বলেছেন জাতিত্ব বন্ধন ছাড়া একতা প্রকৃত এবং অচ্ছেদ্য হতে পারে না। বন্ধনটা আত্মিক হওয়া চাই। মুসলমানদের আত্মিক চরিত্র স্বতন্ত্র বলে এইরকম একতা সম্ভব নয়। আম্বেদকরের মতে ভারতে একটা মাত্র সার্বভৌম কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার বিরোধিতার মধ্যেই পাকিস্তানের সারমর্ম রয়েছে। পাকিস্তান বলতে বোঝায় মুসলমান এলাকাতে মুসলমানদের একটা পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা।

ডাঃ আম্বেদকর মনে করতেন যে প্রধানতঃ মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে, অন্য ধর্মাবলম্বীদের সরিয়ে এনে এলাকাগুলো একজাতীয় করা যেতে পারে। আধুনিক উপায় ও সহায়ের মাধ্যমে ঐ ধরনের লোক বিনিময় কঠিন হবে বলে তিনি মনে করতেন না। তিনি বলেছিলেন এটা করতে যে পরিমাণ ঝঞ্ঝাট ও ব্যয় হবে, জটিল এবং প্রয়োজনীয় সমস্যার স্থায়ী এবং কার্যকরী সমাধান তা পুষিয়ে দেবে।

(চ) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

যেসব অঞ্চল প্রধানতঃ মুসলমান অধ্যুষিত সেইসব অঞ্চলে মুসলমানদের স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র গঠন এবং বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি স্বীকার করে নিয়েছিল। দলের একজন বিখ্যাত নেতা জি. অধিকারী

বলেছেন, 'আমরা যদি প্রগতিশীল অর্থে পাকিস্তান দাবীর কথা চিন্তা করি তবে দেখা যাবে যে এই দাবী প্রকৃতপক্ষে পঞ্জাব, পাঠান, সিন্ধু, বালুচিস্তান এবং বাংলার পূর্বদিকের মুসলমান জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীসমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের দাবী।'৭১

জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীসমূহের সমস্যা এবং স্বাধীন ভারতবর্ষের সম্ভাব্য রাষ্ট্রকাঠামো সম্পর্কে দলের মতবাদ ১৯৪৩ সালে দলীয় কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবের নিম্নের অংশে লিখিত হয়েছে ঃ

"(ক) ভারতীয় জনসাধারণের প্রতিটি অংশ যাদের নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে নিজস্ব বাসভূমি আছে, সর্বজনীন ঐতিহাসিক ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি ও মানসিক গঠন এবং আর্থিক জীবন আছে তাদের একটা সুস্পষ্ট জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠী হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। স্বাধীন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বশাসিত রাষ্ট্র হিসাবে থাকবার অধিকার এদের থাকবে অথবা চাইলে এদের পৃথক হওয়ার অধিকার দিতে হবে। এর অর্থ এইসব জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীর বাসভূমি যেসব ভূখণ্ডে এখন কৃত্রিমভাবে ব্রিটিশ প্রদেশসমূহ এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে আছে সেগুলো স্বাধীন ভারতে পুনরায় একত্রিত হবে সংশিলষ্ট জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীকে প্রত্যার্পণ করা হবে অর্থাৎ আগামীকালের স্বাধীন ভারত হবে পাঠান, পশ্চিম পঞ্জাবী (প্রধানতঃ মুসলমান), শিখ, সিন্ধি, হিন্দুস্তানী, রাজস্থানী, গুজরাতি, বাঙালী, আসামী, বিহারী, ওড়িয়া, অন্ধ্রবাসী, তামিলবাসী, কেরালাবাসী ইত্যাদি জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীর স্বশাসিত রাষ্ট্র-সমূহের একত্রিত যুক্তরাষ্ট্র।

"(খ) এইসব নবসৃষ্ট রাষ্ট্রে যদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে যায়, তাহলে সংস্কৃতি, ভাষা ও শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের অধিকার সাংবিধানিক রক্ষাকবচ দ্বারা রক্ষিত হবে।...

"(৪) এইভাবে অধিকারসমূহের ব্যাখ্যা করলে অর্থাৎ উপরিউক্ত উপায়ে বর্ণিত জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীসমূহের (স্বভাবতই মুসলমান ধর্মাবলম্বী জাতি-ভাবাপন্ন গোষ্ঠীসহ) স্বায়ত্তশাসনের এবং বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার স্বীকার করলে জাতীয় কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে একতার ভিত্তি রচিত হতে পারে। কারণ এর ফলে যেসব অঞ্চল প্রধানতঃ মুসলমান অধ্যুষিত সেখানে মুসলমানরা নিজস্ব স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অধিকার এবং প্রয়োজনে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার লাভ করবে।...অর্থাৎ এইরূপ ঘোষণার ফলে পাকিস্তানের যে দাবী তার ন্যায্য সারবত্তা মেনে নেওয়া হবে।

"(৫) তবে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার মেনে নিলেই যে বিচ্ছিন্নতা ঘটবে এমন মনে করবার কারণ নেই। অপরপক্ষে এর ফলে সন্দেহ নিরসন হবে। তাতে এখন একত্রে কাজ করা যাবে। উপরন্তু ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতের ঐক্য সুদৃঢ় করবে। এইরূপ নীতির ওপর ভিত্তি করে জাতীয় ঐক্য গঠিত হলে এবং মাতৃ-ভূমি রক্ষার জন্য যৌথ সংগ্রামের মাধ্যমে ঐক্য সুদৃঢ় হলে সকল জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীর লোকই একত্রিত হয়ে থাকবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারবে এবং যেখানে সকল জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীর রাষ্ট্র স্বাধীন এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন সদস্য হতে পারবে এমনকি আলাদা হয়ে যাবার অধিকারও পাবে এইরকম স্বাধীন

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবে। সকলেই বুঝবে যে এটাই স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র রক্ষার একমাত্র উপায়।..."৭২

ডাঃ অধিকারী মনে করেন যে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী প্রেরণার প্রসার এবং ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিস্তারের ফলেই ভারতে জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীসমূহের আন্দোলন বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর মতে "ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ভারতবর্ষের সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছে এবং অত্যন্ত অনুন্নত জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের কৃষক সাধারণকে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মধ্যে টেনে আনছে। দেশের মুক্তির জন্য ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন বহুজাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীর সমন্বয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। ব্যক্তিসত্তার জাগরণে লোকে আজ দেশের রাজনৈতিক ও আর্থিক মুক্তির সর্বজনীন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারছে।"৭৩

সবচেয়ে বড় সংখ্যালঘু গোষ্ঠী মুসলমান সম্পর্কে বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী, বিশেষ প্রতিনিধিত্ব এবং মুসলমানরা স্বতন্ত্র জাতি এই ধারণা ভিত্তিক মুসলীম লীগের পাকিস্তান সংক্রান্ত দাবী সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে আলোচনা করেছি।

১৯৩০ সালের পর ভারতীয় জাতীয় রাজনীতিতে জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠী এবং সংখ্যালঘুর সমস্যাই ছিল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে অনেক তীব্র বিতর্ক হয়ে গিয়েছে এবং এইসব প্রসঙ্গ আলোচনা করার সময় প্রবল রাজনৈতিক আবেগ প্রকাশ পেয়েছে।

ভারতীয় সমাজ এবং সমাজবিকাশের ধারা সম্পর্কে বস্তুগত ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে তবেই সমস্যার সামাজিক-আর্থিক দিকগুলো বোঝা যেত। এইরকমভাবে বুঝতে পারলে তবেই এই সমস্যার প্রগতিশীল সমাধান করা সম্ভব হতো।

জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীর সমস্যা প্রগতিশীল সমাধানের পূর্বশর্ত

একটা সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয় সামাজিক এবং বিশেষ রূপ সামাজিক পরিস্থিতির দরুন। যে সামাজিক পরিস্থিতির দরুন সমস্যাটার উদ্ভব হয় সেটা বিদূরিত হলেই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীর সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল সুপ্ত জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীর রাজনৈতিক সচেতনতা বিকাশের ফলে। এই জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি ছিল এবং নিজেদের মধ্যে আর্থিক জীবনও ছিল অনুরূপ। জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীসমূহের আন্দোলনের মধ্যে তাদের আঞ্চলিক সংহতি এবং আর্থিক জীবন, ভাষা ও সংস্কৃতির স্বচ্ছন্দ বিকাশের (ব্রিটিশ শাসনে এইগুলো ব্যাহত হয়েছিল) দাবী মূর্ত হয়ে উঠল।

সুতরাং এই সমস্যার সমাধানের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন ছিল এইসব জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীসমূহের অবাধ বিকাশের পথে ব্রিটিশ শাসনের রূপে যে বাধা তা অপসারণ করা এবং তাদের বিচ্ছিন্ন হবার অধিকারসমেত আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া।

ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারই জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীসমূহের সমস্যার প্রগতিশীল সমাধানের পক্ষে পর্যাপ্ত কিনা সেটাও আমাদের চিন্তা করতে হবে।

গত দুই শত বৎসরের বিশ্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে শুধুমাত্র জাতীয় স্বাধীনতাই জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীর জাতীয়তা সমস্যার সার্থক সমাধানের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী এবং বলকান দেশগুলো স্বাধীন জাতি হওয়া সত্ত্বেও জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীর সমস্যা প্রবল ছিল এবং তার মীমাংসাও সম্ভব হয় নি।

এর কারণ হল এই যে সমাজের পুঁজিবাদী আর্থিক কাঠামোতে জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীর সমস্যার পূর্ণ সমাধান সম্ভব নয়।

এক জাতির সঙ্গে আরেক জাতির এবং একই দেশের মধ্যে এক জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রামের ভিত্তিতেই পুঁজিবাদী সমাজ চলে। আবার অসম অগ্রগতির নীতির দরুন পুঁজিবাদী আর্থিক প্রগতির মধ্যে বিভিন্ন জাতি এবং বিভিন্ন জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীর অগ্রগতিতে বৈষম্য থাকে। বিশ্ব অর্থনীতির পুঁজিবাদী সংগঠনের দরুন বিভিন্ন জাতি ও জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীর বাজারের জন্য, কাঁচামালের জন্য এবং পুঁজিবিনিয়োগের ক্ষেত্রের জন্য অবিরত সংগ্রাম করে চলে। এর ফলে যুদ্ধ, শত্রুতার সৃষ্টি হয় এবং জনসাধারণ অত্যাচারিত হয় ও ক্রীতদাসত্বে আবদ্ধ হয়।

শক্তিশালী পুঁজিবাদী জাতিরা বাজার এবং কাঁচামালের সন্ধানে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে এবং বিভিন্ন জাতিকে নিজেদের অধীন করে রাখে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রয়োজনে একটি জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে ও বাকী বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রামে লিপ্ত হয়। সাম্রাজ্যবাদের যুগে, পুঁজিবাদী অবক্ষয়ের মুখে এই সংগ্রাম বিশেষ জোরদার হয়ে ওঠে, এর ফলে বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে সংহতির মনোভাব আসে না, বরং এর থেকে সৃষ্টি হয় পারস্পরিক বিরোধ, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আর অধীনস্থ জনগণের জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম। মানুষে মানুষে ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রামের ক্ষেত্র হয়ে থাকে এই বিশ্ব।

সমাজের পুঁজিবাদী সংগঠনের মধ্যে আন্তর্জাতিক এবং বিভিন্ন জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীর পারস্পরিক সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী। যদি সমাজকে প্রতিযোগিতা থেকে সরিয়ে সমবায় ভিত্তিতে অর্থাৎ সমাজতন্ত্রী অর্থনৈতিক ভিত্তিতে গড়ে তোলা যায় তবেই এই সংগ্রাম নিবারণ করা সম্ভব।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মুনাফার জন্য প্রতিযোগিতা এবং উৎপাদনের ওপর ভিত্তি করে গঠিত। সুতরাং পুঁজিবাদ মনুষ্য সমাজকে বিভিন্ন বৈরীজাতিতে বিভক্ত করে এবং জাতিকে বিবদমান জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীতে এবং শ্রেণীতে বিভক্ত করে। সমাজতন্ত্রের ভিত্তি সহযোগিতা এবং ব্যবহারের জন্য উৎপাদন। এই কারণে সমাজতন্ত্র মনুষ্য সমাজকে সহযোগিতার বন্ধনে সংহত করে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে। সমাজতন্ত্রের ব্যবস্থার অধীনে জাতি অথবা জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে কোনো পুঁজিবাদী গোষ্ঠী থাকে না। পুঁজিবাদী

গোষ্ঠীসমূহ প্রতিযোগিতার অলঙ্ঘ্য নিয়মে ও আর্থিক প্রয়োজনের তাগিদে আন্তর্জাতিক এবং বিভিন্ন জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে এবং এই বিরোধিতাকে কাজে লাগিয়ে বাজারের বিস্তার, কাঁচামালের উৎস আয়ত্ত করা ইত্যাদি গোষ্ঠীগত স্বার্থসিদ্ধি করে। সমাজতন্ত্রী অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সংগঠিত স্বাধীন জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীসমূহ ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সহযোগিতার জন্য স্বেচ্ছায় সংঘবদ্ধ হয়।

এইভাবে সমাজতন্ত্র শুধুমাত্র যে একটা জাতি এবং জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীর ওপর আধিপত্যের অবসান ঘটায় তাই নয়, জাতিতে জাতিতে এবং এক জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে অপর জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীর সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত করে।

শুধুমাত্র সমাজতন্ত্রী জাতীয় জীবনযাত্রার মধ্যেই সংখ্যালঘু সমস্যা পুরোপুরিভাবে সমাধান করা সম্ভব। স্বাধীন ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক সংবিধান সংখ্যালঘুদের নাগরিক স্বাধীনতা ও অন্যান্য অধিকার সুনিশ্চিত করতে পারে। কিন্তু অনুন্নত সম্প্রদায়ের পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক অগ্রগতির পরিস্থিতিতে তাদের বুর্জোয়া এবং বৃত্তিজীবী শ্রেণীরা ব্যবসা, শিল্পগত স্বার্থ, চাকরি এবং কাজের স্বার্থে পারস্পরিক সংগ্রামে নিজ নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণের সচেতনতাকে ব্যবহার করতে প্রলুব্ধ হয়। এর ফলে দেশে সাম্প্রদায়িকতা এবং পারস্পরিক ঘৃণা ও বিরোধ সৃষ্টি হতে বাধ্য।

সমাজতন্ত্র সমাজের শ্রেণীকাঠামো লুপ্ত করে, বুর্জোয়াদের মধ্যে শ্রেণীগত স্বার্থের অবসান ঘটায় এবং সম্প্রদায় সম্প্রদায়ে ও সেই সঙ্গে জাতিতে জাতিতে এবং এক জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে অপর জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীর শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করে।

জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীসমূহের এবং সংখ্যালঘু সমস্যার পুরোপুরি সমাধানের পূর্বশর্ত হল ভারতীয় জনগণের জাতীয় স্বাধীনতা, জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং সমাজতন্ত্রী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা।

“সাম্রাজ্যবাদ উৎখাত হয়ে গেলেও যেসব সামাজিক শক্তিগুলো ব্যক্তিগত কর্মজীবনে উন্নতিলাভের আগ্রহ ও জন্ম দেয় তার মোকাবিলা করতে হবে। এইখানেই সমাজতন্ত্র সমাধানের পথনির্দেশ করে। গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র থেকে অবিচ্ছেদ্য হয়ে ওঠে। এইখানেই ভারতীয় পুঁজিবাদ এবং সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হবে। জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীর সমস্যা জাতীয় জীবন থেকে আলাদা করা যায় না, সমাজ বিপ্লবের সঙ্গে এই সমস্যা এসে পড়ে ; পুঁজির আধিপত্যের প্রশ্ন থেকে একে আলাদা করা যায় না।...”৭৪

সূত্র নির্দেশ

১ Carr এবং Macartney দ্রষ্টব্য।
২ Winternitz, পৃ. ৬।

৩ Stalin, পৃ. ৮।
৪ Macartney এবং Carr দ্রষ্টব্য।
৫ Stalin, পৃ. ৭।
৬ Krishna, পৃ. ১৮।
৭ Carr দ্রষ্টব্য।
৮ Krishna দ্রষ্টব্য।
৯ W. C. Smith, পৃ. ১ দ্রষ্টব্য।
১০ Graham, পৃ. ৫৮।
১১ Parulekar, 'The Future of Islam in India', **Asia**, Vol. XXVIII, No. 11 (Nov. 1928), p. 874-এ উদ্ধৃত।
১২ R. P. Dutt কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ৩৮৯।
১৩ Hunter, পৃ. ১৫৬।
১৪ W. C. Smith, পৃ. ২২।
১৫ Wilson, পৃ. ১৮৮।
১৬ Graham, পৃ. ১৭৮।
১৭ Graham কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ২৭৩।
১৮ Krishna কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ১৭।
১৯ W. C. Smith দ্রষ্টব্য।
২০ উপরিউক্ত, পৃ. ২০১।
২১ Bucan, পৃ. ২৪৪।
২২ Morley, পৃ. ৩২৫।
২৩ A. Mehta এবং A. Patwardhan, পৃ. ২৮ দ্রষ্টব্য।
২৪ Lord Olivier, letter to **The Times**, 10 July, 1926.
২৫ Krishna কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ৯০।
২৬ Krishna, পৃ. ৩১৪।
২৭ উপরিউক্ত, পৃ. ৮৫।
২৮ উপরিউক্ত, পৃ. ১৩২।
২৯ উপরিউক্ত, পৃ. ১৩৩।
৩০ উপরিউক্ত, পৃ. ১৩১।
৩১ উপরিউক্ত, পৃ. ৭২।
৩২ Lord Cromer, পৃ. ১২৬-৭।
৩৩ W. C. Smith, পৃ. ২২৫।
৩৪ **India in 1919.**
৩৫ Krishna, পৃ. ২৬৬।
৩৬ A. Mehta এবং A. Patwardhan কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ৩৮।
৩৭ Pandit Jawharlal Nehru, পৃ. ৮৬।
৩৮ R. P. Dutt, পৃ. ৪১৮।
৩৯ Krishna, পৃ. ২৭৮।
৪০ উপরিউক্ত, পৃ. ২৯৬।

৪১ Pattabhi Sitaramayya দ্রষ্টব্য।
৪২ A. Mehta এবং A. Patwardhan, পৃ. ৪৩ দ্রষ্টব্য।
৪৩ **Tribune** পত্রিকায় (২১ মার্চ, ১৯৪২) Ansari-র বক্তব্য দ্রষ্টব্য।
৪৪ Mashriqui, W. C. Smith কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ২৭৮।
৪৫ Allah Bux-এর বক্তব্য, **Tribune,** 10 October, 1942.
৪৬ **India's Problem of Her Future Constitution,** পৃ. ১০৩।
৪৭ Iqbal, পৃ. ১০।
৪৮ Jinnah, পৃ. ১২।
৪৯ উপরিউক্ত, পৃ. ১৩-১৪।
৫০ Ashraf, পৃ. ৭৮-৯।
৫১ Fischer, পৃ. ৩৬-৭ দ্রষ্টব্য।
৫২ উপরিউক্ত, পৃ. ৩৪-৫।
৫৩ Ashraf, পৃ. ৭৫ দ্রষ্টব্য।
৫৪ উপরিউক্ত, পৃ. ৮২-৩।
৫৫ উপরিউক্ত, পৃ. ৯৩।
৫৬ Rajendra Prasad, পৃ. ৬-৭।
৫৭ Rajendra Prasad (2), পৃ. ৩১৯-২১।
৫৮ Dr. Nazir Yar Jung, পৃ. ২১১ দ্রষ্টব্য।
৫৯ উপরিউক্ত, পৃ. ১১৯।
৬০ A. Mehta এবং A. Patwardhan, পৃ. ২১১ দ্রষ্টব্য।
৬১ উপরিউক্ত, পৃ. ২১৩।
৬২ উপরিউক্ত, পৃ. ২১৯।
৬৩ Dr. R. P. Paranjpye, Dr Ashraf কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ৬৪-৫।
৬৪ Sir C. Setalvad, Dr. Ashraf কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ৬১।
৬৫ V. D. Savarkar, Dr. Ashraf কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ৪০-১।
৬৬ V. D. Savarkar, Dr. Ambedkar কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ১৩৫।
৬৭ Dr. Ambedkar কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ২৯।
৬৮ Dr. Ambedkar, পৃ. ৩০।
৬৯ উপরিউক্ত, পৃ. ৩২৯-৩০।
৭০ উপরিউক্ত, পৃ. ৩৩৭-৮।
৭১ Dr. G. Adhikari, পৃ. ৩৬।
৭২ উপরিউক্ত, পৃ. ১৫-৬।
৭৩ উপরিউক্ত, পৃ. ৪।
৭৪ Krishna, পৃ. ৩৪৬-৭।

উপসংহার

ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের প্রধান পর্যায়সমূহ

এতক্ষণ পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের ইতিহাস বলা হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়াশ্রিত ও ব্যক্তিচেতনাগত শক্তি ও উপাদানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়েছিল সে আলোচনাও করা হয়েছে। কি কারণে প্রাক্-ব্রিটিশ কালের আর্থিক পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে ভারতীয় জনগণের মনে জাতীয়তাবাদের আবেগ সৃষ্টি হয় নি তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় সমাজের যে মৌলিক আর্থিক রূপান্তর ঘটে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। অসংবদ্ধ ভারতীয় জনগণকে একটা জাতিতে সংহত করার ব্যাপারে যেসব পূর্ব-প্রস্তুতি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ এই রূপান্তর তার অন্যতম। ভারতীয় জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং তাদের মনে জাতীয়তাবাদী চেতনা সঞ্চারে আধুনিক যান-বাহন, নতুন শিক্ষাব্যবস্থা এবং সংবাদপত্রের মতো উপাদানের গুরুত্ব পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং এই উপাদানগুলোর ভূমিকা বর্ণনা করা হয়েছে।

ভারতের জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয়েছে। জাতীয়তাবাদ এক পর্যায় থেকে পরবর্তী পর্যায়ে যতই অগ্রসর হয়েছে ততই এর সামাজিক ভিত্তি প্রসারিত হয়েছে, এর উদ্দেশ্য আরও পরিষ্কার ও প্রকট হয়েছে এবং এর প্রকাশে বৈচিত্র্য বেড়েছে। ভারতীয় এবং বিশ্বব্যাপী শক্তি-সমূহের প্রভাবে ভারতীয় সমাজের নতুন নতুন স্তরে জাতীয়তাবাদের চেতনা প্রসারিত হয়েছে এবং এই স্তরগুলি জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেছে। এই জাতীয় জাগরণ জাতীয় জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ব্রিটিশ আমলের নতুন অর্থনৈতিক কাঠামো থেকে জাত এবং ব্রিটিশ রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অধীনস্থ নতুন শ্রেণীসমূহ তৎকালীন সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নির্বাধ এবং পরিপূর্ণ বিকাশে সম্ভব নয় দেখে ক্রমবর্ধমান হারে জাতীয় পর্যায়ে সংগঠিত হতে শুরু করেছিল এবং বিকাশের বাধাসমূহ দূর করবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আন্দোলন শুরু করেছিল। এদের এই আন্দোলন প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রসার এবং শক্তিবৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

প্রথম পর্যায়

প্রথম পর্যায়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক ভিত্তি ছিল খুব সংকীর্ণ। উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে ব্রিটিশরা ভারতে যে নতুন শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন করে তাতে যাঁরা আধুনিক শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং যাঁরা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি চর্চা করে তা থেকে গণতান্ত্রিক এবং জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণা আত্তীকরণ করেছিলেন সেই বুদ্ধিজীবীরাই ভারতীয় সমাজের সর্বপ্রথম জাতীয় চেতনা এবং আশা-আকাংক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁর আলোকপ্রাপ্ত অনুরাগীরাই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আদিপুরুষ। এঁরাই ছিলেন ভারতীয় জাতির প্রবক্তা। এই ধারণা এঁরা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেছিলেন। এঁরা গণতন্ত্র, যুক্তিবাদিতা এবং জাতীয়তাবাদের নবলব্ধ ধ্যানধারণার অনুযায়ী ভারতীয় সমাজ ও ধর্মের পুনর্বিন্যাস করবার উদ্দেশ্যে সমাজ ও ধর্মসংস্কারের আন্দোলন আরম্ভ করেন। বস্তুতঃ এই আন্দোলনসমূহ ভারতীয় জনগণের একাংশের মধ্যে সৃজ্যমান জাতীয় গণতান্ত্রিক চেতনার প্রকাশ।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এইসব প্রতিষ্ঠাতা ও আদি সংগ্রামীগণ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মতো গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য চেষ্টা করেছেন এবং দেশের শাসনব্যবস্থায় জাতির ভূমিকা প্রতিষ্ঠার দাবী জানিয়েছেন।

দ্বিতীয় পর্যায়

প্রথম পর্যায় ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত প্রসারিত। এই বৎসর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাই এর চরম পরিণতি। মোটামুটিভাবে ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায় বিস্তৃত।

উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীগণ কংগ্রেসের পরিচালক ছিলেন। এঁরাই ছিলেন দ্বিতীয় পর্যায়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কার্যক্রম ও রূপ এঁদের মতাদর্শ এবং কার্যপদ্ধতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে ভারতীয় সমাজে নব উদ্ভূত বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশের স্বার্থ প্রতিফলিত হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি প্রসারিত হল। আন্দোলনের মধ্যে এল শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী এবং বণিকশ্রেণী। আধুনিক শিক্ষা প্রসারের ফলে ঊনবিংশ শতকের শেষ নাগাদ শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিশেষ বিস্তার ঘটে। ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রসারের ফলে বণিকশ্রেণীর বিকাশ হয়। এই সময় আধুনিক শিল্পেরও প্রসার ঘটে। এর ফলে শিল্পপতিশ্রেণীর উদ্ভব এবং শক্তিবৃদ্ধি হয়। শিল্পপতিরা কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকতে শুরু করল যে কংগ্রেস দেশের শিল্পোন্নয়নের কার্যক্রম সমর্থন করত। ১৯০৫ সালে এঁরা সক্রিয়ভাবে স্বদেশী আন্দোলন সংগঠন করেছিলেন।

উদারনৈতিকদের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস শিক্ষিতশ্রেণী এবং ব্যবসায়ী বুর্জোয়াদের দাবীদাওয়া নিয়ে সোচ্চার হতো। এইসব দাবীর মধ্যে ছিল বিভিন্ন কৃত্যকের ভারতীয়করণ, শাসনকার্যে ভারতীয়দের সংশ্লিষ্ট করা, দেশ থেকে বহির্গামী আর্থিক প্রবাহ রোধ এবং কংগ্রেসের প্রস্তাবে সন্নিবিষ্ট অন্যান্য দাবীসমূহ, কংগ্রেস প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক স্বাধীনতার মতো গণতান্ত্রিক দাবীও জানাত। কংগ্রেসের সংগ্রামপদ্ধতিও উদারনৈতিক ধ্যানধারণা

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। কংগ্রেসের পদ্ধতি ছিল প্রধানত নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করা, যুক্তিতর্ক দ্বারা বোঝাবার চেষ্টা এবং ব্রিটিশ জনগণের গণতান্ত্রিক বিবেকবুদ্ধি এবং ঐতিহ্যের প্রতি ঐকান্তিক আবেদন।

ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের অত্যাবশ্যক দাবীগুলোর একটাও মেনে নিচ্ছে না দেখে জাতীয়তাবাদীদের উদারনৈতিকদের মতাদর্শ ও পদ্ধতি সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠল। নতুন দর্শনচিন্তা, রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং সংগ্রাম পদ্ধতির নতুন ধারণা সম্বলিত একটা নতুন গোষ্ঠী কংগ্রেসের মধ্যে দানা বাঁধতে লাগল।

সমাজ ও রাষ্ট্রযন্ত্রে শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীভুক্ত তরুণদের জন্য কোনো সংস্থান না থাকায় ক্রমবর্ধমান বেকারী এবং ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে বিধ্বংসী মহামারী ও দুর্ভিক্ষের ফলে ক্রমবর্ধমান আর্থিক দুর্গতির ফলে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হল সেটা কংগ্রেসের এই নতুন চরমপন্থী গোষ্ঠীর পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। বড়লাট লর্ড কার্জন কর্তৃক অবলম্বিত কয়েকটি অবাঞ্ছিত ব্যবস্থা, যথা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন, বঙ্গভঙ্গ জনমনে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ আরও বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে রাজনৈতিকভাবে সচেতন মধ্যবিত্তশ্রেণী চরমপন্থীদের দিকে ঝুঁকে পড়তে লাগল। এই চরমপন্থীরা তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, লাজপত রায়ের মতো ত্যাগী ও সুযোগ্য নেতাদের নেতৃত্বাধীন ছিল। ১৯০৫ সাল নাগাদ কিছু উদারনৈতিকের মনে ব্রিটিশ সরকার সম্বন্ধে বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করেছিল। তাঁরা অবশ্য নিজেদের রাজনৈতিক, দর্শন ও সংগ্রাম পদ্ধতি পরিত্যাগ করেন নি।

মতাদর্শের প্রশ্নে চরমপন্থীরা ছিল উদারনৈতিকদের বিপরীত।

উদারনৈতিকদের গভীর বিশ্বাস ছিল যে ভারতীয় জনগণকে সমুন্নত প্রগতিশীল সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে উন্নীত করাই ব্রিটিশদের উদ্দেশ্য। চরমপন্থীরা মনে করতেন যে ব্রিটিশ শাসন আসলে ভারতীয় জনগণকে ব্রিটিশের অধীন করে রাখা এবং তাদের ওপর আর্থিক শোষণ চালানোর উপায়। উপরন্তু উদারনৈতিকরা যখন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রশংসায় মুখর, চরমপন্থীরা ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকিয়ে প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির গরিমা প্রচার করতেন এবং তার পুনরুজ্জীবনের কথা বলতেন।

ব্রিটিশ গণতন্ত্রের কাছে আবেদন করার যে পদ্ধতি উদারনৈতিকরা অবলম্বন করতেন তার রাজনৈতিক উপযোগিতা সম্বন্ধে চরমপন্থীদের কোনো আস্থা ছিল না। এর পরিবর্তে দাবী আদায়ের জন্য বয়কট আন্দোলনের মতো পরিষদীয় রীতি বহির্ভূত পদ্ধতি অবলম্বন করে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা তাঁদের কাছে অভিপ্রেত ছিল। চরমপন্থীরা শুধুমাত্র শাসনতান্ত্রিক সংস্কারে তুষ্ট হতে পারেন নি, তাঁদের লক্ষ্য ছিল স্বশাসনের অধিকার অর্জন। ১৯০৬ সালে উদার-নৈতিকরাও এই দাবী সমর্থন করেছিলেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক অসন্তোষ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। জাতীয়তাবাদী যুবকগণের এক ক্ষুদ্র অংশ সন্ত্রাসবাদী দল হিসাবে

সংগঠিত হয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এদের পদ্ধতি ছিল সরকারী কর্মচারীদের হত্যা করা বা সময় সময় সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটানোর চেষ্টা।

তৃতীয় পর্যায়

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিকাশের তৃতীয় পর্যায় ১৯০৫ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্যায়ে চরমপন্থীরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে উদারনৈতিকদের অপসারিত করে।

সরকারের কঠোর দমননীতি সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অগ্রসর হতে থাকে। চরমপন্থীদের রাজনৈতিক প্রচারের ফলে জনগণের মনে জাতীয় আত্ম-সম্মানবোধ ও আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হয়েছিল। উদারনৈতিকদের পরামর্শ অনুসারে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশের দিকে তাকিয়ে না থেকে জনগণ স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে আত্মনির্ভরশীল হতে আরম্ভ করল। অবশ্য এই আন্দোলনের একটা ত্রুটিও ছিল। চরমপন্থী নেতারা পুনরুজ্জীবিত হিন্দু দর্শনের ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন। এর ফলে আন্দোলন কিয়দংশে জটিল এবং দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে এবং এর ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রও দুর্বল হয়ে যায়। এই আন্দোলন যে মুসলমানদের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি এটা তার অন্যতম কারণ।

তৃতীয় পর্যায় ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন সংগ্রামশীল এবং চ্যালেঞ্জকারী হয়ে উঠল এবং নিম্ন মধ্যবিত্তদের কিছু কিছু অংশ সংগ্রামে যোগ দেওয়াতে এর সামাজিক ভিত্তি প্রসারিত হল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় হোমরুল আন্দো-লনের প্রভাবে জনসাধারণের মনে রাজনৈতিক চেতনা দৃঢ়তর হয়।

এই পর্যায়ে উচ্চশ্রেণীভুক্ত মুসলমানদের অংশবিশেষ রাজনৈতিক চেতনা লাভ করে এবং ১৯০৬ সালে নিজেদের সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান মুসলীম লীগ প্রতিষ্ঠা করে। অনেকগুলো কারণে মুসলমান উচ্চশ্রেণী এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-দের রাজনৈতিক চেতনা সাম্প্রদায়িক রূপ পরিগ্রহ করে এবং এরা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে।

চতুর্থ পর্যায়

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন বিকাশের চতুর্থ পর্যায় ১৯১৮ থেকে ১৯৩০-৩৪ সালের আইন অমান্য আন্দোলন পর্যন্ত বিস্তৃত।

এই পর্যায়ের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গণভিত্তির প্রসার এবং প্রত্যক্ষ গণসংগ্রাম।

এতাবৎ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন উচ্চ ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। এই পর্যায়ে আন্দোলন ভারতীয় জনসাধারণের কিছু কিছু অংশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

বেশ কয়েকটি কারণে বিশ্বযুদ্ধের পরপর ভারতীয় জনগণের মনে জাতীয়তা-বাদী চেতনার সঞ্চার হয়। যুদ্ধ পরবর্তী আর্থিক সংকট, সরকারী প্রতিশ্রুতি

সম্পর্কে নৈরাশ্য, ক্রমবর্ধমান সরকারী পীড়ন কৃষক ও শ্রমিক সহ জনসাধারণের মনে প্রভাব ফেলেছে এবং তাদের মনে প্রবল উত্তেজনা সঞ্চার হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক বিশ্বের স্মরণীয় ঘটনাসমূহ যথা অনেকগুলো ইউরোপীয় দেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ভারতীয় জনগণের চেতনা গভীরভাবে আন্দোলিত করেছিল। যুদ্ধের সময় হোমরুল আন্দোলনও ভারতীয় জনগণের মনে রাজনৈতিক চেতনা তীব্রতর ও ব্যাপকতর করেছে। সেভরস্ (Sevres) চুক্তি ভারতীয় মুসলমানদের মনে গভীর ক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল। এর ফলে সংহত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠবার পরিবেশ তৈরী হয়ে উঠছিল।

যুদ্ধের সময় শিল্প প্রসারের ফলে ভারতীয় পুঁজিপতিগণ আর্থিকভাবে অধিকতর ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। এরা পূর্বাপেক্ষা বেশী সক্রিয়ভাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করতে লাগল। স্বদেশী এবং বয়কটের ডাক বস্তুগতভাবে শিল্পপতিশ্রেণীর স্বার্থসহায়ক হয়ে উঠেছিল। এঁরা অর্থ দিয়ে এই আন্দোলনের সহায়তা করেন। গান্ধীর শ্রেণী-সামঞ্জস্য এবং সামাজিক শান্তির নীতি এবং ১৯১৯ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত অধিবেশনে স্বদেশী প্রস্তাবের প্রতি তাঁর সমর্থনে উৎসাহিত হয়ে বুর্জোয়াদের কিছু কিছু অংশ গান্ধী এবং তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেসের জাতীয়তা-বাদী আন্দোলনসমূহ সমর্থন করতে থাকে। ১৯১৮ থেকে ভারতীয় শিল্প-বুর্জোয়াশ্রেণী গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস কর্তৃক পরিচালিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সংগ্রামের কার্যক্রম, নীতি, রণকৌশল ও রূপ নির্ধারণের ব্যাপারে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

এই পর্যায়ের আরেকটা ব্যাপার হল সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট গোষ্ঠী-সমূহের বিকাশ। ১৯২৮ সাল নাগাদ এই গোষ্ঠীগুলো শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীর স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে। উপরন্তু এই গোষ্ঠীগুলো ভারতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করে এবং ঘোষণা করে যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উদ্দেশ্য। রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন শ্রমিকগণ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল, কিন্তু তাদের স্বতন্ত্র শ্রেণীভিত্তিক কার্যক্রম ছিল না। ১৯২৬ সালের পর সাইমন কমিশন বয়কট ও অন্যান্য আন্দোলনে শ্রমিকেরা যোগ দিয়েছিল নিজস্ব পতাকা হাতে নিয়ে ও নিজস্ব স্লোগান উচ্চারণ করে। এসব ক্ষেত্রে তারা প্রায়শই শ্রমিক নেতাদের নেতৃত্বা-ধীনে আন্দোলন করেছে। এইভাবে ১৯২৬ সালের পর থেকে ভারতীয় শ্রমিক-শ্রেণী আন্দোলনে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শক্তিরূপে ক্রমশই অধিকতর প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে লাগল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেব ইতিহাসে এটা নতুন সংযোজন।

এই পর্যায়ে কংগ্রেসের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও স্পষ্টতর হল। এতকাল বলা হতো ভারতের দাবী স্বরাজ। কিন্তু এর অর্থ অস্পষ্ট। এবার স্বরাজের পরিবর্তে স্বাধীনতা হল কংগ্রেসের লক্ষ্য। দেশে যেসব যুব সংগঠন ও ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ গড়ে উঠেছিল তারাও স্বাধীনতা অর্জনই লক্ষ্য বলে ঘোষণা করল।

এইসব ঘটনাপ্রবাহের সমান্তরালে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহ সংগঠিত হতে লাগল। এই সময় বেশ কয়েকটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে।

গান্ধীর নেতৃত্বাধীনে কংগ্রেস কর্তৃক সংগঠিত আইন অমান্য আন্দোলনে (১৯৩০-৩৪) এই পর্যায়ের ঘটনাপ্রবাহ তুঙ্গে আরোহণ করে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে এই আন্দোলন দ্বিতীয় গণ আন্দোলন।

এই পর্যায়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান প্রধান লাভগুলো হল এর গণভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা, স্বাধীনতা অর্জন লক্ষ্যরূপে স্থিরীকৃত হওয়া, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণীর একাংশের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ, বিভিন্ন যুব সংগঠন ও ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের উদ্ভব এবং আন্দোলনে কৃষকদের ব্যাপকতর ভূমিকা। কতকগুলো কারণে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মন্দীভূত হয়ে যায়। এর মধ্যে কয়েকটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য—প্রথমত গান্ধী কর্তৃক ধর্ম ও রাজনীতি একত্রীকরণ এর ফলে জাতীয় চেতনা ধোঁয়াটে হয়ে যায় এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বিভ্রান্তি দেখা দেয়, দ্বিতীয়তঃ কংগ্রেসের ওপর পুঁজিপতিদের ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণ। এর ফলে জাতীয় অগ্রগতির পরিবর্তে পুঁজিপতিদের গোষ্ঠীর সঙ্গে কংগ্রেসের কার্যক্রম ও নীতির সামঞ্জস্য করা হয়েছে। এর পরে রয়েছে সাম্প্রদায়িক ভাবের বৃদ্ধি।

পঞ্চম পর্যায়

পরবর্তী পর্যায়ের শুরু ১৯৩৪ সালে এবং শেষ ১৯৩৯ সালে অর্থাৎ যে বছর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধল। এই পর্যায়ে বেশ কয়েকটা নতুন ঘটনা ঘটে। কংগ্রেসীদের একাংশ গান্ধীর মতাদর্শ, কার্যক্রম এবং কার্যপদ্ধতির ওপর আস্থা হারিয়ে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি গঠন করেন। এই দলের লক্ষ্য ছিল শ্রেণীগতভাবে কৃষক ও শ্রমিকদের সংগঠিত করা এবং এদের জাতীয় সংগ্রামের চালিকাশক্তি হিসাবে প্রস্তুত করা। অবশ্য বিভিন্ন ভাবধারায় বিশ্বাসী নানা গোষ্ঠী নিয়ে এই দল গঠিত হয়েছিল। যাদের গান্ধীবাদে বিশ্বাস অল্পবিস্তর নষ্ট হয়েছে এমন দলগুলো যারা পেটিবুর্জোয়া সামাজিক ভিত্তি থেকে উদ্ভূত তারা এতে ছিল। গান্ধীবাদ থেকে সরে আসার প্রবণতা অন্য দিক দিয়েও দেখা দিল। সুভাষ বসু কর্তৃক পরিচালিত ফরওয়ার্ড ব্লক এর দৃষ্টান্ত।

অবনত শ্রেণীসমূহের আন্দোলন ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলছিল। এটা আর একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই পর্যায়ের শেষদিকে মুসলিম লীগ সাংগঠনিক ও রাজনৈতিকভাবে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল। উপরন্তু জাতীয়তাবাদী অথবা সাম্প্রদায়িক উভয় প্রকার মনোভাবাপন্ন কয়েকটি মুসলমান সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হল।

আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল কমিউনিস্ট পার্টির দ্রুত প্রসার। ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে এই পার্টির প্রভাব ক্রমবর্ধমান হয়ে উঠল।

কৃষক আন্দোলনের দ্রুত প্রসার এই পর্যায়ের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কৃষকদের মধ্যে জাতীয় চেতনা ক্রমশ বেড়ে যেতে লাগল।

উপরন্তু তারা নিজস্ব শ্রেণী সংগঠন, শ্রেণী নেতৃত্ব, কার্যক্রম, স্লোগান এবং পতাকা গড়ে তুলতে লাগল। এ পর্যন্ত কৃষকদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন

অংশ কংগ্রেস নেতৃত্বের অনুসরণ করেছে। এখন থেকে এদের বড় অংশ নিজেদের শ্রেণীগত নেতৃত্বের অনুসরণ করতে লাগল এবং জমিদারী ব্যবস্থার বিলোপ ও সব ঋণ বাতিল করা সহ বিভিন্ন শ্রেণীগত দাবীদাওয়া প্রকাশ করতে থাকল। চেতনাসম্পন্ন কৃষকদের সংগঠন সারা ভারত কিসানসভার লক্ষ্য ছিল ভারতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। কিসানসভা কৃষকদের জন্য স্বতন্ত্র সংগ্রামের সূচনা করে এবং স্বতন্ত্র সংগঠনরূপে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগদান করে।

এই পর্যায়ের আর একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা দেশীয় রাজ্যসমূহে প্রজাসাধারণের মধ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসার। এইসব আন্দোলনের দাবীদাওয়া ছিল রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া অধিকার বিলোপ, প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান, নাগরিক অধিকার ইত্যাদি। দেশীয় রাজ্যের এইসব আন্দোলন প্রধানতঃ বণিকশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হতো। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এইসব আন্দোলনে সমর্থন জ্ঞাপন ও সহায়তা করেছে।

এই সময়ে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ভারতের বিভিন্ন জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীর জাগরণ।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশসমূহের পুনর্গঠনের তাদের দাবী এই জাগরণের লক্ষণ। অন্ধ্র, উড়িয়া, কর্ণাটকী ইত্যাদি জাগ্রত জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠী যে ভাষার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক এলাকায় সংহত হবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি এবং ব্যক্ত করছিল তাতেই এই নতুন ঘটনাপ্রবাহের লক্ষণ ধরা পড়ে।

অবশ্য স্বতন্ত্র কৃষক আন্দোলনের উদ্ভব, সমাজতন্ত্রী শক্তিসমূহের বিকাশ, জাগ্রত, জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীসমূহের আন্দোলন প্রভৃতি জাতীয় আন্দোলনের গৌণ প্রবণতা বলে ধরতে হবে। এই সমস্ত শক্তির উদ্ভব সত্ত্বেও জাতীয় আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে গান্ধীবাদী দৃষ্টিভঙ্গী এবং গান্ধীর রাজনৈতিক দর্শন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল এবং গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছিল। জাতীয় আন্দোলন তখনও প্রধানতঃ পুঁজিপতি এবং অপরাপর উচ্চশ্রেণীর স্বার্থানুসারী ছিল।

অবশ্য নতুন শক্তিসমূহ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করেছে। এর ফলে শ্রমিক ও কৃষকদের নাগরিক অধিকার ও তাদের জন্য উপশমকারী আর্থিক ব্যবস্থাদি সুনিশ্চিত করবার জন্য মৌলিক অধিকারের দাবীপত্র কংগ্রেসের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দেশের প্রধানতম জাতীয় সংগঠন এবং জাতীয় আন্দোলন পরিচালক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জাগ্রত জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীসমূহের সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বীকৃতি ছিল, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও ভাষাভিত্তিক প্রদেশ সমর্থন করল এমনকি ভাষার ভিত্তিতে গঠিত প্রদেশসমূহ ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে যেতে পারে এই অধিকারও স্বীকার করে নিল।

অবশ্য আন্দোলনে আধিপত্য অর্জনের উদ্দেশ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীসমূহের মধ্যে সংগ্রাম ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছিল।

এতাবৎ পুঁজিপতিশ্রেণী কংগ্রেসকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করত। রাজনৈতিক চেতনা এবং স্বতন্ত্র সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির সংগে সংগে শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তদের বামপন্থী মনোভাবাপন্ন অংশের রাজনৈতিক গোষ্ঠীসমূহ কংগ্রেসের নীতি ও কার্যক্রমের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সচেষ্ট হল। বাধাহীন এবং পরিপূর্ণ উন্নতির পথে বাধাসমূহ দূর করবার জন্য জাগ্রত জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীসমূহ নিজেদের দাবীদাওয়া নিয়ে আরও বেশী করে সোচ্চার হয়ে উঠতে লাগল।

পরিপ্রেক্ষিত

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে ক্রমবর্ধমান চেতনাসহ নতুন সামাজিক শক্তিসমূহের উত্থান এবং নেতৃত্বের ওপর তাদের চাপের ফলে অবশ্য আন্দোলন দুর্বল হয়ে ওঠে নি। এটা আন্দোলনে আরও গতি-শক্তি সঞ্চার করল। এতাবৎ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণ ছিল পুঁজিপতিশ্রেণীর হাতে। আন্দোলনের মধ্যে প্রধানতঃ এই শ্রেণী নিজস্ব স্বার্থ ও দৃষ্টিভংগীই প্রাধান্য লাভ করত। আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে অবস্থাটা এইরকম থাকবে নাকি নেতৃত্ব নতুন সামাজিক শ্রেণীসমূহের হাতে চলে গিয়ে এইসব শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা এবং জাতিভাবাপন্ন গোষ্ঠীসমূহ ও অপরাপর সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে সেইটাই প্রশ্ন। কি হবে তা প্রধানতঃ নির্ভর করে ভারতে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বস্তুগত পরিস্থিতির ওপর, এই সব শ্রেণী ও গোষ্ঠীর সম্পর্কের ওপর এবং এদের চেতনার গভীরতা ও সাংগঠনিক শক্তির ওপর।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে বক্ষ্যমান গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে জাতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে যে পূর্বাভাষ দেওয়া হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি করাই সংগত মনে হচ্ছে।

"এখনকার এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর আর্থিক ও সামাজিক শক্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃবর্গ প্রভূত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং তাঁদের রাজনৈতিক ও কৌশলগত দক্ষতা বিশেষ উৎকর্ষসম্পন্ন। ভারতীয় সমাজের সদ্যজাগ্রত নিম্নবর্তী স্তরসমূহ সংস্কৃতির দিক দিয়ে পশ্চাদ্পদ, সাংগঠনিক দিক দিয়ে দুর্বল এবং রাজনৈতিক দিক দিয়ে বুর্জোয়াদের তুলনায় এদের চেতনা কম। উপরন্তু এদের নেতাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা ও অভিজ্ঞতাও কম। পরিস্থিতি দেখে মনে হয় যে পরবর্তী পর্যায়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে পুঁজিপতিশ্রেণীর প্রাধান্যই থাকবে এবং আন্দোলন এই স্বার্থের অনুকূল হবে।

"পুঁজিপতিশ্রেণীর নেতৃত্বাধীন এবং তার স্বার্থে পরিচালিত ভারতীয় ইতিহাসের এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ের ঘটনাপ্রবাহ কোন দিকে যাবে সেটা মোটামুটি আন্দাজ করা যায়।

"এই হিসাবে কতকগুলো লক্ষণের কথা বলা যায়। প্রথমতঃ পরিবর্তিত ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকগণ একদিকে সুবিধা প্রদান এবং অন্যদিকে উচ্চচাপের নীতি ব্যাপকতরভাবে প্রয়োগ করবে। এতে

দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধিত হবে। কায়েমী স্বার্থপরায়ণদের অভ্যন্তরীণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা তিক্ততর হবার ফলে পরিস্থিতি শাসকদের পক্ষে অনুকূল থাকবে। এই নীতির দরুন কায়েমী স্বার্থপরায়ণ গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম তীব্রতর হবে এবং সাম্প্রদায়িকতা এবং আন্তঃপ্রাদেশিক বিবাদ-বিসংবাদ বৃদ্ধি পাবে।

"দ্বিতীয়তঃ কায়েমী স্বার্থপরায়ণদের নেতৃবর্গ সমাজের নিম্নতর পর্যায়ে সংগঠিত গণ আন্দোলনের বিরোধিতা করবে অথবা এইসব আন্দোলন বিকৃত করবে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী এবং নিজশ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বী অংশের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে।

"মনে হয় ভারতীয় ইতিহাসের পরবর্তী পর্যায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে নিয়মতান্ত্রিকতা, তীব্রতর সাম্প্রদায়িকতা। ক্রমবর্ধমান আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং কায়েমী স্বার্থপরায়ণ গোষ্ঠীর নেতৃবর্গ কর্তৃক গণ আন্দোলনের বিরোধিতা অথবা এদের হাতে আন্দোলনের বিকৃতি।"

গ্রন্থপঞ্জী

GENERAL

Adhikari, G., **Pakistan and National Unity** (1944).
Aga Khan, **India in Transition** (1918).
Ahmad, Z. A., **The Agrarian Problem in India** (1936).
Aiyer, Sir P. S. S., **Indian Constitutional Problems** (1928).
Altekar, A. S., **History of Village Communities in India** (1926).
Ambedkar, B. R.,

1. **Thoughts on Pakistan** (1941).
2. **Castes in India** (1917).
3. **Annihilation of Caste** (1936).

Andrews and Mookerjee, **The Rise and Growth of the Congress** (1938).
Ansley, Vera, **The Economic Development of India** (1937).
Arthur, Sir G., **Life of Lord Kitchener** (1920).
Ashraf, K. M. (Ed.), **Pakistan** (1940).
Aiyangar, S. K., **Ancient India and the South Indian History and Culture** (1941).
Baden Powell, **Land Systems of British India** (1882).
Banerjee, D. N., **Early Land Revenue System in Bengal and Bihar** (1936).
Banerjee, Sir Surendra Nath, **Speeches and Writings.**
Barakatulla, Mohamed, **The Khilafat** (1922).
Barker, Sir Ernest,

1. **National Character** (1927).
2. **Ideas and Ideals of the British Empire** (1941).
3. **Reflections on Government** (1942).

Barns, H. E.,

1. **Society in Transition** (1940).
2. **Sociology and Political Theory** (1925).

Barnes, Leonard,

1. **Empire or Democracy** (1939).

2. **Soviet Light on the Colonies** (1944).
Barns, Margarita,
1. **The Indian Press** (1940).
2. **India To-day and To-morrow** (1937).
Basu, Major, B. D.,
1. **The Ruin of Indian Trade and Industries** (1935)
2. **The Rise of Christian Power in India** (1931).
3. **India under the British Crown** (1933).
Beauchamp, Joan. **British Imperialism in India** (1935).
Benn, A. W., **A History of Modern Philosophy** (1933).
Besant, Annie, **How India Wrought for Freedom** (1915).
Bevan, Edwin, **Indian Nationalism** (1913).
Bolts, William, **Considerations on Indian Affairs** (1772).
Bose, Subhas Chandra, **The Indian Struggle** (1934).
Brailsford, H. N., **Subject India** (1943).
Briffault, Robert, **The Decline and the Fall of the British Empire** (1938).
Brijnarayan, **India in the Crisis** (1935).
Brooks, Adams, **The Law of Civilization and Decay**.
Bryce, James, **Modern Democracies** (1921).
Bucan, J., **Lord Minto**.
Buch, M. A.,
1. **Rise and Growth of Indian Liberalism** (1938).
2. **Rise and Growth of Indian Militant Nationalism** (1940).
3. **Rise and Growth of Indian Nationalism** (1939).
Buchanan, D. H., **The Development of Capitalist Enterprise in India** (1934).
Burgess, James, **The Chronology of Modern India** (1913).
Calverton, V. F., **The Awakening of America** (1939).
Carr, E. H. (**Chairman, Study Group**), **Nationalism** (1939).
Caudwell, C., **Studies in a Dying Culture** (1938).
Chaudhari, N. C., **Defence of India** (1935).
Chintamani, C. Y., **Indian Politics since the Mutiny** (1937).
Chirol, V.,
1. **Indian Unrest** (1910).
2. **India** (1926).
Chudgar, P. L., **Indian Princes under British Protection** (1929).
Congress Presidential Addresses (1935).

Cotton, Sir Henry, **New India or India in Transition** (1904).
Coupland, Reginald, **The Constitutional Problem in India** (1944).
Cunningham, W., **Growth of English Commerce and Industries in Modern Times** (1882).
Mehta, A. and Patwardhan, A., **The Communal Triangle in India** (1942).
Mehta, J. M., **A Study of Rural Economy of Gujarat.**
Menon, Lakshmi, N., **The Position of Women** (1944).
Mill, James. **History of British India** (1848).
Mill, John, Stuart, **Representative Government** (1867).
Mitchell, Kate, **Industrialization of the Western Pacific** (1942).
Mitra, N. N. (Ed.), **Indian Annual Registers** (Annual Publication).
Mohammad Noman, **Muslim India** (1942).
Montagu, E. S., **An Indian Diary** (1930).
Mookerji, Radha Kumud, **Fundamental Unity of India** (1926).
Moreland, W. H., **Agrarian System of Muslim India** (1929).
Morley, John, **Recollections**, Vol. II (1918).
Morrison, Theodore, **The Economic Transition in India** (1914).
Mukerjee, Radha Kamal, **Land Problems in India** (1933).
Mukerji, D. P., **Modern Indian Culture** (1942).
Muller, Max, **Biographical Essays** (1884).
Mustafa, Khan, **An Apology for the New Light** (1891).
Naoroji, Dadabhoy,

1. **Speeches and Writings** (1910).
2. **Poverty and un-British Rule in India** (1876).

Nash, V., **The Great Famine** (1900).
Natarajan. M. S., **Famine** (1944).
Natarajan, S., **Social Problems** (1942).
Nazir, Yar Jung (Ed.), **The Pakistan Issue** (1943).
Nehru, Jawaharlal, **An Autobiography** (1936).
Nehru, Motilal, (Chairman), **Nehru Committee Report** (1928).
Nehru, Rameshwari, **The Harijan Movement** (1940).
Nehru, Shaymkumari, (Ed.), **Our Cause.**
Nehru, S. S., **Caste and Credit in a Rural Area** (1942).
Nurullah, Syed, and Naik, J. P., **History of Education in India** (1943).

Oakeshott, M., **The Social and Political Doctrines of Contemporary Europe** (1939).
O'Malley (Ed.), **Modern India and the West** (1941).
Pal, B. C.,
1. **The New Spirit** (1907).
2. **Memories of my Life and Times** (1932).
Palekar, S. A., **Trade of India** (1943).
Paranjpye, M. R., **A Source-book of Modern Indian Education** (1938).
Paranjpye, R. P., **The Crux of the Indian Problem** (1931).
Parulekar, R. V., **Literacy in India** (1940).
'Punjabi', **The Confederacy of India.**
Purcell and Hallsworth, **Report on Labour Conditions in India** (1928).
Purdy, M. G., **The South African Indian Problem** (1943).
Rajendra Prasad,
1. **Pakistan** (1940).
2. **India Divided** (1946).
Ramchandra Rao, P. R., **Decay of Indian Industries** (1935).
Ranade, M. C., **Essays on Indian Economics** (1898).
Rangaiyer, C. S., **India in the Crucible** (1928).
Ranga, N. G.,
1. **Kisan Speaks** (1937).
2. **The Modern Indian Peasant** (1936).
3. **Peasants and Congress** (1938).
4. **Kisan Handbook** (1938).
5. **History of Kisan Movement** (1939).
Ray, P. C., **Life and Times of C. R. Das** (1937).
Richey, J. A., **Selections from the Educational Records**, Parts I and II (1922).
Risley, Sir H. H., **The People of India** (1915).
Rocker, R., **Nationalism and Culture** (1937).
Ronaledshay, Lord, **Life of Lord Curzon,** Vol. II (1928).
Roy, M. N.,
1. **India In Transition** (1922).
2. **Historical Role of Islam** (1938).
3. **Materialism** (1940).
Roy, Raja Ram Mohan, **English Works** (1906).
Rushbrook, Williams, **What About India ?**

Santhanam, K., **The Cry of Distress** (1949),
Sargent, J., **Progress of Education in India** (1940).
Schiff, Leonard, **The Present Condition of India** (1939).
Seal, Brajendra Nath, **Raja Ram Mohan Roy.**
Seeley, J. R., **Expansion of England** (1883).
Senart, M., **Caste in India** (1930).
Sahajanand, Swami, **The Other Side of the Shield** (193
Shah, K. T., **Why Pakistan?—Why Not?** (1940).
Shelvankar, K. S., **The Problem of India** (1940).
Shiva Rao, **Industrial Worker in India** (1939).
Sitaramayya, P., **The History of the Indian National C**
(1935).
Smith, W. C., **Modern Islam in India** (1943).
Smith, W. Roy, **Nationalism and Reform in India** (1
Soni, H. R., **Indian Transport** (1935).
Spratt, Philip, **Gandhism** (1939).
Stalin, Joseph, **Marxism and the National anc**
Question.
Stratchey, Sir John, **India, Its Administration a**
(1903).
Sun Yat Sen, **San Min Chu I** (1929).
Tagore, Rabindra Nath, **Nationalism** (1917).
Tagore Saumendra Nath,
1. **Gandhism and the Labour-Peasant**
2. **Bourgeois Democratic Revolution an**
Tawney, R. H., **Religion and the Rise of C**
Temple, Sir R., **Men and Events of My Ti**
Thomas, F. W., **History and Prospects of**
in India (1891).
Thompson, E., and Garratt, G., **Rise and**
Rule in India (1935).
Thompson, E., **Reconstruction of India**
Trevelyan, C. E., **The Education of the**
Varga, E., **The Great Crisis** (1934).
Vijayaraghavachari, Sir T., **Land and its P**
Visvesvaraya, Sir M., **Planned Economy for India**
Vivekanand, Swami, **From Colombo to Almora,** Seventeen
Lectures (1897).
Wadia, P. A., and Joshi, G. N., **Wealth of India** (1925).

Wadia, P. A., and Merchant, K. T.,
1. **Our Economic Problem** (1943).
2. **Modern Times** (1882).

Darling, M. L.,
1. **The Punjab Peasant in Prosperity and Debt** (1925).
2. **Rusticus Loquitur** (1930).

Das, C. R.,
1. **Speeches.**
2. **India for Indians** (1921).

Das, R. K., **The Labour Movement in India** (1923).
Datta, D., **Landlordism in India** (1931).
Digby, W., **Prosperous British India** (1902).
Dobb, M., **An Outline of European History** (1925).
Donogh, W. R., **The History and Law of Sedition.**
Dutt, R. C., **Economic History of British India under British Rule** (1901).
Dutt, R. P., **India To-day** (1940).
Dutt, Sukumar, **The Problem of Indian Nationality** (1926).
Edib, Halide, **Inside India** (1937).
Edwards and Merivale, **Life of Sir Henry Lawrence** (1872).
Engels, F., **Peasant War in Germany.**
Ezekiel, I. A., **Swaraj or Surrender** (1931).
Featherstone, H. L., **A Century of Nationalism** (1939).
Fischer, Louis, **A Week with Gandhi** (1943).
Fox, Ralph, **Colonial Policy of British Imperialism** (1933).
Gadgil, D. R., **The Industrial Evolution of India in Recent Times** (1933).
Gandhi, Devadas (Ed.), **India Unreconciled** (1943).

Gandhai, M. K.,
1. **Autobiography** (1940).
2. **Speeches and Writings.**
3. **Satyagraha** (1935).

Garratt, G. T., **An Indian Commentary** (1930).
Ghose, A. K., **Public Administration in India** (1930).
Ghose, Aurobindo, **Bal Gangadhar Tilak** (1919).
Ghose, N. N., **Kristodas Pal** (1887).
Ghurye, G. S. **Caste and Race in India** (1932).
Gilchrist, R. N., **Indian Nationality** (1930).
Gokhale, G. K., **Speeches** (1920).

Gooch, G. P., **Nationalism** (1920).
Graham, G. F. I., **The Life and Works of Sir Syed Ahmed** (1909).
Grant, J. B., **Health of India** (1943).
Guha, B. S., **Racial Elements in the Population** (1944).
Gyan Chand, **India's Teeming Millions** (1939).
Hardie, Kerr, **India** (1909).
Hayes, C. J. H., **Essays on Nationality** (1928).
Hartog, Sir P., **Some Aspects of Indian Education, Past and Present** (1939).
Havell, E. B., **A Short History of India** (1924).
Heber, Bishop, **Memoirs and Correspondence** (1830).
Hobhouse, L. T., **Liberalism** (1923).
Hobson, J. A., **Imperialism** (1938).
Holderness, Sir T., **Peoples and Problems of India** (1911).
Houston, F. M., and Bedi, D. B. P. L., **India Analysed**, Vols. I-IV (1933).
Hovland, J. S.,
1. **Indian Dawn** (1934).
2. **Gopal Krishna Gokhale, His Life and Speeches** (1933).
Hunter, W. W., **The Indian Musalmans** (1871).
Hutchinson, Lester, **The Empire of the Nabobs** (1937).
India League Delegation, **Report on the Conditions of India** (1934).
'Indian Mahomedan', **British India, from Queen Elizabeth to Lord Reading** (1926).
Iqbal, Sir M., **Six Lectures on the Reconstruction of Religious Thought in Islam** (1930).
Jain, L. C., **Indian Economy during the War** (1944).
Jathar and Beri, **Indian Economics** (1937).
Jayaswal, K. P., **History of India** (1935).
Jinnah, M. A., **Presidential Address** (1937).
Joseph, B., **Nationality, Its Nature and Problems** (1929).
Kabir, Humayun, **Muslim Politics** (1944).
Kay, Sir John and Malleson, Colonel, **History of the Indian Mutiny of 1857-58** (1888).
Keay, F. E., **Indian Education in Ancient and Later Times** (1938).
Keith, A. B., **A Constitutional History of India** (1936).

Kelkar, N. C., **Life and Times of Lokamanya Tilak** (1928).
Kellock, James, **Mahadev Govind Ranade** (1926).
Ketkar, S. V., **History of Caste in India,** Vol. I (1909).
Khuda Bukhsh, S., **Essays, Indian and Islamic** (1927).
Knowles, L. C. A., **Economic Development of** the **British Overseas Empire** (1924).
Kohn, Hans, **A History of Nationality in the East** (1929).
Kraemer, H., **Islam in India To-day, 'Moslem World'** (April 1931).
Krishna, K. B., **The Problem of Minorities** (1939).
Kropotkin, **The Great French Revolution** (1927).
Lajpat Rai, **Young India** (1916).
Lange, F. A., **The History of Materialism** (1925).
Laski, H. J., **The Rise of European Liberalism** (1936).
Latif, Dr A., **The Muslim Problem in India** (1939).
Lecky, W. E. H., **History of England in the Eighteenth Century (1878-1904).**
Lenin, V. I., **Selected Works** (1936).
Lokanathan, P. S., **Industrialization** (1943).
Lovett, Sir Verney, **History of Indian Nationalist Movement** (1920).
Lyall, Sir A., **Life of the Marquis of Dufferin and Ava.,** Vol. II (1905).
McCabe, Joseph, **Key To Culture.**
Macartney, C. A., **National States and National Minorities** (1934).
Macdonald, J. R., **The Awakening of India** (1910).
Malkani, N. R., **A Report on the Conditions of Harijans in Delhi.**
Mann, H. H., **Land and Labour in a Deccan Village** (1921).
Manshardt, Clifford, **The Hindu-Muslim Problem in India** (1936).
Marx, Karl, **On India.**
Marx, Karl and Engels, F., **Correspondence** (1934).
Mary, Countess of Minto, **India, Minto and Morley** (1934).
Mattahai, John, **Village Government in British India** (1915).
Maynard, Sir John, **The Russian Peasant and Other Studies** (1942).

Mazoomdar, P. C., **Life and Teachings of Keshub Chandra Sen** (1887).

Mazumdar, A. C., **Indian National Evolution** (1917).

Mehtra, Ashoka,

1. **India Comes of Age** (1940).
2. **Indian Shipping** (1940).
3. **Bombay Plan, A Criticism** (1945).

Walchand, Hirachand, **Why Indian Shipping does not Grow** (1940).

Walter, H. A., **The Ahmadiya Movement** (1918).

Webb, Beatrice, **My Apprenticeship (1938).**

Wedderburn, William, **Allan Octavian Hume** (1913).

Weisbord, A., **The Conquest of Power** (1938).

Whitehead Bishop, **Indian Problems** (1924).

Wilson, S. G., **Modern Movement among Moslems** (1916).

Winternitz, J., **Nationalities in Europe** (1945).

Wintringham, T., **Mutiny** (1936).

Yajnik, I. K., **Peasants' Revolts** (1939).

Zacharias, H. C., **Renascent India** (1933).

Zimmern, A. E., **Nationality and Government** (1919).

GOVERNMENT PUBLICATIONS

Imperial Gazetteers of India, Vols. I-IV.

Indian Statistical Abstract (Annual).

Montagu-Chelmsford Report (1918).

Report of the Indian Industrial Commission, 1916-18.

Report of the Sadler Commission, 1917-19.

Report of the Royal Commission on the Public Service (Islington Commission) (1917).

Report of the Rowlett (Sedition) Committee (1918).

Report of the Royal Commission on the Superior Civil Services in India (Lee Commission) (1924).

Report of the Bombay Riots Enquiry Committee (1925).

Report of the Indian Economic Enquiry Committee (1925).

Report of the Royal Commission on Agriculture (1928).

Report of the Butler Committee (1929).

Report of the Hartog Commission (1929).

Report of the Indian Statutory Commission (Simon Commission) (1930).

Report of the Franchise Committee (1931).

Report of the Royal Commission on Labour (1931).

Report of the Indian Central Banking Enquiry Committee (1931).

Report of the Joint Committee (1934).

Report of the Foodgrains Policy Committee (Gregory Committee) (1943).

Report of the Land Revenue Commission (Flouds Commission).

Report of the Famine Commission (Final Report) (1945).

The Moral and Material Progress in India (Annual).

নির্দেশিকা